আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসের আলোকে

সচ্চরিত্র গঠনের রূপরেখা

জাবেদ মুহাম্মাদ

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখক

জাবেদ মুহাম্মাদ। জন্ম ৮০-র দশকে। পিতা মরহুম মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম চৌধুরী। মাতা মিসেস চৌধুরী।

জন্মস্থান!
শিক্ষায় অগ্রগণ্য এলাকা ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলাধীন মিরপুর গ্রাম।

শিক্ষা!
আমি এখনও একজন শিক্ষার্থী। অবিরত জ্ঞান অর্জনে আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থী। তবু বলে রাখছি, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উচ্চতর শিক্ষাক্রমের আওতায় গবেষণায় অংশ গ্রহণের প্রত্যাশায়।

কর্ম!
হালাল উপার্জনে গড়া দেহ-মন নিয়ে চূড়ান্ত মঞ্জিলে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে হারামের পথ থেকে বেঁচে থাকার অভিপ্রায়ে আদর্শ জ্ঞান দান, প্রচার-প্রসার ও বিস্তারে রত থাকতে চাচ্ছি সব সময়ে। আর তাইতো দোয়া চাচ্ছি সকলের কাছে।

লেখালেখি ও গবেষণা!
মানবতার কল্যাণমূলক গবেষণা আমার চেতনা, আদর্শিক লেখা আমার প্রেরণা। লেখালেখি ও গবেষণাকর্মে আমি খুঁজে পাই আনন্দ। কারণ এর মাধ্যমে আমি আমার নিজেকেও সংশোধন করে পরিচালনা করতে পারি আল-কুরআনুল কারীম ও আল-হাদীস মতো। সেই সাথে সমগ্র মানবতার দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও মুক্তির জন্য ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবো বলে আমার বিশ্বাস। তাই মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যেন অনবরত দেশ ও জাতিসত্তার কল্যাণে গবেষণায় রত থেকে হক কথা বলতে ও লিখতে পারি সেজন্য প্রার্থনা করছি সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দরবারে; আর দেশ-বিদেশে অবস্থানরত অগণিত পাঠকদের কাছে প্রত্যাশা করছি একটু দোয়া, সাহায্য সহযোগিতা ও অকুণ্ঠ সমর্থন—যা আমার কলমকে করতে পারে আরো গতিশীল; চিন্তা-চেতনাকে করতে পারে আদর্শমণ্ডিত।

দায়িত্ব!
অর্জিত জ্ঞান চোখকে ভোগবাদের দিকে নিক্ষেপে স্বস্তিবোধ করছি না বলেই চাচ্ছি একটু লিখতে, একটু জানাতে, কিছুটা সচেতন করাতে জাতিকে, সমগ্র মানবতার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকলকে। আর একটু হলেও দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি এইটুকু ভেবে সান্ত্বনা পেতে।

প্রত্যাশা!
জানি একদিন আদর্শের সূর্য উদিত হবে এ সমাজে, দেশে, সারা বিশ্বে। সেদিন আমরা বেঁচে না থাকলেও আত্মা স্বস্তিবোধ করবে পরজগতে। আর তাইতো আসুন না, একটু চেষ্টা করে দেখি এমন কিছু করে যেতে পারি কি-না আজ এবং আগামীর মানুষগুলোর জন্যে।

প্রিয় পাঠক!
লেখক সম্পর্কে জানার আগ্রহে কিছুটা হলেও ভাটা ধরাতে পেরেছি বলে শুকরিয়ায় মাথা নত করছি সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে। তারপরও আপনাদের অনুসন্ধিৎসু মনকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে আবারও লিখব, আরো বিস্তারিত লিখব পরবর্তী সংস্করণে যদি আল্লাহ আমাকে তৌফিক দেন তবে। আল্লাহ হাফিজ।

মা'আসসালাম
জাবেদ মুহাম্মাদ

zabedmbd@yahoo.com

www.amarboi.org

আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসের আলোকে

সচ্চরিত্র গঠনের রূপরেখা

জাবেদ মুহাম্মাদ

সম্পাদনা

আ.ন.ম আব্দুল মান্নান খাঁন
প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান, আরবি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন খাঁন
লেকচারার, আরবি বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

ড. মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম খাঁন
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক একাডেমী
দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়

মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন মুন্সী
চেয়ারম্যান
আদর্শ শিক্ষা ও গবেষণা সোসাইটি

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ■ মগবাজার ■ বাংলাবাজার
Email : info@ahsan publication.com

www.amarboi.org

সচ্চরিত্র গঠনের রূপরেখা
প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স
(৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২২১৯৫
প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী-২০০৭
চতুর্থ প্রকাশ
জুলাই-২০১১
পরিবেশনায়
মক্কা পাবলিকেশন্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১২৫৬৬০
র‍্যাকস পাবলিকেশন্স
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
(নিচ তলা) ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৬৭০ ৬৮৬
মাওলা প্রকাশনী
১৯১, বড় মগবাজার
(দৈনিক সংগ্রামের সামনে)
ঢাকা-১২১৭, ৮৩৫৩১২৭
বর্ণ বিন্যাস
আহসান কম্পিউটার
মোবাঃ ০১৭২৬৮৬৮২০২
প্রচ্ছদ
মুবাশ্বির মজুমদার
মুদ্রণ
র‍্যাকস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ
আদর্শ শিক্ষা ও গবেষণা সোসাইটি
দূরালাপন
লেখক ঃ ০১৭১-৫-০১ ৫২ ৫০
অফিস ঃ ০১৭১৫১০৬৫৫০
ই-মেইল
zabedmbd@yahoo.com.
ISBN : 984-32-2854-5

হাদিয়া ঃ ২৬০.০০ টাকা মাত্র

Shachcharitra Gathaner Ruprekha. By : Zabed Mohammad. Published by : Ahsan Publication Katabon Masjid Complex Dhaka. Latest Edition July, 2011. **Hadia : Tk. 260.00 Only. AP-77**

www.amarboi.org

লেখকের কথা

আদর্শ মানুষ মানে আদর্শ সমাজ। আদর্শ সমাজ মানে সুন্দর শান্তিময় পরিবেশ, উন্নত রাষ্ট্র। প্রমাণ! আজ থেকে প্রায় ১৪০০ শত বছর পূর্বে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের বুকে আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে কলুষাচ্ছন্ন এক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। তৎকালীন মানুষ মানবতাবোধ ভুলে, পাশবিক আচরণে ছিলো মত্ত, যার যা ইচ্ছা তা করতেই তারা ছিলো ব্যস্ত। ঠিক এমন মুহূর্তে তাদেরই মাঝে রাসূল (সা.)-এর বালকসুলভ আচরণ, কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা ও সর্বোপরি সচ্চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ তাদেরই মুখ থেকে বের করে এনেছিল আল-আমীন উপাধি। অন্যদিকে রাসূল (সা.)-এর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাও আল কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করে দিলেন– "তোমাদের জন্য রাসূলের জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" (সূরা আল আহ্যাব, ৩৩ ঃ ২১)

মাত্র ৬৩ বছরের ব্যবধানে অসভ্য ও বর্বর জাতিকে তিনি তার সচ্চরিত্রের সুফলস্বরূপ আদর্শবান সুসভ্য জাতিতে পরিণত করেছিলেন। চরিত্র মাধুর্য দিয়ে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। প্রচার করেছিলেন মানুষের মাঝে স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ফিতরাতের ধর্ম ইসলাম। যা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া ত'আলার সেরা সৃষ্টি মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন নাজাত প্রাপ্তির লক্ষ্যে আল্লাহ মনোনীত বিধি-বিধান সমৃদ্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। এ দ্বীনের বিশাল অংশ আখলাক সম্পৃক্ত বলেই কিভাবে উত্তম আখলাক অর্জন ও অনুত্তম আখলাক বর্জন করা যায় তার সুস্পষ্ট আলোচনা পেশ করা হয়েছে– এ বইতে।

একটি স্বপ্ন!

দীর্ঘ অতিবাহিত জীবনের পরিশুদ্ধতা, কলুষিত ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ থেকে দূরে থাকার প্রবল প্রয়াস, সৎ থাকার প্রেরণা, ভাল কিছু করার চেতনা আর আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসের জ্ঞান অর্জন, সচ্চরিত্রবান বন্ধুত্ব, আদর্শ মানুষের সাহচর্য, দীর্ঘ দিনের শিক্ষকতা ও শিক্ষার্থীদের সচ্চরিত্র গঠনে দিক নির্দেশনা প্রদান এবং দুই-দুইটি বছর ধরে পাণ্ডুলিপি রচনার অন্যতম উপহার বাংলাদেশের ইসলামী বই প্রকাশনা জগতে এমন– একটি বই। যা প্রথম এবং যা হতে পারে অন্যতম আলোচিত বর্তমান ও অনাগতদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যা অধ্যয়নে হয়তো মানুষ তার নফসের পশুত্বকে বন্দী করে আদর্শ মানুষে পরিণত হতে পারবে; ভুলে যাবে সকল ভেদাভেদ। জাতিকে নিষ্কৃতি দিবে অন্যায়, অপকর্ম ও অন্যের হক হরণকারী হওয়া বা করা থেকে। এমন একটি তথ্যপূর্ণ বই উপহার দেয়া বা লেখাই ছিলো আমার স্বপ্ন। আলহামদু লিল্লাহ্, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে এমন একটি যুগোপযোগী ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বই লেখার তৌফিক দিয়েছেন বলে শুকরিয়ায় মাথা নত করছি; আর রাসূল (সা.)-এর প্রতি পেশ করছি বাংলাদশের এ প্রান্ত থেকে দুরূদ ও সালাম। যাঁর চরিত্র মাধুর্যকে কেন্দ্র করে এ বই রচিত

www.amarboi.org

তাঁর চরিত্র মাধুর্যে আলোকিত হোক, গড়ে উঠুক এ সমাজ ও পৃথিবীবাসী-পৃথিবীর মানুষগুলো। আর বাস্তবায়িত হোক দীর্ঘ দিনের লালিত আমার স্বপ্নের সোনালী সমাজ। বাংলাদেশ গড়ে উঠুক আদর্শ মানুষে আর পরিচিত হোক উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের বুকে। এ বইটি হোক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্য একটি জীবন ঘনিষ্ঠ ম্যানুয়াল এবং তাদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠনের ক্ষেত্রে অন্যতম হাতিয়ার।

কেন এ বইটি কিনবেন?

০১. শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদের সচ্চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে এই প্রথম রচিত একটি তথ্যবহুল বই এটি- যা অধ্যয়নে পাঠকদের কখন, কোথায়, কিভাবে, কী করা উচিত, কী করা অনুচিত ইত্যাদি কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে ।

০২. মুসলিম ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যায়, পৃথিবীতে মুসলিমদের সকল সফলতার মূল বিষয় ছিলো সচ্চরিত্র- যার আরেক নাম আদর্শ। এ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ায় মুসলিম জাতি আজ পদে পদে বাধাগ্রস্ত, বিনিময়ে মেনে নিতে হচ্ছে অনাদর্শিক নেতৃত্ব। একে একে হারাতে হচ্ছে মুসলিমদের কর্তৃত্ব, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এসব কিছু পুনরুদ্ধার করে মুসলিম জাতি আবার আগের অবস্থানে প্রতিস্থাপিত হওয়ার লক্ষ্যে আমাদের সকলকে প্রথমেই হতে হবে সচ্চরিত্রের গুণাবলিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

০৩. একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামের বিজয় পতাকা আকাশে উড্ডীন করার মোক্ষম হাতিয়ার হলো মুসলিমদের চরিত্র সংশোধন; সচ্চরিত্র গঠন, মেধার সমাবেশ ঘটানো, আদর্শ সংস্কৃতি ও কৃষ্টি কালচারকে পুনরুদ্ধার ও যথেষ্ট সচেতন, দায়িত্বপ্রবণ এবং মানবতাবাদী হওয়া। এ সমস্ত বিষয়গুলো কিভাবে বর্তমান ও অনাগত সন্তানেরা অর্জন করবে তার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা এ বইতে পেশ করা হয়েছে।

০৪. গতানুগতিক অন্যান্য বইতে চরিত্রের খারাপ দিক বা অসচ্চরিত্রের দিক আলোচনা করা হয়েছে বটে কিন্তু তা থেকে মুক্তির উপায় বা এ লক্ষ্যে করণীয় কী, কিভাবে তা থেকে দূরে থাকা যায় বা যাবে এগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা বিস্তারিতভাবে ঐ বইগুলোতে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রদান করা হয়নি যার ঘাটতিই মূলত এ বইটি রচনার প্রেরণা।

■ **প্রিয় পাঠক।**

আপনাদের কষ্টার্জিত **অর্থ**, আল্লাহর দেয়া অমূল্য সম্পদ **স**ময়, **মে**ধা একটি অনাদর্শিক ও অপ্রয়োজনীয় বই দিয়ে আমি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারি না। তাছাড়া এ বই ব্যবসার জন্য লিখিনি, লিখেছি আপনাদের অধ্যয়নে সচ্চরিত্রের বাস্তবায়নে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে বিন্দুমাত্র ভূমিকা রাখতে পারলে আল্লাহ আমাদেরকে সওয়াব দিবেন সেজন্যে।

কাজেই আমি আশাবাদী, বইটি আপনাদের মনের কথা বলবে, সংশোধন ও গঠনে ভূমিকা রাখবে। সুতরাং কিনে নিতে পারেন। অন্যদিকে জীবনে অনেক বইতো কিনেছেন এটাও এক কপি কিনে দেখুন না, কিছু আছে কী না আপনার প্রয়োজনীয়!

www.amarboi.org

তোহ্ফা

A Present to the Superior.

মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া

ছোট বেলায় হারানো আদরের উৎস যাঁর অনুপস্থিতি আমাকে আজও ব্যাকুল করে তোলে, তিনি হলেন আমার মরহুম বাবা। যাঁর কাছ থেকে সন্তান হিসেবে চরিত্র গঠনের সুশিক্ষা সরাসরি না পাওয়ার ঘাটতি পূরণে বিভিন্ন সময়ে আমার গর্ভধারিণী মা মিসেস চৌধুরীর কাছ থেকে বাবার চরিত্র মাধুর্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি। সেসব নিজের জীবনে প্রতিফলন ঘটানোর পাশাপাশি চলার পথে পিতৃ সমতুল্য কয়েকজন ব্যক্তির আদর-স্নেহ ভালবাসায় কাছে যাওয়ার সুবাদে তাদের চরিতাদর্শ ও জীবনাদর্শের অনুকরণ, অনুসরণের মধ্য দিয়েই আমার জীবনাদর্শ গঠন, আজকের এ পর্যায়ে উত্তরণ। তাঁদের মধ্যে যাদের নাম প্রতিধ্বনি আকারে কানে বাজে, প্রতিটি মুহূর্তে যাঁদের মুখমণ্ডল প্রতিচ্ছবি আকারে চোখের পর্দায় ভেসে উঠে তাঁদের মধ্যে একজন হলেন তিনি। যিনি সৎ, কর্মঠ, নিষ্ঠাবান এককথায় আমার দৃষ্টিতে সচ্চরিত্রবান ও আল্লাহভীরু। যিনি সকলকে উপদেশ দেন ঠিক এভাবে–

" পরিশ্রমে ধন আনে,
পুণ্যে আনে সুখ,
অলসতা আনে দারিদ্র্য,
পাপে আনে দুখ।"

যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে গর্জে উঠেন আর আল্লাহমুখিতায় হোন পুলকিত, ভালবাসায় বিভোর, সত্য ও সঠিক পথে পরিচালন এবং পোষ্যদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠনের লক্ষ্যে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত– এ মানুষ শত-সহস্র কষ্ট, ক্ষুধার জঠর জ্বালার কাছেও বিন্দুমাত্র নমনীয় হতে রাজি নন তাঁরই আমলনামায় কিয়ামত পর্যন্ত এ বই পাঠকদের পক্ষ থেকে আগত সওয়াব তোহ্ফা আকারে সংযুক্ত হোক এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হিসেবে কাল কিয়ামতে কবুল করুক– এটিই আমার প্রত্যাশা।

জাবেদ মুহাম্মাদ

www.amarboi.org

বইটি সম্পর্কে ক'টি কথা

০১. এ বইতে তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি বাস্তব জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় ১০০ টি পরিবারে সরাসরি তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রী পড়ানো এবং তাদের গঠন ও নিয়ন্ত্রণে যা বলেছি বা করেছি তার খণ্ডিত অংশও এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমার সাথে কেউ কেউ অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন বা বিষয় পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ভিন্নমতও পোষণ করতে পারেন। কেননা আমরা জানি, একমাত্র ওহীলব্ধ জ্ঞান ছাড়া কোনো জ্ঞানই শতভাগ নির্ভুল নয়। কাজেই পাঠক ও গবেষকদের কোথাও কোনো আলোচনায় ভিন্নমত থাকলে তা অনুগ্রহ করে লেখকের ফোন নম্বরে ফোন করে জানালে পরবর্তী সংস্করণে বইটিতে সংযুক্ত করে আরো সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করা হবে। আর এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনারাও সওয়াব পাবেন।

০২. সমাজ, দেশ ও দেশবাসীর বর্তমান সমস্যাকে প্রাধান্য দেয়া, তার সাথে সম্পৃক্ত করে বইটি রচনা করা, বিভিন্ন ব্যক্তি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আমাদের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতালব্ধ যেসব তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে তা নিছক কাউকে খুশি বা কারোর প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য নয়। মূলত এদেশ আমাদের সকলের, এদেশকে আমরা সকলেই গড়ব– এ জন্যেই সকলকে আরো বেশি দায়িত্বপ্রবণ ও সচেতন করে তোলার জন্যে এ বর্ণনা। তবু কোনো বর্ণনার জন্য কেউ যদি দুঃখ পান, তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আর যদি কেউ পুলকিত হোন তার আনন্দে অন্যকেও অংশীদার করার জন্য অনুরোধ করছি।

০৩. বইটি রচনার ক্ষেত্রে দেশ বিদেশের অন্যতম ইসলামিক স্কলার ও লেখকদের বই থেকে শিরোনামের সাথে সম্পর্ক রেখে অনেক লেখা কোথাও কোথাও হুবহু সংযোজন করা হয়েছে– এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা যাতে আল্লাহ্ এর সওয়াবটুকু সরাসরি তাদের আমলনামায় পৌছে দেন, যা হতে পারে তাদের জান্নাতের নিয়ামত।

পরিশেষে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে একদম শেষ মুহূর্তে বইটিকে পঁচিশ ফর্মা অর্থাৎ চারশত পৃষ্ঠায় সমাধান করার নেশায় হঠাৎ করেই কিছু লেখা সূচি থেকে বাদ দেয়া, আমার ব্যক্তিগত জীবনে ছোট বেলায় পিতৃহীনতা আর মা-বাবার প্রতি প্রবল শ্রদ্ধাবোধ, আদরের প্রতি নিরন্তর ছুটে চলা, কোথাও বা হঠাৎ করে অনাদশির্কতার করাল ছোবলে দুঃখে ভারাক্রান্ত হওয়া, অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত কথা দিয়ে ঢিল ছোড়াছুড়ি আবার কারোর হৃদয়ের ভালবাসা, আমার আদর্শ ও সৎ চিন্তা-চেতনাকে গ্রাস করতে চাইলেও দীর্ঘ দুই বছর ধরে প্রবল ইচ্ছা, আগ্রহ, আল্লাহর রহমত, প্রিয় শিক্ষার্থীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের শ্রম আমার কলমকে করেছে শানিত, গতিশীল। আমি তাদের সকলের জন্য দু'আ করছি। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করছি, আল্লাহ আমাদের ইহকাল ও পরকালে কামিয়াবী হাসিল করুন। আমীন।

জাবেদ মুহাম্মাদ

www.amarboi.org

সূচিপত্র

০১। চরিত্র ১৫

০২। মানব চরিত্রের বিভিন্নতা ১৮

■ সচ্চরিত্র ১৮

■ অসচ্চরিত্র ১৯

■ মিশ্র চরিত্র ২০

০৩। চরিত্র-সচ্চরিত্র কী ২১

■ আল কুরআনুল কারীমের আলোকে সচ্চরিত্র ২১

■ হাদিসে পাকের আলোকে সচ্চরিত্র ২৩

■ জগদ্বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকদের মতামতের আলোকে সচ্চরিত্র ২৪

০৪। সচ্চরিত্র ও অসচ্চরিত্রের স্বরূপ ২৫

০৫। সচ্চরিত্রতা কিরূপে অর্জিত হতে পারে ২৭

০৬। কুরআনের আলোকে সচ্চরিত্রবান মুসলিমদের পরিচয় ২৯

০৭। সচ্চরিত্র গঠনে ইসলামের মৌলিক ইবাদতের প্রভাব ৩৯

■ ঈমান-এর প্রভাবে সচ্চরিত্র গঠন ৩৯

■ সালাত (নামায)-এর প্রভাবে সচ্চরিত্র গঠন ৪০

■ যাকাত-এর প্রভাবে সচ্চরিত্র গঠন ৪৩

■ হজ্জ-এর প্রভাবে সচ্চরিত্র গঠন ৪৪

■ সিয়াম (রোযা)-এর প্রভাবে সচ্চরিত্র গঠন ৪৬

০৮। সচ্চরিত্র গঠনে বাসার বিভিন্ন উপকরণের প্রভাব ৪৮

০৯। সচ্চরিত্র গঠনে হালাল উপার্জনের আবশ্যকতা ও তার প্রভাব ৪৯

১০। সচ্চরিত্র গঠনে আদর্শ মায়ের ভূমিকা ৫১

১১। মুসলিমদের সংকট ও চির দুশমনের ব্যাপারে সার্বক্ষণিক সচেতনতা ৫৩

১২। সচ্চরিত্র গঠনের সময়কাল ৫৪

■ শৈশব ও বাল্যকাল ৫৪

❑ জীবনের প্রথম শিক্ষক মা-বাবার ভূমিকা ৫৫

❑ বড় ভাই, বোন ও অন্যান্য সদস্য-সদস্যার ভূমিকা ৬৪

❑ প্রতিবেশী ও আশে-পাশের পরিবেশ ৬৬

❑ আত্মীয়-স্বজনদের ভূমিকা ৬৯

www.amarboi.org

❑ বাল্যকালে বিদ্যালয়ে গমন ও শিক্ষকের সাহচর্য ৭১
❑ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ৭১
❑ সহপাঠীদের সাহচর্য ও প্রভাব ৭২
❑ প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য পুস্তক ও সিলেবাসের প্রভাব ৭৪
■ কৈশোর কাল ৭৬
❑ কৈশোর বয়সে সচ্চরিত্র গঠনে পরিবারের প্রভাব ৭৬
❑ মাধ্যমিক স্কুল-কলেজে গমন ও তার প্রভাব ৭৭
❑ শিক্ষকদের চরিত্রগত প্রভাব ৭৭
❑ পাঠ্য পুস্তক ও সিলেবাসের প্রভাব ৭৮
❑ গৃহ শিক্ষকের চরিত্রগত প্রভাব ৭৯
❑ সহপাঠী ও বন্ধুদের চরিত্রগত প্রভাব ৮০
■ যৌবন কাল ৮০
❑ যৌবন কালে সচ্চরিত্র গঠনে পরিবারের ভূমিকা ৮০
❑ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পাঠ্য পুস্তক ও সিলেবাসের প্রভাব ৮২
❑ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চরিত্রগত প্রভাব ৮৪
❑ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের পরিবেশ ও তার প্রভাব ৮৫
❑ সহপাঠীদের সাথে আড্ডা ও তার প্রভাব ৮৬

১৩। সন্তানদের সচ্চরিত্র গঠনে মা-বাবা সৃষ্ট কমন কয়েকটি ভুল ৮৭
■ অবাধে টাকা পয়সা দেয়া ৮৭
■ পরিবারে সদস্য কর্তৃক তথ্য গোপন করা ৯০
■ ভিশন সেটআপ-এ মা-বাবার যৌথ উদ্যোগের অভাব ৯১
■ অতি আদর ও অনাদর দু'টিই ক্ষতিকর ৯২

১৪। সচ্চরিত্র গঠনে শিক্ষার্থীদের পৃথক ক্যাম্পাসের আবশ্যকীয়তা
১৫। ছেলে-মেয়ে অবাধে চলাফেরা সচ্চরিত্র গঠনে প্রতিবন্ধক ৯৪
১৬। ছাত্র-যুবকদের রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ সচ্চরিত্র গঠনে প্রতিবন্ধক ৯৫
১৭। সচ্চরিত্র গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সংগঠনের প্রভাব ৯৬
■ বি. এন. সি. সি. ৯৬
■ স্কাউটিং ৯৭

১৮। সচ্চরিত্র গঠনে আদর্শ শিক্ষার প্রভাব ৯৮
১৯। মানব চরিত্রের ইতিবাচক দিক ১০২

www.amarboi.org

■ সিদক বা সত্যবাদিতা ১০২
■ সত্য প্রকাশে সাহসিকতা ও বীরত্ব ১০৫
■ মিতাচার বা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা ১০৬
❑ সদকা ও দানে মিতাচার ১০৮
❑ ব্যয়ে মিতাচার ১০৮
❑ চলাফেরায় মিতাচার ১০৮
■ ইহসান বা পরোপকার ১০৮
■ লজ্জাশীলতা ও শালীনতা ১১০
■ লজ্জাস্থানের বা গোপন অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা ১১০
■ আমানতদারী ১১১
■ ওয়াদা পালন ১১৩
■ লোভ লালসা থেকে বেচেঁ থাকা ১১৪
■ দানশীলতা ১১৫
■ ক্ষমা ১১৭
■ ক্রোধ বা রাগ প্রদমন ১১৯
■ সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা এবং দয়া ও কোমলতা ১২১
■ বিনয় ও নম্রতা ১২৩
■ ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য ১২৪
■ ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার ১২৫
■ সৃষ্টির সেবা ১২৭
■ অন্যের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা ১২৮
■ আনুগত্য ১২৯
■ কানায়াত বা অল্পে তুষ্ট থাকা ১৩০
■ ত্যাগ ও বদান্যতা ১৩১
■ উদারতা ১৩২
■ শোকর বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার ১৩৩
■ মিতব্যয়ী হওয়া ১৩৪
■ আত্মীয়ের বন্ধন রক্ষা করা ১৩৫
■ বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করা ১৩৭
■ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ১৩৮
■ পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা ১৪০
■ পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা ১৪১
■ যেখানে সেখানে পেশাব পায়খানা না করা ১৪২

www.amarboi.org

■ আচার-ব্যবহার ও আদব কায়দা ১৪৩
❑ এমতাবস্থায় একটি আদর্শ সমাজ নির্মাণে এর প্রভাব ১৪৫
■ দেশপ্রেম ১৪৬
■ অসাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবোধ ১৪৮
❑ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঃ হযরত উমর (রা.)-এর শাসনকাল ১৪৯
■ ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হওয়া ১৫৪
২০। মানব চরিত্রের নেতিবাক দিক ১৫৭
■ আমানত খিয়ানত করা ১৫৭
■ গর্ব ও অহংকার করা ১৫৮
■ হিংসা ও বিদ্বেষ ১৫৯
■ কৃপণতা ১৬১
■ অপব্যয় ও অপচয় ১৬২
■ আত্ম গৌরব ১৬৪
■ অশ্লীল কথা-বার্তা ১৬৪
■ ধোকা ও প্রতারণা ১৬৫
■ খোশামোদ, তোষামোদ ও অতিশয় প্রশংসা ১৬৬
■ তিরস্কার বা ভৎর্সনা ১৬৭
■ ঠাট্টা ও উপহাস করা ১৬৮
■ গীবত ১৬৯
■ কূটনামী ও চোগলখোরী করা ১৭৩
■ লাগামহীন কথা-বার্তা ১৭৫
■ বিশ্বাসঘাতকতা ১৭৭
■ খ্যাতি লাভের প্রবণতা ১৭৯
■ সন্দেহপ্রবণতা ১৮০
■ কথায় কথায় কসম ১৮১
■ কথা ও কাজের বৈষম্য ১৮৩
■ কীনা বা অন্তরে-অন্তরে শত্রুতা পোষণ করা ১৮৫
■ হত্যা সন্ত্রাস ১৮৬
■ চুরি ছিনতাই ১৮৮
২১। নারীদের পর্দা সংরক্ষণ অসচ্চরিত্রের মুখে কালিমা লেপন ১৯০
■ পর্দা সচ্চরিত্রবান হওয়ার ক্ষেত্রে কী আবশ্যকীয়! ১৯০
■ পর্দা নারীদের সভ্য পোশাক এবং সচ্চরিত্রের পরিচায়ক ১৯২
■ ইসলামে পর্দা ও তার বাধ্যবাধকতা ১৯৩
■ পর্দা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে তবেই পারবে ১৯৫
■ পর্দার আরো কিছু বিধান– যা অবশ্যই পালনীয় ১৯৬

www.amarboi.org

২২। নেশায় আসক্ত হওয়া সচ্চরিত্রের প্রতিবন্ধক ১৯৭
■ মদ-মাদকাসক্ত হওয়া ১৯৭
■ ধূমপান-ধূমপানে আসক্ত হওয়া ১৯৯
❑ ধূমপান থেকে মুক্তির উপায় বা করণীয় ২০৩
২৩। সচ্চরিত্র গঠনে খেলাধুলার প্রভাব ২০৫
■ খেলাধুলা সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য ২০৫
■ খেলাধুলায় সচ্চরিত্রের প্রতিবন্ধকতা ২০৬
■ খেলাধুলার প্রভাবে সচ্চরিত্র গঠনের উপায় ২০৭
২৪। সচ্চরিত্র গঠনে কালচার বা সংস্কৃতির প্রভাব ২০৭
■ কনর্সাট ও গানের প্রভাব ২০৭
■ ভালবাসা দিবস ২০৮
■ ৩১ ডিসেম্বর বা থার্টি ফাস্ট নাইট কালচার ২১১
■ পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বরণ ২১৩
■ ছায়াছবি ও নাটক ২১৪
২৫। সচ্চরিত্র গঠনে প্রিন্ট মিডিয়ার প্রভাব ২১৬
■ সংবাদ পত্র ২১৬
❑ দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক ২১৬
■ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী ও ম্যাগাজিন ২২০
❑ বার্ষিকী ও ম্যাগাজিনে কী ধরনের লেখা স্থান পাওয়া উচিত ২২০
❑ সচ্চরিত্র গঠনে স্কুল ও কলেজ বার্ষিকীর ভূমিকা ২২১
২৬। সচ্চরিত্র গঠনে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রভাব ২২২
■ বেতার (রেডিও) ২২২
■ টেলিভিশন ২২৩
■ সিডি, ভিসিডি, এমপি থ্রি প্লেয়ার ২২৭
■ স্যাটেলাইট ও ডিশ কালচার ২২৮
■ কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের কু-প্রভাব ২২৯
■ মোবাইল সমাচার বা কালচারের প্রভাব ২৩১
❑ মোবাইল ফোন ও আজকের তরুণ সমাজ ২৩১
❑ মোবাইল ফোন ব্যবহারে সৃষ্ট সমস্যা ২৩২
❑ মোবাইল ফোন অপব্যবহার রোধে আমাদের কার কী করণীয় ২৩৩
❑ ফোন ব্যবহারে সৌজন্যবোধ ২৩৫
২৭। পার্ক উদ্যান ও লেক সংলগ্ন পরিবেশের প্রভাব ২৩৬
২৮। কর্মজীবনে প্রবেশ ও এ পর্বে সচ্চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ২৩৮
২৯। উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ২৪০
■ সৎ কাজে সহযোগিতা ও অসৎ কাজে বারণ ২৪০
❑ সৎ কাজ ও অসৎ কাজ বলতে কি বুঝায় ২৪০
❑ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার উদ্দেশ্য ২৪২

www.amarboi.org

❑ সৎ কাজে আদেশ কিভাবে করবেন ২৪২
❑ অসৎ কাজে নিষেধে তিনটি বিশেষ নীতি অবলম্বন ২৪৪
■ মূল্যায়ন, মূল্যবোধ ও জবাবদিহির মনোভাব গঠন ২৪৫
❑ মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ২৪৫
❑ মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ কেন প্রদর্শন করব ২৪৭
❑ আজকের বাস্তব চিত্র ও আমাদের করণীয় ২৪৮
■ জবাবদিহি ২৫০
❑ জবাবদিহি কার-কার কাছে করতে হবে ২৫১
❑ জবাবদিহি প্রসঙ্গে আল কুরআনুল কারীমের বক্তব্য ২৫২
❑ জবাবদিহি সরকার জনগণ সবার জন্যই প্রযোজ্য ২৫২
❑ জবাবদিহির মনোভাব গঠনে প্রস্তাবনা ২৫৪
■ সবর বা ধৈর্য ২৫৫
❑ আবেগ ও প্রবৃত্তিকে প্রশমন ২৫৫
❑ সত্যের উপর অটল থাকা ২৫৬
❑ বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করা ২৫৬
❑ আল্লাহর নির্দেশ পালনে সবর ২৫৭
❑ আনন্দ ও খুশির সময় সবর ২৫৮
❑ যুলুম ও অত্যাচারের সময় সবর ২৫৮
❑ প্রতিশোধোন্মুখ উত্তেজনায় সবর ২৫৯
❑ সবরের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব ২৬০
■ সদাচারী হওয়া! সুন্দরভাবে কথা বলা! ২৬৩
❑ কোন্ ধরনের কথা বলা উত্তম ২৬৩
❑ সুন্দর কথা বলার ধরন বা রীতি ২৬৪
❑ সুন্দর কথা বলতে পারার জন্য যা প্রয়োজন ২৬৭
❑ অসুন্দর কথা মানে অশান্তি সৃষ্টি ২৬৭
❑ কিভাবে সুন্দর কথা বলা যায় ২৬৮
❑ তিন দিনের অধিক কথা-বার্তা বন্ধ রাখা নিষেধ ২৭০
■ কম হাসুন! একটু ভাবুন ২৭২
❑ কোন্ ধরনের হাসি উৎকৃষ্ট ২৭৪
❑ ক্রীড়া-কৌতুক ও চিত্ত বিনোদন ২৭৬
৩০। চরিত্রের মারাত্মক খারাপ দিক ২৭৯
■ সম্পদের মোহ বা লোভ ২৭৯
❑ বিশ্ব স্বীকৃত সম্পদশালী লোভী কারূনের শেষ পরিণতি ২৮১
■ সুদ ২৮২
❑ সুদ দেয়া নেয়া অসচ্চরিত্রের প্রতিচ্ছবি ২৮৬
❑ সুদের ক্ষতিকর দিক ২৮৮
❑ সুদ থেকে মুক্তির উপায় কী ২৮৮
■ ঘুষ ও দুর্নীতি অসচ্চরিত্রের প্রতিচ্ছবি ২৯১

www.amarboi.org

❑ ঘুষ ও দুর্নীতি থেকে মুক্তির উপায় কী ২৯৩
■ দুনিয়ার মহব্বত ২৯৫
❑ দুনিয়ার মহব্বত থেকে মুক্তির উপায় ২৯৮
■ যেদিকে মেঘ সেদিকে ছাতা; মানুষকে ভালবাসা পরে ছিদ্রান্বেষণ করা ২৯৯
❑ তেলের মাথায় তেল দেয়া ২৯৯
❑ ভালবাসা অত্যন্ত পবিত্র ৩০১
❑ ভালবাসার মূল্য পরিমাপ অযোগ্য ৩০২
❑ ভালবাসা কখন অপবিত্র বা হারাম ৩০২
❑ ভালবাসার পর ছিদ্রান্বেষণ করা অত্যন্ত জঘন্য ৩০২
■ মিথ্যাচার ৩০৪
❑ মিথ্যা সকল পাপের জননী ৩০৪
❑ কখন মিথ্যা একেবারে নিষিদ্ধ ৩০৬
❑ কখন মিথ্যা বলা বৈধ বা জায়িয ৩০৬
❑ সত্যবাদী হওয়ার উপায় বা পদ্ধতি ২০৭
■ রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত ৩০৯
৩১। বন্ধু বা সৎ সঙ্গের প্রভাব ৩১১
■ বন্ধুত্বকরণে আল্লাহর স্পষ্ট ঘোষণা ৩১১
■ বন্ধুত্বকরণে রাসূল (সা.)-এর পরামর্শ ৩১৮
■ কাকে, কিসের ভিত্তিতে বন্ধু হিসেবে নির্বাচন করবে ৩১৯
■ কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তম বন্ধু কে বা কারা ৩২০
■ এক নজরে আদর্শিক ও অনাদর্শিক বন্ধু-বান্ধবীর পরিচয় ৩২১
■ ছাত্র জীবনে বন্ধু-বান্ধব বৃদ্ধি করা অনুত্তম ৩২১
■ মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও সচ্চরিত্র গঠনে বন্ধুদের প্রভাব ৩২২
৩২। সচ্চরিত্র গঠনে বিভিন্ন সংগঠনের প্রভাব ৩২৩
■ সামাজিক সংগঠনের প্রভাব ৩২৩
■ রাজনৈতিক সংগঠনের প্রভাব ৩২৪
৩৩। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রধানের ভূমিকা ৩২৫
৩৪। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ভূমিকা ৩২৭
৩৫। মসজিদের ইমাম সাহেবদের ভূমিকা ৩২৯
৩৬। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ৩৩২
৩৭। দাওয়াতে তাবলীগের ভূমিকা ৩৩৫
৩৮। অলী আউলিয়া ও পীর মাশায়েখ এবং ভক্তদের ভূমিকা ৩৩৯
৩৯। দেশের শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদদের ভূমিকা ৩৪১
৪০। বিভিন্ন সাহিত্য কেন্দ্র, পাঠাগার ও লাইব্রেরীর ভূমিকা ৩৪৩
৪১। উপন্যাস ও উপন্যাসিকের ভূমিকা ৩৪৬

www.amarboi.org

৪২। মা-বাবার রেখে যাওয়া সম্পদের ভূমিকা ৩৫০
৪৩। সচ্চরিত্র গঠনে পরকালের প্রতি বিশ্বাসের ভূমিকা ৩৫৬
৪৪। অসৎ দোষাবলি থেকে মুক্তির উপায় ও সচ্চরিত্রবান মানুষ হওয়ার পন্থা ৩৬০
■ তাকওয়া ঃ আল্লাহভীতি ৩৬০
❑ তাকওয়ার কেন্দ্র ৩৬০
❑ তাকওয়া অবলম্বনকারীরাই মুত্তাকী বা মুমিন ৩৬১
❑ পরহেযগারীর জিন্দেগীতে সতর্কতা ৩৬২
❑ উপায় উপাদানের পবিত্রতা ৩৬৩
❑ তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৩৬৪
❑ তাকওয়া অর্জনের পন্থা ৩৬৫
■ তাকওয়াক্কুল ঃ আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা ৩৬৫
❑ তাওয়াক্কুলে সফলতা-বিফলতা ৩৬৮
■ তাওবা ও ইসতিগফার ৩৬৮
❑ তাওবা কবুলিয়াতের শর্ত কী কী ৩৬৯
❑ তাওবা করলেই কী শাস্তি রহিত হবে ৩৭১
■ আল কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত ও অনুধাবন ৩৭২
■ আমলে সালেহ বা সৎ কর্ম ৩৭৭
■ আত্মসমালোচনা ৩৭৯
❑ সচ্চরিত্রবান হওয়ার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব ও করণীয় ৩৮১
❑ মুজাহাদা (প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করা) ৩৮২
৪৫। তথ্যপঞ্জি ৩৮৪

www.amarboi.org

চরিত্র

আখলাক (اَخْلَاق) আরবি শব্দ। খুলুকুন (خُلُق)-এর বহুবচন। আখলাক অর্থ চরিত্র, স্বভাব, সদাচার, অভ্যাস, সৌজন্যমূলক আচরণ ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় কোনো মানুষের আচার-আচরণ ও দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে স্বভাব প্রকাশ পায়, তাকে আখলাক বলে। মানুষের জীবনের সবদিক আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত আখলাক বিস্তৃত। মানব জীবনের উত্তম গুণাবলিকে 'আখলাকে হামীদাহ' এবং নিকৃষ্ট ও অপছন্দনীয় দোষাবলিকে 'আখলাকে যামীমা' বলা হয়। মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁদের চরিত্র মাধুর্য ও গুণাবলি কর্মের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ.

"আল্লাহর নিকট সম্মানিত ব্যক্তি সে-ই, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বনকারী।" (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৩)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দেয় বিধান আল কুরআনুল কারীম এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর জীবনী তথা হাদিসের নীতিমালা মেনে চললে মানুষ হতে পারে আদর্শ মানুষ, হতে পারে রাসূল (সা.)-এর গুণাবলিতে বিভূষিত তথা সচ্চরিত্রবান এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠ উম্মত।

এ উম্মতের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে জীবন, সে জীবনে যাতে একজন মানুষ আল্লাহর মনোনীত বিধান তথা আল কুরআনুল কারীমে বর্ণিত গুণাবলিতে বিভূষিত হয়ে জীবন যাপন করতে পারে সে জন্য সকল করণীয় ও বর্জনীয় পথের নির্দেশনা ও নীতিমালা অত্যন্ত সুচারুভাবে এতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানব জাতির দু'জাহানের কল্যাণ ও মুক্তির পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। আপনি কী চান? কিভাবে চান? কেন চান? কোনটি আপনার দরকার? কোনটি দরকার নেই, ব্যক্তিগত কী পারিবারিক, সামাজিক কী রাষ্ট্রীয়, আন্তঃরাষ্ট্রীয়, কী আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, কী

www.amarboi.org

অর্থনৈতিক, ইতিহাস কী দর্শন, সৃষ্টিতত্ত্ব কী সৃষ্টি তথ্য ইত্যাদি সবই এতে সন্নিবেশিত করা আছে। পাশাপাশি আল্লাহ প্রেমিক ও আল্লাহদ্রোহীদের পুরস্কার ও পরিণাম, আখিরাতের অনন্ত কালের সুখকর ও দুঃসহ পরিস্থিতির মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়বিদারক চিত্রও পবিত্র কুরআনে রয়েছে। মানুষ সহজাতভাবে কু-প্রবৃত্তি ও সু-প্রবৃত্তির অধিকারী। মানুষ যাতে তার কু-প্রবৃত্তিকে অবদমিত করে সু-প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, যাতে তার মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে এবং পরিণামে জান্নাতের মতো অনন্য ও চিরস্থায়ী নিয়ামত লাভ করতে পারে সে জন্যই আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসে পাকে এ পথ নির্দেশ ও নীতিমালা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ নীতিমালা অনুসারে গড়ে উঠা একজন মানুষকে বলা হবে আদর্শবান মানুষ ও সচ্চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিত্ব।

এ পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত ধর্ম গ্রন্থ ও মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এগুলোর সবক'টিতে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে, সচ্চরিত্র মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। সচ্চরিত্রবান মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাইতো রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে।

إِنَّ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.

"নিশ্চয়ই আপনি মহোত্তম চরিত্রের ও সৎ স্বভাবের অধিকারী।" (সূরা আল কালাম, ৬৮ ঃ ০৪)

এখানে মহোত্তম চরিত্র বলতে শুধু মানুষের আখলাককেই বুঝায় না, বরং ব্যাপক অর্থে মানবীয় সকল সুকুমার বৃত্তিকেও বুঝায়। আদর্শ শিক্ষা মানুষের সুকুমার বৃত্তির উন্মেষ ঘটায় এবং যাবতীয় মানবীয় গুণে গুণান্বিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এ জন্যই বিদ্যার্জন ইসলামে ফরয করা হয়েছে। আদর্শ চরিত্র গঠনের জন্য মূলত সে শিক্ষাই সবচেয়ে অকাট্য ও অখণ্ডনীয় এবং প্রয়োজনীয়– যা মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) প্রদান করেছেন। সুতরাং সচ্চরিত্র গঠন, সদগুণ ও সৎ স্বভাব অর্জনের জন্য মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অবশ্যই মানতে হবে।

সৎ স্বভাব সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, "সৎ স্বভাবের উন্নত আদর্শ পূর্ণ করার নিমিত্তে আমি প্রেরিত হয়েছি।" (বায়হাকী শরীফ)

অন্যত্র রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

"কেবল সৎ স্বভাবকে দাঁড়ির এক পাল্লায় স্থাপন করে অন্য সমুদয় আমল অপর পাল্লায় স্থাপন করলে সৎ স্বভাবই অধিক ভারি হবে।" (বুখারী শরীফ)

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল, ইয়া

www.amarboi.org

রাসূলাল্লাহ! মানুষকে প্রদত্ত আল্লাহর সর্বোত্তম নিয়ামতটি কী! তিনি বললেন ঃ সৎ চরিত্র। (বুখারী শরীফ)

লোকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ বস্তু সর্বোত্তম? তিনি বললেন ঃ সৎ স্বভাব। তিনি আরও বললেন ঃ বরফ যেমন সূর্যের উত্তাপে গলে যায়। সৎ স্বভাব সেরূপ গুনাহসমূহকে নষ্ট করে ফেলে। কতিপয় লোক একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক স্ত্রীলোক সর্বদা সিয়াম পালন করেন এবং সমস্ত রাত্রি নামায পড়েন। কিন্তু তার স্বভাব বড় খারাপ। অশ্লীল ও কর্কশ। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। এ কথা শ্রবণে তিনি বললেন ঃ তার স্থান দোযখে। (বুখারী শরীফ)

প্রায়ই রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমার শারীরিক আকৃতি যেমন সুন্দর করেছেন আমার স্বভাবও সেরূপ সুন্দর করে দিন।" তিনি আরও বলতেন ঃ "হে আল্লাহ তোমার নিকট আমি স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও সৎ স্বভাব প্রার্থনা করছি।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

প্রত্যেকের জীবনে সফলতা অর্জনের জন্যে সচ্চরিত্রবান হওয়াই পূর্বশর্ত। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

"সে ব্যক্তিই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে এবং সে ব্যক্তিই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কু-স্বভাব দ্বারা কলুষাচ্ছন্ন করবে।" (সূরা আশ শামস, ৯১ ঃ ০৯-১০)

কু-স্বভাব বর্জন করেই সু-স্বভাব অর্জন করতে হয়। মানুষ চেষ্টা সাধনা দ্বারা স্বভাবের উন্নতি করে সৎ স্বভাবের অধিকারী হতে পারে।

রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ.

"উত্তম চরিত্রই হলো সকল নেক কাজের মূল।" (মুসলিম শরীফ)

সচ্চরিত্র মানুষের বিশেষত মুমিনের উত্তম ভূষণ। সচ্চরিত্র বলেই প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যায়। নবী কারীম (সা.) বলেছেন ঃ

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

"তোমাদের মাঝে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী তারাই যারা সচ্চরিত্রের অধিকারী।" (আবু দাউদ শরীফ)

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন ঃ

www.amarboi.org

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا.

"তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট।" (বুখারী শরীফ)

পবিত্র কুরআনে সচ্চরিত্রের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের জীবনে সফলতার জন্য ঈমানের পর পরই সচ্চরিত্রকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আমল সাব্যস্ত করেছে। অসচ্চরিত্রকে ঈমানের বিপরীত আমল বলে বিবেচনা করেছে এবং তা থেকে বেঁচে থাকার প্রতি কঠোর তাকিদ প্রদান করেছে। কেননা সচ্চরিত্রহীন ব্যক্তি পশুর সমতুল্য বরং পশুর চেয়েও অধম ও নিকৃষ্ট।

মানব চরিত্রের বিভিন্নতা

সচ্চরিত্র

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। এ মানুষের ক্ষেত্রে সচ্চরিত্র হচ্ছে ঈমান আর অসচ্চরিত্র হচ্ছে মুনাফেকী। কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের গুণাবলির বা সচ্চরিত্রের বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন। এরপর মানুষ যাতে খুব সহজে তা বাস্তবায়ন করতে পারে সেজন্য হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে তা দুনিয়ার জিন্দেগীতে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সচ্চরিত্রই হচ্ছে মানুষের ভূষণ, শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চরিত্র ছিলো কুরআন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ.

"ক্ষমা অবলম্বন করুন, সৎ কাজের আদেশ করুন এবং মূর্খদের থেকে দূরে থাকুন।" (সূরা আল আ'রাফ, ০৭ ঃ ১৯৯)

এই আয়াত নাযিল হবার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) জিবরাঈল (আ.)-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি আরয করলেন, আল্লাহ পাকের কাছ থেকে না জানা পর্যন্ত এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। অতঃপর জিবরাঈল (আ.) আকাশে গেলেন এবং ফিরে এসে আরয করলেন, এর উদ্দেশ্য এই, যে আপনার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে আপনি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবেন; যে আপনাকে না দেয়, আপনি তাকে দিবেন এবং যে আপনার প্রতি অন্যায় করে, আপনি তাকে ক্ষমা করবেন। রাসূলে কারীম (সা.) বলেন ঃ

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

"আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করতে প্রেরিত হয়েছি।" তিনি আরও বলেন ঃ

www.amarboi.org

اَثْقَلُ مَايُوْضَعُ فِى الْمِيْزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ.

"কিয়ামতের দিন মীযানে সর্বাধিক ভারী বস্তু হবে, আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্র।" (বুখারী শরীফ)

কাজেই বলা যায়, সচ্চরিত্র হচ্ছে একজন ব্যক্তির কাছে আল্লাহর হক ও মানুষের হক সংরক্ষিত হওয়া। ফলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ভোগ করে থাকে।

অসচ্চরিত্র

সৃষ্টি স্রষ্টার নিয়ম-নীতি প্রদর্শিত পথ ও মত এবং রাসূল (সা.)-এর জীবন ও চরিত্র অনুসরণ ও অনুকরণ করে চলার চেষ্টা করবে, চলবে এটা স্বাভাবিক। এ স্বাভাবিক নিয়ম যেখানে লঙ্ঘন হয়, যেখানে মানুষ নিজের আমিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বা নিজেকে শক্তিমান হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চায় সেটাই অসচ্চরিত্র। এ আমিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে যেয়ে যুগে যুগে ধ্বংস হয়েছে ফেরাউন, কারুন ও নমরূদের মতো কত শক্তিশালী খোদা দাবিকারী। আবার অনেকে নিজের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যখন মনে যা চেয়েছে তাই দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে অবাধে। তাদের চেহারা দু'রকম, বাইরে লোকজনের সাথে একরকম ভিতরে আরেক রকম। এ ধরনের লোকেরা প্রকৃত জ্ঞান থেকে দূরে থাকে বা অপব্যাখ্যা করে নিজেদের নামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবাধে এমন খারাপ কাজগুলো করে থাকে।

মানুষের মধ্যে রূহ ও নফসের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। রূহ মানুষকে সুপথে পরিচালিত করে আর নফস তাকে কুপথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। যে মানুষ নফসের বশবর্তী সে পশুবৎ অসচ্চরিত্রবান এবং যে মানুষ রূহ কর্তৃক চালিত হয় সে-ই সচ্চরিত্রবান, পুণ্যবান। রূহ ও নফসের দ্বন্দ্বই আল্লাহ তা'আলার আদেশ। রূহ নফসের তাড়না হতে মানুষকে রক্ষা করতে সর্বদা যত্নবান। নফস রূহের বশবর্তী হলে কুরআনের আদেশ পালন ও হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ অনুকরণ সহজসাধ্য হয়। যে মানুষের নফস রূহের উপর কর্তৃত্ব করে সে সকল অনুশাসন অমান্য করে। স্রষ্টার আদেশ লঙ্ঘন করে এবং অমানবোচিত কার্যের দ্বারা চির দুঃখ, চির অশান্তি খরিদ করে। নফসের সাথে যুদ্ধকে বড় জিহাদ বলে। যে মানুষ নির্জনতা, অল্পাহার, অনিদ্রা ও নির্বিকারের শিকল দ্বারা প্রবৃত্তিকে হেফাযত করে আল্লাহর দিকে মনকে ঝুঁকাইতে পারে, যে বস্তু প্রবৃত্তির নিকট অধিক আকর্ষক, তাকে সর্বাগ্রে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, সেই হতে পারে সচ্চরিত্রবান। আর যদি কাম-বৃত্তি, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, ধন-সম্পদ লিপ্সা, রিয়া,

www.amarboi.org

অহংকার-হিংসা আত্মগরিমা, সম্মান-লালসা ভোজন স্পৃহাসহ যে সকল বিষয়গুলো অন্য মানুষের দৃষ্টিতে খারাপ সেগুলো যার মধ্যে প্রদর্শিত হয় সেই অসচ্চরিত্রের পরিমণ্ডলে আচ্ছন্ন। আর তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি হচ্ছে ঃ

فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.

"যে আমার বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং পার্থিব জীবন ব্যতীত আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না, তার নিকট হতে সরে যাও।" (সূরা আন নাজম, ৫৩ ঃ ২৯)

একবার রাসূল (সা.)-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, অশুভ ব্যাপার কী? তিনি বললেন অসচ্চরিত্র। আরেক ব্যক্তি আরয করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু নসীহত করুন। রাসূল (সা.) বললেন ঃ যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় করো। সে আরয করল, আরও বলুন, রাসূল (সা.) বললেন ঃ কোনো গোনাহ করে ফেললে সাথে সাথে কোনো সৎ কাজ কর। এতে সেই গোনাহ মিটে যাবে। লোকটি বলল আরও বলুন, রাসূল (সা.) বললেন ঃ মানুষের নিকট সচ্চরিত্র প্রদর্শন করো। অন্য এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করল, উত্তম আমল কোনটি?

রাসূল (সা.) বললেন ঃ সচ্চরিত্র প্রদর্শন উত্তম আমল।

মিশ্র চরিত্র

ভাল-মন্দ জুড়েই মানুষের চরিত্র। তবে মানুষ যেদিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে সেদিকটিই বেশি ফুটে উঠে এবং এর ভিত্তিতেই তার পরিচয় সে বহন করে। এখানে মিশ্র চরিত্র বলতে বুঝানো হচ্ছে সচ্চরিত্র ও অসচ্চরিত্রের সম্মিলন ঘটানো। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কতক লোকের চরিত্রে এমন প্রভাব দেখা যায়, তারা নামায আদায় করে আবার ঘুষও খায়, সুদী ব্যাংকে একাউন্টও করে, মুখে দাঁড়ি রাখে আবার সুযোগ বুঝে কাজ করতে চায়, যেখানে স্বার্থ আছে সেখানে তারা নৈতিকতাবোধ ভুলে যায়। তারা এখনই কথা বলে এক রকম আবার একটু পরেই আরেক রকম। এখনই কাজ করে সত্য সুন্দর ও কল্যাণধর্মী আবার একটু পরেই দেখা যায়, অসত্য, অসুন্দর ও অকল্যাণধর্মী কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে। এতে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আরো বেশি ক্ষতি হয়ে থাকে।

ইসলাম ধর্মে বর্ণিত মুনাফিকদের চরিত্রের সাথে তাদের অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মুনাফিকরা হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিম জাতির শত্রু; তাদের সাথে কখনোই সচ্চরিত্রবান লোকের বন্ধুত্ব বা সুসম্পর্ক হতে পারে না। আর হলেও টিকে থাকে না। ইসলাম ধর্মের উষালগ্নে মুনাফিকদের দ্বারা রাসূল (সা.) ও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুরা যতটা বিব্রত হয়েছেন ততটা অন্য শত্রু বা

www.amarboi.org

প্রকাশ্য শত্রু দ্বারাও হননি। রাসূল (সা.) তাই মুনাফিক তথা যারা মুখে বলে একটা বাস্তবে করে আরেকটা এমন ব্যক্তি থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। এ সকল ব্যক্তিদের ব্যাপারে পূর্ব থেকে কোনো সতর্ক দৃষ্টি রাখা যায় না। এতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জাতি সত্তার বিশাল ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। তারা দেশ ও জাতি সত্তার শত্রু। তাদেরকে অনুসরণ, অনুকরণ করে পথ চলার কোনো সুযোগ নেই। এমন ব্যক্তিরা দেশ ও জাতি সত্তার জন্য তো কিছু করেই না বরং প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজন যাদের হক বেশি তাদের হকের ব্যাপারেও সচেতন না হয়ে তারা শুধু স্ব-পূজারী হয়ে থাকে। তারা একবার ভাল কাজ করবে আবার কখনো কখনো অনায়াসেই মন্দ কাজ করতে থাকবে তাহলে তো এটাকে ভাল বলা যায় না। তাদের উপর কোনো কাজের জন্য নির্ভর করা যায় না। তাদের ব্যক্তিগত কোনো স্থিরতা বা দৃঢ়তা থাকে না। এমন মানুষগুলো সচ্চরিত্রের লেবাসে সমাজ সামাজিকতার বিশাল ক্ষতি করে থাকে। ইসলাম ধর্ম এমন চরিত্রের লোকজন থেকে মুমিনদেরকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে।

মিশ্র চরিত্রের লোকজনের অবস্থা হলো কিছুদিন বা কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর অন্যরা তাদেরকে সম্মান করে না। তাদেরকে বাটপার বা প্রতারক, ধোঁকাবাজ বলেই জানে। তাদের কথা ও কাজের প্রতি কারো কোনো বিশ্বাস থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তির কারণে কেউ সরাসরি তাদেরকে খারাপ না বললেও কোনো কাজের নেতৃত্ব সমর্পণের ক্ষেত্রে তাদেরকে কেউ সমর্থন করে না। এরূপ লোক সকল সমাজে যেমনি ধিকৃত তেমনি আল্লাহর কাছেও কঠিন শাস্তির তালিকায় রয়েছে।

চরিত্র-সচ্চরিত্র কী

আল কুরআনুল কারীমের আলোকে সচ্চরিত্র

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ط ذٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ص وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ

www.amarboi.org

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"মুমিন লোকদেরকে বলো, তারা যেন চক্ষুদ্বয়কে সংযত রাখে। তাদেরকে বলো যেন তারা চরিত্রকে ঠিক রাখে এবং মুমিন স্ত্রীলোকদেরকে বলো যেন যাদের সাথে সাক্ষাৎ করার হুকুম আছে তাদের ছাড়া অপরিচিত পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি না দেয়, পরহেয করে, তারা যেন শরীরের অলঙ্কৃত অংশ (বহিরাংশ ব্যতীত) না দেখায়, তাদের বক্ষের উপর আবরণ টেনে দেয় এবং নর্তকীদের ন্যায় পদ-নিক্ষেপ না করে। এর দ্বারা নিশ্চয় তারা কুকার্য হতে রক্ষা পাবে এবং তারা যেন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে– যেন তিনি তাদেরকে পতন হতে রক্ষা করেন।" (সূরা আন নূর, ২৪ ঃ ৩০-৩১)

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ "নিশ্চয়ই (হে মুহাম্মাদ) তুমি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত আছো।" (সূরা আল কালাম, ৬৮ ঃ ০৪)।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম চরিত্রের নমুনা বিদ্যমান।" (সূরা আল আহযাব, ৩৩ ঃ ২১)

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

"নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে।" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ১৪৫)

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ.

"আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৪০)

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ.

"অতএব আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না।" (সূরা আল কালাম, ৬৮ ঃ ০৮)

www.amarboi.org

হাদিসে পাকের আলোকে চরিত্র

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ. فَاحِشًا وَّلاَمُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلاَقًا.

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতিগতভাবে অশ্লীলতা পছন্দ করতেন না এবং তিনি অশ্লীল ভাষীও ছিলেন না। তিনি বলতেন ঃ "তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট লোক তারাই, যাদের চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ صـ قَالَ مَا مِنْ شَئٍ اَثْقَلُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَاِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىَّ.

আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দার আমলনামায় সচ্চরিত্রের চাইতে অধিকতর ভারী আর কোনো আমলই হবে না। বস্তুত আল্লাহ অশ্লীল ভাষী ও নিরর্থক বাক্য ব্যয়কারী বাচালকে ঘৃণা করেন।" (তিরমিযী শরীফ)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ عَنْ اَكْثَرِ مَايُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ قَالَ تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَايُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ.

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, অধিক কোন জিনিস লোকদের জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বলেন ঃ "তাকওয়া বা আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র। তাঁকে আরো জিজ্ঞাসা করা হলো, অধিক কোন্ জিনিস লোকদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তিনি বলেন ঃ মুখ ও লজ্জাস্থান"। (তিরমিযী শরীফ)

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَآئِهِمْ.

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "ঈমানের দিক থেকে সর্বাধিক কামিল মুমিন

www.amarboi.org

সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে সর্বোত্তম আচরণকারী।" (তিরমিযী শরীফ)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ - يَقُوْلُ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهٖ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "মুমিন ব্যক্তি অবশ্যই তার সুন্দর স্বভাব ও সচ্চরিত্র দ্বারা দিনে সিয়াম পালনকারী ও রাত জেগে ইবাদতকারীর মর্যাদা হাসিল করতে পারে।" (আবু দাউদ শরীফ)

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ اَخْلَاقِ الْاِيْمَانِ مَنْ اِذَا غَضِبَ لَمْ يُدْخِلْهُ غَضْبَةٌ فِيْ بَاطِلٍ وَمَنْ اِذَا رَضِىَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ مِنْ حَقٍّ وَمَنْ اِذَا قَدَّرَ لَمْ يَتَّعَاطُ مَالَيْسَ لَهُ.

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "তিনটি বস্তু মুমিনের চারিত্রিক গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। একটি হলো ক্রোধান্বিত হলে, ক্রোধ তার দ্বারা কোনো অবৈধ ও অন্যায় কাজ করাতে পারে না। দ্বিতীয় হলো যখন সে খুশি হয়, খুশি তাকে হকের সীমালঙ্ঘন করতে দেয় না। আর তৃতীয়টি হলো অপরের জিনিসের উপর তার কোনো অধিকার নেই ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে হস্তক্ষেপ করে না।" (মিশকাত শরীফ)

শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকদের মতামতের আলোকে সচ্চরিত্র

০১. হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেছেন, সচ্চরিত্র হচ্ছে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়া, আল্লাহর রাহে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়া।

০২. সাহল তস্তরী বলেছেন, সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে সহনশীল হওয়া এবং প্রতিশোধ না নেয়া; সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে জালিমের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করা এবং তার জন্যে মাগফিরাত কামনা করা।

০৩. হযরত আলী (রা.) বলেছেন, সচ্চরিত্র তিনটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত- হারাম থেকে বেঁচে থাকা, হালাল রুজী অন্বেষণ করা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় না করা।

০৪. আবু সাঈদ খেরায (রহ.) বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুর দিকে মনোযোগ না দেয়ার নাম সচ্চরিত্র।

০৫. আহনাফ ইবনে কায়েসকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি সহনশীলতা কার কাছে শিখলেন? তিনি বললেন, কায়েস ইবনে আছেমের কাছে। লোকেরা বলল,

www.amarboi.org

তার সহনশীলতা কিরূপ ছিলো? তিনি বললেন, একদিন তিনি গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন। তার বাঁদী একটি কাবাবপূর্ণ শিক তার কাছে নিয়ে এলো। ঘটনাক্রমে বাঁদীর হাত থেকে খসে পড়ে তাঁর অল্পবয়স্ক ছেলের উপর পতিত হলো। আঘাতের চোটে ছেলেটি মারা গেলো। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বাঁদী ভয়ে কাঁপতে লাগল। তিনি বললেন, ভয় করিস না। আমি তোকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম।

০৬. হযরত ওয়ায়েস কারনী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁকে যখন দুষ্ট ছেলেরা দেখত, তখন পাথর ছুড়ে মারতো। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, ভাই সকল! যদি মারতেই হয়, তবে ছোট ছোট পাথর মার, যাতে আমার পা থেকে রক্ত বের না হয় এবং নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।

০৭. ডা. লুৎফর রহমান বলেছেন, মানুষের মূল্য কোথায়, চরিত্র; মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্মে? বস্তুত চরিত্র বলেই মানুষের জীবনে যা কিছু শ্রেষ্ঠ বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে, সে শুধু চরিত্রের জন্য অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হবার দরকার নেই।

০৮. স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "টাকায় কিছু হয় না, নাম যশে কিছু হয় না, বিদ্যায় কিছু হয় না, চরিত্রই বাঁধা বিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করতে পারে।"

সচ্চরিত্র ও অসচ্চরিত্রের স্বরূপ

আরবিতে 'খালক' ও 'খুলুক' এ দু'টি শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়। 'খালক' হলো একজন মানুষের বাহ্যিক আকৃতি এবং 'খুলুক' হলো অভ্যন্তরীণ আকৃতি। একটি দেহ, যা চোখে দেখা যায় এবং অপরটি নফস, যা অন্তর্দৃষ্টি ও বিবেক দ্বারা জানা যায়। এতদুভয়ের প্রত্যেকটির একটি আকৃতি আছে-ভাল অথবা মন্দ। যে নফস তথা আত্মা বিবেকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তার মান-মর্যাদা দেহের তুলনায় বেশি। এ কারণেই আল্লাহ্ তায়ালাও একে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন, যাতে এর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ.

"আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। অতঃপর যখন তাকে সঠিকভাবে সৃষ্টি করব এবং তার মধ্যে আমার আত্মা ফুঁকে দিবো, তখন তোমরা (হে ফিরিশতাকুল) তার উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে।" (সূরা আস ছোয়াদ, ৩৮ ঃ ৭১-৭২)

এই আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, দেহের সম্পর্ক সম্বন্ধযুক্ত মাটির সাথে এবং আত্মা সম্বন্ধযুক্ত আল্লাহর তা'আলার সাথে।

www.amarboi.org

'খুলুক' অন্তরে বদ্ধমূল একটি প্রকৃতির নাম, যাদ্বারা ক্রিয়াকর্ম অনায়াসে ও চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে প্রকাশ পায়। এই প্রকৃতি দ্বারা প্রকাশিত ক্রিয়াকর্ম যদি বিবেক ও শরীয়াতের দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট হয়, তবে তাকে সচ্চরিত্র বলে। পক্ষান্তরে যদি তা দ্বারা মন্দ ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ পায়, তবে তাকে অসচ্চরিত্র বলে। এখানে অন্তরে বদ্ধমূল বলার কারণ এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি ঘটনাচক্রে কোনো প্রয়োজনে অগাধ ধনরাশি ব্যয় করে তবে তাকে দানশীল ও সচ্চরিত্রবান বলা হবে না, যে পর্যন্ত এটা তার অন্তরে বদ্ধমূল না হয়। ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে 'চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে' কথাটি এ জন্য যোগ করা হয়েছে যে, যদি কেউ অনেক চিন্তা-ভাবনার পর অর্থ ব্যয় করে, যে পর্যন্ত এটা তাঁর থেকে অনায়াসে চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে প্রকাশ না পায়, সে পর্যন্ত তাকে দানশীল বলা হবে না।

মোটকথা, এখানে চারটি বিষয় আবশ্যক। ০১. ভাল অথবা মন্দ ক্রিয়াকর্ম, ০২. তাতে সক্ষমতা, ০৩. তা চেনা এবং ০৪. আত্মার এমন আকৃতি থাকা– যা দ্বারা ভাল অথবা মন্দের মধ্য থেকে একটি সহজ হয়ে যায়।

যার মধ্যে উপরিউক্ত চারটি বিষয় শরীয়াতের নির্ধারিত সীমায় বিদ্যমান থাকবে, তাকে সর্বাবস্থায় সচ্চরিত্রবান বলা হবে। যার মধ্যে কেবল একটি বিষয় অথবা দু'টি বিষয় থাকবে, তাকে সেদিক দিয়েই চরিত্রবান বলা হবে। যেমন মুখমণ্ডলের কোনো অংশ সুশ্রী হলে সেই অংশকেই সুশ্রী বলা হয় এবং সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলকে সুশ্রী বলা হয় না। শরীয়াত নির্ধারিত সীমা পরিমাণ ক্রোধ শক্তিকে বলা হয় বীরত্ব এবং কাম শক্তিকে বলা হয় সাধুতা। এ দু'টি পর্যায়ই প্রশংসনীয়।

জ্ঞান শক্তির সমতা দ্বারা সুপরিচালন ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ মেধা, বিশুদ্ধ অভিমত, আমলের সূক্ষ্মতা, প্রবৃত্তির গোপন আপদ সম্পর্কিত জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। এর বাহুল্য দ্বারা ধোঁকা, প্রতারণা ও বিদ্বেষ জন্মলাভ করে। স্বল্পতা দ্বারা অনভিজ্ঞতা, অচেতনতা, নির্বুদ্ধিতা ও উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। ক্রোধ শক্তির সমতা অর্থাৎ বীরত্ব, সাহসিকতা, বিনয়, সহনশীলতা, ক্রোধদমন ও গাম্ভীর্য ইত্যাদি জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। এর বাহুল্য থেকে অহংকার, আস্ফালন, রাগে অগ্নিশর্মা হওয়া, অহমিকা ইত্যাদি স্বভাব জন্মলাভ করে এবং এর স্বল্পতা থেকে ভীরুতা, অপমান, লাঞ্ছনা, ভয়, হীনমন্যতা ইত্যাদি দোষ প্রকাশ পায়। কাম শক্তির সমতা অর্থাৎ সাধুতা থেকে সৃষ্ট গুণাবলি হচ্ছে দানশীলতা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য, অল্পেতুষ্টি, আল্লাহভীতি ও নির্লোভ হওয়া ইত্যাদি। এর স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে সৃষ্ট স্বভাবগুলো লালসা, অনর্থক খোশামোদ, হিংসা, অপরের দুঃখে হাস্য করা, ফকীরদেরকে হেয় মনে করা ইত্যাদি। মোটকথা উপরোক্ত প্রজ্ঞা, বীরত্ব, সাধুতা ও মিতাচার- এই চারটি বিষয়

www.amarboi.org

হচ্ছে চরিত্র মাধুর্যের মূল। বাকী সবগুলো এসবের প্রশাখা। এই চারটি বিষয়েরই পূর্ণ সমতার পর্যায়ে আসা রাসূলে আকরাম (সা.) ছাড়া অপর কারোর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যে ব্যক্তির চরিত্রে এগুলো যত বেশি প্রস্ফুটিত সে সেই পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী। আর যে দূরে সে দূরবর্তী। যে ব্যক্তির মধ্যে এমন সবগুলো সচ্চরিত্রের দিক বিদ্যমান, সে এই বিষয়ের যোগ্য যে, সকল মানুষ তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে এবং তার আনুগত্য ও অনুসরণ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব বিশেষণে নয়; বরং এগুলোর বিপরীত বিশেষণে বিশেষিত, সে এ বিষয়ের যোগ্য যে, তাকে জনবসতি থেকে বের করে দেয়া হবে। কেননা, সে বিতাড়িত শয়তানের নিকটবর্তী।

সচ্চরিত্র কিরূপে অর্জিত হতে পারে

সচ্চরিত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, কাম শক্তি ও ক্রোধ শক্তির সমতা এবং শরীয়াতসম্মতভাবে এগুলোর অনুগত হওয়া। সচ্চরিত্র দু'উপায়ে অর্জিত হতে পারে।

এক ঃ আল্লাহ্ তা'আলার দান হিসেবে। অর্থাৎ জন্মলগ্ন থেকে মানুষ পূর্ণ জ্ঞানী ও সচ্চরিত্রবান হবে। কাম ও ক্রোধ তার উপর প্রবল হবে না; বরং উভয়টি শরীয়াতের অনুগত থাকবে। এরূপ ব্যক্তি তালীম ছাড়াই আলেম হয়। যেমন ঃ হযরত ঈসা (আ.), হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) ও পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। অন্যদিকে উপার্জনের মাধ্যমে অর্জিত হয়, এমন বিষয় যা মানুষের সৃষ্টি ও প্রকৃতিতে থাকা অবান্তর নয়। অধিকাংশ শিশু শুরু থেকেই দাতা, নির্ভীক ও স্পষ্ট ভাষীরূপে জন্মগ্রহণ করে। কতক এর বিপরীত হয়; কিন্তু অন্যদের সাথে মেলামেশায় এটা তাদের করায়ত্ত হয়ে যায়। আবার কখনও আদর্শ শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

দুই ঃ অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে সচ্চরিত্র অর্জন করা; অর্থাৎ নফসকে এমন কাজে নিয়োজিত করা, যা দ্বারা চরিত্রের প্রার্থিত বিষয় হাসিল হয়ে যায়. উদাহরণস্বরূপঃ যে ব্যক্তি দানশীলতার চরিত্র অর্জন করতে চায়, সে সর্বদা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাহায্য করবে এবং মনের উপর জোর দিয়ে সৎ ও শরীয়াতসম্মত কাজ করতে অন্তকরণে চেষ্টা করবে। অবশেষে এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। ফলে সে দানশীল হয়ে যাবে। শরীয়াতের উৎকৃষ্ট চরিত্রগুণ এমনিভাবে অর্জিত হতে পারে। এর চূড়ান্তরূপ এই যে, এ কাজে সংশ্লিষ্ট সকলে আনন্দ অনুভব করবে। অর্থাৎ দানশীল তাকেই বলা হবে, যে অর্থ ব্যয় করে আনন্দ অনুভব করে। যে পর্যন্ত ইবাদত পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করা খারাপ

www.amarboi.org

মনে হবে এবং নফস কঠিন মনে করবে, সেই পর্যন্ত ত্রুটি থেকে যাবে এবং পূর্ণ সৌভাগ্য অর্জিত হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِينَ.

"নিশ্চয় এটা কঠিন; কিন্তু বিনয়ীদের জন্যে কঠিন নয়।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ৪৫)

রাসূলে আকরাম (সা.) বলেন ঃ

أُعْبُدُ اللهَ فِي الرِّضَاءِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي الصَّبْرِ عَلٰى مَاتَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ.

"আল্লাহর ইবাদত সন্তুষ্টি অবস্থায় করো। যদি সক্ষম না হও, তবে অসহনীয় বিষয়ে সবর করার মধ্যে অনেক বরকত আছে।"

উপস্থিত সৌভাগ্য অর্জিত হওয়ার জন্যে এটা যথেষ্ট নয় যে, কখনও ইবাদতে মজা পাবে ও অবাধ্যতা খারাপ মনে হওয়া আজীবন অব্যাহত থাকতে হবে। এরপর বয়স যতই বাড়বে, এই সৌভাগ্য অধিক দৃঢ় হবে। এ কারণেই রাসূলে কারীম (সা.)-কে যখন প্রশ্ন করা হলো, সৌভাগ্য কী? তখন তিনি বললেন ঃ

طُوْلُ الْعُمُرِ فِيْ طَاعَةِ اللهِ.

"আল্লাহর আনুগত্যে দীর্ঘজীবি হওয়া।"

এদিক দিয়ে নবী ও রাসূলগণ মৃত্যুর ক্ষেত্রে মন খারাপ করতেন এই ভেবে যে, দুনিয়া আখিরাতের কৃষিক্ষেত্র। সুতরাং দীর্ঘ জীবন পেলে ইবাদত বেশি হবে। আর ইবাদত যত বেশি হবে, ততই সওয়াব বেশি হবে এবং নফ্স পবিত্র থেকে পবিত্রতম হবে। এছাড়া ইবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্তরের উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পারা। এই প্রভাব তখনই হবে, যখন ইবাদত অধিক দীর্ঘ ও অধিক স্থায়ী হবে। সচ্চরিত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে নফস থেকে জাগতিক মহব্বত দূর করা এবং আল্লাহর মহব্বত তাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, এমনকি তার কাছে আল্লাহর দীদার অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোনো কিছু না থাকা। সে মতে ধন-সম্পদও এমন ক্ষেত্রে ব্যয় করবে যাদ্বারা এই উদ্দেশ্য হাসিল হয় এবং কাম ও ক্রোধকেও এমনভাবে কাজে লাগাবে, যাতে আল্লাহকে পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, এটা তখন হবে, যখন এসব কাজ শরীয়াত ও বিবেক অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। এরপর এ ধরনের কাজে মজাও পায়। যদি কেউ নামাযে শান্তি ও চোখের শীতলতা পায় কিংবা ইবাদত সুখকর মনে করতে থাকে, তবে এটা মোটেই অবাস্তব নয়। অভ্যাসের কারণে নফসের মধ্যে এর চেয়েও অধিক আশ্চর্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হয়ে থাকে। দেখুন! নিঃস্ব জুয়াড়ি জুয়া খেলে কেমন আনন্দ

www.amarboi.org

পায়! অথচ যে অবস্থায় সে পতিত তাতে যদি অন্যরা পতিত হয়, তবে জুয়া ছাড়াই জীবন অসহনীয় হয়ে যাবে। জুয়ার কারণে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়, পরিবারে বিশৃংখলা দেখা দেয়। এরপরও জুয়ার প্রতি ভালবাসা ও টান লেগেই থাকে। চোর-পকেটমারদের যতই বেত্রাঘাত করা হয়; তারা একে গর্বের বিষয় মনে করে এবং কঠোর শাস্তি ভোগ করে আনন্দিত হয়। এমনকি তাদের দেহ কেটে খণ্ড খণ্ড করা হলেও তারা চোরাই মালের সন্ধান দেয় না এবং সঙ্গী চোরদের নাম বলে না। এটা এ কারণেই যে, তারা তাদের কাজকে বীরত্ব ও বাহাদুরীর চরমোৎকর্ষ বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। সুতরাং অভ্যাসের কারণে বাতিল বিষয়ে এমন আনন্দ পাওয়া গেলে সত্য বিষয়ে দীর্ঘদিন অভ্যাস করলে তাতে আনন্দ পাওয়া যাবে না কেন?

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সাধনার মাধ্যমে সচ্চরিত্রতা অর্জিত হতে পারে। অর্থাৎ প্রথমে মনের উপর জোর দিয়ে এসব কাজ করলে অবশেষে তা স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়ে পরিণত হয়। এমনিভাবে যে দানশীল, সহনশীল ও বিনম্র হতে চায়, তার উচিত শুরুতে এসব লোকদের ক্রিয়াকর্ম মনের উপর জোর দিয়ে সম্পন্ন করা, যাতে আস্তে আস্তে এসব কাজ তার স্বভাবে স্থান করে নেয়। এটা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। ফিকাহ্‌র অন্বেষী ব্যক্তি যেমন একদিন অনুশীলন বন্ধ রাখলে ফিকাহ্ থেকে বঞ্চিত হয় না এবং একদিনের অনুশীলন দ্বারা ফকীহ হয়ে যায় না, তেমনি যে ব্যক্তি সৎকর্ম দ্বারা আত্মশুদ্ধি চায়, সে একদিনের ইবাদত দ্বারা এই মর্তবা পেতে পারে না এবং একদিনের অবাধ্যতা দ্বারা এই মর্তবা থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। একটি কবীরা গুনাহ্ চিরন্তন দুর্ভাগ্যের কারণ হয় না- বুযুর্গগণের এই উক্তির অর্থ তাই। হ্যাঁ, একদিনকে কর্মহীন রাখা দ্বিতীয় দিনকে কর্মহীন রাখার কারণ হয়। এরপর ক্রমে ক্রমে মন অলসতায় অভ্যস্ত হয়ে একদিন নিয়মিত কর্মই পরিত্যাগ করে বসে। অনুরূপভাবে একটি ছগীরা গুনাহ্ করলে সে আরেকটি ছগীরা গুনাহকে টেনে আনে। সুতরাং একদিনের ভুল-ত্রুটিকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়।

কুরআনের আলোকে সচ্চরিত্রবান মুসলিমদের পরিচয়

মহান আল্লাহ্ কুরআনে সচ্চরিত্রবান মুসলিমদের পরিচয় বর্ণনাকালে তাঁদের যেসব গুণের উল্লেখ করেছেন, সেগুলোই সৎ স্বভাবের চিহ্ন। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

www.amarboi.org

ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ج وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَآتَى الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوْا وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ط أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

"পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফিরানোর মধ্যে সৎ কাজ সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রকৃত সৎকর্মশীল তারাই যারা ঈমান আনে আল্লাহ, আখিরাত, ফিরিশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি। আর আল্লাহর মহব্বতের তাকিদে মাল খরচ করে নিকট আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, অসহায় পথিক এবং অভাবী লোকদের জন্যে এবং ক্রীতদাস মুক্তির জন্যে। তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং ওয়াদা পূরণ করে। আর সবর করে, ব্যক্তিগত বিপদ-আপদে এবং যুদ্ধের ময়দানে। তারাই সত্যিকারের ঈমানদার এবং তারাই প্রকৃত আদর্শ মানুষ।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৭৭)

এ আয়াতে সচ্চরিত্রবান মানুষের পাঁচটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

০১. আল্লাহ, আখিরাত, ফিরিশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন,
০২. অভাবী লোকদের আর্থিক সাহায্য দান,
০৩. নামায কায়েম ও যাকাত আদায়,
০৪. ওয়াদা পূরণ,
০৫. ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে যুদ্ধের ময়দান পর্যন্ত সবর করা।

সচ্চরিত্রবান মানুষদের জন্যে আল্লাহ আখিরাতে পুরস্কারের কথা উল্লেখ করে তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল কুরআনুল কারীমে বলেন ঃ

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ. وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللّٰهُ ص وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

"যারা সুসময়ে-দুঃসময়ে সকল অবস্থায় আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ খরচ করে, যারা রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ এমন বান্দাদের পছন্দ করেন। তাদের আরো বৈশিষ্ট্য হলো– যখন তারা কোনো খারাপ কাজ করে ফেলে অথবা তাদের নফসের প্রতি যুলুম করে ফেলে তখনি আল্লাহর কথা স্মরণ করে তাঁর কাছে

www.amarboi.org

ক্ষমা চায়। তারা জেনে-শুনে কোন খারাপ কাজ বার বার করে না। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে আছে অপরাধ মার্জনা করার?" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৩৪-১৩৫)

এখানে সচ্চরিত্রবান মুসলিমদের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

০১. সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে খরচ করা।

০২. রাগ বা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা।

০৩. মানুষের প্রতি ক্ষমা সুন্দর আচরণ করা।

০৪. মানবীয় দুর্বলতাবশতঃ কোনো অপরাধজনিত কাজ হয়ে গেলে সাথে সাথে আল্লাহর কথা স্মরণ করে ক্ষমা চাওয়া এবং জেনে-শুনে পাপ কাজে লিপ্ত না থাকা।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ لا أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَايَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এ দ্বীন থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে (দ্বীন কায়েমের আন্দোলন থেকে সরে যায়, তারা যেন জেনে রাখে) আল্লাহ্ তাদের পরিবর্তে অন্যদের এ কাজে নিয়োজিত করবেন- আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসবেন, তারা আল্লাহকে ভালবাসবে। তারা মুমিনের প্রতি হবে বিনয়ী, নম্র এবং কুফরীর মুকাবিলায় হবে বজ্র কঠোর। তারা সংগ্রাম করবে আল্লাহর পথে এবং এতে কোনো নিন্দুকের নিন্দা আর সমালোচকের সমালোচনার পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ তিনি যাকে চান তাকেই এই বিশেষ অনুগ্রহে ভূষিত করেন আর আল্লাহ্ তো অতি বিশাল ও সীমাহীন জ্ঞানের অধিকারী।" (সূরা আল মায়িদা, ০৫ ঃ ৫৪)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঈমানদার সচ্চরিত্রবান মানুষদের কাছে চারটি গুণ দেখতে চান।

০১. তাঁরা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসবে।

০২. মুমিনরা বিনয় ও নম্র আচরণ করে এবং কুফরীর প্রতি আপোষহীন কঠোর।

০৩. তারা হবে আল্লাহর পথের নিরলস সংগ্রামী।

০৪. কোনো নিন্দুকের নিন্দা, সমালোচকের সমালোচনা তাঁরা ভ্রূক্ষেপ করবে না।

www.amarboi.org

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْآمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, আল্লাহর পথে ভ্রমণকারী, আল্লাহর দরবারে রুকু এবং সিজদাকারী। তারা সৎ কাজের আদেশ দানকারী এবং অসৎ কাজে বাধা দানকারী, তারা আল্লাহর আইনের সীমানা রক্ষাকারী, এই মুমিনদেরকে তুমি শুভসংবাদ দাও।" (সূরা আত্ তাওবা, ০৯ ঃ ১১২)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ. إِلاَّ عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ. فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ.

"মুমিনগণ অবশ্যই সফলকাম হবে, যারা নামাজে বিনয়, নম্রতা প্রদর্শনকারী, যারা বেহুদা জিনিস ও কাজ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে। যারা আত্মশুদ্ধির সাধনা করে, যারা তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; অবশ্য বিবাহিত স্ত্রী ও দক্ষিণ হস্তের অধিকারীদের ব্যাপারে ব্যতিক্রম, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে যারা এর বাইরে এটাকে ব্যবহার করবে তারা সীমালঙ্ঘনকারী। যারা তাদের আমানত ও ওয়াদার সংরক্ষণ করে। আর যারা তাদের নামাযসমূহের হিফাযতে নিয়োজিত থাকে।" (সূরা আল মুমিনুন, ২৩ ঃ ০১-০৯)

এখানে পাঁচটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ

০১. নামাযে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ, যাকে খুযু এবং খুশু বলা হয় সেইসাথে নামাযের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দাবিসমূহের হিফাজত করা।

০২. অর্থহীন কার্যক্রম ও কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকা, এগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা।

০৩. নাফসের আত্মশুদ্ধি বা তাযকিয়া অর্জনের জন্যে সাধনা করা।

০৪. যৌন চাহিদা পূরণে আল্লাহর দেয়া সীমালঙ্ঘন না করা।

০৫. আমানত ও ওয়াদাসমূহের সংরক্ষণ করা।

www.amarboi.org

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَمًا. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ق إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ق إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا. وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَيَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُّضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ق إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا. وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا. أُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلاَمًا. خَالِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا.

"রহমানের আসল বান্দা তারা, যারা জমিনে বিনয়ের সাথে চলে। আর জাহিল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে আসলে তারা বলে তোমাদেরকে সালাম। তারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যে সিজদা ও কিয়ামের মাধ্যমে রাত কাটায়। তারা এ বলে দু'আ করে– 'হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচাও, অবশ্যই তার আযাব প্রাণান্তকরভাবে লেগে থাকে। বিশ্রামস্থল ও বাসস্থান হিসেবে জাহান্নাম তো বড়ই জঘন্য। তারা খরচ করার সময় বেহুদাভাবে অপব্যয় করে না। আবার কৃপণতাও করে না। বরং দু'টোর মাঝখানে মধ্যম নীতি অবলম্বন করে চলে। তারা আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করে

www.amarboi.org

না এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কোনো প্রাণীকে অকারণে হত্যা করে না। তারা ব্যভিচারেও লিপ্ত হয় না। কারণ এ সকল কাজ যারা করে তারা নিজেদের গুনাহর প্রতিফল পাবে। কিয়ামতের দিন তাদের আযাব বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং লাঞ্ছনাসহ সে আযাবেই তারা পড়ে থাকবে। এ সকল আযাব থেকে কেবল মাত্র তারাই মুক্তি পাবে যারা তাওবা করে ঈমান এনেছে এবং তদনুযায়ী নেক আমল করা শুরু করেছে। এ ধরনের লোকদের দোষ-ত্রুটি ও অন্যায়কে আল্লাহ্ তা'আলা নেক দ্বারা পাল্টিয়ে দিবেন। তিনি তো বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। যে ব্যক্তি তাওবা করে নেক আমল করা শুরু করে সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, যেমন ফেরা উচিত। (রাহমানের বান্দাহতো তারা) যারা অর্থহীন কোনো বিষয়ের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে এড়িয়ে চলে যায়। তাদেরকে তাদের প্রভুর আয়াত দিয়ে উপদেশ শুনালে তার উপর তারা অন্ধ ও বধির হয়ে পড়ে থাকে না। তারা এ দু'য়া করতে থাকে– "হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দ্বারা আমাদের চক্ষুর শীতলতা দাও এবং আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের ইমাম বানাও। এরাতো সেই সকল লোক যাদের সবরের ফলস্বরূপ উচ্চতর মনযিল দান করা হবে এবং তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ ও শুভ সম্বোধনসহকারে সম্বর্ধনা দেয়া হবে। তারা সবসময়ের তরেই সেখানে থাকবে। কতইনা সুন্দর সে বিশ্রামস্থল এবং কতই না উত্তম সে বাসস্থান।" (সূরা আল ফুরকান, ২৫ : ৬৩-৭৬)

আল কুরআনুল কারীমের এই অংশে ইতিবাচক ও নেতিবাচক মিলিয়ে সচ্চরিত্রবান মানুষদের বারটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে :

০১. সচ্চরিত্রবান মানুষ হবে চাল-চলনে বিনয়ী।
০২. তারা মূর্খ লোকদের মূর্খতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত কূট-তর্কে জড়িয়ে পড়ে না।
০৩. তারা রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত বন্দেগীতে সময় কাটায়।
০৪. তারা আখিরাতের শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য সদা পেরেশান হয়ে আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করতে অভ্যস্ত।
০৫. তারা অর্থনৈতিক জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখতে অভ্যস্ত, তারা বাজে খরচ যেমন করে না তেমনি কৃপণতার আশ্রয় নেয় না।
০৬. তারা আল্লাহর সাথে শিরক করে না, আল্লাহকে ডাকতে গিয়ে কাউকে তার সাথে শরীক করে না।
০৭. তারা মানুষকে বিনা বিচারে বা অন্যায়ভাবে হত্যা করে না।
০৮. তারা যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না।
০৯. তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না– মিথ্যার পর্যায়ে পড়ে এমন কোনো কিছু সমর্থনও করে না।

www.amarboi.org

১০. তারা অর্থহীন কোনো কিছুর সম্মুখীন হলে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করে।

১১ তাদেরকে কোনো ব্যাপারে আল্লাহর কোনো আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তারা তা মন দিয়ে শোনার এবং বোঝার চেষ্টা করে, অন্ধ এবং বধিরের মতো না দেখা, না শোনার মতো ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করে না।

১২. তারা স্বামী-স্ত্রী এবং স্ত্রী-স্বামী পরস্পরের উত্তম আমল আখলাকের জন্যে নিজেরাও সহযোগিতা ও পূর্ণ চেষ্টা করে উভয়ে সন্তানসহ গোটা পরিবারকে একটি আদর্শ পরিবার বানানোর জন্যে চেষ্টা করে এবং আল্লাহর কাছেও এ জন্যে সাহায্য চায় ।

অন্যত্র আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ.

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল! আর যেসব লোক তার সাথে রয়েছে তারা কুফরী শক্তির প্রতি বজ্র কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি দয়াশীল। তোমরা তাদেরকে রুকূতে, সিজদায় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির সন্ধানে মগ্ন দেখতে পাবে। সিজদাসমূহের প্রভাবে তাদের চেহারা সমুজ্জ্বল, যা তাদের স্বাতন্ত্রের পরিচায়ক।" (সূরা আল ফাতাহ, ৪৮ ঃ ২৯)

এখানেও রাসূল (সা.) ও তাঁর সাথী অর্থাৎ ঈমানদারদের চারটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে ঃ

০১. তারা কুফরী শক্তির প্রতি হবে বজ্র কঠোর এবং আপোষহীন।

০২. তারা পরস্পরের প্রতি দয়াশীল।

০৩. তারা রুকূ ও সিজদার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি সদা বিনয়ে অবনত থাকে।

০৪. তারা সকল কর্মকাণ্ড ও আদর্শিকতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সাধনার মাধ্যমে পেতে চায় কেবল আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি।

فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ج وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ج وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ص وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ج

www.amarboi.org

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ط إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ. وَلَمَن
انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِيْنَ
يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ.

"তোমাদেরকে এ দুনিয়ার বৈষয়িক সম্পদ যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো অতি নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী, আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা উত্তম এবং চিরস্থায়ী। তাদের জন্যে, যারা ঈমান আনবে, কেবলমাত্র তাদের রবের উপর ভরসা করবে। যারা কবিরা গুনাহ থেকে এবং সকল প্রকার ফাহেশা কাজ থেকে দূরে থাকবে, কখনও রাগ হলে ক্ষমা করবে, যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেবে, নামায কায়েম করবে এবং নিজেদের কার্যক্রম পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করবে। আমার দেয়া রিযিক থেকে খরচ করবে। আর কখনও কেউ তাদের উপর যুলুম করলে বা তাদের সাথে আচার-আচরণে কেউ সীমালঙ্ঘন করলে তারা তা প্রতিহত করবে। এ ক্ষেত্রে অপরাধ যে পরিমাণ হবে প্রতিশোধ ততটাই নেয়া হবে। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ ক্ষমা করে দেয় এবং ব্যাপারটা মিটমাট করে নেয় তবে সে আল্লাহর কাছে অবশ্যই পুরস্কার পাবে। আল্লাহ যালিমদেরকে পছন্দ করেন না। অত্যাচারিত হবার পর কেউ প্রতিশোধ নিলে তাকে দায়ী করা যাবে না। দোষী সাব্যস্ত তো তাদেরই করা যাবে– যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং অন্যায়ভাবে কোন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে চায়। তাদের জন্যে বেদনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর যারা সবর করবে, ক্ষমা করবে তাদের এ কাজটা বড়ই দৃঢ় মনোবলের ও উদার মনের পরিচয় বহনকারী কাজ।" (সূরা আশ শূরা, ৪২ ঃ ৩৬-৪৩)

সূরায়ে শূরার এই অংশে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে গচ্ছিত জান্নাতের চিরস্থায়ী ও উত্তম নিয়ামত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে নিম্নলিখিত গুণাবলি বিকাশের শর্ত আরোপ করেছেন– যা সচ্চরিত্রবান মানুষের সৎ গুণাবলি হিসেবে পরিগণিত ঃ

০১. দৃঢ় ঈমানের অধিকারী হতে হবে এবং আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল হতে হবে।

০২. সকল প্রকারের কবিরা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

www.amarboi.org

০৩. রাগের অবস্থা সৃষ্টি হলে ক্ষমা প্রদর্শন করতে হবে।
০৪. আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে হবে।
০৫. নামায কায়েম করতে হবে।
০৬. তাদের মধ্যে সামাজিক নিয়ম-শৃংখলা থাকতে হবে এবং যাবতীয় কার্যক্রম পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে।
০৭. আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে খরচ করতে হবে।
০৮. আল্লাহদ্রোহী শক্তির বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন এবং যুলুম অত্যাচার প্রতিহত করার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে।
০৯. অবশ্য মিটমাট করে ফেলার সুযোগ থাকলে ক্ষমা প্রদর্শন করে গোলমাল ও গোলযোগ মিটিয়ে ফেলাই আল্লাহ বেশি পছন্দ করেন।
১০. সবর এবং ক্ষমা করতে পারাটাই উত্তম।

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَلاَ يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ. وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ. وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.

"যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করে, কোনো প্রকারের চুক্তি লঙ্ঘন করে না। আল্লাহ তা'আলা যে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন সেটা রক্ষা করে, আল্লাহকে ভয় করে। আর শেষ বিচারের হিসাবে খারাপ পরিণতিকে ভয় করে। তারা তাদের রবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সবর করে। নামায কায়েম করে, আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে। যারা খারাপ আচরণের মুকাবিলায় ভাল আচরণ প্রদর্শন করে তাদের শেষ নিবাস হবে চিরস্থায়ী জান্নাত।" (সূরা আর রাদ, ১৩ ঃ ২০-২২)

সূরা আর রাদের এই অংশে আল্লাহ তা'আলা আদর্শবান মানুষদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন ঃ

০১. তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করবে এবং কোনো প্রকারের চুক্তি লঙ্ঘন করবে না।
০২. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার চেষ্টা করবে।
০৩. আল্লাহকে ভয় করবে।
০৪. আখিরাতে হিসাবের পরিণতিকে ভয় করবে।
০৫. আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় সবর করবে।

www.amarboi.org

০৬. নামায কায়েম করবে।
০৭. আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করবে।
০৮ দুর্ব্যবহারের মুকাবিলায় সদ্ব্যবহার করবে বা ভাল দিয়ে খারাপের মুকাবিলা করবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى أَن يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ ط بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

"হে ঈমানদার লোকেরা! কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন উপহাস না করে; কারণ যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকবে না; ঈমান গ্রহণের পর এহেন ফাসিকী কাজে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত খারাপ। যেসব লোক এ ধরনের আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকবে না তারাই যালিম। হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা বেশি বেশি অনুমান বা ধারণা করা পরিহার করো। কেননা কোনো কোনো ধারণা গুনাহর শামিল, তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুজি করো না, তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? বস্তুত তোমরাতো এটাকে ঘৃণা করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ খুব বেশি তাওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। হে মানুষ সকল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে

www.amarboi.org

নীতিপরায়ণ লোকই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং সবকিছু সবিস্তারে অবহিত।" (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১১-১৩)

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে সচ্চরিত্রবান মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন ঃ

০১. কোনো পুরুষ অন্য পুরুষকে বিদ্রূপ করবে না।
০২. কোনো স্ত্রী লোক অন্য স্ত্রী লোককে বিদ্রূপ করবে না।
০৩. একজন আরেকজনকে দোষারোপ করবে না।
০৪. কাউকে খারাপ নামে ডাকবে না।
০৫. বেশি বেশি ধারণা করা পরিহার করবে।
০৬. কারোর গোপনীয় বিষয়ে খোঁজাখুঁজি করবে না।
০৭. গীবত করবে না।
০৮. বংশ মর্যাদা নিয়ে গৌরব করে কখনো অযাচিতভাবে অন্যদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না।

সচ্চরিত্র গঠনে ইসলামের মৌলিক ইবাদতের প্রভাব

ঈমান-এর প্রভাবে সচ্চরিত্র গঠন

মুসলিম হওয়ার প্রথম ও মৌল শর্ত হলো ঈমান। কিন্তু ঈমান মন-মানস ও হৃদয়-মনের একটা বিশেষ অবস্থা ও ভাবধারা এবং প্রচ্ছন্ন অন্তর্নিহিত ব্যাপার। আল্লাহ ছাড়া তার অস্তিত্ব ও অবস্থা সম্পর্কে কেউই অবহিত হতে পারে না। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা সৎ ও নিষ্কলংক চরিত্রকে মুমিনের ঈমানের মানদণ্ডরূপে নির্ধারণ করেছেন। ইমাম গাযালীর মতে, ইসলামে ঈমানের সাথে চরিত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও নিবিড়। মানব মনে হীন, নীচ ও অসৎ ভাবধারা লালিত-পালিত হয় বিধায় তার ক্ষতি ও অনিষ্টকারিতা প্রবৃদ্ধি লাভ করে। ফলে এমন একটা অবস্থা দেখা দেয়, যখন মানুষ দ্বীনকেই পরিত্যাগ করে বসে। এরূপ অবস্থায় তার ঈমানের দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

স্বয়ং নবী কারীম (সা.) বহু সংখ্যক হাদিসে বহু সংখ্যক গুণ-বৈশিষ্ট্যকে ঈমানদার লোকদের অপরিহার্য বিশেষত্ব রূপে গণ্য করেছেন। সেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যে যতটা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে, ঈমানের অবস্থায়ও সেই অনুপাতে তারতম্য ঘটবে। তার অর্থ আমাদের বাহ্যিক চরিত্র ও আচার-আচরণ, আমাদের অন্তর্নিহিত ঈমানী অবস্থার মাপকাঠি বা পরিমাপ যন্ত্র। কোনো লোকের ঈমানী অবস্থা বাস্তবিকপক্ষে কী তা এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

ইসলাম কোনো জাতি, গোত্র বা বর্ণ বিশেষের ধর্ম নহে। সর্বজনীন বিশ্ব মানবতা প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের মূল ভিত্তি হলো মানুষে-মানুষে প্রেম-প্রীতি, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক আস্থা স্থাপন করা।

www.amarboi.org

ইসলামের দৃষ্টিতে দু'টি নীতিই হলো এর মাধ্যম। একটি হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, অপরটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তথা সচ্চরিত্র গঠন।

ঈমানের পরে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই ইসলামে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দান করা হয়েছে। এমনকি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেই ঈমানের মাপকাঠি বলে উল্লেখ করা হয়েছে– যার চরিত্র দুর্বল, যে সচ্চরিত্রবান নয়, সে খাঁটি ঈমানদার হতে পারে না।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুগত সাহাবীবৃন্দকে অমূলক, বেহুদা এবং অতিরিক্ত কথা হতে বেঁচে থাকার প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْيَصْمُتْ.

"যে আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি যথার্থ ঈমান রাখে, তার উচিত সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" (বুখারী শরীফ)

এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে সচ্চরিত্রের চর্চা করতে বলতেন, উম্মতদেরকে উৎসাহিত করতেন যাতে উহা বিকাশ লাভ করে। তিনি সততা এবং ঈমানের পূর্ণতাই চরিত্রের ভিত্তি বলে অভিহিত করেছেন।

আজকাল কতক নামধারী মুসলিমদের দেখা যায়, যারা নামায, সিয়াম প্রভৃতি নির্ধারিত ইবাদতগুলো খুব সহজ জ্ঞানে পালন করে থাকে এবং লোক সমাজে উহা আদায় করার জন্য খুব আগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করে থাকে। অথচ সেই সঙ্গে তারা এমন সব কাজ করতেও ইতস্তত করে না, যা সচ্চরিত্র ও খাঁটি ঈমানের পরিপন্থী। এরূপ বিচার বিবেকহীন লোকদেরকে রাসূলে কারীম (সা.) সতর্ক করেছেন এবং এরূপ লোকের সংস্পর্শ হতে উম্মতদেরকেও সাবধান করেছেন।

মূল কথা হচ্ছে, অন্তরের সাথে আদৌ সম্পর্ক না রেখেও নামায, সিয়াম প্রভৃতি ইবাদতগুলো যে কেউ করতে পারে। এতে তার চরিত্রের পরিধি কিছুমাত্র বর্ধিত হবে না। ছোট্ট একজন বালকও নামাযের বাহ্যিক অনুসরণ করতে পারে এবং সূরা-কিরাত প্রভৃতি আবৃত্তি করতে পারে। একজন ভণ্ড নকল নবীশও খুশু খুযু অর্থাৎ ভীতি ও বিনয়ের অভিনয় করতে পারে। কিন্তু চারিত্রিক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এই ভাঁড়ামীর কোনোই সার্থকতা নেই। মূলতঃ মাহাত্ম্য এবং উত্তম রীতি-নীতির সত্যিকার মাপকাঠি হচ্ছে উন্নত চরিত্রের মহৎ গুণাবলি।

সালাত (নামায)-এর প্রভাবে সচ্চরিত্র গঠন

আত্মশুদ্ধির জন্য সালাত (নামায) এক সুন্দরতম মুজাহাদা ও প্রচেষ্টা। এর দ্বারা মহান আল্লাহর সাথে বান্দাহ গভীর ও পবিত্র সম্পর্ক স্থাপন করে হৃদয়ে আল্লাহ্র ভয় এবং আল্লাহ্র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের মনোভাব পোষণ করে। সালাতে মানবদেহের প্রায় সব কয়টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়োজিত হয়। দিন-রাত্রির চব্বিশ ঘণ্টায়

www.amarboi.org

পাঁচবার সালাত আদায় আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণবয়স্ক সব মানুষের উপর ফরয (আবশ্যক) করেছেন। সালাতের মাধ্যমে বান্দাহ্ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দুনিয়ার কোনো ফিতনাই সে সম্পর্ককে দুর্বল বা ছিন্ন করতে পারে না। বান্দাহ তখন ভুলে যায় না যে, তার উপর আল্লাহ্‌র হক সর্বাগ্রে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহ কাজে পরিণত করেই তাঁর সে অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে সক্ষম হতে পারে।

আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ দিনের সূচনা করে ফজরের সালাত আদায়ের মাধ্যমে। দাঁড়িয়ে রুকূ-সিজদা দিয়ে তার হাম্‌দ ও সানা পাঠ করে প্রমাণ করে যে, সে একমাত্র আল্লাহ্‌র বান্দাহ্। তাঁর বন্দেগীতে তার হৃদয় যেন স্বচ্ছ ও পবিত্র রয়েছে। এভাবে সে সকল প্রকার পাপ ও অপরাধ থেকে দূরে থেকে সমগ্র দিনব্যাপী কার্যকলাপের মধ্যে পবিত্র থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। অতঃপর সে তার নিরলস কর্মতৎপরতায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে। এই ক্ষেত্রে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ থাকার জন্য যে আত্মিক ও আধ্যাত্মিকতা অবলম্বনের প্রয়োজন, নামাযের মাধ্যমেই সে তা সংগ্রহ করে নেয়। তারপর আসরের সালাতের সময়ও তার কর্ম ব্যস্ততার একবিন্দুও ভাটা পড়ে না। মাগরিবের সালাতের মাধ্যমে তার দিনের অবিশ্রান্ত কর্মব্যস্ততার পরিসমাপ্তি ঘটে। সে যেমন ফজরের সালাতে আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ও তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে দিনের যাত্রা শুরু করেছিল, এশা ও বিতরের সালাতে হাযির হয়ে সে সর্বশেষবারে প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ হিসেবে দিনের তৎপরতা শুরু করেছিল ও নানা ব্যস্ততায় ডুবে গিয়েছিল, এখনও সে সেই আল্লাহ্‌রই একনিষ্ঠ বান্দাহ্ই রয়েছে। সারাদিনে বিচিত্র ধরনের কর্মতৎপরতায় মশগুল হয়েও সে আল্লাহ্‌র বন্দেগীর সীমালঙ্ঘন করেনি।

সারাদিনের কোনো মুহূর্তেও মহান আল্লাহকে ভুলে না যাওয়াই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বড় সুফল, মহামূল্য প্রাপ্তি। এরূপ অবস্থায় কোনোরূপ অপরাধজনক কাজে অংশগ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। এই কারণেই সালাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা হচ্ছে ঃ

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ.

"নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে সর্বপ্রকারের নির্লজ্জ ও ঘৃণ্য কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আল আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪৫)

নবী কারীম (সা.) একটি উদাহরণের মাধ্যমে সালাতের উক্ত শুভ ফলের কথা বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

www.amarboi.org

"তোমাদের কেউ যদি তার ঘরের সম্মুখে প্রবাহিত ঝর্ণায় প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করে, তাহলে তার দেহে কোনোরূপ মলিনতা অবশিষ্ট থাকবে বলে কি তোমরা ধারণা করতে পারো? সাহাবীগণ বললেন 'না'।" তিনি বললেন ঃ

كَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلٰوتِ الْخَمْسُ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهَا الْخَطَايَا.

"ঠিক এমনিভাবেই পাঁচ বারের সালাত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহ্র যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি নিশ্চিহ্ন করে দিতে থাকেন।" (বুখারী শরীফ)

সালাত মসজিদে জামায়াতের সাথে আদায় করা বাঞ্ছনীয়। সেখানে সে অন্যান্য মুসল্লী মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করে। তারা একই কাতারে দাঁড়িয়ে একই ইমামের পিছনে ইক্তিদা করে আল্লাহর ইবাদত সম্পন্ন করে এবং তারই সন্তুষ্টি লাভ করে। প্রত্যেকেই তার অপর ভাইয়ের হাল-অবস্থা সম্পর্কে সরাসরি জানতে পারে। নিয়মিত মসজিদে আসা কোন লোক কখনও অনুপস্থিত হলে তার বিষয়ে খবর জানার তাকিদ নামাযীরা অনুভব করে। এভাবেই মুসল্লীদের মধ্যে গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামষ্টিকতার উদ্রেক ঘটে। ফলে তারা সকলেই প্রত্যেকের পরিপূরক হয়ে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তাবোধ সহকারে জীবন যাপন করার সুযোগ পায়। এভাবে দৈহিক ও পরস্পর নিকটস্থ লোকেরা অন্তরের দিক দিয়ে গভীরভাবে একাত্ম হয়ে উঠে। তারা সকলে একই ইমামের পিছনে একই কিবলামুখী হয়ে একই ইবাদত পালন করে, একই আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে ঐক্যবদ্ধ এক জনসমষ্টিতে পরিণত হয়। এভাবেই মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে একতা গড়ে তোলা ও পরস্পরকে পরস্পরের ভাই বানিয়ে দেয়াই আল্লাহ্র ইচ্ছা ও বাসনা। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ.

"সব মুমিনরাই পরস্পরের ভাই।" (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১০)

মুসলিম যখন একদিন পাঁচবারের সালাতের মাধ্যমে অভিন্ন উম্মত হয়ে গড়ে উঠে, তখন তারা পবিত্র হৃদয়, নিষ্কলুষ পবিত্র মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। তখন প্রত্যেক মুসলিম তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে, যা সে পছন্দ করে নিজের জন্য। আল্লাহকে সে ভয় করতে থাকে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাই তার পক্ষে কোন অপরাধ করা সম্ভব হয় না। কেননা তার অকৃত্রিম বিশ্বাস রয়েছে, অপরাধ বা নাফরমানি করলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

www.amarboi.org

যাকাত-এর প্রভাবে সচ্চরিত্র গঠন

যাকাত মুসলিম ব্যক্তির সামষ্টিক-অর্থনৈতিক ইবাদত। লোভ-লালসা, কার্পণ্য, সংকীর্ণতা, হিংসা, দ্বেষ, ধন-সম্পদের প্রেম-মায়া ইত্যাদি থেকে মানব মনকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে এই যাকাত। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"যেসব লোক তাদের মধ্যকার কৃপণতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে, তারাই সফলকাম।" (সূরা আত তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৬)

বর্তমান পৃথিবীতে বহু লোক শুধু ধন-সম্পদের লোভে পারস্পরিক শত্রুতায় লিপ্ত হয়। একদল অন্য দলের ধন-সম্পদ কেড়ে নেয় শুধু এ জন্য যে, ওদের আছে, আর এদের নেই। মানুষকে 'আছে ও নেই' এই দুই ভাগে বিভক্ত করে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। যাকাত এসব বিপদ আপদকে দূর থেকেই প্রতিরোধ করে। যে মুসলিম যথারীতি যাকাত আদায় করে এবং এই যাকাতের সাহায্যে দারিদ্র্য পীড়িত জনগণকে দারিদ্র্য ও অভাব মুক্ত করেছে, সে কখনও অন্য লোকের ধন-সম্পদকে কোনোরূপ মূল্য বা বিনিময় না দিয়ে হরণ করতে পারে না। লোভ-লালসাও তাকে অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না।

সমাজের দরিদ্র ব্যক্তি যদি শান্তিপূর্ণভাবে ও সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে ধনীদের ধন-সম্পদ থেকে নিজের ন্যায্য অংশ লাভ করে, তখন তার মনে কোনো হিংসা-দ্বেষ থাকতে পারে না। 'আছে' ও 'নাই'র মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ঠিক তখনই সংঘটিত হয়েছে, যখন 'আছে'রা সব ধন-সম্পদ আঁকড়ে ধরে আছে। 'নাই'দের কে দিতে প্রস্তুত হয় না। এরূপ অবস্থায় 'আছে' ও 'নাই'র মধ্যে সর্বাত্মক ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সৃষ্টি হওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠে। যাকাত এই ভুল বিভক্তিকে যেমন মিথ্যা করে দেয়, তেমনি তা ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার দূরত্ব ও বিভেদ-পার্থক্য চিরতরে দূর করে পরস্পর ভাই ভাই বানিয়ে দেয়। দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের অভাব মোচন করে সচ্ছলতার দিকে যাওয়ার অবাধ সুযোগ করে দেয়। এরূপ সমাজেই মানুষ পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসার বন্ধনে বন্দী হতে পারে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.

"তাদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করো। তাছাড়া তুমি তাদের পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করো।" (সূরা আত তাওবা, ০৯ ঃ ১০৩)

বস্তুত যাকাতের যে সামষ্টিক ভূমিকা রয়েছে, তাতে দারিদ্র্যের প্রতিকার

www.amarboi.org

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত মানুষের মধ্যকার দূরত্ব দূর হয়ে তারা সচ্ছলতার দিক দিয়ে অতি নিকটে এসে যায়। ফলে কোনো শ্রেণী পার্থক্য যেমন থাকে না তেমনি লোকদের অন্তরে নিহিত হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা দূরীভূত হয়। তার দরুন শ্রেণী-সংগ্রামের আগুন কখনই জ্বলে উঠে না। মানুষ পরস্পরের ভাই হয়ে পরম একাত্মতার মধ্যে জীবন যাপন করার সুযোগ পায়। সমাজের অভাবগ্রস্ত দরিদ্র লোকদের অভাব মোচনের লক্ষ্যে নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর হয়। যাকাতের বণ্টন খাতসমূহ দেখলেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

"যাকাতের সম্পদ ফকীর, মিসকীন, সে কাজে নিয়োজিত কর্মচারী, যাদের মন রক্ষার প্রয়োজন, যারা দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্‌র পথে এবং নিঃস্ব পথিকের জন্য– আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ সুবিজ্ঞানী।" (সূরা আত তাওবা, ০৯ ঃ ৬০)

বস্তুত ধনীদের ধন-সম্পদে গরীব-মিসকীনদের হক রয়েছে। এ চেতনাই সামষ্টিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণের প্রাণ-শক্তি। এ চেতনা মুসলিমদের শোষণ-পীড়ন ও জুলুম-সীমালঙ্ঘনের জ্বালায় জর্জরিতকরণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর এভাবেই যাকাত সমাজে শ্রেণী বৈষম্য দূরীভূত করে মানুষকে অসচ্চরিত্রের বলয় থেকে মুক্ত করে সচ্চরিত্রের দিকে ধাবিত করতে সহায়তা করে থাকে। যা বাস্তবায়নে সমাজ ব্যবস্থাও সুন্দর হতে বাধ্য।

হজ্জ-এর প্রভাবে সচ্চরিত্র গঠন

বিশ্ব মুসলিমদের মহাসম্মেলন বা মিলন প্রক্রিয়া হলো হজ্জ। এটি মুসলিমদের দেহ-আত্মা-হৃদয়-মন সহকারে আল্লাহ্‌র ঘরে হাযির হয়ে আল্লাহর একত্ববাদ প্রকাশের উত্তম মাধ্যম। তথায় সে আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ করে, সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে 'সায়ী' করে, মিনা ও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান গ্রহণ করে। পালন করে অন্যান্য যাবতীয় জরুরী অনুষ্ঠানাদি।

www.amarboi.org

হজ্জের ক্ষেত্রে প্রত্যেক এলাকার হজ্জ যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট 'মীকাত' থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়। তখন সে তার মন ও দেহ, দেহ ও মন উভয়কেই সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করে নেয়, পবিত্র থাকে তার পরনের দীনাতি দীন-ব্যক্তির উপযোগী পোশাক। এভাবে হজ্জ পালন করে সে গুনাহ মুক্ত হয়, নিষ্পাপ হয়ে যায় মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিস্যাৎ হওয়ার দিনের মতোই।

হজ্জের সমগ্র সফরে 'তাল্‌বিয়া'— 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা'পাঠ করতে হয়। এটি পাঠ করে হজ্জ যাত্রী ঘোষণা করে, 'হে রব্‌! আমি তোমার ডাকে হাযির হয়েছি। আমি তোমার নিকটে হাযির হয়ে আছি।'

বস্তুত হজ্জ এক সাথে বিপুল সংখ্যক ইবাদতের সমন্বয়। হাজী যখন বায়তুল্লাহ্‌ তওয়াফ করে, তখন তার দিল সালাতের সেই কিবলার সাথে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত হয়ে যায়, যেদিকে মুখ করে সে নিজের ঘর বা মসজিদ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে। কাবার তওয়াফকারী সব মানুষ যদিও বিভিন্ন দেশের, বর্ণের, আকার-আকৃতির, পোশাক-পরিচ্ছদের, তবুও তারা এক ও অভিন্ন এদিক দিয়ে যে, তারা সকলে এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার এবং এক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনই তাদের প্রত্যেকেরই চরমতম লক্ষ্য। এ কারণে তারা এক ও সম্পূর্ণ একাত্ম। এই গোটা অনুষ্ঠানই আর একটা বিরাট ঐতিহাসিক ও দৃষ্টান্তহীন আত্মদানের মর্মস্পর্শী দৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ফলে তাদের অন্তর গভীরভাবে ভারাক্রান্ত ও অবনত হয়ে উঠে মহান আল্লাহ্‌র অসীম অনুকম্পায়। আরাফাতের বিশাল ময়দানে প্রায় একটি দিন সে অতিবাহিত করে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি ও দু'আ-প্রার্থনা করে। দুই হাত ঊর্ধ্বে সম্প্রসারিত করে আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত ও রহমত কামনা করে। অন্তর দিয়ে স্মরণ করে সেই দিনের কথা ঃ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ج وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ج تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيْدًا.

"যেদিন প্রতিটি মানুষ তার কৃত ভাল কাজের সুফল সম্মুখে উপস্থিত পাবে। আর যে খারাপ কাজ সে করেছে, সে বিষয়ে তার মনে এই কামনা জাগবে যে, কতই ভাল হতো যদি তার সাথে সে জিনিসের অনেক বেশি দূরত্ব হতো।" (সূরা আলে-ইমরান, ০৩ ঃ ৩০)

হাজী হজ্জ করে এই আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করে এবং সেই পাথেয় নিয়ে সে নিজের দেশে ফিরে আসে। এই শক্তিই তার পরবর্তী সমগ্র জীবনে সর্বপ্রকারের পাপ ও অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য ঢালের কাজ করে।

www.amarboi.org

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ.

"যে হজ্জ করলো এবং স্ত্রীর সাথে মিলিত হলো না, কোনোরূপ পাপের কাজও করলো না, সে ফিরে এলো মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মতোই সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়ে।" (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

সিয়াম (রোযা)-এর প্রভাবে সচ্চরিত্র গঠন

রামাদানের এক মাস সিয়ামের প্রশিক্ষণমূলক অবদান অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও গভীর। সিয়াম মানব মনের যাবতীয় কু-প্রবৃত্তির উপর শক্ত লাগাম লাগিয়ে দেয় এবং সিয়ামকারীকে যাবতীয় নাফরমানী কাজকর্ম থেকে বিরত রাখে। মানুষের মনে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি জাগ্রত করে দেয়। অন্যদিকে মানুষের অপরাধ যে ধরনের ও যে প্রকৃতিরই হোক, তা নফ্সের খায়েশ, কামনা, বাসনা, লোভ ও লালসা থেকেই উৎসারিত হয়। আর তার গোড়াতে তিনটি প্রবল শক্তি-উৎস নিহিত থাকে।

০১. লোভ-লালসার শক্তি;
০২. যৌন স্পৃহা ও কু-প্রবৃত্তি এবং
০৩. অহমিকতা- দাম্ভিকতাবোধ। সিয়ামের প্রবল প্রশিক্ষণমূলক প্রভাব রয়েছে এই তিনটি শক্তি-উৎসের উপর।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র রিযিকসমূহ হালাল করেছেন এবং সকল প্রকার অপচয় ও অপব্যবহারমুক্ত পানাহারকে মুবাহ ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ করেছেন ঃ

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"তোমরা খাও এবং পান করো, তবে কোনো অবস্থাতেই অপচয় করো না, কেননা আল্লাহ তা'আলা কখনো অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (হে নবী) তুমি বলো, আল্লাহ তা'আলার (দেয়া) যেসব সৌন্দর্য (মণ্ডিত পোশাক) এবং পবিত্র খাবার তোমাদের জন্যে কে হারাম করেছে? যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজেই তাঁর বান্দাহদের জন্যে উদ্ভাবন করে এনেছেন, তুমি বলো, এগুলো হচ্ছে যারা ঈমান এনেছে তাদের পার্থিব পাওনা, (অবশ্য) কিয়ামতের দিনও এগুলো ঈমানদারদের জন্যেই নির্দিষ্ট থাকবে।" (সূরা আল আ'রাফ, ০৭ ঃ ৩১-৩২)

মানুষ সাধারণত সকাল, দুপুর এবং রাতে তিনবার পানাহারে অভ্যস্ত। আর যখনই পিপাসা লাগে পানি পান করে এবং যখনই ইচ্ছা হয় পানাহার করে।

www.amarboi.org

কিন্তু রামাদান মাসে এই পানাহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। সুব্‌হে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তা সবই বন্ধ থাকে। এ সময় ক্ষুধা তাকে যন্ত্রণা দেয়, পিপাসা তার বক্ষদেশ জ্বালায়–যদিও তার সুমিষ্ট পানীয় ও সুস্বাদু আহার্য সবই বর্তমান থাকে। আর তার জন্য আল্লাহ্ তা হালালও করেছেন। কিন্তু সিয়ামের এই সময় সে সেইসব কিছু পান ও গ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। তার অর্থ, যে আল্লাহ তার জন্য এসব পানাহার হালাল করে দিয়েছেন, এই সময়টায় তারই আদেশে তা থেকে বিরত থেকে মানুষ এ কথাই প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে দেয় যে, সে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কিছু করে না। সে সেই কাজ করে এবং সেই সময় করে; যখন আল্লাহ্ যা করার অনুমতি দান করেন। বছরের বারটি মাসের মধ্যে একটি মাসকাল ধরে যে নিজেকে এভাবে চালিত করতে অভ্যস্ত হয়, তার এ অভ্যাস দীর্ঘস্থায়ী বলে পরবর্তী এগারটি মাস সে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ পানাহার ও ধন-সম্পদ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে খুবই সাফল্যসহকারে সক্ষম হয়।

সিয়াম মুসলিমকে অশ্লীল, বাজে ও অর্থহীন কথাবার্তা বলা থেকেও বিরত রাখে। এ কাজ মুসলিম ব্যক্তির জন্য সাধারণভাবেও হারাম বটে; কিন্তু রামাদান মাসে এইগুলোর হারাম তো আরও তীব্র ও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ لَّمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

“যে লোক মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আমল ত্যাগ করলো না, তার খাদ্য-পানীয় পরিত্যাগ করে চলায় আল্লাহ্‌র কোনো প্রয়োজনই নেই।” (বুখারী ও মুসলিম)

অপর হাদিসে বলা হয়েছে ঃ

كَمْ مِّنْ صَائِمٍ لَيْسَ مِنْ صِيَامِهٖ اِلاَّ الْجُوْعُ وَالْعَطَشُ.

“বেশ সংখ্যক সিয়াম পালনকারীর অবস্থা এমন হয়ে থাকে, যাদের সিয়ামে ক্ষুধা-পিপাসার কষ্ট সহ্য করা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।” (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

আল কুরআনুল কারীমে যদিও অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সকলকেই দেয়া হয়েছে– যেমন বলা হয়েছে - جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا. ‘অন্যায়ের প্রতিফল অনুরূপ অন্যায়ই হয়’। কিন্তু সিয়াম পালনকারীকে এক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে হয়। কারোর পক্ষ থেকে অন্যায় হলেই সেও তার জবাবে অন্যায় করবে এইরূপ স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়নি। কেউ তাকে গাল-মন্দ বললে সেও অনুরূপ গাল-মন্দ তাকে শুনিয়ে দেবে, তা সিয়ামপালনকারীর জন্য বাঞ্ছনীয়

www.amarboi.org

নয়। এরূপ অবস্থা দেখা দিলে সিয়ামই তাকে ঢাল স্বরূপ আড়াল করে রাখবে। হাদিসে এ কথাই বলা হয়েছে এই ভাষায় ঃ

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ اَحَدُكُمْ فَلاَيَرْفُثْ وَلاَيَصْخَبْ فَاِنْ سَابَهُ اَحَدٌ اَوْقَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ اَمْرَوٌ صَائِمٌ.

"সিয়াম (সওম) ঢাল বিশেষ। সিয়ামের দিনে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া উচিত নয়, উচিত নয় হৈ হুল্লা চিৎকার ও গোলমাল করা। কেউ যদি তাকে গাল-মন্দ বলে বা তার সাথে মারামারি করতে আসে, তাহলে তার বলা উচিত "আমি একজন সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

এভাবে একজন লোক যদি সারা মাস ধরে ক্রোধ-আক্রোশ এড়িয়ে চলার অভ্যাস করে, অন্যদের উপর বাড়াবাড়ি করা থেকেও বিরত থাকে, তাহলে পরবর্তী এগার মাসকাল এই অভ্যাসের শক্তি দিয়ে সকল প্রকার অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে ওসব এড়িয়ে চলতে সক্ষম হবে– এটাই তো আশা করা যায়।

মানুষের উপর সর্বাধিক প্রভাব ও কর্তৃত্ব খাটায় মানুষের ইচ্ছা শক্তি। সেই ইচ্ছাশক্তিই যদি এক মাসকাল ধরে উক্তরূপ নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে সে তার ঈমানী শক্তিকে প্রবল ও অনমনীয় ইচ্ছা শক্তির উপর বিজয়ী করে ও তাকে শরীয়াতের বিধানের আওতায় নিয়ন্ত্রিত রাখতে সক্ষম হবে। এই উদ্দেশ্যেই সিয়ামের এই সুমহান ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়াতে গ্রহণ করা হয়েছে।

সচ্চরিত্র গঠনে বাসার বিভিন্ন উপকরণের প্রভাব

পরিবারের বিভিন্ন উপকরণ যেমন, টিভি, ভিসিডি, ভিসিপি, বেতার, টেপরেকর্ডার, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ল্যান্ড ফোন, মোবাইল ফোন ইত্যাদি প্রত্যেকটির নিজস্ব স্বকীয়তা এবং সে অনুযায়ী তাদের চাহিদা ও দাবি অব্যক্তভাবেই সকলের কাছে প্রকাশ করে থাকে। এক্ষেত্রে এ উপকরণগুলোর উপস্থিতি আমাদের পরিবারগুলোতে ছোট ছোট মানুষগুলোর মনে খুব প্রভাব বিস্তার করে। ফিরিশতা সমতুল্য ছোটমণিরা কার্টুন ছবি আর মারামারির দৃশ্য দেখার নামে কার্যত তা আয়ত্ত করা, পিস্তল হাতে নিয়ে দম্ভভরে অন্যদেরকে হটিয়ে দেয়া, বোমা ফাটিয়ে পালিয়ে যাওয়া, অশালীন ভাষা ও আচরণ শেখাসহ টিভি সেটের সামনে বসে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সময় ব্যয় করে থাকে– যা দুঃখজনক। তারা ড্রয়িং রুমে বসে রিমোর্ট চেপে চেপে টিভি দেখতে আর কম্পিউটারে বসে গেমস বা হাতে মোবাইল নিয়ে গেমস খেলতে খুব পছন্দ

www.amarboi.org

করে। এভাবে ওদের মেধা খুব বেশি ব্যয় হয় খেলার সফলতা অর্জনের নেশায়। অধিকন্তু বাসাগুলোতে চলতে থাকে ইসলাম বিরোধী কিছু অনুষ্ঠানের মহড়া, জন্মদিনের নামে এসব প্রোগ্রামে ওদেরকে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনরা উপহার দিয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার সরঞ্জামাদি এবং কিছু বাজে লেখকের বই। যা পড়ে তাদের মেধা উল্টা বিকৃত হয়ে থাকে। এসব ভূত-পেত্নীর গল্প সম্বলিত বই দিয়ে ওদের মেধাকে করা হয় ক্ষতিগ্রস্ত। চিন্তা-চেতনাকে করে দেয়া হয়-উদ্ভট। যে বয়সে কুরআন ও জীবন বিধান হিসেবে ইসলামী নীতি নৈতিকতাবোধ তথা কী করণীয় কী বর্জনীয় এমন বিষয়গুলো শেখার কথা সে বয়সে বাসায় গানের শিক্ষক রেখে সারে গামা পাধা নিসা অথবা গানের সুরে সুরে বাদ্যের তালে তালে নৃত্য শিখতে উদ্যত করা হয়ে থাকে— যা সত্যিই লজ্জাকর এবং রীতিমত এমন পরিবারের সন্তানগুলো আদর্শ মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রেও এগুলো বড় ধরনের প্রতিবন্ধক। পরিবার বা বাসায় এ সমস্ত উপকরণগুলো থাকবে কিন্তু এ থাকাটাকে পজিটিভ করে ব্যবহার করতে হবে। টিভিতে সব সময় যে বাজে বা অনাদর্শিক প্রোগ্রাম পরিবেশিত হয় তা ঠিক নয় তবে প্রয়োজনীয় এবং গ্রহণযোগ্য আদর্শিক প্রোগ্রামগুলো সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিতভাবে দেখতে হবে। তাহলে পাপ হবে না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সাওয়াবও অর্জিত হতে পারে। ভিসিডিতে প্রতি শুক্রবার যদি কুরআনিক আলোচনা সম্বলিত সিডি, ইসলামিক সংগীত, রাসূল (সা.)-এর জন্মভূমি পবিত্র মক্কার দৃশ্যগুলো দেখা হয় তাহলে একদিকে যেমন সাওয়াব হবে অন্যদিকে মুসলিমদের অতীত ঐতিহ্যগুলো সবাই জানতে পারবে। ফলে এর প্রভাবে আমাদের ছোটমণিরাও সচ্চরিত্রবান হয়ে গড়ে উঠবে। ছোট বেলায় এ শিক্ষাটি ওদের আগামীদিনের দিনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে। বাসায় রহমত ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। সন্তানরা হবে মা-বাবার মুখ উজ্জ্বলকারী সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণকামী আদর্শ মানুষ।

সচ্চরিত্র গঠনে হালাল উপার্জনের আবশ্যকতা ও তার প্রভাব

হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম মনে করাই জ্ঞানসম্মত। প্রকৃত অর্থে আদর্শ মানুষ বা মুমিন হওয়ার পূর্বশর্ত হলো হালাল উপার্জন করা, হালাল খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করা এবং অন্যান্য অসৎ পথে উপার্জিত অর্থের উৎস মুখ থেকেও দূরে সরে থাকা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

www.amarboi.org

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

"হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্য বস্তু তা হতে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৬৮)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ط إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

"হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার করো ও সৎ কর্ম করো। তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।" (সূরা আল মুমিনুন, ২৩ ঃ ৫১)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিযিক দান করেছি তা থেকে আহার করো।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৭২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশকে লঙ্ঘন করে যারা দুনিয়ার জিন্দেগীতে শয়তানের পদাঙ্ক অনুকরণ করে চলবে তাদের জন্য দুনিয়াতেও অপমান, লাঞ্ছনা, রোগ শোকের মাধমে শারীরিকভাবে শাস্তি আর আখিরাতে আগুনের কুণ্ডুলী অপেক্ষার সংবাদ বহুভাবে কুরআনে প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে যে সমস্ত পরিবারের অভিভাবকরা হালাল উপার্জন করেন তাদের অনেক প্রাচুর্য হয়তোবা না হলেও দুনিয়াতে শান্তি আর তাদের সন্তানদের আগামীতে আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠন হওয়ার মাধ্যমে মা-বাবার মুখকে উজ্জ্বল করে দেয়ার ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ পাক করে দেন। তাদের সন্তানরা চোর-বাটপার, বদমায়েশ, ছিনতাইকারী এক কথায় অসচ্চরিত্রে আচ্ছন্ন কম হয়ে থাকে। সচ্চরিত্রবান মা-বাবার সন্তান কখনো অসচ্চরিত্রের হতে পারে না। অমানুষ হতে পারে না। কারণ যারা সৎপথে পরিচালিত হয়, সৎভাবে জীবন যাপন করে, সৎভাবে উপার্জন করে তাদের উপর আল্লাহ রাজি খুশী থাকেন। তাদেরকে আল্লাহ নেক সন্তান দান করেন। সন্তানরা মা-বাবার প্রতি হয়ে উঠেন অত্যন্ত সচেতন, যত্নশীল এবং তাদেরকেই অনুকরণ অনুসরণ করে থাকেন। একটি বিষয় আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আদর্শবান নামাযী, অপরের

www.amarboi.org

কল্যাণকামী মা-বাবার-সন্তান কখনো সাধারণত অসচ্চরিত্রের হয় না বরং যেমন বাবা তেমনি সন্তান হয়ে থাকে– যা সবসময় শোনা যায়। পাশাপাশি বাবা যদি অসৎ উপায়ে হারাম অর্থ উপার্জন করেন তাহলে তার আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। হারাম অর্থ দিয়ে খাবার খাওয়া, বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়লে তাও কবুল হয় না। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নিয়ামত। মা-বাবার জান্নাত জাহান্নামের প্রধান মাধ্যম। কাজেই তাদেরকে মানুষ করতে পারলেই জান্নাত পাওয়া সম্ভব। সন্তানকে মানুষ করার জন্য প্রয়োজন তাদের প্রতি নসীহত প্রদান করা, তাদের তা মানতে উৎসাহ দেয়া, প্রয়োজনে শেষ পর্যন্ত বাধ্য করা। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি কাজ করে তা হলো মা-বাবা আদর্শবান হওয়া, সচ্চরিত্রের হওয়া; তাহলে সন্তানদের চিন্তা-চেতনা এবং চরিত্রও উত্তম হবে খুব সহজে। আদর্শ সন্তান গঠনের জন্য মা-বাবার হালাল উপার্জন পূর্বশর্ত। কারণ হারাম দিয়ে কখনো আদর্শ কিছু আসতে পারে না। আশাও করা যায় না। বরং আসলেও তা হারাম হয়ে যাবে। তার মধ্যে কল্যাণ থাকতে পারে না। যার জন্যে অসৎ উচ্চ পদবীর কর্মকর্তাদের সন্তানদেরকে খুব সহজেই অসচ্চরিত্রের হতে দেখি, সমাজে খারাপ কাজে নেতৃত্ব দিতে দেখি। এর কারণ একটাই হারাম অর্থে রক্ত মাংস গড়া যে দেহ, যে শিক্ষা; তাতো কখনো ভাল কিছু উপহার দিতে পারে না। কাজেই নেগেটিভ। তাই বলব সকল চেষ্টা তদবীর চিন্তা-চেতনা ব্যর্থ হবে যদি না হালাল উপার্জনের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চেষ্টা করা হয়।

সচ্চরিত্র গঠনে আদর্শ মায়ের ভূমিকা

মা বর্তমান সময়কালের শ্রেষ্ঠ মানুষ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। প্রত্যেক সন্তান একান্ত আপনজন হিসেবে মাকে পেয়ে থাকে, গ্রহণ করে পথ প্রদর্শক হিসেবে। নয় মাস দশ দিন মায়ের গর্ভে থেকে লালিত পালিত হয়ে একটা করুণ ও বর্ণনাতীত কষ্ট ও যাতনা প্রদানের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে আগমন ঘটে এক একজন মানব সন্তানের। মায়ের ৭৫ শতাংশ রক্তে গড়া এ সন্তানরা তিল তিল করে মায়ের কোলেই বড় হয়ে ওঠে। তারা পড়ালেখা করে আদর্শ মানুষ হবে। মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল করে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তির জন্য পবিত্র আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসে নির্দেশিত পথে চলাফেরা করবে এটা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সন্তানের মন-মানসিকতা গঠনে মায়ের আদর্শিক চিন্তা-চেতনা একশত ভাগ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মা যা-যা করে, যা-যা বলে, যা-যা করতে চায় সেদিকেই তাদের সন্তানরা গমন করে। ফলে যে সকল মায়েরা উদাসীনের মতো আচরণ করে, নিজেরা অনাদর্শিক, সম্পদের প্রতি ঝুঁকে যায়, সম্পদের কাছে মাথা নত করে দেয়, বাসায় খারাপ আচরণ করে, নিজের মনে যা চায় তাই করতে থাকে, উত্তম চারিত্রিক চিন্তা-চেতনায় শতভাগ উন্নীত নয়, প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ করে না, সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলে না, মার্কেটে গিয়ে কেনাকেটা করা, বেড়ানো, বেশি বেশি গল্প করা, আল্লাহর আদেশ ও নামায সময় মতো আদায়

www.amarboi.org

করে না তাদের সন্তানরা বখাটে মিথ্যাবাদীসহ অন্যান্য অসৎ চরিত্রের, অসৎ স্বভাবের হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। মায়ের অনুসরণ অনুকরণ করতে যেয়ে তারাও মনের অজান্তেই আদর্শের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে-- যা দুঃখজনক। তাদের দ্বারা পরিবারের ঐতিহ্য যেমনি বিনষ্ট হয় তেমনি সম্মানও হানি হয়। কোথাও কোথাও মা-বাবার হাতে হাত কড়া লাগিয়ে দুনিয়ার জীবনে পুলিশ কর্তৃক আটক হওয়ারও নজীর রয়েছে। অন্যদিকে, সন্তানের এ অনাদর্শের জন্যে সর্বপ্রথম মা-বাবাকেও মাটির নিচে আসামীর কাতারে মহান আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে হবে। পাশাপাশি উদাসীন মায়ের অসৎ চরিত্রের সন্তানদের সম্পর্কে সমাজের লোকজনেরা অতিষ্ঠ হয়ে অনেক সময়ই প্রশ্ন করে থাকে-- এ কেমন মায়ের সন্তান? মন্তব্য করে থাকে-- সন্তান এমন খারাপ না জানি তার মা কত খারাপ? না-না ভাল মানুষের সন্তান এত জঘন্য অমানুষ হতে পারে না। খোঁজ-খবর নিয়ে দেখো মায়ের বাবার বাড়ির মানুষ কেমন? সব কী মূর্খ জাহিল, টাকা-টাকা করে, টাকার পিছনে ঘুরে, টাকার জন্য যা ইচ্ছা তাই করে; সুদ ও অন্যের হক হরণ করে? আর সেই পরিবারের সন্তান হিসেবে মাও তেমনি। ফলে সন্তানও আদব কায়দাহীন বেয়াদব। আর হচ্ছে বড় মূর্খ ও জাহিল। যেমন গাছ তেমনই তার ফল। আম গাছে আমই ধরে, জাম ধরে না। কাজেই যেমন মা তেমনই তার সন্তান। (আবার মা ভাল হলে সন্তান ভাল। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে)।

সুতরাং সন্তানদের সচ্চরিত্রবান করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সচ্চরিত্রবান, আদর্শবান, উন্নত মন-মানসিকতাসম্পন্ন, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত, দুনিয়ার সম্পদের প্রতি নির্লোভ একজন আদর্শ মা-মা-মা। তারপর বাবা।

এদিকে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন প্রত্যেক মা-ই চায় তাদের সন্তান সচ্চরিত্রবান ও আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠুক। কিন্তু হয় না। কারণ, মা যদি অনাদর্শিক হোন তাহলে জন্মগতভাবে, দাদার বাড়ি ও নানার বাড়ির তারা যদি অনাদর্শিক হয় তাহলে তো বংশগতভাবে, সহজাতগতভাবে রক্তের সাথে মিশেই আসে, আর পরিবেশও তাকে সেদিকে যেতে সহায়তা করে। সন্তানের জন্য মামার বাড়ি হচ্ছে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। সেখানে মামারা, খালারা যখন মূর্খ আর যেন তেন উপায়ে সম্পদ বৃদ্ধি নিয়ে ব্যস্ত তখন তাদের সেই পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। যদি নানা অত্যন্ত সচেতন, আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত না হোন তাহলে কখনো সম্ভব নয়, বরং বাবাও হেরে যাবে; আর অন্যদিকে মায়ের এমন চাওয়ার মধ্যেও থাকে ঘাটতি; মা সন্তানের জীবন ধ্বংসকারী তা সে নিজের আদর্শ জ্ঞানের ঘাটতির কারণে উপলব্ধি করতে পারে না। তাছাড়া দুনিয়ার প্রতি আসক্ত, সম্পদের প্রতি উন্মত্ত পাগল, বিশেষ করে সম্পদের প্রতি যাদের লোভ বেশি, যারা যত পায় তত চায়, আরো চায় আরো .....। শেষ পর্যন্ত খেয়ে না খেয়ে জমি কিনতে চায়, ইটের দালান তৈরি করতে চায়, যেকোন উপায়ে সম্পদ বাড়াতে চায়, তারা সন্তানদের পড়াবে, সচ্চরিত্রবান

www.amarboi.org

করতে যাবে, এদের জন্যে টাকা ব্যয় করবে, ব্যাংক থেকে জমানো টাকা ভেঙ্গে সন্তানদের পিছনে ব্যয় করবে– এটা ভাবাই যেন কষ্টকর। অথচ শিক্ষা ব্যতিরেকে কোনো মানব সন্তানই আদর্শ মানুষ হতে পারে না। শিক্ষা ছাড়া সম্পদে পরিণত হতে পারে না। মা-বাবার দেয় সম্পদের সুষ্ঠু হিফাযত করতে পারে না। এমনকি তাঁদের মৃত্যুতে সঠিকভাবে জানাযাও করতে পারবে না। অন্যদিকে সমাজ ও জাতির জন্য কোনো কল্যাণকামী কর্ম ও চিন্তা তাদের কাছে আশা করা যায় না। আদর্শ শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা সচ্চরিত্রেরও প্রতিবন্ধক। আরো একটি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক, সেটি হলো সন্তানদেরকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে আদর্শ মানুষ ও সচ্চরিত্রের অধিকারী হিসেবে গঠন করতে না পারলে মা-বাবা নিজেরাও মা-বাবা হিসেবে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর কথা অনুসারে যেরূপ মর্যাদা ও সম্মান সন্তানদের পক্ষ থেকে পাওয়ার হকদার তা পাবেন না। রাসূল (সা.) পরিষ্কারভাবে বলেছেন,

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ.

"কোনো বাবা স্বীয় সন্তানকে যত কিছুই দিয়েছে এর মধ্যে কোনো উপহার উপঢৌকনই উত্তম চরিত্র ও ব্যবহার শিখানোর চেয়ে উৎকৃষ্ট হতে পারে না।" (তিরমিযী শরীফ)

অন্যত্র হাদিসে রয়েছে ঃ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَكْرِمُوْا اَوْلَادَكُمْ وَاَحْسِنُوْا اَدَبَهُمْ.

"হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) ইরশাদ করছেন, তোমরা নিজ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও এবং তাদেরকে সুশিক্ষার মাধ্যমে সচ্চরিত্রে চরিত্রবান করো।" (ইবনে মাজাহ শরীফ)

মুসলিমদের সংকট ও চির দুশমনের ব্যাপারে সার্বক্ষণিক সচেতনতা

সচ্চরিত্রবান মুসলিমদেরকে সব সময়ই থাকতে হবে সচেতন ও আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। সমাজ যেভাবে কলুষিত, চারদিকে মানুষ যেভাবে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে যাচ্ছে, শয়তান যেভাবে মানুষকে বিপথগামী করতে হন্যে হয়ে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে সেখানে সচ্চরিত্রবান মুসলিমদের দুনিয়ার জিন্দেগীতে সংকট ও দুশমনকে চিনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

www.amarboi.org

রাসূল (সা.) বলেন, মুমিন ব্যক্তি পাঁচটি সংকটের মধ্যে থাকে।

এক. মুমিন – যে তাদের প্রতি হিংসা রাখে।

দুই. মুনাফিক – যে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

তিন. কাফির – যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

চার. শয়তান – যে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য সর্বদা নিয়োজিত থাকে।

পাঁচ. কুপ্রবৃত্তি – যে তাদের সাথে সবসময় তর্ক করে।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মারুফ বলেন, মানুষের দুশমন তিনটি–

এক. দুনিয়া।

দুই. শয়তান ও

তিন. কুপ্রবৃত্তি।

সংসারের প্রতি না ঝুঁকে দুনিয়া থেকে আত্মসমর্পণ করা উচিত, শয়তান থেকে তার বিরোধিতা করার মাধ্যমে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে আশা আকাঙ্ক্ষা বর্জন দ্বারা বেঁচে থাকার চেষ্টা করা প্রত্যেক সচ্চরিত্রবান মানুষের পূর্বশর্ত। এসব কিছুর প্রতি ঝুঁকে গেলে যে কোনো সময় বিপথগামী হওয়ার সুযোগ থাকে।

এগুলো থেকে মুক্তির জন্য যা করণীয়

মানুষের কুপ্রবৃত্তি তার সাথে তর্ক করে বিধায় ইসলামিক পন্থায় সাধনা করা অত্যন্ত জরুরী। এখানে সাধনার বিষয়টি আমাদের পরিষ্কার হওয়া দরকার। সাধনা চার প্রকার। সচ্চরিত্রবান হতে হলে প্রত্যেককে এ সাধনাগুলো করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

এক. অল্প আহার করা।

দুই. অল্প নিদ্রা যাওয়া।

তিন. যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কথা বলা।

চার. প্রয়োজনে মানুষের কষ্ট যাতনা সহ্য করা।

অল্প আহারে আশা আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু ঘটে। অল্প নিদ্রায় নিয়ত পরিষ্কার হয়। কম কথায় বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করলে সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করা যায়। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাধনার তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করা উচিত।

সচ্চরিত্র গঠনের সময়কাল

শৈশব ও বাল্যকাল

সচ্চরিত্র গঠনের কার্যক্রম শুরু হয় পরিবার থেকে। মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে সে পরিবারের পরিবেশেই দিন দিন বড় হতে শুরু করে। এমতাবস্থায় পরিবারের সকল সদস্যদের কৃতকর্মকে সে বা তারা পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করতে থাকে। আর এ সময় ফিরিশতা সমতুল্য কোমলমতী প্রখর

www.amarboi.org

মেধাসম্পন্ন এ শিশুরা যা দেখবে তাই বুঝার চেষ্টা করবে এবং মনের মণিকোঠায় স্থান দিয়ে রাখবে। পরবর্তীতে সে একটা একটা করে এ সমস্ত আচরণগুলোর বাহ্যিক রূপ দিতে শুরু করে তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত স্ব-স্ব- কৃতকর্ম কথা-বার্তা, আচার আচরণ বিধি ইত্যাদি প্রসঙ্গে সচেতন ও স্পষ্ট ভাষী হওয়া। আর থাকা উচিত এগুলোর সাথে আদর্শের ছোঁয়া। তবেই না আজকের শৈশব কালের এ শিশুরা কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করে আগামীদিনে জাতির জন্যে কিছু করতে পারবে এবং সেও তার পরিবারবর্গ ও পরবর্তীতে জান্নাত নামক চিরসুখের স্থানটি উপহার পাবে।

জীবনের প্রথম শিক্ষক মা-বাবার ভূমিকা

প্রত্যেক মানব শিশুর জীবনের প্রথম শিক্ষক মা-বাবা। কাজেই এ ক্ষেত্রে মা- শুধু গর্ভে ধারণ করার মাধ্যমেই তার দায়িত্ব শেষ এমনটি বলা বা বাবা সন্তানদের সকল খরচের যোগান দিচ্ছেন বলে আদর্শ শিক্ষা ও আদর্শ চরিত্র গঠনের শিক্ষা প্রদান করা থেকে বিরত থাকবেন, বিষয়টি ঠিক এমন নয়। তাদেরকেই যৌথভাবে পালন করতে হবে এ গুরু দায়িত্ব। একজন শিশু যে পরিবেশে বাস করে শিশুর চরিত্র, আচরণ ও অভ্যাস গঠনে সেই পরিবেশের একটি কার্যকরী প্রভাব রয়েছে। শিশু সর্বপ্রথম প্রভাবান্বিত হয় তার মা-বাবার দ্বারা। কেননা শিশু তার আচার-আচরণে এদেরকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করে থাকে। তাই মা-বাবার কর্তব্য, তাঁরা যেন সন্তানদের সামনে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আচরণ প্রকাশ করেন এবং তাঁরা কথায় ও কাজে নিজেদেরই যেন উত্তম উদাহরণরূপে উপস্থাপন করেন।

এখানে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেটি হলো বার বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে বা মেয়ে সবাই হচ্ছেন কাঁদা মাটির ন্যায়। কাঁদা মাটিকে যেমন একজন কুমার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে রূপান্তর করে হয়তোবা এই মাটি দিয়ে কেউ মূর্তি তৈরি করে যা নাজায়িয। আবার কেউ কেউ হাড়ি-পাতিল, ফুলের টব, ইট ইত্যাদি তৈরি করে থাকেন যা জায়িয ঠিক তেমনি বার বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ নামের এ জীবগুলোকেও আপনি বা আমরা সুশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ হিসেবে সহজে গঠন করতে পারবো। কেননা, বার বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েরা ফিরিশতা সমতুল্য থাকে, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত বেশি থাকে। যে কোনো ভাল নির্দেশনা, কাজ বা যা চোখে দেখছে তারা তা খুব সহজে আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু বার বছর পর শয়তান এসে পরিকল্পিতভাবে তাদের পেছনে লেগে থাকায় তখন তারা যা শুনে তা ৭৫% মনে রাখতে পারে। ৫০% মানে আর যা দেখে তা ১০০% ই মাথায় রাখতে বা চোখে চোখে ধরে রাখতে পারে। আবার এ সময়ে তারা পরিবারের বাইরে গমন

www.amarboi.org

করতে শুরু করে কিন্তু বাইরেতো আর পরিবারের মতো ১০০% সুশিক্ষা পাওয়া যাবে না। কাজেই বলা যায়, সুশিক্ষা না পেলে অনাদর্শিক মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠবে। তাতে পরিবার সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব শান্তি বিনষ্ট হবে। সুতরাং আদর্শ মানুষ গঠন করতে সবাই চায় কিন্তু কিভাবে-

আমাদের পরিবারগুলোতে প্রত্যেক দিন ফজর নামায আদায় করে যদি মা-বাবা শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আল কুরআনুল কারীমের সূরা বাকারা থেকে কমপক্ষে ২টি আয়াত পড়ে তার ব্যাখ্যা করে, আমাদের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনার সাথে সম্পৃক্ত করে যদি আলোচনা পেশ করা হয় তাহলে সন্তান যারা শুনছে অবশ্যই এ থেকে মূল নির্যাসটি গ্রহণ করবে। তারপর সন্তানদেরকে যদি প্রয়োজনে ২০ মিনিট সময় আল কুরআনুল কারীম পড়া বা শিখার প্রতি তাকিদ দেয়া হয় তাহলে তারাও একদিন যখন বড় হবে তখন এটি করবে এবং যুগ যুগ ধরে এ বংশে আদর্শ মানুষের একটি ধারা অব্যাহত থাকবে তাতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীর জনগণ উপকৃত হবে।

যেমনি ভাত রান্নার পাত্র আর তরকারী রান্নার পাত্র এক সাথে রাখতে বা ধৌত করতে ধাক্কা লাগে তেমনি দুই পরিবারের দুই বংশের দু'জন মানুষ মা-বাবা তাদের মধ্যে কখনও কোনো কথা কাটাকাটি বা রাগের সৃষ্টি হতেই পারে। কিন্তু এগুলো যতটা সম্ভব সন্তানদের চক্ষুর আড়ালে হলে ভাল হয়। তাছাড়া কখনও সাময়িকভাবে দু'জনের মধ্যে রাগ হলেও এক সময়তো তারা একত্রিত হবেই এবং হওয়াটাই আমাদের কামনা। এখানে একটি বিষয় বলে রাখা ভাল, আমাদের সমাজে এমন অনেক কথা প্রচলন আছে রাগ নাকি মায়া-মমতা বাড়ায়। কিন্তু আমার এ জীবন পর্যন্ত অর্জিত জ্ঞানের আলোকে বলছি আমি কুরআন বা হাদিসে এমনটি কোথাও পাইনি। বরং এমন পেয়েছি রাগের সাথে শয়তানের একটা সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই এটি না করাই উত্তম। কিন্তু তারপরেও যদি সাংসরিক জীবনে চলার ক্ষেত্রে রাগ চলেই আসে তাহলে মনে করুন দু'পক্ষের রাগের মধ্যে এক পক্ষ সঠিক আরেক পক্ষ হয়তোবা তৎক্ষণাৎ জিনিসটি ভুল করেছেন বা বলেছেন বা যা মনে করেছেন তা সঠিক নয়। এক্ষেত্রে যদি সন্তানদের সামনে এটি করা হয়, তাহলে তারা বুঝে হোক আর না বুঝে হোক এক পক্ষের প্রতি ঝুঁকে যাবে তাতে সন্তানদের পক্ষ থেকে হয় বাবাকে বা মাকে অবজ্ঞা করা হয়ে যাবে। এতে একজন হেয়প্রতিপন্ন হওয়ার কারণে মনে কষ্ট পাবে যা পরবর্তীতে তাদের সচ্চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে এবং সন্তানদের জীবনে সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে।

মা-বাবা সব সময় ছেলে-মেয়েদেরকে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসবেন, আদর করবেন, স্নেহ দিবেন (যা পৃথিবীতে আর কেউ এর চেয়ে বেশি দিতে পারে না) এটি বলাই বাহুল্য। পাশাপাশি জীবনে চলার জন্যে প্রতিটি পদে পদে, প্রতি

www.amarboi.org

ক্ষেত্রে যে যোগসূত্র তা সঠিকভাবে বজায় রাখার জন্যে উপদেশ দিবেন, বলবেন, নির্দেশ দিবেন, বুঝাবেন, এটি বাবা-মার পক্ষ থেকে সন্তানদের পাওয়ার একটি অধিকার-যেমন পাওয়া যায় সম্পদ, বাবার গাড়ি-বাড়ি।

এখানে একটি বিষয় ইঙ্গিত প্রদান করতে চাই, সেটি হলো প্রায় ৯০% পরিবারের অভিযোগ সন্তানরা তাদের মানতে চায় না, মানলে কয়দিন পর আবার সে আগের অবস্থানে ফিরে যায়। (উল্লেখযোগ্য প্রায় ১০০টি পরিবার ব্যবস্থা আমার এ স্টাডির অন্তর্ভুক্ত)। শ্রদ্ধাময়ী মা-বাবারা– এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আমি যা বলব তা হলো, সন্তানরা আপনাদের কথা শুনে না, কার কথা শুনে বা শুনবে? কে আছে আপনাদের চেয়েও তাদের প্রিয়! এই ক্ষেত্রে অনেক মা-বাবা বলে থাকেন যা বেরিয়ে যা, যেখানে পারিস সেখানে যা। কিন্তু না আমার পরম শ্রদ্ধেয় বর্তমান সময়ে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্মানিত মা-বাবা এমন কথা আপনারা বলবেন না। কেননা তাতে আপনাদের ক্ষতি হয়ে যাবে। কেমন?

এ রকম বললে সন্তানরা বাসা থেকে বেরিয়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিবে, তার দুঃখ, হতাশা, মন খারাপ দূরীভূত করার লক্ষ্যে সে মাদকাসক্ত বা আরও চরম কোনো কাজ করা, দীর্ঘ সময় দূরে থাকার লক্ষ্যে ছায়াছবি দেখা অন্যথায় গানের আসরে বা যাত্রা গানের আসরে চলে যাবে। তাতে আপনারাই আবার একটু পরে ছোটাছুটি করবেন, খুঁজতে শুরু করবেন, প্রয়োজনে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবেন " X " তুমি ফিরে এসো, তোমার মা অথবা বাবা হাসপাতালে ভর্তি বা বেতারে বিজ্ঞাপন প্রচার করবেন হারানো বা নিখোঁজ সংবাদের অংশে ইত্যাদি– এতে সন্তানরা আরো বেশি খারাপ হয়ে যাবে। গত কয়েকদিন পূর্বে একজন মায়ের এমন অভিযোগে আমি বলেছি– সন্তান মায়ের কথা শুনবে না, কার কথা শুনবে? মায়ের চেয়ে আপন এ পৃথিবীতে আর তার কে আছে? আমি মাকে বলেছি, আপনার স্নেহ, আদর, ভালবাসা, প্রয়োজনে চোখের পানি এসব কিছু দিয়ে আপনি আপনার সন্তানকে বুঝাবেন, বলবেন, সে মানবে না, আপনার কথামত চলবে না এমনটি হতেই পারে না। আর এরপর আল্লাহর কাছে দু'হাত তোলে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে আপনি যখন জায়নামাযে বসে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন তখন দু'টি লাভ হবে একটি হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত আসবে (মনে রাখবেন সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে মা-বাবার জন্যে নেয়ামত এবং এটি আল্লাহই দেন আবার কেড়ে নেন, এতে কারোর কোনো হাত নেই, কৃত্রিম উপায়ে জন্ম প্রতিহত করা ছাড়া) আর অন্যটি হলো, আপনার কান্নার শব্দে, চোখের পানি দেখে তার মন নরম হয়ে যাবে। সে তখন আপনার কাছে এসে মাফ চাইবে আর বলবে মা-মাগো! আমি ভুল করেছি মা- আমাকে ক্ষমা করে

www.amarboi.org

দিন। এ রকম কয়েকবার বলার পর আপনি তাকে তখন কাছে টেনে এনে বলুন, যদি মেয়ে হয় মা, ছেলে হলে বাবা- বলো! আমি কি তোমাদের মা নই? আমি কি তোমাদের ভাল চাইনা? তাদেরকে আস্তে আস্তে বুকের সাথে জড়িয়ে বলুন কোনো বাবা-মা কি সন্তানের অমঙ্গল চাইতে পারে? আমি কি সেদিন তোমাদের চাহিদামত এটি দেইনি আমি কি তোমার জন্য সেদিন এই জামা বা খাবারটি কিনে আনিনি? কেন তোমরা আমার মনে কষ্ট দাও? এমনটি বলার পর এ পৃথিবীতে এমন কোনো সন্তান নেই যে বা যারা মা-বাবার কথামত চলবে না, এর ব্যতিক্রম খুবই নগণ্য। কিন্তু তা না করে যদি বাবা-মারা বলে উঠেন ওরে বাদড়, মুখ পোড়া ঘর/বাসা থেকে বেড়িয়ে যা, তোর মুখ আমি দেখতে চাইনা, আমার চোখের সামনে আর আসবি না, তখন সন্তান ছেলে হোক আর মেয়ে হোক তারা অন্যদিকে মানে চারিত্রিক সৎ গুণাবলি অর্জনের চেয়ে অসৎ দোষাবলিতেই বেশি আচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

আবার দেখুন না, এইতো কতক্ষণ আগে হয়তোবা ১/২/৩ ঘণ্টা আগে বলেছেন তোকে দেখতে চাই না, তোর মুখ দেখতে চাই না, যেই সে দূরে সরে গিয়ে উপরিউক্ত সময় অতিক্রম করল তখনই দেখি আপনি বা আপনারা (বাবা মা) অস্থির হয়ে প্রাণপ্রিয় ছেলে-মেয়েকে খুঁজতে শুরু করলেন। তাতে ওরা সুযোগ পেয়ে গেল, সংশোধনের চেয়ে আপনাদের দুর্বলতার সুযোগে মাথায় চড়ে বসল এবং পরবর্তীতে দেখা যাবে তাদের মন মতো কোনো কিছু না দিলে বা না বললেই রাগ করে বসে, দূরে সরে যায়। কারণ, সে জানে কিছুক্ষণ পর আপনারাই (বাবা-মা) তাদের টেনে কাছে আনবেন। কাজেই এমনটি করবেন না। তাছাড়া, এমন বকা দেয়া কোনো বাবা-মার পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য শুভ নয়। বিরাট অমঙ্গলও ডেকে আনতে পারে। ওরা তখন মনে করতে পারে মা-বাবা আমার মুখ দেখতে চায় না, কাজেই আমিতো কপাল পোড়া সুতরাং আমি আর বেঁচে লাভ কী? যে কোনো কঠিন জীবননাশী সিদ্ধান্ত বা আপনাদের মান মর্যাদা হানিকর কোনো সিদ্ধান্ত তারা নিয়ে নিতে পারে। কাজেই কখনও এমন কথা বলা বা রাগের চূড়ান্ত সীমানায় উন্নীত হবেন না, সন্তানরা ভুল করবেই, এটা স্বাভাবিক। কারণ তারা বর্তমান সময় ছাড়া ভবিষ্যতে কী হবে তাতো জানে না, এই মনে করুন সন্তানরা পড়ালেখা করে না। এখন পড়ালেখা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্টকর কাজ কোনো সন্দেহ নেই। আবার পড়ালেখা করলে সে তার সৃষ্টিকে চিনে ফেলবে; সে দুনিয়ার কোথাও মাথা নত করবে না; সে তাকওয়াবান হয়ে যাবে ইত্যাদি সহ সবসময় ভাল কাজ করবে। সুতরাং শয়তান চাইবে তাকে আদর্শিক পরিবেশ থেকে ফিরিয়ে রাখতে, বাবা-মার অবাধ্য বানাতে, কেননা আপনার সন্তান যদি আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যায়, তাহলে শয়তানতো এখানে হেরে যাবে (এখানে বলে রাখা ভাল প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের ভাল কাজে শয়তান হচ্ছে শত্রু তার সাথে যুদ্ধ করে এটি করতে হয় এবং এ

www.amarboi.org

পর্বে অনেক বাধা বিঘ্ন আসবে। সুতরাং এটি মেধা, ধৈর্য ও আল্লাহ্‌র কাছে শয়তান থেকে পানাহ্ চাওয়া ছাড়া সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। আর মন্দ কাজে শয়তান ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো সহযোগিতা করে এবং খুশী হয়ে থাকে।) কাজেই শয়তান বাধাগ্রস্ত করতে চাইবেই। আমরা সবাই জানি, শয়তান ওয়াদাবদ্ধ, সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ক্ষমতা চেয়ে নিয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সে ক্ষমতাও দিয়েছেন, (তবে শয়তানের বিচার হবে) এখানে কেউ কেউ ভুল বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ্ শয়তানকে ক্ষমতা দিয়েছে, শয়তান আমাদেরকে খারাপ কাজে জড়িত করছে। কাজেই আমরা খারাপ কাজ করলে আমাদের দোষ কী? আবার কেউ কেউ বলবেন আল্লাহ্‌র ইশারা ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না। কাজেই আমাদের দোষ কী? এগুলোর জবাবে আমি বলব, এমন বলা ঠিক হবে না, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের কাছে কুরআন বা পথ নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। শিক্ষক হিসেবে ২,২৪,০০০ মতান্তরে ১,২৪,০০০ পয়গম্বর পাঠিয়েছেন। এমনকি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূল (সা.)-কে পাঠিয়েছেন; যিনি জীবনের ৬৩টি বছর বিন্দুমাত্র নিজের জীবনের স্বার্থে ব্যয় করেননি। কাজেই আমাদের শয়তানের সাথে যুদ্ধ করে সফলতা আনতে হবে। এখন যারা ছোট শিক্ষার্থী তারা তো এটা ঠিকভাবে বুঝবে না; সুতরাং সে পড়তে চাইবে না, আবার তার ভবিষ্যৎ তথা পড়ালেখা না করার যে করুণ পরিণতি তাতো সে অবগত নয়। কাজেই সে বা তারা এমন বলতেই পারে। আর পড়তে পারব না। পড়তে ভাল লাগে না। এত পড়তে বলবা না, তোমরা পড়া ছাড়া কিছু বুঝ না। এইতো সেদিন ঐ জিনিসটা চাইলাম তা দিলে না আর খালি পড়া পড়া করো। স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়তে দেও না, বই ঠিকভাবে কিনে দেও না, স্কুলে হেঁটে যাই, অন্যরা রিকশায় বা গাড়িতে আসে ইত্যাদি..... অসংখ্য কথা বা প্রশ্ন। কিন্তু এগুলো বললে আপনারা (বাবা-মা) যদি রেগে যান আর বলেন আর পড়ার কথা বলব না। যা ইচ্ছা তাই করো। তাহলে শেষ, ফলাফলতো বিপরীত হয়ে যাবে। আপনি যখন শুনবেন পাশের ঘরে ভাল ফলাফল অর্জন করেছে। সাংবাদিক আসছে, তাদের ছবি সংবাদ পত্রে ছাপা হয়েছে, সমগ্র দেশ ও বিশ্বের মানুষ তা দেখছে এবং সেই গৌরবময়ী মা-বাবার জন্য দু'আ করছে, তাদের সুনাম করছে, টিভিতে বাবা-মা সহ সাক্ষাৎকার প্রচার করা হচ্ছে অথচ আপনার গর্ভের সন্তান ফেল (আল্লাহ্ এমনটি না করুক) করেছে। বলুন! মা- মাগো, সেদিন আপনি কিভাবে সহ্য করবেন; আপনার মাতৃত্ব সেদিন কিভাবে এটি মেনে নিবে। কেমন হবে আপনার মনের অবস্থা। মুহু মুহু ফোন আসবে, আত্মীয়-স্বজনরা বাসায় আসবে, জিজ্ঞাসা করবে আপনার সন্তানের ফলাফল কী? বাবাকে চায়ের দোকানে, মসজিদের বা রাস্তায় গমন পথে ঘনিষ্ঠজনরা জিজ্ঞেস করবে বৃত্তি, এস. এস. সি বা এইচ. এস. সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, আপনার

www.amarboi.org

সন্তানের খবর কী? কিছু বলছেন না কেন? মিষ্টি কোথায়? তখন বাবার- বা আপনার মাথায় কি আকাশ ভেঙে পড়বে না? আপনার কি খারাপ লাগবে না? (পাশের বাসায় শিক্ষার্থীরা ভাল করেছে আর আপনার শিক্ষার্থীরা খারাপ ফলাফল করেছে। এতে আপনার খারাপ লাগা প্রতিহিংসার নয়, এটাকে ভুল বুঝা যাবে না। এটি হচ্ছে ভাল কাজে প্রতিযোগিতার লড়াই বা মনোবৃত্তি। এটি ইসলাম ধর্ম মতে জায়িয।)

কাজেই রাগ করে এমনটি না বলে আপনি বা আপনারা অযু করে নামাযে দাঁড়িয়ে যান এবং তার পাশে বা সে যে কক্ষে সেই কক্ষে গিয়ে তাকে কিছু না বলে, নামায শেষ করে মুনাজাতে আল্লাহ্‌র কাছে বলেন হে আল্লাহ্ তা'আলা, হে দুনিয়ার মালিক, আপনি..... তাদের মধ্যে এমন বুঝ শক্তি দিন, তাকে মাফ করে দিন, এমন বুঝ দিন যেন মা-বাবার সাথে রাগ না করে পড়ালেখা ঠিকভাবে করে এবং আমাদের কথা শুনে। তাহলে দেখবেন তাদের মনের মধ্যে একটি পরিবর্তন আসবে এবং সে পড়তে বসবে, আবার যদি এমন বলেন বেয়াদব কথা শুনে না, অসভ্য, বদমায়েশ, তাহলে কী অবস্থা হবে শুনুন, সে আরও উল্টা রেগে গিয়ে শুয়ে থাকবে খাওয়া-দাওয়া করবে না এবং অনেক ক্ষতিকর কাজের দিকে ধাবিত হবে। আর মা-বাবাকে সম্মান করবে না। এখানে আমি সেই মা-বাবার কাছে সবিনয়ে জানতে চাই আপনারা যে তাকে বেয়াদব বলবেন? সত্যিই কি বেয়াদব? আপনারা কি জানেন আল্লাহ্ তা'আলা বেয়াদবদের পছন্দ করেন না এবং এজন্যে আল্লাহ্‌র রহমত তার উপর থেকে উঠে যাবে, আপনাদের এ সাক্ষ্য দানের ফলে ধরে নিলাম সে বেয়াদব কিন্তু তার পরেওতো কথা থেকে যায়, এমন বেয়াদব তো আপনারাও পছন্দ করেন না। এই জন্যে তো তাকে বেয়াদব বলে বকা দিলেন তাহলে সন্তানদের মধ্যে এটি কোথা থেকে আসল? থাক আল্লাহ্ মাফ করুন, এমনটি বলে বকা না দেয়াই উত্তম বলে আমি মনে করি।

এক্ষেত্রে তাদেরকে বুঝাতে হবে পড়ালেখা না করলে এমন হবে, করলে এমন হবে অর্থাৎ সুফল-কুফল বাস্তব দৃষ্টান্ত আশে পাশের প্রতিবেশীর বা দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের উদাহরণ দিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে দিন, তাদেরকে বারবার বুঝান, মা-বাবা তাদের সাথে রাগ করবেন না, বারবার বুঝানোর চেষ্টা করুন। এখন নয় তখন, আজ নয় কাল, একদিনতো বুঝবে, কাজেই বুঝানো আর আল্লাহ্‌র রহমত কামনা বন্ধ করে দিবেন না। তাহলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে কারণ যে সময়, দিন আজ যায় তা আর ফেরত আসবে না। তারা আপনার সম্পদ, আপনার জান্নাত-জাহান্নাম, তাদের সফলতা-বিফলতা, ভাল কাজ বা খারাপ কাজের ফলাফলের উপর নির্ভর করে। কাজেই তা ভুলে গেলে চলবে না।

আবার যদি এমন হয় বাবা অফিসে বা ব্যবসা ক্ষেত্রে বা দূরে এই কতক্ষণ

www.amarboi.org

পরেই বাসায় আসবে তাহলে সন্তানদেরকে ভয় দেখিয়ে বলুন যে তুমি এমনটি করেছ আর কখনও করো না করলে আমি কিন্তু তোমার বাবার কাছে এটি বলে দিবো। দেখবেন আপনার সন্তানরা এটি অন্তত কয়েকদিন করবে না, তারপর হয়তোবা আবারও করলে তাকে পূর্বের ন্যায় বুঝিয়ে ভয় দেখিয়ে বলুন আমি জানি তোমার বাবা যদি এটি জানে তাহলে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন, তোমার প্রতি রাগ করবেন, তোমার জন্যে এ পছন্দনীয় খাবারটি, জামাটি আর আনবে না। এটি না এনে দিলে আমি কোথায় পাবো? কোত্থেকে তোমাকে দিবো বা তাকে বলুন তুমি এটি পছন্দ কর আমি দিবো কিন্তু এ কাজটি তুমি আর করবে না আমাকে বলো। এভাবে তাদেরকে সংশোধনে রাখার চেষ্টা করবেন কিন্তু মাথায় রাখবেন বাবাকে বলে দেয়ার ভয় দেখাবেন কিন্তু সহসা বলবেন না। বললে বাবা শাস্তি দিবেন বা দিবেন না কিন্তু দু'টিই সন্তানের জন্য পরবর্তীতে ক্ষতি হয়ে যাবে। মনে করুন বাবা মার দিলো, সন্তান পরবর্তীতে এই ভুলটি পুনরায় করলে আপনি তাকে বুঝালেও সে বুঝবে না এবং সে মনে মনে বলবে বিচার দিলে দাও কি আর হবে জানিতো হয়তোবা বকা বা বেত্রাঘাত করবে। এইতো আর কী?

অনুরূপ বাবা আবার অনেক ক্ষেত্রে বলবেন তোমার মা তোমাদের কত আদর করেন, না খেয়েও খাওয়ান, নতুন কাপড় পরিধান না করেও তোমাদের জন্য ঈদ-উল-ফিতরে জামা এনেছে কাজেই তোমরা এ ভুলটি বা এমনটি আর করো না। তাহলে আমি তোমাদের মাকে বলে দিবো। এতে তারা মায়ের প্রতি একদিকে শ্রদ্ধা আরেকদিকে কিছু হারানোর ভয়ে (আদর, খাবার, প্রিয় পিঠা হাতের তৈরি অন্যান্য খাবার, ঈদে মায়ের পছন্দনীয় কাপড় জামা) ঐ রকম আর করবে না। সন্তান আস্তে আস্তে আপনাদের কথা শুনবে, খারাপ আচরণ করবে না। দেখুন আমার সম্পর্কে একটু বলি, আমি আমার মায়ের চোখে– পানি দেখলে একটুও সহ্য করতে পারি না। ছোটবেলা বাবাকে হারিয়ে মায়ের কঠোর শাসন আর চোখের পানির বদৌলতে আমি আজ এখানে। আমার গর্ভধারিণী মায়ের চোখে কোনো কারণে পানি দেখলে আমার বুকে কান্নার জোস পড়ে যায় এবং আমি ক্ষমা চাইতে থাকি না জানি আমার মা আমার কোনো কথা, কাজ, পরিকল্পনায় কষ্ট পেয়েছেন আর পাশাপাশি আল্লাহ্‌র কাছেও সাহায্য চাইতে শুরু করি কেন মায়ের চোখে পানি দেখলাম তার কারণ, আমার ভূমিকা বা ভুল খুঁজতে শুরু করি; জানতে চেষ্টা করি, জিজ্ঞাসা ও অনুরোধ করতে শুরু করি ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আমি মূল কথাটি জানতে পারি। তারপর আর করব না কথা দিই এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইতে শুরু করি। সুতরাং আমার মতোইতো আপনাদের সন্তানরা। কাজেই আমার বিশ্বাস অবশ্যই আপনাদের সন্তানরা কথা শুনবে, ভাল করবে, রাগ করবেন না। বকাবকি করবেন না। আর করলেও কারোর সামনে বা শুনিয়ে তো নয় কারণ অন্যকে শুনিয়ে বকলে তার লজ্জা কমে যাবে পাশাপাশি জেদ আসবে আরও বেশি বেশি করবে।

www.amarboi.org

দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে সরকার চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী ধরে জেলখানায় নিয়ে যায়। প্রচার করে বলে তার লজ্জা কমে যায় সে জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসলে সবাই বলে– চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী, আর তখন সে আর ফিরে আসতে পারে না। সে আরও বেশি বেশি করে চুরি, ডাকাতি ও সন্ত্রাসী কাজে জড়িয়ে পড়ে। (অবশ্য আরও অনেক কারণ আছে আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না)। কাজেই বাবা-মাদেরকে অনুরোধ করে বলবো আপনারা আপনাদের সন্তানদের প্রতি যত্নশীল হোন।

- ভুল করলে বুঝাবেন, বুঝাবেন বার-বার।
- সহসা অধৈর্যশীল হবেন না।
- তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করে জোর কণ্ঠে ধমক দিয়ে বা মা যদি এমন বলেন বাবার গোষ্ঠীটাই এরকম, জাতের ধারাতো পাবেই অথবা বাবা যদি বলেন, একদম মায়ের গোষ্ঠীর মতো হয়েছে (অবশ্য এমনটি শোনা যায় না) তাহলে আমাদের আদরের ছোট ভাই-বোনরা কথাতো শুনবেই না। অনেক সময় তারাও ধমকের সুরে জোর চিৎকার দিয়ে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করবে না। আবার অনেক সময় মা-বাবাকে বলেই ফেলে এত চিৎকার করো না আমার মাথা ব্যথা করে তোমার কথা শুনলে ইত্যাদি.....। যা আদর্শ চরিত্রের পরিচয় বহন করে না। শুনতেও দৃষ্টিকটু মনে হয় আবার আশে পাশে অন্যরা শুনলেও দু'পক্ষকেই খারাপ মনে করবে– যা নিন্দনীয়।
- বকাবকি করা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবেন কারণ আত্মসম্মানবোধ সবাই বুঝে। আবার বকাবকি করলেও এককভাবে তাকেই শুনিয়ে বকবেন কিন্তু অন্যদের সামনে বা সজোরে নয়। তাহলে অনেক সময় সন্তানরা প্রতিবাদী কণ্ঠের মতো পাল্টা জবাব দিয়ে ফেলে যা দৃষ্টিকটু ও বেয়াদবির শামিল।
- মার দেবেন না, মারের ভান করবেন, ভয় দেখাবেন, মা-বাবার কথা বলে ভয় দেখাবেন, বাবা-মার কথা বলে ভয় দেখাবেন।
- কখনও কোনো কিছুর চূড়ান্তরূপ দেখতে চাইবেন না, তাহলে এরপরতো আর কিছুই থাকে না। কাজেই পরবর্তীতে কিন্তু সে উল্টো কাজ করে বসবে।
- অতীতের দিনগুলোর ভাল অবস্থা বা খারাপ অবস্থা বর্তমানের সময়ে তুলনা করে তাদেরকে উৎসাহী করে তুলবেন আর ভবিষ্যতের প্রতি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা সম্বলিত উপদেশ প্রদান করবেন।
- সব সময় শুধু নির্দেশনা প্রদান করা যাবে না তাহলে আবার বলবে কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা মানব ইত্যাদি।

www.amarboi.org

■ কখনো মিথ্যা বললেও আপনারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলবেন না। বরং এভাবে বলবেন, মনে করুন কোনো একটা কাজ তারা খারাপ করেছে যা ক্ষতির শামিল আপনারা জানেন কাজটি আপনাদের সন্তান করেছে; জিজ্ঞাসা করলে সে আপনাদের ভয়ে নিষেধ করেছে এক্ষেত্রে আপনি যদি বলেন তুমি মিথ্যা কথা বলেছ তুমি মিথ্যাবাদী তাহলে সে সত্যবাদী তা প্রমাণ করার জন্য আরো যতটা সম্ভব মিথ্যা কথা বলতে শুরু করবে। কাজেই আপনি মেনে গিয়ে বলুন, যে আসলে কাজটা এমন না হয়ে এমনটি হতে পারত আর তাহলে ক্ষতিটা হত না। তাদেরকে মিথ্যাবাদীও বললেন না সত্যবাদীও বললেন না এতে সে কখনই মিথ্যা বলা কী জিনিস তা অন্ততঃপক্ষে এ পরিবেশে ভুলে যাবে। আরেকটি বিষয় ক্ষতি যা হয়েছে তাতো হয়েছেই কাজেই কেন এত বকাবকি, মারামারি, রাগারাগি, কী দরকার! প্রয়োজন আছে কি? তাছাড়া এভাবে বললেইতো তারা হতে পারে সত্যবাদী ও সচ্চরিত্রবান।

■ স্কুলে স্যারদের প্রতিদিনের পড়া শেষ করেনি। অথচ আপনারা জিজ্ঞাসা করেছেন তুমি কি এটা করেছ? জ্বি করেছি। আপনারা তখন তাকে নিয়ে চেয়ার টেবিলে বসে বলেন যে একবার লিখে দেখাও তো কেমন হয়েছে? লিখতে অনীহা প্রকাশ করলে আপনি একটু আদর করুন তারপর বলুন, ঠিক আছে হয়তোবা লেখার মতো হয়নি, আসো! আরেকটু ভালভাবে পড়ে নাও। শেষ পড়া তৈরি হয়ে গেলো। কিন্তু এমনটি না করে মা-বাবারা বাসা বা ঘর সরগম করে তোলে চিৎকার করে। কিন্তু কী লাভ পড়াতো হলো না। আর এরপর বসলেও পড়া ঠিকমত হয় না। কাজেই চূড়ান্ত সীমায় না গিয়ে একটু আদর করে তাকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিন, তাহলে দু'পক্ষই হবেন লাভবান।

■ বাসা থেকে বেড়িয়ে বা প্রবেশের ক্ষেত্রে যদি বাবার সাথে বের হয়, তাহলে বাবা বলবেন আম্মুকে সালাম দিয়ে বলে আসো আর আম্মুর সাথে বের হলে আম্মু বলবেন তোমার আব্বুকে সালাম দিয়ে বলে আসো আব্বু আমরা আসি, দু'আ করবেন। আল্লাহ্ হাফিয। এভাবে আবার বাসায় ফিরে এসেও ঠিক তেমনিভাবে যদি ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষা দেয়া হয় বাসায় গিয়ে আব্বুকে, আম্মুকে বা বাসায় যারা থাকবে যারা তোমাকে গেট বা দরজা খুলে দিবে তাদের বলবে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"। আব্বু, আম্মু বা ভাইয়া আন্টি কেমন আছেন? তাহলে উপস্থিত সবাই খুশী হবে, বাসায় যদি কোনো মেহমানও থাকে তাহলে তারাও খুশী হবে এবং বলবে "আল্লাহু আকবার" ওরা কত ভাল! দু'আ করবে, হে আল্লাহ্ তাদেরকে আদর্শ মানুষ হওয়ার তৌফিক দান করো। আর এ পর্বে আল্লাহ্ তা'আলা খুশী হয়ে যাবেন। ছেলে-মেয়েরাও হতে থাকবে আদর্শ মানুষ।

www.amarboi.org

বড় ভাই-বোন ও অন্যান্য সদস্য-সদস্যার ভূমিকা

প্রকৃতিগতভাবে এক যায় আরেক আসে। তেমনি এখন যে আসবে সে তখন যে এসেছিল তাকে অনুসরণ করবে অর্থাৎ ছোটরা বড়দের অনুসরণ, অনুকরণ করবে এটা স্বাভাবিক। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে এক দিনের বড় সে তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী।" কাজেই ছোটরা বড়দের সম্মান ও ভক্তি করবে, পরস্পর সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ হবে, হৃদ্যতা বাড়াবে। বড়রা ছোটদের স্নেহ করবে, আদব-কায়দা শিক্ষা দেবে। ছোটরা সব সময় বড়দের কথা শুনবে, মানবে, মানার চেষ্টা করবে, শুনার চেষ্টা করবে। বড়দের কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা, চাহনি বস্ত্র পরিধান, মাথার চুল কাটা থেকে শুরু করে সব কিছু ছোটরা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ, অনুকরণ করে থাকে। এ পর্বে বড়রা যদি সচেতন না হোন, পড়ালেখা করে আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম না হোন তাহলে ছোটরা কোথায় থেকে শিখবে? তারাইবা কেমন মানুষ হবে?

শৈশব ও বাল্যকালের এ সময়টুকু হলো শিক্ষা ও জীবনের বীজ বপনের সময়, আগামীদিনের সমগ্র জীবনটাই ছোটবেলার এ শিক্ষার উপর নির্ভর করে। ছোট মনে তীক্ষ্ণ মেধায় তারা যা দেখে যা শুনে, তাই করতে উদ্ধত হয়ে থাকে। ওরা ছোট, ওরা বুঝে না– এমন বলে ছোটদেরকে অবহেলা বা ওদের সামনে অবাধে মন্দ কথা বলা, মন্দ কাজ করা ঠিক হবে না। ছোটদের চোখের সামনে আদর্শ মানব চরিত্রের বিপরীত বা নৈতিকতা বিরোধী কোনো কাজ করা মানে হলো একটি অনাদর্শিকতা, অনৈতিকতা বা অসচ্চরিত্রের বীজ বপন করে দেয়া– যা পরবর্তীতে সে প্রথমে চুপে চুপে তারপর সরাসরি বা প্রকাশ্যে করতে থাকবে। এক্ষেত্রে বড় ভাই-বোন বা বাসার অন্যান্য সদস্য-সদস্যার করণীয় হলো সুন্দর সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়ার চেষ্টার পাশাপাশি আদর্শ জীবন গঠনের লক্ষ্যে বই পড়া, ইসলামী দাওয়াত ও শরীয়ার দাবি জানার জন্যে কুরআন ও হাদিস পাঠ করা, সত্য কথা বলা, সুন্দর আচার-ব্যবহার প্রদর্শন করা, মা-বাবার সাথে আদবের সঙ্গে কথা বলা, অপরের কল্যাণ কামনা করা, নামায রীতিমত পড়া, সব সময় সৎ চিন্তা করা, একে অপরের প্রতি মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ সৃষ্টি ও প্রদর্শনে সর্বাত্মক চেষ্টা এবং বাস্তবায়ন করা। তারপর ছোটদেরকে বলে মানানোর চেষ্টা করা। আর তাহলেই বড়দের এ বলা ছোটদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রশ্ন করে বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না তা কেন বলো? (সূরা আসসাফ, ৬১ ঃ ০২)

www.amarboi.org

পক্ষান্তরে বড়দের কখনো কোনো ভুল ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে শয়তানের প্ররোচনায় হয়ে গেলে অনুতপ্ত হওয়া, তা নত শিরে স্বীকার করা এবং মিথ্যা কথা বলা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা হবে জ্ঞানীর মতো কাজ।

ছোট ভাই বোন বা অনুকরণ প্রিয়দের সামনে নিজেকে সুন্দর অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা উচিত সকলের। আজকাল আমাদের পরিবারগুলোতে ছোট ভাই-বোনেরা বড় ভাইদের কথা শোনে না, মূল্যায়ন করে না– এমন একটি কমন অভিযোগ রয়েছে। তার জবাবে আমি বলব, বড়দেরকে ছোটদের সাথে চলতে হবে আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শনের মাধ্যমে অত্যন্ত সচেতনভাবে। ছোটদের সবকিছু জানার চেষ্টা করতে হবে। তাদের জীবনে একজন বড় ভাই বা কাকা, চাচা, বোন, ফুফু হিসেবে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কোনভাবেই নিজের কোনো ক্রটি, অপারগতা বা দুর্বলতা তাদের কাছে ব্যক্ত করা যাবে না। ছোট ভাই অত্যন্ত স্নেহের, ভালবাসার, আদরের হবে। কিন্তু কখনোই বন্ধুর মতো তার সাথে বসে সব ধরনের গল্প-গুজব করা ঠিক হবে না। অনেকে মনে করে ভাইয়েরা-ভাইয়েরা, বোনেরা-বোনেরা, বন্ধু-বান্ধবীর মতো চলবে। অবশ্য এটা স্বাভাবিক সুন্দর। কিন্তু আমার অভিমত হলো একে অপরের কাছে তাদের মূল্যমান ও অবস্থান বজায় রেখে চলতে হবে। কেননা শিক্ষার একটি অন্যতম মাধ্যম হলো হোঁচট খেয়ে শিক্ষা। এক্ষেত্রে বড় ভাই- বোনেরা মনে করুন কোনো একটা নেগেটিভ হোঁচট খেয়ে কিছু শিখেছে, এখন তা ছোটদের সাথে অত্যন্ত ফ্রি হওয়ার সুবাদে বলে দিয়ে যদি শিখাতে চায়, তাহলে এক সময় ওদের কাছে বড় ভাই বোনেরা হয়ে যাবে হাসির উপকরণ। আর এ হাসি দেখে বড়রা পাবে কষ্ট, শুরু হবে মুখ কালো করে দ্বন্দ্ব– যা অবশেষে একে অপরের মধ্যে মূল্যায়ন ও মূল্যবোধের ঘাটতি সৃষ্টি করে দূরে সরিয়ে দেয়ার মাধ্যম হবে। পরিণামে একজন এক কক্ষে অন্যজন বাসার অন্য কক্ষে অবস্থান করে। কেউ কাউকে দেখতে পারে না– যা দুঃখজনক। কাজেই বলব পারসোনালিটি বা আত্মসম্মান,ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য ঠিক রেখে ছোটদের উপর প্রভাব বিস্তার করলে তারা হবে সচ্চরিত্রবান। কোনভাবেই তাদের সাথে বিচারপতির ন্যায় ভূমিকা পালন না করে চরিত্র সংশোধনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। অতীতের দেয়া ক্রটির শাস্তি দিয়ে স্বস্তি লাভের চেষ্টার পরিবর্তে প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে এসব দোষক্রটি দূর করার চিন্তা করতে হবে। যেন ভবিষ্যতে এসব ক্রটির পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে ঠাণ্ডা মাথায় সুন্দর সুন্দর উপমা ও পরিণতির ইঙ্গিত বা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে অসচ্চরিত্রের প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত করে সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। যা হয়েছে তার জন্য আফসোস না করে, মাথা গরম না করে, চিৎকার না করে, রাগারাগি, মারামারি না করে ভবিষ্যতে যেন আর না হয় সেদিকে অত্যন্ত দায়িত্বের সাথে খেয়াল রাখতে হবে।

www.amarboi.org

প্রতিবেশী ও আশে পাশের পরিবেশ

প্রতিবেশীর চিন্তা-চেতনা ও চাহিদার পরিমণ্ডলে গড়ে উঠে এক-এক এলাকার পরিবেশ। এ পরিবেশ আদর্শিক হবে; না অনাদর্শিক হবে তাও পরিবেশের ধারক-বাহক সেখানকার জনগোষ্ঠীর বিষয়। আদর্শ পরিবেশ হলো আদর্শ ও সচ্চরিত্রবান মানুষ হওয়ার আঙ্গিনা। যেখানে থাকবে আদর্শ চিন্তা, সুন্দর পরিবেশ, থাকবে না অনৈতিকতা, অসচ্চরিত্রতা ও সর্বোপরি স্রষ্টা বিমুখতার কোনো অশিক্ষা, কুশিক্ষার উপায় ও উপকরণ। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বাল্যকাল থেকেই কোলাহল মুক্ত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিক্ষার্থীদের আদর্শ শিক্ষা অর্জনের সুব্যবস্থা করে এক একজন আদর্শ পতাকাবাহী ঝাণ্ডা হিসেবে গঠনের লক্ষ্যে আজ একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে আমাদের প্রয়োজন ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক মত পার্থক্য ভুলে এক সাথে আমাদের সন্তান আমাদেরকেই গড়তে হবে– এ নীতিতে উজ্জীবিত হয়ে সম্মিলিতভাবে তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া। কেননা এ সময়ের শিক্ষাই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিক দিশারী হিসেবে কাজ করবে, প্রতিষ্ঠিত করবে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা, সংঘঠিতভাবে দূরীভূত করতে চেষ্টা করবে অন্যায় অপকর্ম অশ্লীলতা, এসিড সন্ত্রাস ও যৌতুক প্রবণতার মতো অন্যান্য খারাপ দিকগুলো। গড়ে তুলবে সমাজে একের প্রতি অপরের পক্ষ থেকে সম্মান, মূল্যায়ন ও মূল্যবোধের মনমানসিকতা। কাজেই আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আদর্শ শিক্ষার প্রচার ও প্রসার আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। রাসূল (সা.) বলেছেন,

مَثَلُ الَّذِىْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ فِىْ صِغَرِهٖ كَالنَّقْشِ فِى الْحَجَرِ وَمَثَلُ الَّذِىْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ فِىْ كِبَرِهٖ كَالَّذِىْ يَكْتُبُ عَلَى الْمَاءِ.

"শৈশবকালে ইল্‌ম শিক্ষা করা পাথরে কারুকার্য খচিত করার ন্যায়। আর বৃদ্ধকালে ইল্‌ম শিক্ষা করা পানির উপর লেখার ন্যায়।"

শিক্ষার্থীদেরকে সুষ্ঠু ও নিয়মিতভাবে শিক্ষা প্রদান করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে কোনরূপ খিয়ানত করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

نَاصِحُوْا فِى الْعِلْمِ فَاِنَّ خِيَانَةً اَحَدِكُمْ فِىْ عِلْمِهٖ اَشَدُّ مِنْ خِيَانَةٍ فِىْ مَالِهٖ وَاِنَّ اللّٰهَ سَائِلُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"ইল্‌ম শিক্ষাদানে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তোমরা পরস্পর উপদেশ দিবে। কেননা সম্পদের খিয়ানতের তুলনায় ইল্‌মের খিয়ানত মারাত্মক দূষণীয় বিষয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন।"

www.amarboi.org

সুতরাং শিক্ষার্থীদের মেধা ও চারিত্রিক গুণাবলি উপযুক্ত বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। শিক্ষার্থীরা সমাজের সম্পদ; শিক্ষার্থীরা দেশের সম্পদ। নিজেদের ঔরসজাত সন্তানদেরকে যেমন ভালবাসা ও পড়ালেখার চেষ্টা করা হয় তেমনি প্রতিবেশীর সন্তানদেরকেও সেভাবে ভালবাসা ও সচ্চরিত্র গঠন এবং পড়ালেখার জন্য নসীহত করা উচিত। মনে করুন, আপনি ভাবছেন আপনার ছেলে ভাল; প্রতিবেশীর ছেলেটা খারাপ। সুতরাং এতে আপনার মাথা ব্যথার দরকার নেই, সে খারাপ হচ্ছে হোক। কিন্তু এ বিষয়টি কি একটু ভেবে দেখবেন কিছুক্ষণ পরতো ওরা এক সাথে স্কুলে যাবে, বিকালে এক সাথে হবে, মসজিদে এক সাথে গমন করবে আর তারই সুযোগে ঐ খারাপের প্রভাবটা তখন আপনার সন্তানকেও গ্রাস করবে। খুব সহজেই আপনার সন্তানের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়বে। কারণ, শয়তানতো আপনার সন্তানের ভালত্বকে নষ্ট করে খারাপের দিকে নিতে চাচ্ছে। সেইসাথে আছে প্রতিবেশীর ঐ খারাপ চরিত্রের ছেলেটির ছোয়া। এজন্য সম্মিলিতভাবে এ সন্তানদের ব্যাপারে আমাদের সকলের যত্নশীল হওয়ার প্রতি ইসলাম খুব বেশি জোর দিয়েছে।

একটি আদর্শ সন্তান একটি সমাজের জন্য একটি জাতির জন্য আলোকবর্তিকা। একটি পরিবার শুধু নয় সে সমগ্র বংশ ও গ্রামের নামকেও নিয়ে যেতে পারে সম্মানের আসনে। দিতে পারে মানুষের কাছে পরিচিত করে। অন্যদিকে অশিক্ষা, কুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রতিবেশীর সাথে দ্বন্দ্ব-কলহের জের হিসেবে সে সমাজে এমন সন্তানও হতে পারে যে বংশের নামকে করে দিতে পারে কলংকিত। সমাজের সকল জনগোষ্ঠীকে করে তুলতে পারে উদ্বিগ্ন। প্রতিবেশীর বড়দের মধ্যে ছোটখাট দ্বিমত থাকতে পারে (যদিও তা ইসলাম সম্মত নয়) কিন্তু সন্তানদের ব্যাপারে বা এক একজন শিক্ষার্থী যাদেরকে এক একটা গোলাপ ফুলের কলির সাথে তুলনা করা যায়, তাদের ব্যাপারে হতে হবে যত্নশীল। তাদেরকে রাখতে হবে দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে। তাদের গঠনের ব্যাপারে পালন করতে হবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য রচিত বিধান কুরআনুল কারীমে এক আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করার নির্দেশ দানের পরপরই মা-বাবা, নিকটবর্তী ও পাড়া প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালনের কথা বলেছেন। আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ.

www.amarboi.org

"এবং দাসত্ব কবুল করো এক আল্লাহ্‌র এবং তাঁর সাথে এক বিন্দু শির্‌ক করো না। আর পিতা-মাতার প্রতি কল্যাণকর, কল্যাণ কামনা ও কল্যাণমূলক আচরণ করো নৈকট্য সম্পন্ন ব্যক্তি, ইয়াতিম ও মিসকীনগণ, নিকটাত্মীয়তাসম্পন্ন প্রতিবেশী, পার্শ্বে অবস্থানকারী প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী সহচর-এর সাথে।" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ৩৬)

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিবেশীর একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন, সুন্দর পরিবেশ সংরক্ষণ এবং কষ্ট না দেয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

একদিন রাসূল (সা.) পর পর তিন বার বললেন ঃ

وَاللهِ لاَيُؤْمِنُ.

"আল্লাহ্‌র কসম, সে ঈমানদার নয়"

তিনবার বলা এ কথাটি শুনে সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন রাসূল আপনি কার কথা বললেন? জবাবে তিনি বললেন,

اَلَّذِىْ لاَيَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

"আমি সেই ব্যক্তির কথা বলছি, যার নিপীড়ন ও জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপত্তা পায় না।" (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

গরুর ঘর, হাঁস-মুরগীর খামার, রান্নাঘর, সময়ে-অসময়ে বাড়ির আশে পাশে চিৎকার ঝগড়াসহ এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পড়ালেখা করা কঠিন। তার পাশাপাশি প্রতিবেশী ও সমাজের লোকদের পক্ষ থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঠিক দিক নির্দেশনা ইত্যাদির অভাব ঘটলেতো আরো পিছিয়ে থাকতে হবে। এ পৃথিবীতে পড়ালেখা করে সচ্চরিত্রের মানুষ হতে পারা একটি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য নিয়ামত। এটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। সেইসাথে আল্লাহ্‌র আদেশ লঙ্ঘনকারী অভিশপ্ত শয়তানতো আছেই মানুষকে বিপথগামী করানোর চেষ্টায়। কারণ, মানুষকে সিজদা না করেই ইবলিস অভিশপ্ত হয়েছে, শয়তান হয়েছে। কাজেই সেই মানুষকেতো সে কখনো বন্ধু হিসেবে নিতে পারে না। আর এমন প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে যদি প্রতিবেশীসহ আমরা সকলে একে অপরের প্রতি হই সচেতন ও দায়িত্বপ্রবণ এবং আমাদের নিজেদের মান, অভিমান, আভিজাত্য, বংশের অহংকারকে বড় করে না দেখে এক সাথে সম্মিলিতভাবে আমাদের আগামীদিনের পৃথিবীকে যারা সুন্দর করে গড়বে এমন একদল নাগরিক গঠনে আত্মনিয়োগ করি।

সন্তান আদর্শ মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশ একটা বিশাল উপাদান। কিন্তু তার পরেও বলব যে সমস্ত পরিবেশে মূর্খ লোকেরা বেশি বসবাস করে বা বংশগতভাবে কোনো কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর লোকজন বসবাস করে সে সকল এলাকায়

www.amarboi.org

সন্তানদেরকে সে পরিমণ্ডল থেকে বের করে উচ্চশিক্ষিত আদর্শ চরিত্রবান করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার বটে। তবু কামারের সন্তান কামার হবে এমনটি চিন্তা না করে যদি প্রতিবেশীর সবাই মিলে তাদের সেটাকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করি তাহলে সেও হয়তোবা ড., প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার, ডা. ও সচ্চরিত্রবান মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর এমন একদল সচ্চরিত্রবান মানুষ দিয়েইতো সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি – যা আমাদের প্রত্যাশা।

আত্মীয়-স্বজনদের ভূমিকা

শিক্ষার্থীদের সচ্চরিত্র গঠনের সময় শৈশব ও বাল্যকাল। এ বয়সে আত্মীয়-স্বজনদেরও তাদের গঠনে রয়েছে বিশাল দায়িত্ব ও কর্তব্য। আত্মীয়-স্বজনরা অন্য আত্মীয়দের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আদর্শ মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে সময়মত নানা রকম দিক নির্দেশনা, পর্যালোচনা, বড় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উৎসাহ-উদ্দীপনা, বাসা বা বাড়িতে পড়ার পরিবেশ গঠন পড়ালেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য দিয়ে হলেও গড়ে তোলার চেষ্টা করা নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কারভাবে বলেন ঃ

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى.

"বরং প্রকৃত কল্যাণময় আমলের পথ হচ্ছে তার, যে আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশতা, নাযিল হওয়া কিতাব ও নবীগণের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তারই মহব্বতে নিকটাত্মীয়দের আর্থিক সাহায্য দিয়েছে।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৭৭)

প্রয়োজনে এ আর্থিক সাহায্য দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষিত হলে, আদর্শ মানুষ হলে একদিকে যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পাবেন তেমনি অন্যদিকে তারাও আপনাদের করবে মূল্যায়ন, করবে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

মনে করুন, আপনি শিক্ষিত হালাল উপার্জনকারী একজন ব্যবসায়ী বা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। আপনার আত্মীয় দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। ফলে তাদের সন্তান মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও পড়ালেখা করতে পারছে না। কারো এস.এস.সি, এইচ.এস.সি পাশ করে বা তার পূর্বেই পড়ালেখা জীবন শেষ করে দিতে হচ্ছে। কেউবা অনার্সে পড়া অবস্থায় শিক্ষা জীবন শেষ করতে হচেছ। আপনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, আপনি উপকার করতে চান, তাকে চাকুরীও দিলেন, আপনি ভাল মানুষ, সেও আপনাকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করে কিন্তু যেই ছাত্রটি এস.এস.সি,

www.amarboi.org

এইচ.এস.সি বা অনার্স পড়া অবস্থায় পারিবারিক চিন্তায় অর্থাভাবে পড়ালেখা ছেড়ে দিতে চাচ্ছে এক্ষেত্রে আপনি কি পারেন না তাকে আর দুই-তিন বছর অর্থ সাহায্য বা কর্জে হাসানা (শর্তযুক্ত) স্বরূপ অর্থের যোগান দিয়ে উচ্চশিক্ষিত একজন সচ্চরিত্রবান পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠনে ভূমিকা পালন করতে? যে পরবর্তীতে একাই তার পরিবারের অন্যান্যদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে এবং আপনার প্রয়োজন না হলেও আপনার পরিবারের আগন্তুক সন্তানসহ অন্যান্য আত্মীয়দের ক্ষেত্রে এমন ভূমিকা পালন করার মতো উপযোগী হবে।

অন্যদিকে, আপনি আজ একজন অল্প শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মানুষের পক্ষ থেকে সালাম আর শ্রদ্ধা পাচ্ছেন, কিন্তু একটু অর্থ সাহায্য দিয়ে তাদের শিক্ষিত করে তুললে উচ্চ শিক্ষিত আদর্শ সচ্চরিত্রবান মানুষের পক্ষ থেকে সালাম ও শ্রদ্ধা পেতেন। বলুন! এ দু'শ্রেণীর মানুষের পক্ষ থেকে দেয় সালাম ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাত্রাকে যদি পরিমাপ করা হয়, মূল্যায়ন করা হয় তাহলে কি এক রকম হবে? প্রশ্নই আসে না। এক রকম হতেই পারে না। শিক্ষিত সমাজে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে তা হলো- মূর্খদের সাথে পোলাও কুরমা খাওয়াও ঠিক নয়, শিক্ষিতদের লাথি খেলেও যেন ভাল হয়। মানুষ হওয়া যায়। এর অনেক ব্যাখ্যা, আমি সেদিকে যাব না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَاتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ.

"এবং নিকটাত্মীয়কে তার হক্ দাও।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ২৬)

এই হক আদায়ের বিধানস্বরূপ তাদেরকে এমনভাবে সাহায্য প্রদান করতে হবে যাতে তারা হয় আল্লাহমুখী, আদর্শমুখী, রাসূলের চরিতাদর্শের রঙে তারা নিজেদেরকে রঙিন করে হতে পারে সচ্চরিত্রবান। তাছাড়া নিকটাত্মীয়দের পরস্পরে যে সম্পর্ক, তা আল্লাহরই স্থাপিত এবং তা স্বয়ং আল্লাহরই ওয়াদা ও চুক্তি বিশেষ। আল্লাহর সে ওয়াদা ও চুক্তি অবশ্যই সংরক্ষিত হতে হবে। তা সংরক্ষিত না করা হলে আল্লাহর বিধানকেই লঙ্ঘন করা হবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ أُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ.

"আল্লাহর ওয়াদা ও চুক্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হওয়ার পর যারা তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ যা মিলিয়ে রাখার আদেশ করেছেন তা ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় এবং

www.amarboi.org

পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, তাদের জন্য অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ পরিণতি।" (সূরা আর রাদ, ১৩ ঃ ২৫)

বাল্যকালে বিদ্যালয়ে গমন ও শিক্ষকের সাহচর্য

শিশুদের বয়স যখন চার বা সাড়ে চার তখন থেকেই তাদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর চেষ্টা করতে হবে। তাদেরকে বুঝিয়ে বিদ্যালয়ে নিয়ে যেতে হবে, বলতে হবে পড়ালেখা করে তোমাকে হতে হবে আদর্শ মানুষ। আর এ জন্যে প্রত্যেক অভিভাবকই চায় আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের সন্তানদেরকে ভর্তি করাতে। কেননা শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিককে সুসমন্বিতভাবে বিকাশ সাধনের দায়িত্ব সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের উপরই ন্যস্ত হয়ে থাকে। শিশুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে যা কিছু শেখে তাতে না থাকে কোনো শৃঙ্খলা, না থাকে কোনো শ্রেণী বিন্যাস। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই একমাত্র এমন সৃশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান, যেখানে সুযোগ্য শিক্ষকদের সাহায্যে এক বিশেষ নিয়ম, সুশৃঙ্খলা, শ্রেণী বিন্যাস ও ধারাবাহিকতার সাথে শিশুদের শিক্ষা দেয়া হয় এবং তাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের বিকাশ সাধন করা হয়। গৃহের ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিও শিশুদের আবেগপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। তারা নিজেদের শিক্ষককে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি মনে করে এবং তাঁদের জ্ঞান সম্পর্কে অস্বাভাবিক আস্থা রাখে। তাঁদের স্বভাব চরিত্র আচরণ ও রীতি-নীতিকে নিজেদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ মনে করে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ তাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। এখানে শিশুদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উপর যে ছাপ অংকিত হয় তা আজীবন অক্ষুণ্ন তাকে। এসব কারণেই এই সংস্থা (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) সব চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

- শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় ও জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি সৃষ্টি করা। শিশুরা এখান সেখান থেকে যা কিছু শিখে বা যেসব জ্ঞান অর্জন করে তা সাধারণত অসম্পূর্ণ বা অপ্রতুল হয়ে থাকে। তাতে কোনো শৃংখলা ও ধারাবাহিকতা থাকে না। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয়ের করণীয় তারা যেন একটা বিশেষ স্তর বিন্যাস, শৃংখলা ও ধারাবাহিকতার সাথে ছাত্রদের জ্ঞান দান করে এবং দক্ষতা ও যোগ্যতার সৃষ্টি করে।
- ভুল সংশোধন করা ও আদব-কায়দা শেখানো, জ্ঞান ও কর্মগত, দৈহিক কিংবা নৈতিক দিক থেকে শিশুদের মাঝে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মন্দ জিনিস শিকড় গেড়ে বসতে চায়, সেগুলো সংশোধন করা, পছন্দনীয় অভ্যাস ও আচরণের ধারকরূপে তৈরি করা, তাদের অভ্যন্তরীণ যোগ্যতা ও প্রতিভাগুলোকে সঠিক পথে প্রবাহিত করা। তাছাড়া তাদেরকে এমন সব বাস্তব ও নৈতিক গুণাবলিতে বিভূষিত করা যা তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্বসমূহ সুন্দরভাবে আঞ্জাম দানে সহায়ক হয়।

www.amarboi.org

- শিশুদের মাঝে ভাল মন্দের পার্থক্য, হক ও সত্যের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা, বাতিলের প্রতি তীব্র ঘৃণা, সৎ কাজের প্রচার ও প্রসার এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধ করার জযবা ও প্রেরণাকে জাগিয়ে তোলা যাতে তারা সমাজের ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় ঝোঁকপ্রবণতার মুকাবেলা করতে সক্ষম হয়। নিজেরা যেন এর শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং অন্যদেরকেও রক্ষা করতে ব্রতী হয় তজ্জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।
- শৈশব ও যৌবন, পাঠ্য জগৎ ও কর্ম জগৎ, বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে যে শূন্যতা থাকে তা পূরণ করা, যাতে শিশুরা বাস্তব জগতে সফলতার সাথে জীবন অতিবাহিত করতে পারে।
- গোটা মানব জাতির কর্মোপযোগী ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাসমূহ এবং পূর্বসূরীদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান বিজ্ঞানমূলক, প্রযুক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারিত্বের সংরক্ষণ এবং তাতে যথাযথ সংযোগ সাধন করে পরবর্তী আগন্তুকদের নিকট হস্তান্তর করা। আমাদের পূর্বসূরীগণ বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানের যেসব উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, সেসবকে ধ্বংস ও বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষা করা এবং নিজেদের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা তাকে আরো সমৃদ্ধ করে আমাদের ভবিষ্যৎ অনাগতদের নিকট হস্তান্তর করা বিদ্যালয়সমূহের অবশ্য কর্তব্য।
- সমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মান মর্যাদার মাপকাঠি সরবরাহ করা। অর্থাৎ বিদ্যালয় প্রদত্ত সার্টিফিকেটগুলো থেকে সমাজ যেন সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে যে, কোন্ সার্টিফিকেটের অধিকারী ব্যক্তি কোন্ ধরনের যোগ্যতার অধিকারী এবং সে কী ধরনের দায়িত্ব পালনে সক্ষম।
- শিক্ষার্থীদের মাঝে মেধা, মন-মানসিকতা, শারীরিক ও সামাজিক এবং নৈতিক ও চারিত্রিক দিক দিয়ে যে তারতম্য রয়েছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাদের প্রতি ভিন্নভাবে ব্যক্তিগত দৃষ্টি দেয়া উচিত, যেন প্রত্যেকটি শিশুই নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে সামনে অগ্রসর হতে পারে এবং বাংলাদেশকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

সহপাঠীদের সাহচর্য ও প্রভাব

আজকের শিশুরাই আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। এ ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের সম্পদকে গড়ে তুলতে চাই শিক্ষা। এজন্যেই প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষার প্রসার ও বাস্তবায়ন, আদর্শ সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলে আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠাকরণ। আজকাল শিশুরা প্রকৃতিগতভাবেই অনেক অগ্রগামী। তাই প্রয়োজন শিশুকাল থেকেই তাদের মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ ও সযত্নে লালিত হওয়ার জন্যে সুষ্ঠ

www.amarboi.org

পরিবেশ ও সুন্দর নীতি অবলম্বন। তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কর্মের ভুল-ত্রুটিকে কঠোর ভাষায় নয়, সুন্দর ও সহজ ভাষায়, ধমকের সুরে নয়, স্বাভাবিকভাবে বলে বুঝিয়ে সংশোধনকরণ। ভুল তারা করবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু যেকোন ভুল সাথে সাথে সংশোধনের চেষ্টা না করে মেনে নেয়া হবে অস্বাভাবিক। আদর করে ভালবাসার নেশায় ছোট বলে কিছুই না বলে মেনে নেয়া হবে তার চোখে অন্যায়কে জীবন দান আর আগামী দিনগুলোর জন্য ন্যায়ের অপমৃত্যু ঘটানোর শামিল। শিশুরা নার্সারী বা প্রথম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায়ই বন্ধুত্ব গড়তে চায়। পড়ালেখার বিষয়ে একে অপরের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠে। তারপর গল্প করা, দৌড়াদৌড়ি করা, ছুটাছুটি করা, খেলার মাঠে এক সাথে খেলতে যাওয়া, বই বিনিময় করা এবং সর্বশেষ ফোন নম্বর লিখে নিয়ে আসা। এভাবে বাসায় এসে ফোনে কথা বলার মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের অভিভাবকগণ ছোটদের ফোনে আলোচনা বা কথোপকথন দেখে তাদের বুদ্ধিমত্তা বাড়ছে, অভিজ্ঞতা হচ্ছে ইত্যাদি ভেবে খুশী হয়ে থাকেন। কিন্তু এভাবে একদিন, দু'দিন করে সে যে নিয়মিত একজন টেলিফোন ব্যবহারকারী হয়ে উঠছে সেদিকে খেয়াল নেই। আবার কী ধরনের আলোচনা করছে? কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে? কার সাথে কথা বলছে? ঐ বন্ধু কেমন? তার পারিবারিক অবস্থান কেমন? কোন্ ধর্মাবলম্বী ইত্যাদি বিষয়ে মোটেও ভ্রূক্ষেপ নেই– যা সন্তানের জীবনের জন্য মারাত্মক ক্ষতি বয়ে আনে। এক সময় নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। এতে ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি পাশাপাশি ইসলামী বিধি-বিধান মানার প্রতি তারা হয়ে থাকে গাফিল। সময়ের প্রতি থাকে না তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ। কাজেই প্রত্যেক মা-বাবার উচিত তাদের বন্ধু নির্বাচন করে দেয়া। ফোনে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতে না দেয়া বা দিলেও খুব দ্রুত কথা শেষ করতে বলা এবং সামনে থেকে সে কী বলছে, কিভাবে বলছে ইত্যাদি খেয়াল করা। ছেলে-মেয়েরা বন্ধুদের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে। মহানবী (সা.) বলেছেন "মানুষ বন্ধুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়। সুতরাং সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে তা যেন যাচাই করে নেয়।"

এক বন্ধুর প্রভাব অন্য বন্ধুর ওপর পড়ে। ফলে অনুকূল পারিপার্শ্বিকতা ও সৎ বন্ধুর সাহচর্যে মানুষ মর্যাদার উচ্চাসন অর্জন করতে পারে। পক্ষান্তরে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতা এবং অসৎ বন্ধুর সংস্পর্শে সে মহাধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে পারে। সুতরাং অবশ্যই আমাদের উচিত, আদর্শ পরিবারের আদর্শ সন্তান যারা নামায, সিয়াম পালন করে, সত্যবাদী, ভাল ছাত্র, ভাল ফলাফলকারী পড়ুয়া, উগ্র নয়, বদমেজাজী নয়, বড়দের দেখলে

www.amarboi.org

সালাম দেয়, ছোটদের স্নেহ করে, বিনয়ের সাথে সুন্দর করে কথা বলে, মা-বাবা ও বড়দের আদেশ-উপদেশ শোনে-মানে এবং বাস্তবায়ন করে এমন ছেলে-মেয়েদের সাথে নিজেদের সন্তানদেরকে মিশতে দেয়া। তাদেরকে সহপাঠীদের সাথে বয়স ও মর্যাদানুসারে সদ্ব্যবহার ও ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রাখতে বলে দেয়া, ক্লাসে পরে আগমনকারী সাথীদেরকে বসার জন্যে জায়গা করে দেয়া, কাউকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে বসার চেষ্টা না করা, অযথা ক্লাস থেকে বারবার বের না হওয়া এবং তাদের সকলের সাথে হাসি মুখে কথা বলার চেষ্টা করা। রাসূল (সা.) বলেন ঃ

إِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ أَنْ يَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ.

"তোমার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও পুণ্যের কাজ।" (তিরমিযী শরীফ)

আর এভাবেই সেও হতে পারে অন্যদের মতোই আদর্শবান ও সচ্চরিত্রের অধিকারী একজন মানুষ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ.

"এবং যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তবে তারাই আল্লাহর দল। তারাই বিজয়ী হবে।" (সূরা আল মায়িদা, ০৫ ঃ ৫৬)

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাসের প্রভাব

জ্ঞান অর্জনের প্রধান মাধ্যম পুস্তক বা বই। জীবনকে গড়তে, অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের করে আনতে চারদিক আলোয় ভরপুর করে তুলতে তথ্যবহুল ও যুগোপযোগি আদর্শ বইয়ের বিকল্প নেই। পৃথিবীতে মানুষের সকল সমস্যা ও সমাধান বা তাদের প্রয়োজন পূরণের সকল উপাদান সংযোজন করা হয় বইতে। কাজেই শ্রেণীভিত্তিক এ বই নির্বাচনে প্রয়োজন দায়িত্বশীলদের সঠিক জ্ঞান ও সচেতনতার সমন্বয়। এ বই অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীরা যেন তাদের বয়সভিত্তিক চিন্তা-চেতনা, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ এবং সর্বোপরি ধ্যান-ধারণায় স্রষ্টামুখী হয়ে আদর্শবান ও কল্যাণকামী মানুষ এবং রাষ্ট্রের সম্পদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি এবং জাতিসত্তাগতভাবে এক আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে সকলে মিলে মিশে একটি সুখী সুন্দর শান্তি প্রিয় ও অভাবমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে নিজেদেরকে গঠন

www.amarboi.org

করার মানসে প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষা। এছাড়াও আমাদের পরিবারগুলোতে আজ সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হলো মা-বাবা কর্তৃক বই ক্রয়, অধ্যয়ন ও সংরক্ষণ। অত্যন্ত অপ্রিয় হলেও সত্য মুষ্টিমেয় পরিবার ছাড়া আজকাল মানুষ হওয়ার প্রধান উপকরণ গ্রন্থ অধ্যয়ন, কুরআন অধ্যয়ন ও হাদিস অধ্যয়নের নজীর পরিবারে দেখা যায় না– যা দুঃখজনক। অন্যদিকে, যে সমস্ত বাসা-বাড়িতে মা-বাবা রীতিমত বই অধ্যয়ন করেন সেখানে ছোটরা মনে করে আমাদেরকেও এটা করতে হবে। তারাও তখন পড়তে উদ্বুদ্ধ হয়। এক পর্যায়ে যেকোন বই পড়ার চেষ্টা করে। তারপর আমাকেও বই কিনে দিতে হবে এ দাবি পেশ করে। অমনি আমাদের মা-বাবারা তাদের জন্য বই নির্বাচন করে ভূত-পেত্নীর গল্প, কৌতুক, উপন্যাস, তিন গোয়েন্দার বই, সেবা প্রকাশনীর বই আরেকটু এগিয়ে সাইন্স ফিকশন বই, কার্টুন ও ভারতের চাচা চৌধুরীর লেখা বই ইত্যাদি। যা কোমলমতি স্বচ্ছ ব্রেনের অধিকারী ছেলে-মেয়েদের মাথাগুলোকে উদ্ভট, বিকৃত, বাজে চিন্তা-চেতনার দিকে ধাবিত করে থাকে। এতে ছেলে-মেয়েদের মা-বাবাদের সাথে কথোপকথনে কোনো ব্যালেন্স থাকে না। আচার আচরণ হয় বেয়াদবদের ন্যায় উদ্ভট– যা একদমই অমার্জিত।

এ পর্বে ছোটদের পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাসের প্রতি প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সরকার এবং অভিভাবক শ্রেণী সকলের সচেতন থাকা উচিত। বই পড়তে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের করণীয় হলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিবস বা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তাদের জন্য অন্য সকল উপকরণ বা উপহার কেনার পাশাপাশি আদর্শ লেখক রচিত গ্রন্থ, ছোটদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকা, আদর্শ জীবন চরিত্রের উপমা সম্বলিত উপন্যাস, ছোটদের ইসলামিক সংগীত চর্চা, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেম ও শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানীদের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ, দেশ গঠনে যুবকদের করণীয়, ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করা। তাদের অবসর সময় টেলিভিশন দেখা, ঘুরাঘুরি বা বাজে গল্পে যেন সময় ব্যয়িত না হয়, সেজন্যে আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসে পাকের ভিত্তিতে সমকালীন সমস্যা ও সমাধান সম্বলিত ইসলামিক আলোচনা, মতামত ও পরামর্শ অডিও, ভিডিও সিডি, ভিসিডির মাধ্যমে শুনা, দেখা ও বুঝার ব্যবস্থা করে সময়কে যথাযথ ব্যবহারের চেষ্টা করা। আর তাহলেই তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে মহানুভবতা, আত্মীয়তার মনোবৃত্তি, সহজ হবে সচ্চরিত্র গঠন এবং প্রত্যেকে হবে দেশ প্রেমিক আদর্শবান নাগরিক।

রাষ্ট্রের সমগ্র জনগণের অর্থ দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও পুস্তক নির্বাচনে অবশ্যই তাদের চিন্তা-চেতনা এবং সংস্কৃতিকে মূল্যায়ন করা উচিত। অন্যথায়

www.amarboi.org

মুসলিম অধ্যুষিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ব্যবস্থা আদর্শ মানুষ গঠনে ব্যর্থ হবে। পরিণামে মদখোর, সুদখোর, ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ ও অপরের সম্পদ হরণকারী সর্বোপরি অসচ্চরিত্রের দোষাবলিতে পরিপূর্ণ লোক বৃদ্ধি পাবে।

কৈশোর কাল

কৈশোর বয়সে সচ্চরিত্র গঠনে পরিবারের প্রভাব

এ সময়ে পরিবারের যে কোনো কাজ, কথা-বার্তা চিন্তা-চেতনা, বেড়াতে যাওয়া, বাসায় অতিথি আসা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এমনভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে যেন ছোটদের মনে বিরূপ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। এতে সকল ক্ষেত্রে তাদের মতকে প্রাধান্য দেয়া বা মতামত প্রকাশের সুযোগ দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করা কোনোটিই স্বাভাবিক আচরণ বা সুন্দর আচরণের অনুকূল নয়। কোথাও বেড়াতে যাওয়া বা কেউ বেড়াতে আসা এ সকল ক্ষেত্রে যা বাস্তবে হয় তা হলো যাওয়া আসার আগে ও পরে তাদের মন-মানসিকতায় প্রস্তুতিমূলক চাপ– যা তাদের পড়ালেখা, জীবন বোধমূলক আদর্শিক গ্রন্থ তথা কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন নামায আদায় বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। আবার এ প্রস্তুতির সাথে যা যুক্ত হয় তা হলো অর্থ। সৎ ও হালাল আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ব্যয় করা বা দাবি পূরণ করা আল্লাহর আদেশ। এ সময় ছেলে-মেয়েদের দাবিকে যদি নিয়ন্ত্রণে রাখা না যায় এবং অভিভাবকের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের সাথে মিল না থাকে তাহলেতো বাবা না দিতে পারলে বাবা হবে অগ্রহণযোগ্য, ছেলে-মেয়েরা বাবার কথা শুনবে না। কাজেই আগে থেকেই তাদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ না দিয়ে যদি মা-বাবা যৌথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে তাদের মন-মানসিকতা সুন্দর ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে– যা হবে সুন্দর চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ।

মাধ্যমিক স্কুল-কলেজে গমন ও তার প্রভাব

কৈশোর বয়সে 'আমরা করবো জয়' এ নেশা ও সিদ্ধান্তে তরুণরা যখন এগিয়ে চলতে থাকে আদর্শের পানে তখন তাদের গমন পথ, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার বিরূপ প্রভাব অসচ্চরিত্রের দিকে ধাবিত করে থাকে। আর এ জন্যই প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন বা প্রধান প্রধান গমন পথের দু'পাশে আদর্শ শিক্ষা সংক্রান্ত, শিক্ষকদের মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন সংক্রান্ত, সহপাঠীদের সাথে কথা-বার্তা ও পড়ালেখা, সচ্চরিত্র গঠন, দেশ ও জাতির প্রতি তাদের দায়িত্ব কর্তব্য, বড়দের সম্মান ও ছোটদের আদর-স্নেহ করা, শ্রেণীভেদ অনুসারে যেমন একজন অষ্টম শ্রেণীতে পড়লে যারা উপরের শ্রেণীতে তারা বড়, যারা নিচের শ্রেণীতে তারা ছোট এমন ক্ষেত্রে উপদেশমূলক বাক্য আমাদের স্রষ্টা

www.amarboi.org

এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের ভাষায় বিভিন্ন উপদেশ যদি সাইনবোর্ড আকারে বড় করে লিখে দেয়া হয়, তাহলে তাদের মনে এগুলোর একটা পজিটিভ প্রভাব পড়তে বাধ্য। তারা স্কুল-কলেজে যানবাহনে বা হেঁটে যাবে আর এগুলো মনে মনে পড়তে থাকবে এবং সময়ের সাথে সম্পর্ক রেখে তারা তা বাস্তবে রূপদান করতে থাকবে। এতে কিশোর মনে সুন্দর প্রভাব পড়বে তারা নিজেদেরকে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের একজন হিসেবে ভাবতে শুরু করবে।

স্কুল-কলেজের আশে পাশের পরিবেশের প্রভাব

স্কুল-কলেজ হচ্ছে মানুষ হওয়ার আঙ্গিনা। এখানে আদর্শ মানুষরা নবীওয়ালা দায়িত্ব পালন করে কথা, উপদেশ, আদেশ শিখানো ও মানানোর মধ্য দিয়ে মানুষ নামের জীব থেকে পশু প্রবৃত্তিকে দমন করে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। সুতরাং বলা যায়, আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্যে স্কুল-কলেজের বিকল্প কোনো স্থান নেই। কাজেই এটি একটি পবিত্রতম স্থান, জগতের অন্যতম স্থানের মধ্যে একটি। এর আশে পাশে বা চত্বরে স্থান পাওয়ার কথা মসজিদ বা আল্লাহর ঘর কিন্তু বেখেয়ালী বা অনাদর্শিক কর্তা ব্যক্তির প্রভাবে সেখানে গড়ে উঠতে দেখা যায় বাজার, আরেকটু এগিয়ে সিনেমা হল, রাজনৈতিক অফিস বা পার্টি সেন্টার ইত্যাদি– যা সত্যিই দুঃখজনক। কাজেই আজকের কিশোরদের আগামীদিনের জন্য যোগ্য ও সৎ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং স্কুল-কলেজের প্রধানদের খেয়াল রাখা উচিত। জানি, এতে আপনাদের সাময়িক স্বার্থ বিঘ্ন হতে পারে কিন্তু বহু বা দীর্ঘ স্বার্থের প্রতীক্ষায় সাময়িক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিলে অবশ্যই এ যুগের কিশোররা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গদেরকে শ্রদ্ধা করবে এবং আপনারা হবেন মরেও অমর; সব সময় স্থান পাবেন তাদের হৃদয়ে।

শিক্ষকদের চরিত্রগত প্রভাব

একটি বিষয়ে সবাই একমত হবেন তা হলো, একজন শিক্ষার্থী শিক্ষকের কথা যেভাবে মানে বা মানতে চায় ঠিক তেমনভাবে অন্য কারোর কথা মানে না বা মানতে চায় না। আর এ জন্যই প্রত্যেক অভিভাবকই তাদের কলিজার টুকরা সন্তানদেরকে শিক্ষকের দারস্থ করতে ব্যস্ত থাকেন, শিক্ষকদের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। এখন এমন শিক্ষকদের কেমন হওয়া উচিত? একজন শিক্ষক নিজেই যদি আদর্শবান না হোন, চরিত্র গুণে গুণান্বিত না হোন, মাথার চুল থেকে শুরু করে পায়ের জুতা পর্যন্ত যদি অন্যদের জন্য উদাহরণ সমতুল্য না হোন, তাহলে শিক্ষার্থীরা শিখবে কোত্থেকে? প্রত্যেক শিক্ষার্থী চায় তাদের শিক্ষক হবে ঠিক যেন একজন আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাঁর সবকিছু থেকে যেন

www.amarboi.org

ওরা শিখতে পারে কিছু না কিছু। এদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার ও কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের মেধা এবং চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত হওয়ার দিকে খেয়াল দিবেন কি? যিনি শিখাবেন, শিখানোর যোগ্যতা থাকবে তিনিই শিক্ষক, কিন্তু তারা নিজেরাই যদি হোন অযোগ্য কোনো রকমে টেনে হিঁছড়ে পাশ করা, কোনো কাজ পান না সেজন্য এ শিক্ষকতা করা, রাজনৈতিক বা সরকার দলের নেতা বা একনিষ্ঠ কর্মী তাহলে কি তিনি পারবেন আমাদের আগামীদিনের উদীয়মান এ তরুণদের তারুণোজ্জ্বল ভূমিকায় যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখানোর মতো করে তুলতে! অন্ততপক্ষে একটি বিষয়তো কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না, যে শিক্ষক নির্বাচিত হবেন কম মেধা সম্পন্ন ! কেননা শিক্ষার্থীরা যখন দেখবে শিক্ষক নিজেই অনেক কিছু পারেন না বা তাদের সমস্যার জবাব দিতে পারেন না তাহলে তারা কি সেই শিক্ষকের মুখে সচ্চরিত্র গঠন বা আদর্শের কথা বা উপদেশ বাণীকে শুনতে বা মানতে রাজী থাকবে! আর যদি না থাকে তাহলেই বা তা মানানোর জন্য কী করা যাবে? কাজেই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনেই শিক্ষকদেরকে আদর্শবান ও সচ্চরিত্রবান হওয়া উচিত।

পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাসের প্রভাব

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আমাদের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সিলেবাস হওয়া উচিত আদর্শমুখী। পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত জীবন বোধসম্পন্ন বাস্তব দিক নির্দেশনা সম্বলিত ইহজগৎ ও পরজগতের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বিষয়গুলো। শিক্ষা ব্যতীত কোনো মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষে পরিণত হতে পারে না। আর সেই শিক্ষার প্রধান বাহন হলো পাঠ্যপুস্তক ও তার সিলেবাস, বয়সের সাথে তাল মিলিয়ে তরুণদের চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে সকল বয়সে সকল সময়ের মানুষের অভাব পূরণের লক্ষ্যে সকল উপকরণ যদি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত না করা যায়, তাহলে এ অসম্পূর্ণ শিক্ষার পেছনে আমরাই বা অর্থ ব্যয় করতে যাব কেন? যে শিক্ষা আমাদের তরুণদের আগামীদিনে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে মানবতার প্রয়োজনে নিজেকে নিয়োজিত করার মন-মানসিকতায় উজ্জীবিত করতে পারে না, স্রষ্টাকে চিনতে সহায়তা করে না, মালিকের কথা মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করে না, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মানবতার মুক্তির দিশারী যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ তাঁর পথে চলতেও উৎসাহিত করতে পারে না সে শিক্ষার পেছনে কেন মানুষ সময়, অর্থ, শ্রম, ব্যয় করবে? কাজেই আজ যারা এই স্তরে দায়িত্ব প্রাপ্ত আছেন তাদের উচিত বাস্তবজীবন ও কর্মমুখী আদর্শবাদী সিলেবাস উপহার দিয়ে পাঠ্যপুস্তক তৈরি ও নির্বাচন করা। তাহলেই এ দেশে যে সম্পদ আছে তা দিয়েও আমরা এগিয়ে যেতে পারব। একবিংশ শতাব্দী হবে আমাদেরই শতাব্দী, উন্নয়নের শতাব্দী, বিশ্বের দরবারে আরো বিকশিত হবার শতাব্দী।

www.amarboi.org

গৃহ শিক্ষকের চরিত্রগত প্রভাব

আজকাল গৃহ বা বাসায় শিক্ষক রেখে পড়ানো বা পড়ানোর ব্যবস্থা করা বহুলভাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছে, তার কারণ বহুবিধ। যেমন ঃ

০১. শিক্ষার্থীরা সব সময় মা-বাবার কাছাকাছি থাকার কারণে তাঁদের কথা সব সময় মানতে চায় না,

০২. বাবা কর্মস্থলে মা বাসার বহুবিধ কাজে ব্যস্ত থাকাতে তাঁদের সময় দানে ব্যাঘাত ঘটে,

০৩. বই-পুস্তকের ব্যাপক পরিবর্তনে মা-বাবা শিক্ষিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে যায়,

০৪. ভাল ফলাফল করানোর জন্য নোট করে পড়ালেখা আদায় করা তাদের সম্ভব হয়ে উঠে না ও

০৫. মা-বাবা অশিক্ষিত হওয়া ইত্যাদি।

এ পর্বে উপরিউক্ত সমস্যা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে অধিকাংশ অভিভাবক গৃহ শিক্ষক নির্বাচন করে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেমন লোককে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেবেন? একজন লোকের হাতে আপনার আদরের পুত্র-কন্যাকে শিক্ষিত আদর্শ মানুষ করার দায়িত্ব দেয়ার পূর্বে তিনি নিজে কতটুকু ভাল শিক্ষিত ও আদর্শবান মানুষ সেটা কি একটু ভেবে দেখা উচিত নয়! তিনি নিজে যোগ্যতাসম্পন্ন কিনা, চরিত্রের পরাকাষ্ঠায় উন্নত কিনা, কলুষিত রাজনীতির কর্মী কিনা, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের সাথে কোনো সামঞ্জস্য আছে কিনা, নামাযী কিনা, কথা বলার ভঙ্গি ও বুঝানোর ধরন কেমন ইত্যাদি তো অবশ্যই দেখা উচিত। অনেকে ভাল ফলাফল করেছে, নিঃসন্দেহে বলা যায় জানে কিন্তু জানাতে পারে না বা অনেকে নিজে মানে না কিন্তু শিক্ষার্থীদের মানাতে চায় (তা তাসির করবে না) এ রকম কিনা ইত্যাদি দেখা আবশ্যক। কারণ যার নিকটে আপনার পুত্র-কন্যাকে পড়তে দিলেন, গড়তে দিলেন, মানুষ বানাতে দিলেন, আপনি তাঁকে আর খেয়াল করলেন না, তাঁর সাথে মাঝে মাঝে কথা বললেন না, পরামর্শ চাওয়া ও দেয়া এবং কখন কী পড়ছে কী বলছে তার খোঁজ-খবর রাখলেন না, তাহলেতো হয়তোবা আপনার শিক্ষার্থী মূল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে। এমন অনেক মা-বাবা দেখেছি যাদের উদাসীনতার ফলে তাদের সন্তানদের শিক্ষা জীবন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে মূর্খতার জীবন যাপন পরিচালনা করছে। তারপর তাদের সন্তান হবে আরো বড় মূর্খ এটাতো স্বাভাবিক। কাজেই বলব একশত ভাগ ব্যক্তি স্বাধীনতা না দিয়ে শিক্ষকের প্রতি খেয়াল রেখে শিক্ষর্থীদের পড়ালেখা করার ব্যবস্থা করতে হবে আর তাহলে

www.amarboi.org

তারাও ভালভাবে পড়ালেখা করবে এবং জীবন গড়ে তোলতে পারবে আদর্শের ছাঁচে সকলের সহযোগিতায় সকলের মনঃপূত করে।

সহপাঠী ও বন্ধুদের চরিত্রগত প্রভাব

সহপাঠী বন্ধুদের সাথে অজানা বিষয়ে জানার উদ্দেশ্যে মত বিনিময় করাসহ সমাজ সামাজিকতার প্রয়োজনে যেকোন দায়িত্ব পালনে উদ্যমী হলে সমাজ হবে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। আজকে যারা ছোট আগামীদিনে তারাই হবে বড়। ছেলেবেলায় শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যদি অযথা, অগঠনমূলক, অপরিকল্পিত, অনাকাঙ্ক্ষিত আড্ডাবাজি করে সময়কে ব্যয় করে দেয় তা হবে সময়কে অবমূল্যায়নেরই শামিল। এ সময় এত মূল্যবান যে হারানোর পর আর ফেরত আনা যায় না। পুরো পৃথিবীর বিনিময়েও সময়কে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। কাজেই অবাস্তব, অসত্য গল্প বা কথা না বলে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একে অপরের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করা, পাঠ্য বইয়ের কঠিন কঠিন অধ্যায় বা প্রশ্নোত্তরগুলো; গণিতের জটিল সমস্যাগুলো যদি কয়েক বন্ধু মিলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বুঝার চেষ্টা করে তাহলে তা সহজ ও সকলের বোধগম্য হয়ে থাকে, এতে সকলেই ভাল ফলাফলের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। বন্ধু যদি বন্ধুর সমস্যায় এগিয়ে না আসে বা সকল বন্ধুরা যদি মিলেমিশে ভাল ফলাফলই অর্জন করতে না পারে তাহলে আজকের বন্ধুটি তো আগামীতে হারিয়ে যাবে, ছিটকে পড়বে, বিদ্যালয়েই তার শিক্ষা জীবন শেষ হয়ে যাবে। কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। এমন যদি হয় বাস্তবতা তাহলে এ কেমন বন্ধুত্ব! এ কেমন আড্ডা! বন্ধুদের আড্ডা হোক পজিটিভ, ফলাফল হোক ভাল, সাফল্য আসুক সকলের জীবনে উপকৃত হবে দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সেটিই হলো আমাদের প্রত্যাশা।

যৌবন কাল

যৌবন কালে সচ্চরিত্র গঠনে পরিবারের ভূমিকা

কৈশোর পেরিয়ে সময়ের ব্যবধানে পরিবারের ছেলে-মেয়েরা যখন এ পর্যায়ে উন্নীত তখন মা-বাবাসহ পরিবারের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় বড়দের দায়-দায়িত্ব বেড়ে যায়। এ বয়সে ছেলে-মেয়েরা অনেক জটিল ও অনাকাঙ্ক্ষিত কাজও শয়তানের প্রভাবে করে ফেলতে পারে। তাদের নিজস্ব মেধা ও বুদ্ধিমত্তা এ সময়ে ততটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো স্থির থাকে না, চিন্তা শক্তির স্থিরতা এবং ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা করতে না পারা বা অদূরদর্শিতার অভাবে তারা অনেক কিছু করে ফেলতে পারে। তাদের চোখে মুখে তখন থাকে শুধু রঙিন স্বপ্ন, যা দেখে তাই পছন্দ হয়। যা ইচ্ছা তাই করতে মন চায়, বন্ধুদের

www.amarboi.org

সাথে উঠা-বসা, চলা-ফেরা করার নেশা থাকে বেশি। এ সময় সচ্চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে মা-বাবার পক্ষ থেকে যা করণীয় তা হলো ঃ

এক ঃ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তাকওয়ার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সাধারণত মা-বাবা যদি তাকওয়ার ভিত্তিতে ইসলামী বিধি-বিধান মেনে জীবন পরিচালনা করে তাহলে সন্তানের মন-মানসিকতায় তা সুন্দর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

দুই ঃ আমাদের পরিবারগুলোতে একে অপরের প্রতি মূল্যায়ন ও মূল্যবোধের মন-মানসিকতায় উজ্জীবিত হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। এ শিক্ষা প্রদানের মুখ্য দায়িত্ব হলো মায়ের। তিনি বাবার সাথে কিভাবে কথা বলবে এবং সর্বোপরি বাবাকে মূল্যায়ন ও সম্মান প্রদর্শনসহ বাবার আদেশ-নিষেধ মান্য করে চলার প্রতি সন্তানদেরকে শিক্ষা দিবেন। পাশাপাশি বাবাও মায়ের ব্যাপারে সন্তানদেরকে উজ্জীবিত করবেন। তাহলে ছেলে-মেয়েরা মা-বাবা ও অন্যান্য সদস্যদের কথা-বার্তা আদেশ উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে নিবে। যা সচ্চরিত্র গঠনের জন্য অন্যতম। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এমন পরিবেশ আমাদের পরিবারগুলোতে আজ নেই।

তিন ঃ মা-বাবার মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত আভিজাত্যের দ্বন্দ্ব ছেলে-মেয়েদের সচ্চরিত্র গঠনে অন্যতম প্রতিবন্ধক। এ দ্বন্দ্বের কারণে মা-বাবার ঝগড়া ও মুখকালো না দেখার মানসে তারা পরিবার থেকে বেরিয়ে অনেক দূরে বন্ধুদেরকে নিয়ে আড্ডাবাজি করতে থাকে। এতে ঐ বন্ধু ভাল মানুষ হলেও এক্ষেত্রে এ বন্ধুর মন খারাপ পরিস্থিতি তার মনেও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ফলে একজন বন্ধুর কারণে আরেকজনের মন খারাপ হয়ে দু'জনই ভিন্ন চরিত্রের দিকে ধাবিত হওয়ার সুযোগ থাকে।

চার ঃ এ বয়সে ছেলে-মেয়েদের একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে উঠে। তাই তাদের সে জগতে বা ব্যক্তিগত সত্তায় হস্তক্ষেপ না করা উত্তম। এমন কিছু বলা উচিত নয় যা তাদের ব্যক্তি সম্মানে আঘাত হানে। তাহলে জেদ ধরে নেগেটিভ চরিত্রের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

পাঁচ ঃ এ বয়সে ছেলে-মেয়েদেরকে কখনোই এমন বুঝানো উচিত নয় যে, আমার অনেক আছে। কারণ সন্তান যখন যা চায় তা পেলেই আজকে বায়না ধরবে সেন্টমার্টিন বেড়াতে যাবো, কালকে নওগাঁ, সুন্দরবন, জাফলং ইত্যাদি। তাছাড়া এমন সব বায়না যেখানে তাদের দাবির শেষ থাকবে না। তারপরেও তা সঠিকভাবে ব্যবহার হলে তো হতো। তাও হয় না, ফলে পজিটিভ হওয়ার তুলনায় নেগেটিভ হয় বেশি। অধিক টাকা পাওয়ার কারণে তাদের নির্দিষ্ট বা অত্যাবশকীয় ব্যয়ের খাত না থাকায়

www.amarboi.org

অন্যদের সাথে মাঠে বসে আড্ডাবাজি, আড্ডাবাজির দল ভারী হওয়া, মোবাইলে বেশি বেশি কথা বলার মাধ্যমে বিল বাবদ টাকা খরচ করা ইত্যাদির মাধ্যমে ঐ টাকা ব্যয় করা হয়ে থাকে। এ বয়সটি প্রত্যেকের জন্য, প্রত্যেকের জীবনের মোড় ঘুরাতে সহায়ক। আগামীদিনের জীবন ব্যবস্থা এ সময়ের কৃতকর্মের উপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকে। ফলে সকলকে সতর্ক দৃষ্টি প্রখর করে অসচ্চরিত্রের সহায়ক উপায় উপকরণগুলোকে হিকমতের সাথে দূরে রেখে নামায পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করতে হবে। ভুল দেখলে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলতে হবে। খুব মন খারাপ করলেও কিন্তু সুন্দর সুন্দর কথা বলে ঠাণ্ডা মাথায় বুঝাতে চেষ্টা করতে হবে। তাদেরকে আপনি মা-বাবার স্থানে প্রতিস্থাপন করে বুঝাতে হবে এই বলে যে, বাবা এমন পরিস্থিতিতে তোমার কাছে কেমন লাগত? অর্থাৎ ওদের মুখ থেকে এদের ভুল হচ্ছে এমন বিষয়টি বের করে সংশোধনের প্রতি ইঙ্গিত করতে হবে। সবশেষে ভাল কাজের স্বীকৃতি প্রদান করে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাসের প্রভাব

জ্ঞান অর্জনের বিশ্ব স্বীকৃত সর্বশেষ শিক্ষা স্তর হলো বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ব ব্যাপী জ্ঞানার্জনের এ স্তরে সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা হয় অত্যন্ত সুচারুভাবে, সচেতনতার সাথে যুগোপযোগি চিন্তা করে। কেননা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে নিজ নিজ দেশে সে পেয়ে থাকে প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা আর বিশ্বে সে হয় সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য। ফলে নিঃসন্দেহেই বলা যায়, এমন শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশের সম্পদ, এতে তাদের শুধু নিজ দেশে নয় বিশ্বের যেকোন দেশে কাজ করার যোগ্যতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বের যেকোন অঙ্গনে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয় তাদের সিলেবাস এবং প্রণয়ন করা হয় তাদের পাঠ্যপুস্তক। কিন্তু এ পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রত্যেক দেশে সেই সকল জাতি বা গোষ্ঠীর স্ব-স্ব ধর্ম অনুসারে তাদের ধর্মগ্রন্থকে যদি পড়ানো হয় তাহলে তাদের মাঝে খুব সহজেই প্রতিষ্ঠা পাবে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে অসাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাই স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে একটি আদর্শ ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে। কেননা একমাত্র আদর্শ শিক্ষার প্রভাবেই মানুষ ব্যক্তি পূজারী না হয়ে সমষ্টিগতভাবে সকলের কল্যাণে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিতে চেষ্টা করে। এতে রাষ্ট্রে উন্নয়নের পাশাপাশি শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। দুর্নীতি

www.amarboi.org

রহিত হবে। অন্যায় অপকর্ম থেকে মানুষ মুক্ত থাকতে পারবে। যার সুফল ভোগ করবে দেশবাসীসহ আগন্তুক জাতি গোষ্ঠীর সন্তানেরা। তাইতো ধর্ম মানুষের জন্য ধর্ম শিক্ষায় অবশ্যই সকলকে শিক্ষিত হওয়া উচিত।

এখানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ Stanly Hull-এর বক্তব্য তাই অন্তসার বলে গ্রহণ করতে হয়। তিনি বলেছেন, "If you teach your children three 'R' [Reading, Writing and Arithmatic] and leave the fourth 'R' [Religion] you will get fifth 'R' [Rascality]"

অর্থাৎ "আপনি যদি আপনার সন্তানকে তিনটি 'আর' মানে পড়া, লেখা এবং গণিত বা হিসাব শাস্ত্রে শিক্ষিত করেন, চতুর্থ 'আর' মানে ধর্মকে বাদ রাখেন, তাহলে পঞ্চম 'আর' মানে বর্বরতাই পাবেন।"

গ্লোবালাইজেশনের এ যুগে পৃথিবীতে এটি প্রমাণিত হয়েছে, যে জাতি গোষ্ঠী তাদের স্ব-স্ব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের দ্বারা সমাজে খারাপ কর্ম বা দুর্নীতি কম হয়ে থাকে। যেমন ঃ বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক, যারা উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের পাশপাশি ধর্ম বিষয়ক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন তারা সমাজ থেকে মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সুদ ব্যবস্থার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে লাভ-ক্ষতি পদ্ধতি মোতাবেক ব্যাংক চালু করার অভিমত দিয়েছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন। অন্যদিকে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করে অনায়াশেই দুর্নীতির সাথে মানুষ কোনো না কোনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাদের মনে কোনো রকম কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে না। যার কারণেই দেশ প্রেমিক আদর্শবাদী শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ মিলে দেশে আদর্শবাদী সিলেবাস ও পুস্তক উপহার দেয়ার চেষ্টা করা উচিত।

বিশ্বে এমন কোনো ধর্ম নেই যে ধর্মের মূল সুর আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কাজেই বলব, ধর্ম শিক্ষাকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির মনগড়া লেখা ও পুস্তকের পোকা বানিয়ে সংকীর্ণতায় আবদ্ধ করার মধ্যে কখনো কল্যাণ থাকতে পারে না। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শতভাগ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রের মানুষের অস্থিরতা, দেশ দখল করার ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হত্যার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

মোট কথা, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের বাণী পড়ানো হবে না অথচ বিশ্বের অন্যান্য শিক্ষকদের, লেখকদের লেখা গ্রন্থ পড়ানো হবে আর আমরা শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে চাই তাতো হতেই পারে না। বরং বলা যায়, শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের বাণী সম্বলিত গ্রন্থ ও নবী রাসূল ও সাহাবাদের জীবনাদর্শ না পড়িয়ে শুধু দুনিয়াবী লেখকদের গ্রন্থ পড়ালে এ জাতির চিন্তা-চেতনা হবে সংকীর্ণ। তারা হবেন ব্যক্তি পূজারী। সর্বোপরি তাদের আদর্শ হবে প্রশ্নবিদ্ধ। আর আদর্শ মানুষ পাওয়া হবে সুদূর পরাহত।

www.amarboi.org

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চরিত্রগত প্রভাব

যিনি শিখাবেন তিনিই শিক্ষক। যার কাছ থেকে শিখতে পারব তিনি শিক্ষক। বিদ্যালয় ও কলেজ জীবন সমাপ্ত করে শিক্ষার্থীরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত এমন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করতে আসে তখন স্বভাবত কারণেই তারা শিক্ষক হিসেবে পান সবচেয়ে মেধাবী চিন্তা ও গবেষণার সহজ বাস্তব রূপদানকারী উচ্চ শিক্ষিত নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গকে। যারা হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে প্রখর মেধাসম্পন্ন ব্যতিক্রমী উচ্চ শিক্ষিত মানুষ। এক্ষেত্রে তাদের সচ্চরিত্রবান হওয়া হচ্ছে প্রধান শর্ত। কেননা তাদের সংস্পর্শে এসে শিক্ষার্থীরা অনুসরণ অনুকরণ করতে থাকে, তাইতো শিক্ষকগণ যেকোন দিকে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাদের ছাত্রদেরকে গড়ে তুলতে পারেন খুব সহজে। তারা জ্ঞানের আলো বিতরণ করে ছাত্রদেরকে গড়ে তুলতে পারেন চৌকস করে এবং আগামী আগন্তুক জাতির জন্য উজ্জ্বল আলোকবর্তিকারূপে, সচ্চরিত্রবান আদর্শ মানুষ হিসেবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শিক্ষকদেরকে অবিরত জ্ঞান বিতরণকারী সম্বোধন করে বলেন ঃ

إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا. وَدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

"আমি তোমাকে পাঠিয়েছি প্রমাণ হিসেবে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং প্রদীপ হিসেবে।" (সূরা আল আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৫-৪৬)

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের যেভাবে সম্মান প্রদর্শন এবং মান্য করেন সত্যি কথা বলতে কি আর অন্য কোনো মানুষকে সেইভাবে সম্মান করেন না। আজ তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শিক্ষকদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى.

"শিক্ষা ও উপদেশ দান করতে থাকো, যতক্ষণ তা উপকারী হয়।" (সূরা আল আলা, ৮৭ ঃ ০৯)

এবার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকবৃন্দ যদি আদর্শিক চিন্তা-চেতনায় আদর্শের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করেন তাহলে খুব সহজেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীদের দ্বারা অনৈতিকতা, চর দখলের ন্যায় হল দখল, ক্যাম্পাস দখলের অশুভ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি দূর হয়ে যাবে। যে যখন যেকোন বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হোক না কেন সবাই ক্যাম্পাসে সমান অধিকার ভোগ করবে। শিক্ষা জীবনের শেষ এ স্তরে এসে সবাই নিজেদেরকে সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণকামী ও মানবতাবাদী এক একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করবে। জ্ঞানের বিশ্বায়নের এ স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

www.amarboi.org

সমাপ্ত করে তারা আদর্শের মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য চেয়ারগুলোতে, দেশ ও জাতি সত্তার উন্নয়নে নিজ মহিমায় কর্তব্য পালনে হবে তৎপর। অন্যদিকে একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে এদেশবাসী এক মহাক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে।

কাজেই আজ দেশের যুবক ও তরুণ বয়সের সবাইকে যদি আদর্শবান করে গঠন করা যায়, তাহলে রাষ্ট্র ও এ জাতিসত্তা ফিরে পাবে তাদের সেই হৃত গৌরব, পুনরুদ্ধার করতে পারবে মান মর্যাদা সম্মান।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের পরিবেশ ও তার প্রভাব

আদর্শ মানুষ হওয়ার আঙিনা জ্ঞানার্জনের শেষ কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের পরিবেশ হবে আদর্শমণ্ডিত, জ্ঞানার্জনের জন্য উত্তম সুশোভিত ও জ্ঞান বিতরণের জন্য উন্মুখ, উন্মুক্ত। কিন্তু আজ কোথাও কোথাও দেখা যায়, জ্ঞানার্জনের এমন প্রাঙ্গন কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির ও অসচ্চরিত্রের শিক্ষার্থী নামধারীদের দ্বারা কলুষিত। অত্যন্ত অপ্রিয় হলেও সত্য এদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্যাম্পাসের সাথে মিশে আছে অনেক ঘটনা, দুর্ঘটনা। কত যে অপ্রীতিকর, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনাদর্শিক ধ্বনি ও দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী এ ক্যাম্পাসের ইট, বালু, সিমেন্ট, ঘাস, ডাস বৃক্ষরাজি আর বসার স্থানগুলো তার ইয়ত্তা নেই। অথচ এ অঙ্গনগুলো প্রতিবছর মুখরিত হয়ে উঠে দেশের প্রত্যেকটি পরিবারের বাছাইকৃত মা-বাবার কলিজার টুকরা শ্রেষ্ঠ, মেধাবী, উদীয়মান শিক্ষার্থীদের পদচারণায়; যাদের চোখে মুখে থাকে অনেক স্বপ্ন, বুকে অনেক প্রত্যাশা, মা-বাবার চোখে মুখে থাকে শুকরিয়ার বাণী এবং স্নিগ্ধ হাসি। কিন্তু অল্প কিছু দিন যেতে না যেতেই সেই মেধাবী শিক্ষার্থীর সব কিছু বিশেষত মাথার চুল, গাঁয়ের জামা, পায়ের জুতা, চোখের চশমা, হাতের ঘড়ি, অন্তরের মায়া-মমতা, কথা বলার ধরন, আচার-আচরণ, সর্বোপরি তাকওয়ার ভিত্তি পরিবর্তনে তারা আজ নামায পড়তে চায় না, হৈ হুল্লোড় নিয়ে ব্যস্ত থাকে ইত্যাদি। সকাল হলেই ভার্সিটিতে, দুপুরে ক্যাম্পাসে, বিকেলে ক্যাম্পাসে, সন্ধ্যায় ক্যাম্পাসে, ক্যাম্পাস যেন কোনভাবেই ছাড়ছে না তাদের। এমতাবস্থায় ক্যাম্পাসের পরিবেশকে অনুকূল করে গড়ে তোলা, সেখানে আদর্শের বাণী প্রতিধ্বনি আকারে বাজিয়ে তোলা, নৈতিকতার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষায় উজ্জীবিত করতে পারলেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের পরিবেশ হবে সার্থক। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস হবে সচ্চরিত্র গঠনের অন্যতম সহায়ক। রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের এ শিক্ষার্থীরা নিজেরা আদর্শে ম্রিয়মান হয়ে রাষ্ট্র উন্নয়নে সৎ, সততা ও একনিষ্ঠতার সাথে কাজ করবে এমন সচ্চরিত্রবান আদর্শ ও উচ্চ শিক্ষিত মানুষইতো রাষ্ট্র প্রত্যাশা করে। আর সেজন্যেইতো তাদের পেছনে এত ব্যয় হতে পারে গ্রহণযোগ্য।

www.amarboi.org

সহপাঠীদের সাথে আড্ডা ও তার প্রভাব

সহপাঠীদের সাথে পড়ালেখা, সৃষ্টির কল্যাণ চিন্তা, স্রষ্টার মহত্ত্বের প্রশংসায় মাথা নত করে একে অপরের সমস্যা সমাধানে কথা বলা, আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্য আমাদের ছেলে-মেয়েরা এক সাথে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেহুদা বা নিরর্থক গল্প-গুজব করে থাকে, যার সাথে বাস্তবতা বা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো কাজের সম্পর্ক থাকে না। অথচ আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন ঃ .

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ.

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন পরস্পর গোপন কথা বলো, তখন গুনাহ, বাড়াবাড়ি ও রাসূলের নাফরমানীর কথা-বার্তা নয় বরং সৎ কর্মশীলতা ও আল্লাহকে ভয় করে চলার (তাকওয়ার) কথা-বার্তা বলো এবং সেই আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। যার দরবারে তোমাদেরকে হাশরের দিন উপস্থিত হতে হবে।" (সূরা আল মুজদালা, ৫৮ ঃ ০৯)

জাতিগতভাবে মুসলিম হিসেবে আখিরাতে বিশ্বাসী সবাই জানে পৃথিবী হচ্ছে ভাল-মন্দ কাজের ক্ষেত্র। দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু করে তার ফল সে আখিরাতে ভোগ করবে। এবার সে কুরআন অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা এবং রাসূল (সা.)-এর চরিতাদর্শ অনুসারে জীবন গঠনে সক্ষম হলে আল্লাহ তাকে জান্নাত নামক মহাসুখের স্থান উপহার দিবেন। অন্যথায় জাহান্নাম নিশ্চিত। তাই সেজন্য চাই সময়ের সঠিক মূল্যায়ন, যথাযথ ব্যবহার, চিন্তা-চেতনায় আদর্শিক ও সৎ সঙ্গের আবশ্যকীয়তা, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নয়নে একাগ্রতা এবং একনিষ্ঠ চেষ্টা ও চর্চা।

পক্ষান্তরে নিছক গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, উপহাস-পরিহাস, সমালোচনা,ব্যক্তি বিশেষে প্রেম-ভালবাসা তথা আজে-বাজে আলোচনা সময়কে করে তোলে নিরর্থক। ফলে দুনিয়ার জিন্দেগীকে বাহ্যিক্যভাবে দূরে থেকে শান্তিময় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে শান্তির লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি মৃত্যুর পরে জাহান্নামের কঠিন আগুন ও শাস্তির মুখোমুখি আমাদেরকে হতেই হবে। কাজেই সময়কে মূল্যায়ন করে যথাসময়ে যথাযথ কাজের সমর্থনে আমাদের একে অপরকে সাহায্য করতে হবে, পরামর্শ দিতে হবে, নিছক দুষ্টামি বা শয়তানীমূলক বেহুদা কথার জন্য কয়েকজন একত্রিত না হয়ে রাষ্ট্রের গঠনমূলক, অপরের কল্যাণমূলক চিন্তা চেতনার ও কাজের মাধ্যমে সময় ব্যয় করা সচ্চরিত্রবান মানুষের স্বরূপ হতে পারে।

www.amarboi.org

সন্তানদের সচ্চরিত্র গঠনে মা-বাবা সৃষ্ট কমন কয়েকটি ভুল

অবাধে টাকা পয়সা দেয়া

"অর্থই অনর্থের মূল" অতি পরিচিত একটি প্রবাদ বাক্য। এ বাক্যকে কেন্দ্র করে অতীতে অনেক আলোচনা হয়েছে বর্তমানেও হচ্ছে ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই হবে। অর্থ প্রত্যেকের জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি উপকরণ। যার জন্য মানুষ প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করে বা করতে চায়। অর্থের পজিটিভ দিক হলো- সৎ ও হক হালালভাবে উপার্জিত অর্থ যথাসময়ে যথাস্থানে পরিমিত ব্যবহারে মানুষকে দুনিয়াতে সুন্দর জীবন যাপন ও আখিরাতে মুক্তির ফায়সালার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ অর্থ ব্যয়ে আসতে পারে কল্যাণ; গঠিত হতে পারে একটি সুখী, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল আদর্শবাদী পরিবার। অন্যদিকে এ অর্থ উপার্জন যদি হয় অসৎ পথের বলয়ে (সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি... ইত্যাদি) তাহলে তার ফলাফল নেগেটিভ বলার অপেক্ষা রাখে না। এ অর্থ দিয়ে একজন ব্যক্তি যত ভাল কাজই করুক না কেন তা জান্নাতের ফায়সালার জন্য বিন্দুমাত্র সহায়ক হবে না; হতে পারে না। আবার সৎ পথে উপার্জিত অর্থ যদি পরিবারের কর্তা বাবা-মা ছেলে-মেয়েদেরকে অবাধে দিতে থাকেন তাহলেও তার ফলাফল নেগেটিভ হতে বাধ্য। প্রশ্ন আসতে পারে টাকা পয়সা অবাধে দেয়া মানে কি? সৎভাবে উপার্জিত টাকা কি কেউ অবাধে দিতে পারে? যা দেয়া হবে এতো তাদের শিক্ষা ব্যয় বা প্রয়োজন মাত্র!

এবার আসুন, অবাধে দেয়া বলতে কি বুঝাতে চাচ্ছি সে বিষয়টি একটু আলোকপাত করি। যা প্রতিনিয়ত স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পরিবারগুলোতে সংঘটিত হয়ে থাকে।

এক ঃ আপনার ছেলে-মেয়েদের স্কুল/কলেজে যাওয়ার ভাড়া বাবদ প্রয়োজন ত্রিশ টাকা আপনি দিলেন ৫০ টাকা। কারণ ভাংতি নেই। বাকী ২০ টাকা.....?

দুই ঃ খাতা কিনবে ১টি, কলম কিনবে ১টি লাগবে ১৭ টাকা দিলেন ২০ টাকা। বাকী ৩ টাকা.....?

তিন ঃ অত্যন্ত প্রয়োজনে বাজারে কেনাকেটা করার জন্য পাঠালেন ১০০/৫০০ টাকা দিয়ে আসার পর হিসাব চাইলেন না বা চাইলেন কিন্তু ফেরত টাকাগুলো নিলেন না।

চার ঃ বিকেলে খেলার মাঠে, বন্ধুর বাসায় যাওয়ার নামে মায়ের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে গেল ৫০ টাকা। কিন্তু কিভাবে কত ব্যয় হলো মা তা জানতে চাইলেন না।

www.amarboi.org

পাঁচ ঃ যারা স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলে থাকে তাদের সর্বসাকুল্যে মাসিক ব্যয় হিসাব কষে টাকা না দেয়া বা দিলেও বেশি বেশি দেয়া এবং ব্যয়ের খাত জানতে না চাওয়া।

ছয় ঃ শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করতে টাকা চাইল আর অমনি দিয়ে দিলেন কিন্তু আদৌ ক্রয় করা হলো কিনা বা ক্রয় করলে কত টাকার ক্রয় করা হয়েছে তা আর খতিয়ে না দেখা।

সাত ঃ মায়ের কাছে কিছু খাইতে মন চাচ্ছে- এ কথা বলতেই টাকা দিয়ে দেয়া

আট ঃ শার্ট, প্যান্ট ও জামা কিনার জন্য ৫০০ টাকা দেয়া হলো হয়তোবা সে কিনলো ৩৫০ টাকা দিয়ে বাকী ১৫০ টাকা.....?

এগুলো ছাড়াও অস্বাভাবিক বা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অভিভাবকদের দায়িত্ব অবহেলা বা অসচেতনতার জন্যে শয়তানের উসকানিতে কোমলমতি আদর্শ সচ্চরিত্রবান সন্তানও হতে পারে আদর্শবিমুখ। যা লক্ষণীয় ঃ

এক ঃ কোচিং বা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ছে এ পর্বে সেখানে বেতন/সম্মানী কত শিক্ষার্থীরা এসে বাসায় বলল কিন্তু পরিমাণ ঠিক না বেঠিক জানতে চাইলেন না, ক্লাশ রীতিমত করছে কিনা তার খোঁজ-খবর নিলেন না বা আপনারা (মা-বাবা) ভর্তি করিয়ে দিয়ে আসলেন, এক মাস পড়ল তারপর আর পড়ছে কিনা তা আর জানতে চাইলেন না। অত্যন্ত দুঃখের সাথে অপ্রিয় হলেও এ কথাগুলো লিখতে হচ্ছে কতিপয় শিক্ষার্থীরা বাসা থেকে টাকা নিলো স্যারকে দেয়ার কথা বলে কিন্তু দিলো না এবং পরবর্তীতে আর ক্লাশ করতে গেল না অথচ প্রতিমাসে বেতন/ সম্মানী বাবদ টাকা নিচ্ছে.........?

দুই ঃ নবম-দশম বা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদেরকে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন বিল পরিশোধ করতে পাঠালেন কিন্তু সে হয়তোবা বলল পকেটমার নিয়ে গেছে। অথচ অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতা হলো তার মনে কু-বুদ্ধি আসল টাকার অংক অনেক এ দিয়ে কিছু করা যাবে। আবার পজিটিভ ধরি, সত্যিই পকেটমার বা ছিনতাইকারী ধরে নিয়ে গেলো; আঘাত করল। বলুন! কষ্টতো ঠিকই পেল!

এভাবে অভিভাবকের মনের অজান্তেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আর কিছুটা দায়িত্ব সচেতনতার ঘাটতিতে যে টাকা শিক্ষার্থীরা পেল তা কি অবাধে পাওয়ার সাথে তুলনা হতে পারে না? যদি তাই হয়, তাহলে তার ফলাফল কি পজিটিভ হতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু কেন সে বিষয়টি তুলে ধরছি-

শিক্ষার্থীর হাতে শিক্ষা উপকরণ বা শিক্ষা ব্যয় ব্যতীত অতিরিক্ত টাকা দিলে তা নির্ধারিত খাত না থাকায় কিসে ব্যয় করবে একটু ভেবে দেখবেন কি? আমি

www.amarboi.org

আজকের ছেলে-মেয়েরা যেসব খাতে এ টাকা ব্যয় করে তা লিখলাম না। কারণ তা আবার ঐ সকল শিক্ষার্থীদের পক্ষে চলে যাবে। তারা উৎস জেনে খুশী হবে। তাছাড়া আমার লেখা ধ্বংসমুখী নয় গঠনমুখী। সুতরাং চরিত্রকে গঠন করার লক্ষ্যে, উন্নত করার লক্ষ্যে উপরোক্ত পদ্ধতিতে টাকা পয়সা না দেয়ার পলিসি কিভাবে গ্রহণ করবেন সে সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করছি ঃ

০১. যে সমস্ত বাসায় শিক্ষার্থীরা স্কুল/কলেজে যাতায়াত করে তাদের ভাড়া দেয়ার লক্ষ্যে সব-সময় ড্রয়ারে ভাংতি টাকা রাখবেন। যাতে ভাংতির অভাবে বেশি টাকা দিতে না হয়।

০২. খাতা কলম শিক্ষার অত্যাবশকীয় উপকরণ। যা ব্যতিরেকে পড়ালেখা সম্ভব নয়। তাই যথাসম্ভব বাবা কিনে আনার চেষ্টা করতে হবে। আর শিক্ষার্থীরা কিনে আনলে সহজ সরলভাবে টাকা ফেরত পাওয়া নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে হবে।

০৩. স্কুল/কলেজগামী শিক্ষার্থীদের বিশেষ মুহূর্ত ছাড়া বাজারে না পাঠানোই উচিত। কেননা বাজার হচ্ছে দুনিয়ার সকল স্থানের চেয়ে নিকৃষ্টতম স্থান।

০৪. মা কোনভাবেই ছেলে-মেয়েদেরকে নির্ধারিত খাত ছাড়া টাকা পয়সা দেয়া ঠিক হবে না। যেকোন প্রয়োজনে বাবার কাছ থেকে নেয়ার জন্য তথা বাবামুখী করে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে তেমনি বাবা আবার শর্ত ছাড়া টাকা পয়সা দিবেন না। শর্ত হবে প্রেক্ষাপট অনুসারে যেমন মাহে রামাদান মাসের আগমনে বাবা বললেন তুমি যদি ৩০টি সিয়াম ও প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায সঠিক সময়ে আদায় কর (কাজা ছাড়া) তাহলে তোমাকে ঈদের শপিং এ সুন্দর জামা দেয়া হবে, তুমি যদি পরীক্ষায় প্রথম হও তাহলে তোমাকে দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হবে ইত্যাদি।

০৫. ছেলে-মেয়েরা আপনার চোখের অলক্ষ্যে হোস্টেলে থাকে। তাদের সর্বসাকুল্যে মাসিক ব্যয় এবং তাদের মাস পূর্ব বাজেট লিখিতভাবে নেয়ার চেষ্টা করা তারপর আবার মাস শেষে ঐ বাজেট অনুযায়ী খরচ হয়েছে কিনা তা হিসাব কষে দেখা এতে শিক্ষার্থীরা ব্যয় সচেতন হবে।

০৬. শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করতে চাইলে তা অভিভাবকদের নিজেদের হাতে করে দেয়া উচিত।

০৭. খাওয়ার নাম করে টাকা চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে তা না দিয়ে তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার শিক্ষা দেয়া উচিত। সব সময় চাইতেই দিয়ে দেন কখনো হয়তোবা সত্যই আপনার কাছে টাকা নেই চাইতেই দিতে পারছেন না তখন সে আপনার সাথে খারাপ আচরণ করবে। কান্নাকাটি করবে। অনেক

www.amarboi.org

ক্ষেত্রে ভাঙা-ভাঙি করবে। বাজে কথা বলবে। যা আপনার জন্যও হতে পারে লজ্জাকর।

০৮. মা-বাবা পছন্দ করে ছেলে-মেয়েদের শার্ট প্যান্ট জামা কিনে দেয়া হলে এক্ষেত্রে তাদের হাতে অতিরিক্ত টাকা যাওয়া বন্ধ হতে পারে।

০৯. কোচিং বা প্রাইভেট টিউটরের সাথে অভিভাবকরা কথা বলে পড়া শুরু করা এবং মাস শেষে নিজেদের হাতে শিক্ষকের সম্মানী পৌঁছিয়ে দেয়া ও তাঁদের সাথে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে পরামর্শ করা আবশ্যক। তাহলে শিক্ষকও হবেন দায়িত্ব সচেতন এবং তৎপর, শিক্ষার্থীরাও হবে উদ্যমী। কিন্তু শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষকের টাকা না দেয়াই উত্তম। অন্য দিকে অধিক টাকাতো অবশ্যই দিবেন না।

১০. গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধের জন্য শিক্ষার্থীদের না পাঠিয়ে যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে নিজেরা যাওয়া এবং নিজ হাতে তা পরিশোধ করা। ছাত্র বয়সে বা কৈশোরের এ সময়ে হাতে অনেক টাকা থাকলে খুব সহজেই শয়তানের প্ররোচনায় ফাঁকিবাজি ও অসৎ চিন্তা-চেতনা মনে আসতে পারে– যা সচ্চরিত্রের সাথে মারাত্মকভাবে সাংঘর্ষিক।

পরিবারে সদস্য কর্তৃক তথ্য গোপন করা

মানুষ ভুল করবে আবার এক সময় শুধরে নিবে। ভুল করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। পশু প্রবৃত্তির বশে শয়তানের পিছু পিছু চলা এবং প্রবল প্ররোচনায় ছেলে-মেয়েরা বিপথগামী হতে পারে। জড়িয়ে যেতে পারে বন্ধুদের আড্ডায়। বাসা থেকে যখন তখন যেতে পারে বেরিয়ে। ফিরে আসতে পারে বাবা অফিস থেকে আসার পূর্বে। টেলিফোনে চলতে পারে গল্প। পড়ার টেবিলে বসে পড়তে পারে আজেবাজে গল্পের বই। দরজা বন্ধ করে দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে খেলতে পারে কম্পিউটার গেমস। বসে থাকতে পারে পড়ার সময়েও টেলিভিশন সেটের সামনে। কুরআন অধ্যয়নে মন বসছে না, নামায আদায় ঠিকভাবে করছে না, মায়ের কথা অবনত মস্তকে মেনে নিচ্ছে না। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রয়োজনে অর্থের যোগানও দিচ্ছেন মা, ফলে অস্বাভাবিক সবকিছু। ছেলে-মেয়েদের পছন্দ অনুযায়ী চলতে থাকলে মূল কাজ পড়ালেখার ব্যাঘাত ঘটা স্বাভাবিক। যদিও মা সবসময় জোঁকের মতো তাদের তত্ত্বাবধান করার চেষ্টা করছেন কিন্তু মানছে না। মায়েদের অভিযোগ একদম ভয় পায় না। কথা শুনে না। শুধু বাবাকে ভয় পায়, বাবার কথা শুনে কিন্তু বাবা শুনে বকা-বকি করবে, ধমক দিবে সেজন্য মা এসব কিছু গোপন করতে থাকে, বাবাকে বলতে চায় না বা বলে না। আবার সন্তানরা মায়ের সাথে রাগ করবে এজন্যও অনেক মায়েরা

www.amarboi.org

বাবাকে বলতে চায় না। এভাবে ছেলে-মেয়েরা একটা একটা করে যখন এমন অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলোতে পূর্ণ মাত্রায়, তখন পড়ালেখা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অসৎ চরিত্রের দিকে ধাবিত হতে থাকে মা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে বাবাকে বললেও আর সে সমস্ত পথগুলো থেকে অনেক ক্ষেত্রে শতভাগ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না। সুতরাং সন্তানের অসৎ চরিত্রের প্রভাবে মা-বাবার হাতে হাতকড়া বা ক্রসফায়ারে নিহত হওয়ার ঘটনা বা দুনিয়ার জিন্দেগীতে অপমানিত, অপদস্থ, লাঞ্ছিত আর পরকালে জাহান্নামের আগুন নিশ্চিত অপেক্ষায় থাকে– যা দুঃখজনক।

পাশাপাশি যখন যা হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে বা হওয়ার আশঙ্কা উপলব্ধি করা মাত্রই মা যদি সন্তানদের পাশে বসিয়ে সে বিষয়টির কু-প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন, বুঝিয়ে বলেন তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই তারা এতে লিপ্ত হবে না। আর তারপরও প্রভাব মুক্ত না হলে তাদেরকে বলুন, তোমরা সংশোধন না হলে আমি বিষয়টি তোমাদের বাবাকে বলব। তাহলে তারা যেহেতু বাবাকে মান্য করে, বাবার প্রতি দুর্বল বেশি তাহলে তারা এটি করবে না। সংশোধনের দিকে এগিয়ে যাবে। এভাবে কোনো তথ্যই (পজিটিভ-নেগেটিভ) বাবার গোচরে না আনা মানে সন্তানদের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া– যার অনলে পুড়ে জ্বলতে হবে দু'জনকেই এক সাথে। তাই আগে থেকে যেখানে ভুল সেখানেই সংশোধন যখন ভুল তখন শুদ্ধ করে দেয়া বা বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ করা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ভিশন সেটআপ-এ মা-বাবার যৌথ উদ্যোগের অভাব

আদর্শ মানুষ হিসেবে একদিন বড় হবে মুখ উজ্জ্বল করবে বংশের, সেবা করবে সমাজের ও রাষ্ট্রের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর, দেশ গড়ায় রাখবে ভূমিকা এমনটি সকলেরই প্রত্যাশা। পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যারা মিলে পরামর্শ করে ছোটদের ভিশন সেট করলে ভবিষ্যতে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা আসবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরামর্শ করার প্রতি জোর তাকিদ প্রদান করেন। তাছাড়া পরামর্শ করে যেকোন কাজ করার মধ্যে অনেক রহমত ও বরকত পাওয়া যায়। এতে আল্লাহ খুশি হোন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা অনেক পরিবারে দেখি ছেলে-মেয়েরা চায় মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান যেকোন একটিতে পড়ে সে অনুযায়ী ভবিষ্যতে রাজনীতিবিদ, ব্যাংকার ও ডাক্তার যেকোনটি হতে কিন্তু তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয় তাদের মতের বিপক্ষের কোনো একটি। আবার মা চায় একটা বাবা বলে একটা, ছেলে বলে আমি হব ইঞ্জিনিয়ার, বাবা বলে তুমি হও ডাক্তার, মা বলে না সে হবে ব্যারিষ্টার ইত্যাদি। এমন ক্ষেত্রে কয়েকটার ভাবনায় শিক্ষার্থীরা ভোগে সিদ্ধান্তহীনতায়। এভাবে মা মনে করে আমি যা বুঝি তাই ঠিক।

www.amarboi.org

বাবা মনে করে এটা আবার ঠিক হয় কী করে? সে থাকে চার দেয়ালের মধ্যে; সে বুঝলেই বা কতটুকু বুঝে? সবশেষে যেদিকেই পাঠানো হয় এক মত না হওয়ার কারণে লক্ষ্য হয় ভ্রষ্ট, তারপর সন্তান হয়ে যায় আদর্শবিমুখ উন্মাদ। কিন্তু সন্ত ানদেরকে আদর্শ মানুষ করার জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই তাই প্রয়োজন পরামর্শের ভিত্তিতে ভিশন সেটআপ করা এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

অতি আদর ও অনাদর দু'টিই ক্ষতিকর

আদর, স্নেহ-ভালবাসা প্রত্যেকেরই চাওয়া। শুধু মানুষ নয় সকল প্রাণীই এটি তাদের আপনজনের কাছে প্রত্যাশা করে থাকে। ধরা ছোয়ার বাইরে অদৃশ্যমান একটি সম্পদ যার প্রভাব এবং পরবর্তী ফলাফল পজিটিভ নেগেটিভ দু'ক্ষেত্রেই অত্যন্ত প্রবল। কাজেই প্রয়োজন সুষ্ঠু সমন্বয়করণ। অতিরিক্ত যেকোন কিছুই খারাপ তেমনি অতি আদরও অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে কাঁদায় বা ঘরকুনে করে ফেলে। কর্ম অক্ষম করে তোলে বা এক কথায় মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। আদরের প্রতি আকর্ষণ অনেকেরই থাকে, আদর সকলেই চায়। এমন কেউ নেই যে আদর চায় না। কাজেই আদর করা ভাল কিন্তু কখনো যদি এমন আদর কেড়ে নেয়া হয় তাহলে তা ভুলে যাওয়া কতটা কষ্টদায়ক তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই বুঝাতে পারবে। এতে অনেকে জীবন বিসর্জন দেয়ার মতো কঠিন সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারে। জীবনের লক্ষ্যচ্যুতি হতে পারে ছিটকে পড়ে যেতে পারে সঠিক স্থান থেকে। আবার অন্ধের মতো আদর করে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়াও দুঃখজনক। আদরের কারণে আল্লাহ বিরোধী কাজ ও চলাফেরাকে সমর্থন করা ইসলাম কখনো মেনে নিতে পারে না। সুদী ব্যাংকে লেনদেনের মাধ্যমে সুদ খাওয়া ন্যায় বহির্ভূত, কাজ করে দেয়ার নামে ঘুষ খাওয়া, নামায আদায় না করা, ধূমপান করা, অসচ্চরিত্রের অসৎ দোষাবলির সাথে সম্পৃক্ত আছে জেনেও তা সংশোধন করানোর ভূমিকায় অবতীর্ণ না হওয়া; আপন হওয়ার নেশায় তা মেনে নেয়া বা তারপরও আদরের নেশায় ভুলে যাওয়া কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়।

অন্যদিকে অনাদর অনেক ক্ষেত্রেই মানুষকে অমানুষে পরিণত করতে সহায়ক হয়ে থাকে। যাদের মা-বাবা পৃথিবীতে বেঁচে নেই তাদের আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্যিই অত্যন্ত কঠিন। আমাদের সমাজে মা-বাবা হারা সন্তানগুলো নিগৃহীত হয়ে থাকে বেশি। আদর বঞ্চিত এ শিশুরাই একদিন হয়ে উঠে কুখ্যাত সন্ত্রাসী বা সমাজ ও রাষ্ট্রদ্রোহী। হত্যাযজ্ঞ তাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ। সুতরাং সচ্চরিত্রবান হওয়ার লক্ষ্যে এ দু'টির ক্ষেত্রে সমন্বয়সাধন করা উচিত মা-বাবাসহ সকলকে। তাহলেই মানুষ হবে আদর্শবান ও কল্যাণকামী।

www.amarboi.org

সচ্চরিত্র গঠনে শিক্ষার্থীদের পৃথক ক্যাম্পাসের আবশ্যকীয়তা

বাংলাদেশে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন কিছু নয়। ইংরেজ আমলে যখন থেকে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; তখন থেকে বাংলাদেশে সহশিক্ষা রয়েছে। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শহরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা ভিন্ন। কিন্তু গ্রাম প্রধান এ দেশে ছেলে-মেয়েরা এক সাথেই পড়ালেখা করছে। তবে মাদ্রাসার ক্ষেত্রে সহশিক্ষা নাই বললেই চলে। অবশ্য তৎকালীন সমাজের মেয়েদের জন্য মাদরাসা ছিলো না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে হাতে গোনা দু-একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোনো পৃথক ক্যাম্পাস নেই। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে যেখানে পূর্বে ছাত্রীরা কম ছিলো, সে সময় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গভীর মেলামেশা ছিলো না বা খুব কম ছিলো। এর ফলে তেমন কোনো সমস্যাও দেখা দেয়নি। এখন অবশ্য সঙ্গত কারণেই ছাত্রী সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর প্রভাবও পরিবেশের উপর পড়তে শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সহশিক্ষার কারণে তাদেরকে মেলামেশা, মত বিনিময়, ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই একত্রে বসে গল্প করতে দেখা যায়, যেখানে সব ধরনের হাসি-ঠাট্টা চলে। কিছু ছাত্র-ছাত্রী আরো এগিয়ে যায়। হাত ধরাধরি করে চলে, একত্রে রিকশায় চলে, গাড়িতে পাশাপাশি বসে। এর কোন্‌টিই ইসলাম অনুমোদিত নয়। শয়তান সব সময় ইসলাম ও মুসলিম জাতির ভাল কাজের বিপরীতে চলতে চায়। শয়তান এসে তাদের সাথে যুক্ত হওয়ায় কথা বলতে বলতে অনাদর্শিক কথা, হাত ধরতে ধরতে গাল ধরা, ভাল লাগতে লাগতে ভালবাসা সুন্দর লাগতে লাগতে সুন্দরের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটা ইত্যাদি হচ্ছে আদর্শ চরিত্রের সাথে মারাত্মক সাংঘর্ষিক বিষয়।

এর দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলও অনেক ক্ষেত্রে খারাপ হচ্ছে। নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবৈধ সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে ১৯৯৮ সালের ১৪ মে বাংলাদেশ অবজার্ভার পত্রিকায় ডা. সাবরিনা কিউ রশীদ লেখেন, "পূর্বে কখনো আমরা ডাক্তারেরা এত অধিক সংখ্যক অবিবাহিত অল্প বয়স্ক মেয়েকে গর্ভবতী হতে দেখিনি। তিনি এ মন্তব্য সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের সম্পর্কে করতে গিয়ে প্রবন্ধে উল্লেখ করেন—

ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত সৎ থাকে না। এগুলো পরবর্তীতে স্পর্শ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যৌন হরমোনের নিঃসরণ হওয়ায় যে কোনো স্পর্শ শরীর ও মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এটি ছেলেদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে। কেননা মেয়েরা একটু ঠাণ্ডা হলেও ছেলেরা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। সুতরাং মেয়েরা ছেলেদের বন্ধু হিসেবে নিতে চাইলেও ছেলেরা তার চেয়ে অনেক বেশিভাবে।

www.amarboi.org

সে জন্য ডা. রশীদ সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা না করতে এবং নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে চলতে বলেছেন। ডা. সাবরিনা রশীদের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া চিন্তা করা উচিত ছেলে-মেয়েদেরকে দুটো ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন মেজাজে, ভিন্ন চাহিদা ও শারীরিক গঠনে, ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন বস্ত্র পরিধান করার আদেশ দিয়ে স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। তাহলে কিভাবে তাদের মধ্যে স্রষ্টার আদেশ ব্যতিরেকে মিল বা বন্ধুত্ব হতে পারে? (বিয়ে ছাড়া কি সম্ভব!) তবে যেহেতু তাদের সাথে আপাতত ক্লাস করতেই হচ্ছে কাজেই আমাদের উভয় পক্ষের আচরণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফর্মাল হওয়া উচিত। আমরা একটি অফিসে গেলে যেভাবে অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় কথা বলি, ব্যবহার করি এটাই হচ্ছে ফর্মাল ব্যবহার।

প্রাইভেট টিউশনির ক্ষেত্রেও একই সতর্কতার প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখার প্রয়োজনেও শিক্ষকদের সঙ্গে বা ছাত্রীরা ছাত্রীদের সঙ্গে এবং ছাত্ররা ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করাই সঙ্গত। অন্যরকম হলেও শেষ পর্যন্ত (কিছুটা ব্যতিক্রম ছাড়া) পরিস্থিতি ঐদিকে চলে যেতে পারে। যা ইসলাম অনুমোদন করে না। ছাত্রীদের মহিলা শিক্ষকদের কাছেই পড়া উচিত। তাহলেই অনেকটা মনের অজান্তেই পারিবারিক সিদ্ধান্তের সুবাধে এ সমস্যার সমাধান হবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কিন্তু বাস্তব আমাদের দেশে প্রাইভেট টিউশনির কারণে ছেলে-মেয়েরা বাল্য বয়সেই প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। যা তাদের এবং পরিবারসমূহের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

এ বিষয়ে অবশ্য অনেক চিন্তাশীল লোক অন্য রকম সমাধানের কথা ভাবেন। তারা মনে করেন যে, উচ্চ পর্যায়ে সহশিক্ষা তুলে দিয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বা আলাদা ক্যাম্পাস করাই ভাল। রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি পর্যায়ে মহিলা স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রীয়ভাবে সহশিক্ষা তুলে দেয়া আজ সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে। বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সহশিক্ষার কুফল ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাপকতার কথা দেখেও আমাদের আজ চুপ থাকার কোনো সুযোগ নেই। যে সকল স্কুল ও কলেজে এখনো সহশিক্ষা আছে সেগুলোতেও ছেলে-মেয়েদের দু'টি আলাদা সেকশনে ভাগ করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। যা পরিণামে জাতির আগামীদিনের ভবিষ্যৎ সন্তানদের চরিত্র সংরক্ষণ করে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

ছেলে-মেয়ে অবাধে চলাফেরা সচ্চরিত্র গঠনে প্রতিবন্ধক

ইসলাম ছেলে-মেয়েদেরকে অবাধে চলাফেরা করা, বিনা প্রয়োজনে পাশাপাশি বসে কথা বলা, রাস্তা দিয়ে গমন করা, নিউমার্কেট ও গাউছিয়ার মতো শপিং সেন্টার বা মার্কেটে এক সাথে কেনাকেটা করতে যাওয়া ইত্যাদি

www.amarboi.org

নিরুৎসাহিত করছেন। অফিসে বা কর্মস্থলে নওজোয়ানদের পাশাপাশি চেয়ার টেবিলে বসে দায়িত্ব পালন করাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করছেন। ছেলে ও মেয়ে উভয়েই মানুষ; মানুষ হিসেবে তারা অভিন্ন। কিন্তু যেহেতু তাদের একজন ছেলে এবং অপরজন মেয়ে সেহেতু তাদের মাঝে ভিন্নতাও আছে। আল্লাহর রাব্বুল আলামীন মেয়েদের দেহকে কোমলরূপে সৃষ্টি করেছেন। নম্রতা, বিনয়, মায়া মমতার আধিক্য এবং প্রখর সৌন্দর্যানুভূতি তাঁদের চরিত্রের ভূষণ। ফলে তাদের মাঝে প্রভাব গ্রহণের প্রবণতা বেশি। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى.

"তোমরা স্বাভাবিকভাবে বাড়ির ভিতরে থাকবে। আগের যমানার বর্বর অসভ্যদের ন্যায় (জাহিলী যুগে নারীগণ যেভাবে বেপর্দা করে বেড়াতো ও বেশভূষা প্রকাশ করতো) সেজে-গুজে পথে ঘাটে বা পুরুষের কর্মক্ষেত্রে ঘোরাফেরা করো না।" (সূরা আল আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৩)

এই আয়াত দ্বারা পরিষ্কার বুঝা গেল নারী গৃহের মধ্যে থাকবে, বাইরে যাবে সভ্য পোশাক পরিধান করে। অন্যথায় পুরুষদের সামনে আল কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ১৪ জন ব্যতীত অন্যত্র বা কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার অধিকার নারীর নেই।

অন্যদিকে আজকের সমাজের বাস্তব চিত্রই হলো এসব আল্লাহ প্রদত্ত গযব। রেলগাড়ি যেমন পাশে পাশে আপন আপন লাইন ধরে উন্মাদের মতো ছুটে চলেছে। কারো সাথে কারো সংঘাত নেই। ঠিক এভাবেই আল্লাহর নির্দেশ মান্য করে আমরা যদি আপন আপন সীমারেখার মধ্যে চলাফেরা করি, তাহলে আমাদের জীবনে কোনরূপ অশান্তি আসবে না। আমরা যতক্ষণ আল্লাহর হুকুম বা বিধান মেনে চলবো, ততক্ষণ আল্লাহর সমস্ত মাখলুক আমাদের পক্ষ হয়ে আমাদের সাহায্য করবে। যেমন আগুন সাহায্য করেছিল ইবরাহিম (আ.)-কে। পানি সাহায্য করেছিল হযরত মূসা (আ.)-কে, ছুরি সাহায্য করেছিল হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে। আর যদি আল্লাহর বিধান অমান্য করে নিজের খুশিমতো খামখেয়ালীভাবে চলাফেরা করি, তবে আল্লাহর সমস্ত মাখলুক আমার বিরুদ্ধে খাটবে। যেমন নীল দরিয়ার পানি ফেরাউনের বিরুদ্ধে লড়েছিল, আল্লাহর মাখলুক মশা যেমন নমরূদের বিরুদ্ধে লড়েছিল, আবাবিল পাখি যেমন লড়েছিল বাদশা আবরাহা ও তার বিরাট হাতী ও সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ইত্যাদি।

ছাত্র-যুবকদের রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ সচ্চরিত্র গঠনে প্রতিবন্ধক

ছাত্র-যুবক আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। তারা নীতি নৈতিকতায় আদর্শবান; চরিত্রের দিক দিয়ে সচ্চরিত্রবান হোক এটা সকলেই চায়। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আজকের ছাত্ররাই জাতীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি হিসেবে ব্যবহৃত

www.amarboi.org

হচ্ছে। যাদের হাতে থাকার কথা বই, খাতা ও কলম; আজ তাদের হাতে ও কোমরে পিস্তল আর ছুরি। যাদের মুখে থাকার কথা ছিলো স্রষ্টার গুণগান, তাওহীদের সেই অমর বাণী; তাদের মুখে সৃষ্টির গুণগান আর সৃষ্টির বাণী এসব কিছু মিলে তারা আজ যা-যা করার কথা যেমন ঃ পড়ালেখা, আদর্শ সচ্চরিত্রবান জীবন গঠন তা ভুলে যেন ভবঘুরে হয়ে পড়েছে। দূরে সরে যাচ্ছে তাদের মূল কাজ বা করণীয় থেকে– যা আগামীদিনের জন্য এক অশনি সংকেত। এবার ছাত্র-যুবকদের মূল কাজ বা করণীয় এবং তার ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা করা হলো ঃ

এক. ছাত্রদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার অপূরণীয় ক্ষতিজনক বিষবৃক্ষের ফল হলো পড়ালেখায় মন বসে না, ভাল ফলাফলও অর্জন করা সম্ভব হয় না।

দুই. পড়ালেখায় উদাসীনতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

তিন. অযথা প্রচুর সময় নষ্ট হয়।

চার. ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার হয়ে উঠে।

পাঁচ. যারা ছাত্র জীবনে রাজনীতি করে তাদের রাজনীতিও হয় না পড়ালেখাও ঠিকমত হয় না।

ছয়. বেকার ও হতাশা নিরাশা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

সাত. ন্যায়পরায়ণতা, ইনসাফ ও আদব আখলাক দূর হয়ে যায়।

আট. মিথ্যা কথা বলা ও ওয়াদা খেলাফীর অভ্যাস হয়ে যায়।

নয়. এ রাজনীতির ফলে কতিপয় বদঅভ্যাস ধূমপান, মদ, গাজা ও আফিম ইত্যাদির প্রতি ঝুঁকে যায়।

দশ. নীতি নৈতিকতাবোধ থেকে দূরে সরে সর্বশেষ অসচ্চরিত্রের এক ভয়ঙ্কর কীটে পরিণত হয় যার থেকে সকলেই দূরে থাকতে চায়। এমনকি মা-বাবাও অতীষ্ঠ হয়ে বাসা থেকে বের করে দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সংগঠনের প্রভাব

বি.এন.সি.সি

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বি.এন.সি.সি) গঠিত হয়েছে তারুণ্যে উজ্জ্বল-উচ্ছল প্রাণবন্ত শিক্ষার্থী সমাজকে নিয়ে। এর উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম আদর্শমুখী। কাজেই প্রয়োজন শিক্ষার সকল স্তরে গ্রামে ও শহরে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন সংগঠন সংযোজন এবং অভিভাবকদের সচেতনতা। এ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো ঃ

০১. ছাত্র তথা যুব সমাজের নৈতিক উন্নয়ন, গুণাবলির বিকাশ, দেশসেবা ও দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করা, সর্বোপরি নিজেদের মাঝে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব গঠন।

www.amarboi.org

০২. দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তরুণ ছাত্র সমাজের আগ্রহ সৃষ্টি ও তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া।

০৩. দেশের উন্নয়ন কাজে এবং বিভিন্ন জাতীয় বিপর্যয়ের মোকাবেলা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করা।

০৪. বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রেক্ষিতে দেশের দ্বিতীয় সারির প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা।

০৫. প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ দেশের সকল কাজে নেতৃত্বের উপযোগী ব্যক্তিত্ব গঠন করা।

সুতরাং বলব এ সংগঠনটি শিক্ষার্থীদেরকে নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সময়ানুবর্তিতা এবং প্রচণ্ডভাবে শৃঙ্খলাগত চেইন অব কমাণ্ডের জগতে পরিচিত করিয়ে দেয়। ফলে সোনা পুড়িয়ে যেমন খাঁটি করা হয়, সেখানে মানুষের অতিরিক্ত ইমোশন অসতর্কতা, অমনোযোগসহ অসচ্চরিত্রের অসৎ দোষগুলো তথা টিনেজ বয়সের মানুষের মন মানসিকতার নেগেটিভ দিকগুলোকে ঝেড়ে ফেলে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আদর্শ ছাত্র ও মানুষ গড়ে তুলতে এ সংগঠনের ভূমিকা অভূতপূর্ব। কাজেই যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে এ সংগঠনের কার্যক্রম আছে সেখানে শিক্ষার্থীদেরকে বেশি বেশি করে এতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সংগঠনটিকে ঢেলে সাজিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে পড়ালেখায় মনোযোগী ও স্ব-স্ব ধর্ম অনুযায়ী কর্মের প্রাকটিস ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গঠন করতে চেষ্টা করা উচিত।

অন্যদিকে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বি.এন.সি.সি. সংগঠনটি নেই সেখানেও এটি চালু করলে খুব ভাল হবে।

স্কাউটিং

১৯০৭ সালে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল স্কাউট আন্দোলন শুরু করেন। তারই হাত ধরে ১৯২০ সালে অবিভক্ত ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে স্কাউট আন্দোলন শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীদের এ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করে আদর্শ ছাত্র ও নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। সাধারণত শিক্ষার্থীরা স্কাউটিং এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর যে প্রতিজ্ঞা বা শপথ গ্রহণ করে থাকে তা হলো ঃ

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে,

০১. আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে,

০২. সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে,

০৩. স্কাউট আইন মেনে চলতে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

এ শপথে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে স্কাউটরা আদর্শ ছাত্র ও সুনাগরিক হওয়ার ভিত্তি স্থাপন করে থাকে। স্কাউটিং অন্তর্ভুক্ত সকল শিক্ষার্থীরা সম্মান (Honour), আনুগত্য (Loyalty), সাহায্য (Help), বন্ধুত্ব (Friendship), বিনয় (Courtesy), সাহস

www.amarboi.org

(Courage), প্রফুল্লতা (Cheerfulness) এবং মিতব্যয়িতা (Thriftiness) ইত্যাদি ইতিবাচক গুণাবলি ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে ছেলে-মেয়েরা তাদের নৈতিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে মজবুত ও দৃঢ় করে থাকে। স্কাউট জীবন এরকম দৈনিক সৎ কাজ (Good Turn), অপরের জন্য ভাবার এবং কাজ করার অভ্যাস তৈরি করে।

এ জন্যেই আমাদের দেশে শহর ও গ্রামের সকল প্রতিষ্ঠানে বা যেখানে বি.এন.সি.সি. সংগঠনটি নেই সেখানে অবশ্যই এরূপ একটি সংগঠন চালু প্রয়োজন। আর যেখানে বর্তমানে আছে সেটিতো অবশ্যই ভাল। মূলতঃ এ সংগঠনটি দেশে শিক্ষার্থীদের চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা ও এদেশের কৃষ্টি-কালচার এবং ধর্মের রীতিনীতি অনুযায়ী যেহেতু শিক্ষার্থীদেরকে আদর্শবান করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে তখন আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে এতে অন্তর্ভুক্ত হতে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে কোনরকম বাধা থাকার কথা নয়। এতে টিনেজ বয়সী ছেলে-মেয়েদের মাথায় কু-চিন্তা বা শয়তান জেঁকে বসতে পারবে না। তারা আদর্শবাদী নেতৃত্বশীল, ভাল কথার অধিকারী, সমাজের জন্য কল্যাণকামী মানুষ হবে। আর এভাবে দেশেরও উন্নয়ন হবে। বাংলাদেশ হবে বিশ্বের অন্যতম উন্নত রাষ্ট্র।

সচ্চরিত্র গঠনে আদর্শ শিক্ষার প্রভাব

শিক্ষা জাতির বিবর্তনের মূল উৎস। একটি জাতির উন্নতি-অবনতির ব্যারোমিটার। শিক্ষার মানদণ্ডেই নির্ণীত হয় পৃথিবীর কোনো জাতি কতটুকু উন্নত অথবা অনুন্নত। একটি জাতির চিন্তা-চেতনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য মূল্যবোধ এবং জাতীয় মনন ও বিকাশধারা শিক্ষানীতির মৌলিকত্বকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এদিক থেকে শিক্ষাই একটি জাতির মৌল প্রাণ। শিক্ষাই মানুষকে ভিন্ন করে তোলে অন্যান্য প্রাণী থেকে। শিক্ষার জন্যই সৃষ্টি হয় মানুষে মানুষের মধ্যেও এক বিশাল ব্যবধান। আমাদের চারপাশে যেসব জীব-জন্তুর সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তাদের মধ্যে শিক্ষার কোনো কৃত্রিম প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই না। এদের স্বভাবের মধ্যেই মহান আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এরা সহজাত বৃত্তির তাগিদে প্রাকৃতিক নিয়মে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করে থাকে। এদেরকে না যেতে হয় কোনো শিক্ষকের কাছে, না আছে তাদের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অথচ মানব শিশুদের মা-বাবাকে তাদের সন্তানদেরকে উপযুক্ত শিক্ষার জন্য পেরেশান হয়ে যেতে হয়। তাদেরকে পাঠাতে হয় শিক্ষকের কাছে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অন্যথায়, তাদের বুদ্ধিবৃত্তির কোনো বিকাশ ঘটে না। পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্বলতম এবং পরনির্ভরশীল করে সৃষ্টি করা হয়েছে মানব শিশুকে, মানব শিশু আগুন, পানিকে খেলার উপকরণ মনে করে হাত দিতে চেষ্টা করে, প্রস্রাব, পায়খানাকে হালুয়া মনে করে হাত দিয়ে চেঁটে মুখে দিতে চেষ্টা করে, ক্ষুধা পেলে কান্না ছাড়া ব্যক্ত

www.amarboi.org

করতে পারে না। মানব শিশুকে ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম প্রচেষ্টা দ্বারা যা শিক্ষা দিতে হয়, অন্যান্য জীবের বাচ্চা বা ছানারা তা সহজাত বৃত্তি দ্বারা আপনা-আপনিই লাভ করে থাকে। মানুষকে জ্ঞান সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য একটি পরিকল্পিত কৃত্রিম কার্যকরী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কেননা প্রত্যেক মানুষ তিনটি সত্তার সমন্বয়ে গঠিত। দেহ, মন ও আত্মা এই তিনটি সত্ত্বার সমন্বয়ে একজন মানুষের অস্তিত্ব। মানব শিশুর জন্মের পর থেকে ক্রমাগত এবং অব্যাহত পরিচর্যার মাধমে তার দৈহিক বিকাশ ঘটে; নানা সামাজিক বিক্রিয়ায় তার মন বেড়ে ওঠে। আর আত্মার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ভর করে নৈতিক পরিগঠনের উপর। আর এ জন্যে প্রয়োজন স্রষ্টার নির্দেশমত মানুষের শিক্ষা লাভ করা। স্রষ্টা যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ফিরিশতাদের মানুষ সৃষ্টির বিপক্ষে দেয় সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করে মহব্বতের স্বাক্ষর স্বরূপ এ মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেখানে তো অবশ্যই তিনি এ মানুষের জন্য উত্তম পথও বাতলে দিবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর সেই বাতলে দেয়া পথ এবং পথের গাইড লাইনস্বরূপ পাঠিয়েছেন যুগে যুগে নবী রাসূল ও বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত সংবিধান বা কিতাব। কিন্তু তারপরেও সে সমাজের লোকজন ব্যক্তি পূজারী ও জালিমের মতো আচরণ করতে শুরু করল। সে সমাজেও পড়ালেখা ছিলো, শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো, ছিলো প্রবল জ্ঞানের প্রতিযোগিতা। সে শিক্ষায় আবুল হাকাম পরবর্তীতে অভিশপ্ত হয়ে আবু জাহিল, আবু লাহাব, উতবা, শাইবা ওয়ালীল তৈরি হয়েছে। যেখানে অভাব-অনটন, মারামারি, খুনাখুনি স্বেচ্ছাচারিতা আর মূর্তিপূজা সম্পর্কে পড়ানো হচ্ছে, শেখানো হচ্ছে স্রষ্টাবিমুখতা, ব্যক্তি উদারতার নামে প্রভুত্ব আর পশুর ন্যায় আচরণ বিধি। সে সময়ে হেরা গুহায় জিব্রাঈল (আ.) এসে যখন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে বললেন পড়ুন, তখন তিনি জবাবে বললেন, আমি পড়তে পারি না। তাছাড়া কী পড়ব? কিভাবে পড়ব? তখন বলা হলো ঃ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

"পড়ো, স্রষ্টার নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ো, কেননা আপনার স্রষ্টা মহান সম্মানী ও দাতা। তিনি কলম দ্বারা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা মানুষ জানত না।" (সূরা আল আলাক, ৯৬ ঃ ০১-০৫)

এ নির্দেশের প্রত্যেক বর্ণের পরতে পরতে লুকায়িত রয়েছে মানব সত্তার চরিত্রকে আদর্শ চরিত্রে পরিণত করার সকল উপকরণ। যা মানুষকে স্রষ্টার প্রিয়তম ও মানুষ মানুষের জন্য এমন মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন

www.amarboi.org

করে থাকে এবং তা বাস্তবায়নে আদর্শ শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের বিকল্প পৃথিবীতে কিছু নেই তাও প্রমাণ করে।

এ থেকে বুঝা যায়, একজন মানুষ যা ইচ্ছা-তাই পড়তে পারে না, যা-তা শিখতে পারে না। পড়বে, শিখবে যাতে তার স্রষ্টার নাম আছে। আর এ নামই হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণ। এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে শিক্ষার মূল উপকরণ, মূল কথা, মূল আদর্শ। যেমনিভাবে প্রাণই হচ্ছে জীবন, প্রাণবিহীন অবস্থাই হচ্ছে মরণ। আজকের সমাজের বেশির ভাগ বাস্তব চিত্র তারই প্রতিফলন।

মনে করুন, একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক, জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব মৃত্যুবরণ করলেন। নিয়ে আসা হলো গ্রামের বাড়িতে। অত্যন্ত ভাল মানুষ হওয়ায় শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ কেউ তাঁকে কবরস্থ করতে যায় না। তিন দিন পর ঘরের মানুষ দুর্গন্ধের কারণে থাকতে পারছে না। পাঁচদিন পর দেখা গেল আশে-পাশের লোকজন দুর্গন্ধে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এভাবে বিভিন্ন গ্রামের লোকজন যদি এমন মৃত ভাল মানুষের লাশ সংরক্ষণ করতে চায়, তাহলে সে কী ভয়াবহ ও অসহনীয় অবস্থা দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। দুর্গন্ধ ছড়াতেই থাকবে যতদিন একদল সাহসী দুর্গন্ধ বিরোধী মানবগোষ্ঠী এগিয়ে না আসবে। তারা এসে লাশটিকে কবরস্থ করবে ছড়াবে সুগন্ধি। আচ্ছা বলুন! কেন.....? কেন এমন দুর্গন্ধ? ঐ মৃত ব্যক্তির সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গতো ঠিক আছে। কেন তাকে কবরস্থ করা হচ্ছে! তিনি তো সবার শ্রদ্ধাশীল প্রিয় একজন ভাল মানুষ ছিলেন। আজ নেই তার দেহে শুধু একটি জিনিস। আর তা হলো রূহ। যা জীবনের মূল, জীবনের প্রাণ। সুতরাং বুঝা গেল প্রাণহীন, রূহহীন মানুষ; মানুষ নয়-লাশ। ঠিক তার মতোই, স্রষ্টার নাম ছাড়া যে শিক্ষা আছে তা শিক্ষা নয়, তা শিক্ষার মৃত লাশ সদৃশ। এই মৃত দেহকে কবরস্থ করতে এগিয়ে আসতে হবে সকল শ্রেণীর সকল সচেতন মানুষকে। নইলে এর দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকবে আজীবন। এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষিত মানুষদের কাছ থেকে দুর্গন্ধই পাওয়া যাবে। সুগন্ধির আশা সুদূর পরাহত।

এজন্যই একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে সময়ের প্রকট দাবি হলো আদর্শ শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটানো, বাস্তবায়ন ঘটানো। সমগ্র বিশ্ব অনাদর্শের করাল ছোবলে যখন আহত, প্রতিদিন অগণিত মানব যাদের জন্যে পৃথিবী সজ্জিত তাদেরই যখন অকালে জীবন সাঙ্গ, মানুষ যখন মানুষের জন্য কল্যাণকামী না হয়ে হচ্ছে চির শত্রু, চির প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সর্বোপরি মানুষের কাছে মানুষের মতো আচরণ পাওয়া যখন সুদূর পরাহত, বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তেও যখন সুন্দর কথা, সুন্দর আচরণ বিধি, মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা বিলুপ্ত, ধর মার খাও দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে যা পাও তাই লুফে নাও, কার কী? নেয়া ঠিক হবে কিনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও– এমন দুর্নীতি আর ক্ষমতার আগ্রাসনে মানবতা যখন চরমভাবে উপেক্ষিত, আদর্শ চিন্তা-চেতনাশীল মানুষদের যখন হতে হয়

www.amarboi.org

অবমূল্যায়িত, অপমানিত, লজ্জিত আর জীবনের চলার পথ করে দেয়া হয় সংকীর্ণ, বলা হয় তারা আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত এমনকি মাও যখন সন্তান সদৃশ ছেলেদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সম্পদ অর্জন ও সম্পদশালীদেরকে নিয়ে আনন্দ-ফূর্তিতে মশগুল থাকতে ব্যস্ত, সন্তানহীনা নারীরাও যখন সম্পদ বৃদ্ধিতে অনাদর্শ ও স্রষ্টা কর্তৃক নিন্দিত, সমাজের চোখে এক বাক্যে ঘৃণিত সুদের মাধ্যমে টাকা বাড়াতে প্রতিনিয়ত উন্মুক্ত তখন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা এবং তাদেরকে সেই কণ্টকাকীর্ণ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা ছাড়া আর কি-ই বা করার থাকতে পারে? (অবশ্য এ জন্যও নানা অপবাদ, বকা আর বিচ্ছিন্নতা আসতে পারে)। তাদেরকে লক্ষ্য করেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

اِعْلَمُوٓا أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِينَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ط كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ط وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ لا وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ.

"এই জ্ঞানার্জন করো যে, দুনিয়ার জীবনটা একটা খেল তামাশা ও চাকচিক্য মাত্র আর পরস্পরের গৌরব করা এবং সম্পদ ও সন্তানের দিক দিয়ে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র।............ বিপরীত পক্ষে রয়েছে পরকাল। সেখানে আছে কঠিন আযাব আর আছে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষ।" (সূরা আল হাদীদ, ৫৭ ঃ ২০)

দুনিয়ার জীবনকে অনেক বড় মনে করে, রূপ রস গন্ধে মুগ্ধ হয়ে সম্পদের পাহাড় গড়তে ব্যস্ত হয়ে এক শ্রেণীর মানুষ স্রষ্টার বিরোধী কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করছে না। বর্তমান প্রচলিত লর্ড মেকলে প্রণীত এ সিলেবাসের অধীনে এক শ্রেণীর শিক্ষিত শিক্ষাবিদরা সম্পদের কাছে মাথা ঝুঁকে দিচ্ছে। সম্পদ থাকলে অসচ্চরিত্রের মানুষও ভাল হয়ে যাচ্ছে। মনে করছে সম্পদ আছে তো সব আছে। কিন্তু তারা জানে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ কী ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

"এই জ্ঞান লাভ করো যে, তোমাদের সন্তান ও সম্পদ পরীক্ষার বস্তু আর আল্লাহর কাছে রয়েছে অবশ্য বড় পুরস্কার।" (সূরা আল আনফাল, ০৮ ঃ ২৮)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

فَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

www.amarboi.org

"জেনে নাও যে, কেবল আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক। তিনি উত্তম অভিভাবক আর উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা আল আনফাল, ০৮ ঃ ৪০)

কাজেই বলব সর্বোপরি প্রচলিত এ শিক্ষাকে আদর্শ শিক্ষায় রূপান্তর করে, স্রষ্টার নাম তথা নৈতিকতাবোধ ও মানবতাবোধসহ সচ্চরিত্র গঠনের মূল উপকরণ ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন পরিমার্জন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ছাড়া অসৎ চরিত্রের এ যে ধস তা থামানো সুদূর পরাহত হয়ে যাবে। চারদিকে গড়ে তুলতে হবে অসৎ চরিত্রের কৃতকর্মের চিন্তা-চেতনার বিপক্ষে দুর্বার গণসচেতনতা, প্রয়োজনে পোষণ করতে হবে ঘৃণা, অপবাদের ভয়ে, খাবার কেড়ে নিয়ে আদর বঞ্চিত করবে– এ ভয়ে তাদের মুক্তির জন্যে জ্ঞানীরা চেষ্টা না করে থেমে থাকলে তো চলবে না। তাহলে যে আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধুরাই হবে দু'জাহানে ঘৃণিত ও চরমভাবে উপেক্ষিত। সেদিন যে মুক্তি পাবার পথ হবে রুদ্ধ। হই না আমি এককভাবে আজ বঞ্চিত, তবুও যদি করতে পারি এ লেখার মাধ্যমে বহুজনকে মুক্ত তবেইতো রয়েছে শান্তি। আমি চরমভাবে বিশ্বাস করি সার্টিফিকেট হয়তোবা আমাদের আছে, শিক্ষা জীবনও ব্যয়িত হয়েছে ঠিকই কিন্তু রয়েছে আমাদের শিক্ষায় ঘাটতি। এ থেকে মুক্তির জন্যে আজ প্রথমে আমাদেরকেই হতে হবে সচেতন, সৎ মানুষ তারপর আমাদের সমাজের সকল লোকজনকে স্ব-স্ব স্থানে থেকে তাদের চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতার অঙ্গনে প্রভাব বিস্তার করে সুন্দরের প্রতি, সচ্চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারতে হবে। এ দায়িত্ব সকলের। সকলে মিলে মিশেই কেবল এটি করা সম্ভব। কেউ কেউ এমন মনে করতে পারেন কে সচ্চরিত্রবান বা অসচ্চরিত্রের তা আমার দেখার দরকার কী? আমি ভাল হলেইতো জগৎ ভাল। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলব, এটা সত্য আগে আপনাকে আমাকে ভাল হতেই হবে। অন্যকে ভাল করানোর জন্যে এগিয়ে থাকার পূর্বশর্ত হলো নিজে আগে ভাল হওয়া আর এরপর অন্যকে ভাল করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। এটি সকলের দায়িত্বও বটে– এ দায়িত্ব আমি কারোর মাথার উপর চাপিয়ে দিচ্ছি না, আসলে এটি আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। সুতরাং মানতেই হবে, আর মানলেই সচ্চরিত্রবান মানুষ দিয়ে সুন্দর সমাজ গড়া সম্ভব হবে।

মানব চরিত্রের ইতিবাচক দিক

সিদক বা সত্যবাদিতা

সিদ্‌ক বা সত্যবাদিতা হলো সচ্চরিত্রের প্রধান ভূষণ। সত্যবাদিতা এমন একটি মহৎ গুণ– যা আদর্শবান মানুষের জন্য অপরিহার্য। সত্যবাদিতার সম্পর্ক

www.amarboi.org

যেমনিভাবে কথা ও কাজের সাথে সম্পৃক্ত, তেমনিভাবে অন্তর ও আমলের সাথেও সম্পৃক্ত। এ ত্রিবিধ দিক থেকেই বলা যায়, আদর্শবান মানুষের মাঝে সত্যবাদিতার গুণের সমন্বয় থাকতে হবে।

এটি মুমিনের এমন একটি মহৎ গুণ যা সত্যবাদীর অনুভূতিবোধ, বিশ্বাস, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও কর্ম পরিধিতে পরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যবাদী ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ এবং তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ ইখলাস তথা ঐকান্তিকতা ও সদিচ্ছার আয়না সদৃশ। তাই তাকে বলা হয় 'সিদ্দীক' বা সত্যবাদী। মহান আল্লাহ্র দৃষ্টিতে নবীগণের পরই সিদ্দীক বা সত্যবাদীগণের স্থান। সত্যবাদিতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।" (সূরা আত তাওবা, ০৯ ঃ ১১৯)

সত্যবাদিতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ فَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةَ.

"সত্যবাদিতা পুণ্যের কাজ। আর পুণ্য জান্নাতে পৌছিয়ে দেয়।"

মিথ্যাবাদিতাকে সকল পাপের উৎস হিসেবে আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الْكِذْبُ اُمٌّ لِكُلِّ الذُّنُوْبِ.

"মিথ্যা সকল পাপের জননী।"

যারা মিথ্যাবাদী তাদের কেউ বিশ্বাস করে না এবং বিপদের সময় তারা কারো সাহায্য পায় না। যেমন ঃ এক রাখালের ঘটনা, যে জঙ্গলে পশুপাল চড়াবার সময় মাঝে মাঝে বাঘ বাঘ বলে চিৎকার দিতো। আশপাশের লোকজন তার সাহায্যের জন্য যখন যেত তখন খিলখিল করে হাসতো এবং লোকেরা দুঃখিত মনে ফিরে যেত। কিন্তু যেদিন সত্যিই বাঘ আসলো সেদিন তার চিৎকার শুনে কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসলো না। বরং লোকেরা মনে করলো, সে মিথ্যা কথা বলছে। ফলে বাঘ তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে।

সমাজ জীবনে যারা মিথ্যাচারী, তারা সকলের নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিচিত। সকলেই তাদের ঘৃণা করে এবং সোহবত থেকে দূরে থাকে। পক্ষান্তরে যারা সত্যবাদী, তাঁদেরকে সবাই শ্রদ্ধা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নবুওয়াত পূর্ব জীবনে সত্যবাদিতার জন্য তাঁর কাওমের লোকদের থেকে 'আল-আমীন' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পরও তার সমাজের এই সব লোক, যারা

www.amarboi.org

তাঁর উপরে ঈমান আনেনি, তারাও তাদের ধন-সম্পদ তাঁর কাছে তাঁর সত্যবাদিতার কারণে আমানত রাখতো। হিজরতের সময় যা তিনি মালিকদের কাছে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য হযরত আলী (রা.)-কে দায়িত্ব দিয়ে যান এবং হযরত আলী (রা.) সেসব মালামাল মালিকদেরকে ফিরিয়ে দেন। সত্যবাদী লোকদের পরিচয় আল্লাহ্ তা'আলা আল কুরআনুল কারীমে এভাবে দিয়েছেন ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ.

"বস্তুত তারাই মুমিন যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ করেনি এবং নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী।" (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৫)

এ আয়াতে প্রকৃত সত্যবাদীর পরিচয় দেয়া হয়েছে। ঈমানদারের অন্তরে যে ঈমান ছিলো তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে কথা দ্বারা প্রমাণ করেছে এবং তাদের আমল দ্বারাও তার সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কথা, অন্তর ও আমলের পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্যের নামই হলো সত্যবাদিতা।

সত্যবাদীগণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মহামর্যাদার ব্যবস্থা রেখেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَن يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولٰٓئِكَ رَفِيقًا.

"আর কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে সে নবীগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মপরায়ণগণ, যাঁদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, তাঁদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী।" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ৬৯)

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يَكُوْنُ صِدِّيْقًا وَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا.

www.amarboi.org

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "সত্যবাদিতা মানুষকে পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সত্য কথা বলতে থাকে, অবশেষে সে সিদ্দীক তথা মহাসত্যনিষ্ঠ হয়ে যায়। আর মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপাচার মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, অবশেষে সে আল্লাহ্র নিকট মহামিথ্যুক হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়ে যায়।" (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

فَاِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيْنَةَ وَالْكِذْبُ رِيْبَةَ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "সত্যনিষ্ঠ অবশ্যই প্রশান্তিদায়ক আর মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টিকারী।" (তিরমিযী শরীফ)

বস্তুত সততা ও সত্যবাদিতা আখ্লাকে হাসানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যার মধ্যে এ গুণের সমাহার থাকবে। সমাজের সব ধরনের লোক তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে এবং সে আখিরাতে আল্লাহ্র কাছে এর বিনিময় লাভ করবে এবং সত্যবাদিতার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সত্য প্রকাশে সাহসিকতা ও বীরত্ব

মুমিনগণ হলেন সত্যের সৈনিক, সাহসিকতা ও বীরত্বের মূর্ত প্রতীক। সত্য প্রকাশে তারা অনড়। সত্য প্রতিষ্ঠায় তারা সদা উন্মুখ। এমনকি জীবন দিতেও প্রস্তুত। সত্যের পথে যত বাধা থাকুক, নিন্দুকের যত নিন্দা আসুক এতে তারা কখনো ভয় পায় না। জালিমের পক্ষ থেকে যত অত্যাচার ও উৎপীড়ন তাদেরকে গ্রাস করতে চেষ্টা করুক তাঁরা কখনো তা পরোয়া করে না। মুমিনের এ সত্য প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠিতকরণে সাহসিকতা বীরত্ব নিঃসন্দেহে সচ্চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।

আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসে এ বিষয়ে স্পষ্ট বিবৃতি ও বর্ণনা রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

"তাঁরা (মুমিনরা) আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না।" (সূরা আল মায়িদা, ০৫ ঃ ৫৪)

মুমিনদের এই দৃঢ় সাহসিকতার কারণে পরবর্তী বছর কুরাইশরা মদীনা আক্রমণ করতে সাহস করে নি বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে। আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَمَّا رَاَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا.

www.amarboi.org

"আর মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তারা বলে উঠল, এ তো তাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন, আর এতে তাঁদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।" (সূরা আল আহযাব, ৩৩ ঃ ২২)

মুমিনগণ অসত্যের ও অন্যায়ের পাহাড় সমান যত বাধাই আসুক এতে কখনো বিচলিত হয়না। সাহস হারায় না, বরং আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল–নির্ভরতার কারণে তাদের সাহস ও বীরত্বে আরো ব্যাপকতা ও বিশালতা আসে, তাদের মনে আরো শক্তি সঞ্চার হয়। মুমিনগণ তাঁদের স্বভাবজাত সাহসিকতা ও বীরত্ব এবং অকপটে সত্য প্রকাশের গুণের কারণে যালিম ও স্বৈরাচার শাসকের বিরুদ্ধেও সোচ্চার কণ্ঠ হয়ে থাকে। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةُ حَق عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرِ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "যালিম শাসকের সামনে হক কথা বলা হচ্ছে উত্তম জিহাদ।" (তিরমিযী শরীফ ও আবু দাউদ শরীফ)

মিতাচার বা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। কাজেই কুরআনের আওতায় গড়া এ জীবন ব্যবস্থায় কোনো বাড়াবাড়ি করার সুযোগ নেই, মাত্রাতিরিক্ততারও সুযোগ নেই। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই ইসলামের নির্দেশ। মুমিনের জীবনের সব কাজের মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকা একান্ত প্রয়োজন।

মিতাচার মানে মধ্যম বা মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করা, কোনো কাজে ও কথায় সীমালঙ্ঘন না করা, বাড়াবাড়ি না করা এবং মাত্রাতিরিক্ত কিছু না করা।

কোনো কাজে একদিকে ঝুঁকে পড়লে অন্যদিকের ফরয ইবাদত আদায়েও অসুবিধা হতে পারে। এ কারণে ইসলাম জীবনের উপর চরম কঠোরতা আরোপ করতে নিষেধ করেছে। মূলত মিতাচার অবলম্বন না করার কারণেই এ কঠোরতা আসে। পবিত্র কুরআনে মিতাচার সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

"আল্লাহ্ তোমাদের সাথে সহজ ব্যবহার করতে চান এবং কঠিন ব্যবহার করতে চান না।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৮৫)

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عَنْ اَنَس رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ اِلى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْئَالُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.amarboi.org

فَلَمَّا اُخْبِرُوْا كَاَنَّهُمْ تَقَالُوْهَا وَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ اَحَدُهُمْ اَمَا اَنَا فَاُصَلِّى الَّيْلَ اَبَدًا، وَقَالَ اٰخَرُ وَاَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ اُفْطِرُ، وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ اَتَزَوَّجُ اَبَدًا ـ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ـ مَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَخْشَاكُمُ اللّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ، وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ.

"হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনজন লোক নবী (সা.)-এর স্ত্রীগণের বাড়িতে এসে নবী (সা.)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। তখন তাদেরকে এ সম্পর্কে বলে দেয়া হলো, তারা এটাকে (নিজেদের জন্যে) কম মনে করল। তারা বলতে লাগল ঃ নবী (সা.)-এর তুলনায় আমরা কোথায়! আল্লাহ্ তো তাঁর পূর্বের ও পরের ত্রুটি-বিচ্যুতি (যদি হয়) মাফ করে দিয়েছেন। তাদের একজন বলল ঃ আমি চিরকাল সারা রাত নামায রত থাকব। আর একজন বলল ঃ আমি স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকব এবং কখনও বিয়ে করব না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের কাছে তাশরীফ আনলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি এরূপ কথা বলেছ! আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের চেয়ে আমি আল্লাহ্‌কে বেশি ভয় করি এবং বেশি তাক্ওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু আমিতো সিয়াম রাখি আবার খাই। নামায পড়ি আবার ঘুমাই এবং বিয়ে-শাদীও করি। (এটাই সুন্নাত নিয়ম) যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত (নিয়ম) পালন করবে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادِدَ الدِّيْنَ اِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدُّوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا وَاَسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدَاوَةِ وَالرَّوْحَةِ.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্‌র দ্বীন সহজ, যে কোনো ব্যক্তি এ দ্বীনকে কঠিন বানাবে তার উপর তা চেপে বসবে। কাজেই মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করো। আর সুখবর গ্রহণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় ইবাদত করে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও।" (বুখারী শরীফ)

একজন মুমিনকে এ দুনিয়াতে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। সুতরাং কোনো একটি কর্তব্য নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে নিশ্চিত অন্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষতি হতে বাধ্য। এ কারণে ইসলাম প্রতিটি কাজে এমন পন্থা

www.amarboi.org

অবলম্বন করতে নির্দেশনা দিয়েছে যাতে প্রতিটি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা যায়। ইসলামের পূর্বের অন্যান্য ধর্ম ব্যবস্থার মতো ইসলামে নেই কোনো কঠোরতা, অসম্পূর্ণতা, অপূর্ণতা। যে কেউ অন্তকরণে চাইলেই এ ধর্মে দিক্ষিত হয়ে নিজেকে আলোকিত করতে পারে।

সাদকা ও দানে মিতাচার

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا.

"এবং তুমি তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না, তা হলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে। অর্থাৎ দানের বেলায়ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ২৯)

ব্যয়ে মিতাচার

ব্যয়ে মিতাচার প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

"এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।" (সূরা আল ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৭)

চলাফেরায় মিতাচার

আল কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ.

"এবং তুমি পদক্ষেপ (চলাফেরা) করবে সংযতভাবে।" (সূরা লুক্মান, ৩১ ঃ ১৯)

উল্লেখিত আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে, শুধু দ্বীনী কাজ নয় দুনিয়াবী সকল কাজেও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে। কোনো কাজেই বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা আরোপ করা যাবে না। মুমিনের জীবনে সালাত, সাওম, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, ইবাদত-বন্দেগী, আহার-নিদ্রা, সমাজ সেবা, দান-খয়রাত তথা সকল কাজে মিতাচার অবলম্বন অত্যাবশ্যক।

ইহসান বা পরোপকার

মানুষ মানুষের জন্য। এ নীতিতে অভ্যস্ত হওয়ার সহজ পথ হলো পরোপকার করা। পরোপকার আদর্শবাদী মানুষদের একটি অনন্য সদ্গুণ। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা, নিজের জন্যই সবকিছু করা তাদের বৈশিষ্ট্য নয়। বরং

www.amarboi.org

আদর্শবাদী মানুষ তথা মুমিনের বৈশিষ্ট্য এমন হওয়া উচিত সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে। ইসলামের দৃষ্টিতে ইহ্সান অর্থ হলো অপরের সাথে উত্তম আচরণ ও উদার ব্যবহার এবং অপরকে তার প্রাপ্যের অধিক প্রদান করা।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ.

"এবং পরোপকার করো যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।" (সূরা আল কাসাস, ২৮ ঃ ৭৭)

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ইনসাফ ও পরোপকারের নির্দেশ দিচ্ছেন।" (সূরা আন নাহ্ল, ১৭ ঃ ৯০)

ইসলামে পরোপকারের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। কেবল টাকা-পয়সা দিয়েই পরোপকার হয় না। মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহারও পরোপকার। কাউকে ভাল পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করাও পরোপকার। ব্যক্তি ও জাতির বিপদে-আপদে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোও পরোপকারের শামিল। হাদিসে পরোপকারের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে :

اَللّٰهُ بِعَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ بِعَوْنِ اَخِيْهِ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার প্রতি সহায়তা করেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাই-এর প্রতি সহায়তা করেন।" (মুসলিম শরীফ)

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ وَلَايَظْلِمُهُ وَلَايُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করতে পারে না। তাকে নিরাপত্তাহীনতায় ছেড়ে দিতে পারে না। যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসবে, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিনে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার দোষ ঢেকে রাখবেন।" (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

www.amarboi.org

লজ্জাশীলতা ও শালীনতা

সচ্চরিত্র গঠনে লজ্জাশীলতা ও শালীনতাবোধ অত্যন্ত জরুরী গুণ। লজ্জাহীন ব্যক্তি পশুর সমতুল্য। সে যেকোন অসৎ কাজ করতে পারে, আর এজন্যই বলা হয়, যার লজ্জা-শরম নেই তার ঈমানও নেই। কারণ লজ্জা ও শালীনতাবোধ মানুষের সকল প্রকার অশ্লীলতা ও খারাপি থেকে বাঁচার উত্তম হাতিয়ার।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

فَاِنَّ الْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ.

"লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা।" (বুখারী শরীফ)

اِنَّ الْحَيَاءَ وَالْاِيْمَانَ قَرْنَاءَ جَمِيْعًا فَاِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الْاٰخَرُ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "লজ্জা ও ঈমান সর্বদা পরস্পর সাথী হয়ে থাকে। যখন এর একটি বিলুপ্ত হয়, অপরটিও উঠিয়ে নেয়া হয়।" (বায়হাকী শরীফ)

অন্যত্র রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও এ গুণে গুণান্বিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صُفْرًا.

"তোমাদের প্রতিপালক লজ্জাশীল, পরম দয়ালু। বান্দা যখন তাঁর দরবারে মুনাজাতে উভয় হাত উত্তোলন করে তখন তিনি তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।" (তিরমিযী শরীফ)

লজ্জা এমন একটি গুণ যার ফলে সর্বদা কল্যাণ লাভ করা যায়। নবী কারীম (সা.) বলেন ঃ

"লজ্জাশীলতা কেবল কল্যাণ ও মঙ্গলই বয়ে আনে।" (বুখারী শরীফ)

ভাল-মন্দ সকল কাজ করতে পারে। কোনো কিছুই তাকে মন্দকাজ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

اِذَا لَمْ يَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.

"লজ্জা-শরম না থাকলে তুমি যা ইচ্ছা করতে পারবে।" (বুখারী শরীফ)

লজ্জাস্থানের বা গোপন অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে পুরুষ কি নারী সবার জন্যই লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করা শ্রেষ্ঠ আসনেরই বহিঃপ্রকাশ। আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসে

www.amarboi.org

মানুষের লজ্জাস্থানের হিফাযত করার বা পবিত্রতা রক্ষা করার বিশেষ তাকিদ রয়েছে। লজ্জাস্থানের উপর কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখাই শুধু লজ্জাস্থানের হিফাযত নয়। বরং অবৈধভাবে লজ্জাস্থানের বা যৌনাঙ্গের ব্যবহার না করাই লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করার মর্ম। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُل لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ.

"হে রাসূল! মুমিনদের বলুন, তাঁরা যেন তাঁদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাঁদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটা তাঁদের জন্য উত্তম।" (সূরা আন নূর, ২৪ ঃ ৩০)

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামে বর্ণিত পর্দা মূলত মানুষের লজ্জা ও লজ্জাস্থানের হিফাযতের জন্যই। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقُل لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ.

"আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তাঁরা যেন তাঁদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাঁদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, তাঁরা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাঁদের আবরণ প্রদর্শন না করে, তাঁদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় (ওড়না ও চাদর) দ্বারা আবৃত করে।" (সূরা আন নূর, ২৪ ঃ ৩১)

প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে কোনো অবস্থাতেই অশ্লীল আচরণ, ক্রিয়াকাণ্ড যা লজ্জাস্থানের পবিত্রতা নষ্ট করে তার কাছেও যাওয়া যাবে না।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

"আর প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, বেহায়াপনা ও অশ্লীল আচরণের নিকটও যাবে না।" (সূরা আন আন'আম, ০৬ ঃ ১৫১)

উক্ত আয়াতে 'অশ্লীল আচরণের নিকটও যাবে না' বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যেসব কাজ ও কাজের উৎস অশ্লীলতা ও পাপাচারের সাথে সম্পৃক্ত বা সেদিকে নিয়ে যায় তাও পরিত্যাগ করতে হবে। এর মধ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অভিসার, অশ্লীল গান-বাদ্য, বিনোদন, ম্যাগাজিন, ছায়াছবি ইত্যাদিও শামিল।

আমানতদারী

আমানতদারী একটি মহৎ গুণ। এতে মানব জীবনের সকল প্রকার আমানত শামিল। শরয়ী ও দুনিয়াবী আমানতও এর মধ্যে রয়েছে। ধন-সম্পদের আমানত,

www.amarboi.org

দায়িত্ব ও পদমর্যাদার আমানত, ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আমানতও এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি কারো প্রাপ্য আদায় করে দেয়াও আমানতদারী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا.

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে যাবতীয় আমানত তার মালিকদের (হকদারদের) কাছে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ৫৮)

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ.

"তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত প্রত্যার্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২৮৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا أَمٰنٰتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! জেনেশুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভংগ করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও না।" (সূরা আল আনফাল, ০৮ ঃ ২৭)

আল কুরআনুল কারীমের দুই জায়গায় প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির পরিচয় ও গুণাবলির কথা উল্লেখপূর্বক আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ.

"এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।" (সূরা আল মুমিনূন, ২৩ ঃ ০৮ ও সূরা আল মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৩২)

আমানতদারী ঈমানের আলামত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

لَاإِيْمَانَ لِمَنْ لَاأَمَانَةَ لَهٗ وَلَادِيْنَ لِمَنْ لَاعَهْدَ لَهٗ.

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই এবং যে অঙ্গীকার রক্ষা করে না তার মধ্যে দ্বীন নেই।" (বায়হাকী শরীফ)

আমানতের খিয়ানত করা মুনাফিকীর আলামত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ.

"মুনাফিকের আলামত তিনটি ঃ

www.amarboi.org

০১. যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে,

০২. ওয়াদা করলে বরখেলাফ করে এবং

০৩. আমানত রাখলে খিয়ানত করে। (বুখারী শরীফ)

আমানতদারী উঠে যাওয়াকে হাদিসে কিয়ামতের আলামত বলা হয়েছে। সরকারী বা বেসরকারী, ব্যক্তিগত বা সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কি আন্তঃরাষ্ট্রীয় যেকোন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার মাঝেও আমানতদারী রয়েছে। দায়িত্বশীল ব্যক্তি; কর্মকর্তা ও কর্মচারীকেও স্ব-স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা অবশ্যই আমানতদারীর মধ্যে শামিল। সুতরাং কেউ যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করে তবে নিশ্চিত আমানতদারী আদায় হবে না। তা হবে অবশ্যই আমানতের খিয়ানত।

দায়িত্বে নিয়োগ ও সুযোগ সুবিধা দেয়ার ব্যাপারেও আমানতদারী রয়েছে। কর্তা ব্যক্তিবর্গ বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ যদি নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো যোগ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিয়োগ দান করে, তবে তাও আমানতদারীর খিয়ানত হবে। এ ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতিও খিয়ানত। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ عَصَابَةٍ وَفِيْهِمْ مَنْ هُوَ اَرْضىٰ لِلّٰهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজ গোষ্ঠীর কোনো লোককে কাজে নিয়োগ করল, অথচ তাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট অধিকতর প্রিয় ও যোগ্য লোক বর্তমান রয়েছে সে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাথে খিয়ানত করলো।" (কানযুল উম্মাল)

হাদিসে আছে, অযোগ্য পাত্রে দায়িত্ব অর্পণও কিয়ামতের আলামত। কারো কথা আমনত হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। গোপন কথা, চাই ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় তা প্রকাশ করা অবশ্যই খিয়ানত।

ওয়াদা পালন

ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালন করা একটি উত্তম মানবিক গুণ। এটি সত্যপরায়ণতারই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শরীয়াতসম্মত কোনো ওয়াদা দিয়ে পালন করা কর্তব্য। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিষয়েও ওয়াদা– চুক্তিপত্র থাকতে পারে, তা পালন করা অবশ্যই কর্তব্য। কেননা এ ধরনের ওয়াদা পালন না করলে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। বিঘ্নিত হতে পারে সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শান্তি।

www.amarboi.org

পবিত্র কুরআনুল কারীম ও হাদিসে ওয়াদা পালনের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিদ্যমান। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا.

"আর সত্যপরায়ণ তারাই যারা ওয়াদা দিয়ে তা পূর্ণ করে।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৭৭)

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً.

"এবং প্রতিশ্রুতি পালন করবে, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে অবশ্যই (কিয়ামত দিবসে) কৈফিয়ত তলব করা হবে।" (সূরা বনী ইস্‌রাঈল, ১৭ ঃ ৩৪)

ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করা যেমন মহৎ গুণ, তেমনি তা পূর্ণ না করা অসৎ স্বভাব। হাদিসে ওয়াদা পূর্ণ না করাকে মুনাফিকী বলা হয়েছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, মুনাফিকের আলামত তিনটি, তন্মধ্যে একটি হলো وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ –যখন ওয়াদা করে তখন তা বরখেলাফ করে।

লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকা

লোভ-লালসা মানুষের অন্তরের একটি মারাত্মক ব্যাধি। এ ব্যাধির চিকিৎসা না হলে মুমিন কখনো তার চরিত্র ও আত্মাকে সংশোধন করতে পারে না। মূলত লোভ-লালসা মানুষকে পাপের পথে চালিত করে। লোভাতুর ব্যক্তির জীবনে কখনো শান্তি আসতে পারে না। কথায় বলে "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।" অবশ্য লোভ-লালসা মানুষের সহজাত অভ্যাস ও প্রবৃত্তি। সুতরাং একে অবদমিত ও শৃঙ্খলিত করতেই হবে। লোভাতুর ব্যক্তি কখনো পরোপকার করতে পারে না। কারণ লোভী ব্যক্তি স্বভাবতই কৃপণ হয়ে থাকে। তবে লোভী ব্যক্তি ভোগ-বিলাসীও হতে পারে।

লোভ-লালসা অনেক রকমের হতে পারে। ধন-সম্পদ, সম্মান-প্রতিপত্তি, এমপি-মন্ত্রী ও সুখ্যাতি লাভের লোভ ঈমান ও আমলের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং সচ্চরিত্র গঠন ও সংশোধনের পথে বিরাট অন্তরায়।

মহান আল্লাহ্ তাঁর রহমতে যা দেন তাতে সন্তুষ্ট থাকাই ঈমানদারের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য। অপরের সম্পদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতির প্রতি তাকানোর প্রয়োজন কী? মুমিন কখনো অপরের সম্পদের দিকে তাকায় না। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ج وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقىٰ.

"আর তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করবে না, তার প্রতি যা আমি

www.amarboi.org

তাদের (কাফির ও মুশরিক) বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, তাদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য এবং তোমার প্রতিপালকের প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।" (সূরা ত্বাহা, ২০ ঃ ১৩১)

উল্লেখিত আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মুমিন কখনো লোভাতুর দৃষ্টিতে পার্থিব ভোগ উপকরণসমূহকে দেখতে পারে না। লোভাতুর দৃষ্টিতে দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রীকে দেখার স্বভাব বে-দ্বীনের। মুমিন দুনিয়ার সহায়-সম্পদকে দেখবে আখিরাত বা পরকালে সাফল্য লাভের উপায় হিসেবে। মুমিনের মৌল লক্ষ্য থাকবে মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভ। কেননা ধন-সম্পদ ও সম্মানের লোভ দ্বীন ও ঈমানের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلاَ فِىْ غَنَمٍ بِافْسَدٍ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرْفِ لِدِيْنِهٖ.

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন ঃ "দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে একটি মেষের উপর ছেড়ে দিলে এ দু'টি মেষের জন্য এর চেয়ে ক্ষতিকর হবে না, একজন মানুষের সম্পদ ও সম্মানের লোভ তার দ্বীনের জন্য যতটুকু ক্ষতিকর হয়।" (তিরমিযী শরীফ)

দানশীলতা

দানশীলতা বা বদান্যতা একটি মহৎ গুণ। দানশীল ব্যক্তিকে মানুষ যেমন ভালবাসে তেমনি মহান আল্লাহ্‌ও তাঁকে ভালবাসেন। আসলে দান করার জন্য মন থাকা চাই, তাছাড়া সম্পদ থাকলেই দানশীল হওয়া যায় না।

দানকারীর দান কখনো বৃথা যায় না। যদি তাতে রিয়া বা অন্য কোনো দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য মিশ্রিত না থাকে। তবে দানশীলতার জন্য যেমন দুনিয়াবী পুরস্কার আছে, তেমনি দানের পরকালীন পরিণাম রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। দান করে কখনো খোটা দেয়া যায় না, এতে দানের ফযীলত ও বরকত নষ্ট হয়ে যায়। মুমিনকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে দুনিয়াটা শুধু ভোগের নয়, ত্যাগের ও দানের। ধন-সম্পদ যা আছে তা চিরস্থায়ী নয়, সে অস্থায়ী মালিক, সেও চিরস্থায়ী নয়। মুমিনের চিরস্থায়ী আবাস হলো পরকাল তথা জান্নাত। যা অনন্ত অসীম। সে অনন্ত কালের কল্যাণের নিমিত্তেই তাকে দান করতে হবে। দান করতে হবে লোক দেখানো ও সুনামের জন্য নয় বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে। যেহেতু তিনি (আল্লাহ্‌) সম্পদ দিয়েছেন, তাঁরই শুকরিয়াস্বরূপ দান করতে হবে। সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষ বসবাস করে। কেউ ধনী আবার কেউ

www.amarboi.org

গরীব। ধনীদের জন্য উচিত গরীবদের সহযোগিতায় দানের হাত সম্প্রসারিত করা। সমাজের গরীব শ্রেণীর লোকদের প্রতি দানশীলতা ও বদান্যতা প্রদর্শন করা একটি মহৎ কাজ। আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ তাকিদ রয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২৬৭)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ছিলেন দানশীলতার মূর্ত প্রতীক। জীবনে কেউ তাঁর নিকট কিছু চেয়েছে এবং জবাবে তিনি না বলেছেন এমনটি কখনো হয়নি। হযরত আনাস (রা.) বলেন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ.

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সমস্ত মানুষের তুলনায় সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও সর্বাধিক সাহসী ছিলেন।" (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَآ اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ.

"তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি (আল্লাহ্) তা পূরণ করে দেন।" (সূরা আস সাবা, ৩৪ ঃ ৩৯)

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ج وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ج وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ.

"যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করো তা তোমাদের নিজেদের জন্য। তোমরা তো শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ অর্থেই ব্যয় করে থাকো। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা পূর্ণ করে দেয়া হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২৭২)

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ.

www.amarboi.org

"তোমরা যে ধন-সম্পদ ব্যয় করো। আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২৭৩)

দানের মধ্যে অনেক ফযীলত ও বরকত রয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"যারা নিজেদের ধন-ঐশ্বর্য আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজ যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে রয়েছে একশত শস্যকণা। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়। (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২৬১)

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পুণ্য ফল তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২৭৪)

অর্থাৎ বদান্যতা ও দানশীলতার পরিণামে দাতাকে মহান আল্লাহ্ এমন পুরস্কার দিবেন যে, তারপর তাদের উপর কোনো বিপদ আসার ভয়-ভীতি থাকবে না এবং তারা কখনো চিন্তিত হবে না।

দানকারীর জন্য কর্তব্য হলো, স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করা। উপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করা, উত্তম মাল দান করা ও গোপনে দান করার পর তা বলে বেড়াবে না এবং গ্রহীতাকে কোনরূপ কষ্ট দিবে না।

ক্ষমা

ক্ষমা মহান আল্লাহ্‌র অন্যতম গুণ। আরবি 'আফ্উ' শব্দের অর্থ ক্ষমা করা।. ইসলামী পরিভাষায় 'আফ্উ' হলো, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করে দেয়া। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল। মহান আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও মহাপ্রতাপশালী। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সকল অবাধ্য গুনাহগার বান্দাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন। তাঁর কাজে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। এতদসত্ত্বেও বহু সংখ্যক মানুষ তাঁকে এবং তাঁর দেয়া জীবন বিধানকে কেবল অস্বীকার করে না; বরং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং শিরকের

www.amarboi.org

ন্যায় জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়। অথচ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেন।

মহান আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে ভালবাসেন। ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ। অজ্ঞ মূর্খদেরকেও অহরহ ক্ষমা করতেই হবে। ক্ষমা করা নিঃসন্দেহে উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম। ক্ষমা করা দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তিত্বের চিহ্ন। ক্ষমা ব্যতীত এ জগৎ সংসার অচল হতে বাধ্য। মনিব তার চাকর-বাকরকে, মালিক তার শ্রমিককে, কর্তা ব্যক্তি তার অধীনস্থদেরকে ক্ষমা করতেই হবে। এমনকি পশু-পাখি, জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপরবশ হয়েও ক্ষমা করতে হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর হুকুম হচ্ছে ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ.

"আপনি ক্ষমা করুন, সৎ কাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞ বা মূর্খ ব্যক্তিদেরকে এড়িয়ে চলুন।" (সূরা আল আ'রাফ, ০৭ ঃ ১৯৯)

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"আর তাদের উচিত তাদেরকে ক্ষমা করা এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আন নূর, ২৪ ঃ ২২)

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

" তারা (মুমিনরা) লোকদেরকে ক্ষমা করে থাকে। আল্লাহ্ সৎ কর্মশীলদের ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৩৪)

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ.

"যে লোক ধৈর্যধারণ করবে ও ক্ষমা করবে, নিঃসন্দেহে এটা বড় উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম।" (সূরা আশ শুরা, ৪২ ঃ ৪৩)

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ.

"অতএব আপনি (হে নবী) তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৫৯)

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে 'ক্ষমা' কে নবী-রাসূলগণের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ.

www.amarboi.org

"অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।" (সূরা আল আহ্কাফ, ৪৬ ঃ ৩৫)

প্রতিটি মানুষের জন্য দয়া ক্ষমার গুণে গুণান্বিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র ঘোষণা ঃ

وَإِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"আর তোমরা যদি ওদের মার্জনা কর, ওদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আত তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৪)

দয়া-মায়া ও ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র নীতি ও নির্দেশ অনুসরণ করা আবশ্যক। মানুষ ভুল-ত্রুটি মুক্ত নয়। কোনো কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কাজেই সাধারণ ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা করাই শ্রেয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَسَارِعُوْا إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ لا الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে ধাববান হও যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ন্যায়। যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ্ নেক্কার লোকদের ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৩৩-১৩৪)

অন্যায়কারীর অপরাধ ক্ষমা করা তাক্ওয়া লাভের উপায় এবং ক্ষমা তাক্ওয়ার নিকটবর্তী গুণ। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَاَنْ تَعْفُوْآ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى.

"আর মাফ করে দেয়াই তাক্ওয়ার নিকটতর।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২৩৭)

অতএব বলব, প্রত্যেক মুসলিমের চরিত্রে এমন মহৎ গুণগুলোর সমন্বয় ঘটানো উচিত।

ক্রোধ ও রাগ প্রদমন

ক্রোধ সচ্চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অন্তরায়। রাগ বা ক্রোধকে অবদমিত করে সহনশীলতা ও কোমলতা অবলম্বন করতে পারা আদর্শবান

www.amarboi.org

মানুষের একটি বিশেষ গুণ। ক্রোধ আসে শয়তানের পক্ষ হতে। শয়তান মানুষের চরম শত্রু। সে কারণে ক্রোধ বা রাগ আসলে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

ক্রোধ মানুষের হিতাহিত জ্ঞানকে তিরোহিত করে দেয়। ক্রোধ মানুষকে পাপাচার ও অনাচারে লিপ্ত করে। এ কারণে আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ক্রোধের অপকারিতা বর্ণিত হয়েছে এবং সহনশীলতা, ধৈর্য ও কোমলতার নীতি অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ.

"তাঁদের (মুমিনদের) বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা ক্রোধকে হজম করে এবং লোকদের সাথে ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে চলে।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৩৪)

আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকী লোকদের প্রশংসা করে ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ.

"এবং যখন তাঁরা ক্রোধান্বিত হয় তখন তাঁরা মাফ করে দেয়।" (সূরা আশ শুরা, ৪২ ঃ ৩৭)

হাদিসে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-কে বললেন, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ "রাগ করো না। লোকটি এ কথাটি কয়েকবার বলল, নবী (সা.) বললেন ঃ রাগ করো না।" (বুখারী শরীফ)

একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো, রাগকে সংবরণ করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

"ঐ ব্যক্তি বীর পুরুষ নয়, যে অন্যকে ধরাশায়ী করে। বরং সে-ই প্রকৃত বীর যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। শয়তান আগুনের তৈরী আর আগুনকে পানি ঠাণ্ডা করে দেয়। যদি কারো ক্রোধের উদ্রেক হয় তার উচিত অযূ করে নেয়া।" (আবু দাউদ শরীফ)

অকারণে বা অযথা রাগ করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। নবী কারীম (সা.) বলেছেন ঃ "রাগ মানুষের ঈমানকে নষ্ট করে দেয়। যেমনিভাবে তিক্ত ফল মধুকে নষ্ট করে দেয়।" (বায়হাকী শরীফ)

তবে ক্রোধ বা রাগের আবার পজিটিভ দিকও আছে। রাগের সাথে সম্পর্ক

www.amarboi.org

রয়েছে জীবনের সফলতার। যদি কেউ রাগ বা জেদ ধরে জীবনে সফলতার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে তাহলে সে তা অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে রাগ পুরুষের ভূষণে পরিণত হতে পারে।

অন্যদিকে, এমন রাগ বা জেদ নারীদের জীবনে হলে তা হবে ধ্বংসমুখী। সেজন্যে সমাজে প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে তা হলো, পজিটিভ ক্রোধ বা রাগ পুরুষকে করে বাদশা আর নারীদের ক্ষেত্রে পজিটিভ হলেতো ভাল আর তা না হলে তারা হয়ে যায় বেশ্যা।

কাজেই বলব, নারী জীবনের তিনটি পর্যায়– কন্যা, বউ ও মা। এগুলোর কোনো ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে ক্রোধ বা রাগ বা জেদ থাকা শুভ লক্ষণ নয়।

পুরুষের জীবনে রাগ না থাকলেতো পুরুষ নির্জীব হয়ে যাবে। রাগ থাকবে, এটি জীবনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের একটি অংশ কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত নয়। মনে রাখতে হবে, যে ক্রোধের পজিটিভ দিক সুন্দর তার নেগেটিভ দিকও কিন্তু চরম কুৎসিত। কারোর মধ্যে রাগ যখন চূড়ান্ত সীমায় আসবে তখন তার উচিত দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়া, বসে থাকলে শুয়ে যাওয়া। এতেও ক্রোধ দমন না হলে অযু করা আর বুঝতে হবে এখানে শয়তান উপস্থিত। এমতাবস্থায় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সাহায্যকারী, আমাদের প্রতিপালক ও সর্বনিয়ন্তা মালিক।

সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা এবং দয়া ও কোমলতা

সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা এবং দয়ামায়া ও কোমলতা মুমিনের চরিত্রের স্বাভাবিক লক্ষণ। সহিষ্ণুতা মুমিনের অলংকার। কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থায় স্বীয় আবেগ ও উচ্ছ্বাস দমন করা, প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও না নেয়াই হলো সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা। সহনশীলতা মহান আল্লাহ্‌র একটি সিফাত বা গুণ। তাঁর নবী ও রাসূলগণের জীবনে সহনশীলতার গুণটি ছিলো অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। নবী-রাসূলগণ ছিলেন দয়া ও কোমলতার মূর্ত প্রতীক। শুধু মানুষ নয় তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি ছিলেন দয়ামায়া ও কোমলতা প্রদর্শনকারী।

পবিত্র কুরআনে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ.

"অবশ্যই ইব্‌রাহীম সহনশীল, কোমল হৃদয়, আল্লাহ্ অভিমুখী।" (সূরা হূদ, ১১ ঃ ৭৫)

নবী কারীম (সা.)-এর দয়া ও কোমলতা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

www.amarboi.org

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ.

"(হে রাসূল) আল্লাহ্‌র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর-চিত্তের অধিকারী হতেন তবে তারা আপনার কাছে থেকে সরে পড়ত। সুতরাং আপনি তাদেরকে মাফ করুন আর তাদের জন্য মাফ প্রার্থনা করুন।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৫৯)

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

"আর মুমিনদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করুন।" (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৮৮)

পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ. وَمَا يُلَقَّاهَآ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا ج وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ.

"ভালো ও মন্দ সমান নয়। তুমি ভালো দ্বারা মন্দকে প্রতিহত কর। অবশেষে তোমার ও অন্যের মধ্যে যে শত্রুতা ছিলো তা এমন হয়ে যাবে যে সে তোমার পরম বন্ধু। আর এহেন সুফল তারই ভাগ্যে জোটে যে বিশেষ ধৈর্য ও সহনশীল চরিত্রের অধিকারী এবং যে বিরাট সৌভাগ্যশালী।" (সূরা হামীম আস সাজদা, ৪১ ঃ ৩৪-৩৫)

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "মহান আল্লাহ্ স্বয়ং কোমল ও দয়াবান। তিনি প্রত্যেক কাজে কোমলতা ও দয়ার নীতি পছন্দ করেন।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

اِنَّ الرِّفْقَ لَايَكُوْنُ فِىْ شَيْءٍ اِلَّا زَانَهُ وَلَايُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ.

"যে জিনিসে কোমলতা থাকে, কোমলতা সেটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেয়। আর যে জিনিস থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেয়া হয় সেটাই দোষ ও ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়।" (মুসলিম শরীফ)

পারস্পরিক আচার-ব্যবহার, লেনদেন, কঠোরতার পরিবর্তে নরম ও কোমল

www.amarboi.org

আচরণ করাই সচ্চরিত্রের দাবি। কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে নরম ও কোমলতার নীতি অনুসরণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যদিও অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আজকের সমাজে এ নীতিগুলোর প্র্যাকটিস না থাকার কারণে অনেকে এটিকে বিশেষ দুর্বলতা বা তার বুঝি কিছুই নেই বা সে বুঝি কিছু চায় ইত্যাদি মনে করে থাকে।

বিপদ-আপদ, কষ্ট মুমিনের জন্য পরীক্ষা বিশেষ। এ সবের সম্মুখীন মুমিনকে হতেই হয়। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার নীতি অবলম্বন করতেই হবে।

বিনয় ও নম্রতা

ইসলামে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন হচ্ছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিনয়ের অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র অন্য বান্দাদের তুলনায় নিজেকে ছোট জ্ঞান করা এবং অন্যদেরকে বড় মনে করা। বিনয় আল্লাহ্‌র নিকট খুবই পছন্দনীয়। এটি মর্যাদা লাভের একটি বিশেষ সোপান। বিনয় অবলম্বনকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ.

"কেউ যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিনয় অবলম্বন করে তবে আল্লাহ্ তায়ালা তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেন।" (মুসলিম শরীফ)

মানুষের আচার-ব্যবহার বস্তুত তার গোটা ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের আয়নাস্বরূপ। কারো আচার-ব্যবহার ও চাল-চলন দেখে তার মনের অবস্থা অনুমান করা যেতে পারে এবং তার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যেতে পারে।

বিনয় ও নম্রতাকে কখনো দুর্বলতা মনে করা উচিত নয়। মনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ অত্যন্ত বিনম্র ও বিনীত ছিলেন। গর্ব-অহংকার তাঁদের মাঝে কখনো দেখা যায়নি। তাদের কথা-বার্তা, চলা-ফেরা, চাল-চলন দেখেই বোঝা যেত যে তারা সত্যিকার অর্থেই মহাজন ও সজ্জন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا.

"দয়াময়ের অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা তারাই যারা বিনম্রভাবে পৃথিবীতে চলাফেরা করে।" (সূরা আল ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৩)

উদ্ধত ও অহংকারভরে চলাফেরা করা, কথাবার্তা বলা মুমিনের সচ্চরিত্রের লক্ষণ নয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلاَتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا.

"অহংকার বশে মানুষ থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না।" (সূরা লুক্‌মান, ৩১ ঃ ১৮)

www.amarboi.org

বিনয় মানুষের মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেয়। হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَمَاتَوَاضَعَ اَحَدٌ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "দান-খয়রাত মাল-সম্পদকে কমিয়ে দেয় না, ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ বান্দার সম্মানই বাড়িয়ে দেন। কেউ বিনয় অবলম্বন করলে আল্লাহ্ তাকে আরো উপরে উঠিয়ে দেন।" (মুসলিম শরীফ)

ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য

মুমিনকে অবশ্যই চলাফেরা, কথা-বার্তা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, কাজ-কারবার, লেন-দেন তথা জীবনের সব কিছুতেই স্বীয় মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে।

সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে অহরহ বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। ইসলামী শরীয়তসম্মত যে কোনো কাজে মুমিন তার সাধ্যমত অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু অশ্লীল ও অসার ক্রিয়া-কলাপ অবশ্যই তিনি পরিহার করবেন। কখনো নিজেকে তাতে জড়িয়ে ফেলবেন না। এমন কোনো কাজ তিনি করবেন না, যা তার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার জন্য ক্ষতিকর ও মানহানিকর। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا.

"এবং তারা অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে।" (সূরা আল ফুরকান, ২৫ ঃ ৭২)

মনের পরিশুদ্ধতা ও সচ্চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ হলো মানুষের আচার-ব্যবহার তার ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য। এমন কোনো কাজ-কর্ম করা থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে যা তার জন্য মর্যাদা হানিকর। হাসি-তামাশা, কৌতুকেও অনেক সময় মানব চরিত্রের মননশীলতা প্রকাশ পায়। সুতরাং হাসি-তামাশার বিষয়েও মুমিনকে সাবধানী হতে হবে। মুচকি হাসিই হলো উত্তম চরিত্রের ভূষণ। অসার হাসি-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক কখনো করা যাবে না। স্বীয় মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এসব করতে হবে। কারণ ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য সচ্চরিত্রের ভূষণ। প্রত্যেক আদর্শবান ব্যক্তির মধ্যেই এটি থাকা উচিত।

ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে একে অপরের সাথে চলাফেরার ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি ও সুবিচারের গুরুত্ব অপরিসীম। পার্থিব জীবনের সর্বত্র ইনসাফ বা

www.amarboi.org

ন্যায়-নীতি বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। ন্যায়পরায়ণতার ধারণাটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তঃরাষ্ট্রীয় এককথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি জীবনে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার এমন একটি ব্যাপক চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য যে তা ব্যতিরেকে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় থাকতে পারে না। যেহেতু সুবিচার বা ন্যায়-নীতি ব্যক্তি ও সমাজ এবং রাষ্ট্রের সার্বিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত তাই পবিত্র কুরআন ও হাদিসে এর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার কায়েমের তাকিদ দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

"নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।" (সূরা আল হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৫)

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبٰى.

"এবং যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায্য বলবে, স্বজনের সম্পর্কে হলেও।" (সূরা আল আন'আম, ০৬ ঃ ১৫২)

وَاَقْسِطُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"আর তোমরা ইনসাফ করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন।" (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ ঃ ০৯)

বিচার ব্যবস্থায় ইনসাফের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ অত্যাচারিত হলে বিচারের দ্বারস্থ হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, উঁচু-নিচু নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায় বিচার করা বিচারকের দায়িত্ব। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ.

"তোমরা যখন মানুষের বিচার করবে, তখন তোমরা ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ৫৮)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

www.amarboi.org

"আর যখন তুমি বিচার করবে, তখন লোকদের মাঝে ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকারীদের পছন্দ করেন।" (সূরা আল মায়িদা, ০৫ ঃ ৪২)

ন্যায়নীতি ও সত্যবিমুখ হওয়া ঈমানের পরিপন্থী এবং মানব চরিত্রের চরম অধঃপতন। যে সমাজে ও রাষ্ট্রে ইনসাফ-ন্যায়নীতি নেই, সেটাকে কখনো সভ্য সমাজ ও রাষ্ট্র বলা চলে না। ব্যক্তি জীবনে নিজের অধিকার সংরক্ষণ করার সাথে সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের মধ্যে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিরা পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কর্মজীবন ও পেশাগত জীবন নির্বাহ করে। কাজেই কারো প্রতি যাতে বে-ইনসাফী না হয় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। জাতীয় জীবনেও ইনসাফ-ন্যায়নীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন মানুষের জীবনের সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার যিম্মাদারী শাসক শ্রেণীর হাতে থাকে। দেশের শাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থায় যদি ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়, তবে জাতীয় জীবনে অশান্তি, বিশৃংখলা, সন্ত্রাস ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেবেই। সুতরাং জাতীয় জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। অন্যথায় আল্লাহর আদালতে জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা সবার জন্যই ন্যায়ের মানদণ্ড সঠিক রাখতে হবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে কঠোর নির্দেশ বিদ্যমান ঃ

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ.

"এবং আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে।" (সূরা আন নূর, ২৪ ঃ ০২)

ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ন্যায়পরায়ণ শাসক চাই, বিচারকার্যের জন্য ন্যায়পরায়ণ বিচারক চাই। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَقْرَبُ هُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ عَادِلٌ

وَاِنَّ اَبْغَضَ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَشَدَّ هُمْ عَذَابًا اِمَامٌ جَائِرٌ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত লোক হবে ন্যায়পরায়ণ শাসক। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র নিকট কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ঘৃণিত ও কঠিন শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি হবে অত্যাচারী শাসক।" (তিরমিযী শরীফ)

www.amarboi.org

ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুতি একটি জাতিকে ধ্বংস করে দেয়। ন্যায়বিচার ব্যতীত কোন দিনই সভ্য ও সুশীল সমাজ, রাষ্ট্র ও বিচার ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না।

পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি সবার ব্যাপারে ন্যায়-নীতি ও সুবিচার প্রযোজ্য। অর্থাৎ যার যা হক বা অধিকার রয়েছে তা পূর্ণাঙ্গ বা পরিপূর্ণভাবে আদায় করাও ন্যায়পরায়ণতার মধ্যে শামিল।

সৃষ্টির সেবা

সৃষ্টির সেবা হলো আল্লাহকে নিজের প্রতি রাজি খুশি করার সহজ উপায়। বস্তুত ইল্‌ম ও বক্তৃতার দ্বারা মানুষের মস্তিষ্ককে বশীভূত করা যায়। কিন্তু মানুষের অন্তরকে তেমন কোনো প্রভাবিত করা যায় না। মানুষের অন্তর প্রভাবিত হয় সেবা ও খিদমতের দ্বারা। এই সেবা বা খিদমত দুইভাবে করা যায় ঃ ০১. আত্মিক ও ০২. বৈষয়িক। বৈষয়িক সেবার তুলনায় আত্মিক সেবার বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে কুরআন ও হাদিসে আত্মিক সেবার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বৈষয়িক খিদমতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ج وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোর মধ্যে কোনো পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশ্‌তাগণ, কিতাবসমূহ এবং নবীগণের উপর ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ্‌র মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থসংকটে, দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং তারাই আদর্শ মানুষ।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৭৭)

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) ছিলেন জনসেবা এবং খিদমতের মূর্তপ্রতীক।

www.amarboi.org

সেবার এ গুণটি তাঁর মধ্যে নবুওয়াত প্রাপ্তির আগেও বিদ্যমান ছিলো। প্রথম ওহী প্রাপ্ত হয়ে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং এ ঘটনা হযরত খাদীজাতুল কুব্‌রা (রা.)-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন খাদীজাতুল কুবরা নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা নবী কারীম (সা.)-কে সান্ত্বনা দিলেন ঃ

كَلاَّ وَاللهِ لاَيُخْزِيْكَ اللهُ اَبْدًا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ وَتُعِيْنَ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

"আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আল্লাহ্ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়ের প্রতি সদাচার করেন। অসহায় ব্যক্তির বোঝা বহন করেন, নিঃস্ব-ব্যক্তির অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করে দেন; মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি সহায়তা দান করেন।" (বুখারী শরীফ)

মূলকথা হলো, ইসলাম মানুষের সেবা ও খিদমতের জন্য; সমাজের উপকারের জন্য নিজের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। যাতে সমাজ থেকে অশান্তি ও অবজ্ঞা দূর হয়ে নেমে আসে সমাজ জীবনে শান্তির ফল্গুধারা। ইসলাম শুধু মানুষের সেবার প্রতিই উদ্বুদ্ধ করে না। বরং আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টির প্রতি সেবা দানের ব্যাপারেও অনুপ্রাণিত করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ.

"যারা অন্যের প্রতি দয়া করে, রহমান– অতি দয়াবান প্রভু তাদের প্রতি দয়া করেন। সুতরাং পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত সৃষ্টির প্রতি তোমরা রহম কর। তাহলে আকাশে অধিষ্ঠিত প্রভুও তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন।" (আবু দাউদ শরীফ ও তিরমিযী শরীফ)

অন্যের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা

সচ্চরিত্রের মধ্যে 'অন্যের প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা' বিষয়টি হচ্ছে অন্যতম। তাছাড়া দলীল প্রমাণ ব্যতিরেকে কোনো মুসলিমের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা হারাম। সাধারণ অবস্থায় অন্যের প্রতি ভাল ধারণা করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

"তোমরা কু-ধারণা পোষণ করা থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কেননা কু-ধারণা জঘন্যতম মিথ্যা।"

www.amarboi.org

অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

ظَنُّوْا بِالْمُؤْمِنِيْنَ خَيْرًا.

"মুমিনদের প্রতি তোমরা ভাল ধারণা পোষণ করবে।"

সু-ধারণা পোষণ করা প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوْا هٰذَا إِفْكٌ مُّبِيْنٌ.

"এই কথা শুনার পর মুমিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি, এতো স্পষ্ট অপবাদ।" (সূরা আন নূর, ২৪ ঃ ১২)

আনুগত্য

সচ্চরিত্রের একটি অন্যতম গুণ হচ্ছে আনুগত্য। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আজ মূল্যবোধ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে সমাজে বিশৃঙ্খলা। বাড়ছে মারামারি, খুন-খারাবি, রাহাজানি। নষ্ট হচ্ছে সমাজে আনুগত্যের ভারসাম্য। এটা আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর নাফরমানী। ফলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য লাভ করতে পারে না।

আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ.

"আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বশালীদের।" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ৫৯)

সমাজ ও রাষ্ট্র নামক যন্ত্রকে সুন্দর সচল রাখার লক্ষ্যে আজ প্রয়োজন শ্রেণীভেদে একে অপরের মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ সৃষ্টির বাস্তবায়নস্বরূপ আনুগত্য প্রদর্শন করা। আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসের যথার্থ জ্ঞান যাদের থাকে তারা কখনোই আনুগত্যের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শন করতে পারে না।

রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে, সে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং যে আমার নাফরমানী করে সে আল্লাহর নাফরমানী করে। আর যে আমার (অর্থাৎ রাসূল (সা.) নিযুক্ত অথবা তার আনুগত্যকারী) আমীরের আনুগত্য করে, সে আমার আনুগত্য করে এবং যে আমার আমীরের সাথে নাফরমানী করে সে আমার নাফরমানী করে।"

কাজেই আনুগত্য প্রদর্শন করা বা করার প্রতি মন-মানসিকতা নমনীয় রাখা

www.amarboi.org

সচ্চরিত্রের একটি নমুনা। তবে ইসলাম কখনো অন্ধ আনুগত্যের আদেশ দেননি। বরং ইসলাম সৎ কর্মের ক্ষেত্রে আনুগত্য চেয়েছে। সৎ কর্মের সীমার বাইরে ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে সুস্পষ্ট। আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"গুনাহ ও আল্লাহ নির্ধারিত সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে পরস্পরের সহযোগী হয়ো না।" (সূরা আল মায়িদা, ০৬ ঃ ০১)

কানায়াত বা অল্পে তুষ্ট থাকা

সৎ ও হালালভাবে উপার্জিত অর্থের বিনিময়ে যখন যতটুকু যোগান দেয়া সম্ভব তাই ভোগ করা সচ্চরিত্রের অন্যতম লক্ষণ। সম্পদের প্রাচুর্যতায় সম্পদকে হিফাযত করার জন্য সবাইকে ব্যস্ত হয়ে যেতে হয়। এভাবে মনের অজান্তেই সম্পদের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটতে শুরু করে মানুষ যা ইসলাম ধর্মে নিন্দনীয়। বরং অল্প সম্পদ ও জীবিকায় তুষ্ট থাকা প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইসলাম কবুল করলো এবং তাকে জীবন-যাপনের উপযোগী জীবিকা দান করা হলো, আর তাতে সন্তুষ্ট থাকার তৌফিক আল্লাহ তাকে দান করলেন; তবে সে সফলতা ও সৌভাগ্যের অধিকারী হলো।" (মুসলিম শরীফ)

عَنِ ابْنِ الْفَرَاسِيْ اَنَّ الْفَرَاسِيَ قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْئَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وَاِنْ كُنْتَ لاَبُدَّ فَسْئَلِ الصَّالِحِيْنَ.

ইবনে ফারাসী থেকে বর্ণিত। (তার পিতা) ফারাসী বলেছেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ওগো আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষের নিকট হাত পাতবো? নবী কারীম (সা.) বললেন না। যদি হাত পাতা তোমার জন্যে কখনো অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে নেককার লোকদের নিকট পাতবে।" (আবু দাউদ শরীফ)

www.amarboi.org

এ হাদিসে বিশেষ ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনে নেককারদের নিকট হাত পাতার অনুমতি এ জন্যে দেয়া হয়েছে যে তারা প্রতিদান চাইবে না এবং খোটা দিয়ে মনে কষ্ট দিবে না।

আসলে যতক্ষণ সম্ভব কোনো জিনিসের অভাব অনটনে সবর করা, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং কর্মে সক্ষম থাকা অবস্থায় যে কোনো হালাল কর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা করা উচিত। মানুষ কাজের চেষ্টা করলে একটা না একটা কাজ সে পাবেই। এটি ব্যবস্থা করে দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর নিজের। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا.

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকল প্রাণীর রিযিক দেয়া আল্লাহরই দায়িত্ব।" (সূরা হূদ, ১১ ঃ ০৬)

কাজেই যখন যা রিযিকে থাকে তখন তাই পাওয়া যাবে। হাবুডুবু করে দুনিয়ার পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরে অসচ্চরিত্রের দিকে ঝুঁকে যাওয়া কখনোই জ্ঞানীর কাজ হতে পারে না। বরং অল্পতে তুষ্ট থাকাই জ্ঞানীর কাজ।

ত্যাগ ও বদান্যতা

ত্যাগ করা মানে হলো নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে বেশি প্রাধান্য দেয়া। এটা একমাত্র আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর সন্তুষ্টির জন্যই হতে পারে। এটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। যেখানে আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে "আপনি বাঁচলে বাপের নাম"– সে সমাজে লোকজন নিজে না খেয়ে, না পরিধান করে বা সুফল ভোগ না করে অন্যকে কিছু দিয়ে দেয়া সত্যিই সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। একমাত্র সচ্চরিত্রবান মানুষরাই নিজেদের চেয়েও অন্যের প্রয়োজনকে বেশি অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

"আর তারা নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা নিজেরা অভুক্ত থাকে।" (সূরা আল হাশর, ৫৯ ঃ ০৯)।

বদান্যতা মানে দানশীলতা। এটি অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কোথাও কোথাও দেখা যায় ভিক্ষুক এসে হাত পাতলে বা কিছু সাহায্য চাইলে অনেকে এটাকে আপদ বা অশুভ কিছু মনে করে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। গাড়ির ভিতর থাকলে জানালার কাঁচ উঠিয়ে বন্ধ করে দেয়। ব্যবসা ও ব্যবসায়ী বলে অপবাদ দেয় বা চোখ রাঙ্গিয়ে ধমক দেয়ার চেষ্টা করে থাকে- যা দুঃখজনক। অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন ঃ

www.amarboi.org

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

"তাদের সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও ভিখারীর হক রয়েছে।" (সূরা আয যারিয়াত, ৫১ ঃ ১৯)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا.

"আহারের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা তা অভাবগ্রস্ত পিতৃহীন ও বন্দীকে দান করে।" (সূরা আদ দাহর, ৭৬ ঃ ০৮)

সুতরাং বলব, ত্যাগ ও বদান্যতার মানসিকতা সৃষ্টির জন্য আল্লাহর হক ও বান্দার হকের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। কৃপণতা বা বখীলী চেতনা থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণ ও কৃপণতার বিপরীত প্রেরণা লাভ করতে হবে এবং সুন্দর চরিত্রের প্রতি আকর্ষণবোধ সৃষ্টি করতে হবে। বাসায় ছেলে-মেয়েদেরকে সব সময় কয়েক টাকা অতিরিক্ত রাস্তায় ভিক্ষুক, ফকীর মিসকীনদেরকে দেখলে দেয়া এবং বিশেষ করে শুক্রবার, শবে কদর, মাহে রামাদান, জীবনে চলার পথে যে সমস্ত এলাকায় যাবে সেখানের মসজিদে নামায আদায় ও মসজিদের দান বাক্সে যা সম্ভব দান করে নির্মাণ কাজে সহযোগিতা করা, ঈদের সময় অভাবগ্রস্তদেরকে নিজেরা ত্যাগ করে হলেও দেয়ার মন-মানসিকতা সৃষ্টির প্রতি উৎসাহিত করাই হচ্ছে সচ্চরিত্রের শিক্ষা ও লক্ষণ।

উদারতা

উদারতা সংকীর্ণতার বিপরীত অবস্থান থেকে সৃষ্টি। ব্যক্তি স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে সার্বজনীন স্বার্থের চিন্তায় মনকে বিকশিত করাকে বলা হয় উদারতা। উদারতা সম্পন্ন মানুষ কখনো নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে না, নিজের আমিত্বকে দুমড়ে মুচড়ে সে শেষ করে দিতে চেষ্টা করে। যার ফলে ক্ষমা, দয়া, আত্মত্যাগ ও কারোর জন্য কিছু করার চিন্তা তাদের মাথায় আসে। এমন চরিত্রের ব্যক্তিরা সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য বহু অবদান রাখতে পারে। উদারতার সাথে সচ্চরিত্রের অনেক দিক জড়িত আছে। কাজেই যিনি উদার মন-মানসিকতার তাদের কাছে আত্মীয়-স্বজনরাও মূল্যায়িত হয়ে থাকে। তারা সব সময় সকলকে নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে। উদারতা প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন ঃ

عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ الْجُشَمِىْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَقْرِلِىْ وَلَمْ يُضِفْنِىْ ثُمَّ مَرَّبِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ اَاَقْرِيْهِ اَمْ اَجْزِيْهِ قَالَ بَلْ اِقْرِهٖ.

www.amarboi.org

আবুল আহওয়াস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (তাঁর পিতা) বলেন, "আমি রাসূলাল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে আরয করলাম। হে আল্লাহর রাসূল! আমি কোনো ব্যক্তির বাড়ির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলাম। কিন্তু সে আমার মেহমানদারীর হক আদায় করেনি। কিছুদিন পর সে আমার বাড়ির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করে। আমি কি তার মেহমানদারীর হক আদায় করবো, নাকি তাঁর (উপেক্ষার) প্রতিশোধ নিবো। এ ব্যাপারে আপনার মত কী? তিনি বললেন ঃ "বরঞ্চ তুমি তার মেহমানদারীর হক আদায় করো।"

শোকর বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে কোনো নিয়ামত প্রাপ্তিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করা, আর যে ব্যক্তি নিয়ামতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করবে, স্বাভাবিকভাবে তার ফলাফলস্বরূপ সে আল্লাহর প্রতি মনে মনে প্রফুল্ল হবে এবং সর্বাগ্রে সেই অনুগ্রহ দানকারী আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হবে, তার নির্দেশ পালনে তৎপর হবে এবং তার দেয়া নিয়ামতকে তাঁর নাফরমানীর কাজে লাগাবে না। এটাকেই বলা হয় শোকর বা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা।

যেকোন সফলতা প্রাপ্তিকে আল্লাহর নিয়ামত বা বিশেষ রহমত মনে করা এবং কখনো কোনো বিফলতা বা ব্যর্থতায় চিন্তা-ভাবনা করা, আবার চেষ্টা করা এবং আল্লাহকে তাড়িত না করা, সচ্চরিত্রবান মুমিন ব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ। বরং এ ব্যর্থতায়ও কল্যাণ থাকতে পারে সে জন্য আল্লাহর কাছে শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নতশিরে বলা– "আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন" তাহলে আল্লাহ খুশী হবেন। কেননা এ পৃথিবীতে আমাদের আগমন এটিইতো আল্লাহর করুণা। তারপরে তো আরো কত কিছু দিয়েছেন। যদিও মানুষ এতসব ভুলে আরো-আরো চাই বলে আল্লাহর হুকুম পালন থেকে দূরে সরে আসতে চায়। আসলে অবিবেচক, নিমকহারাম। তাছাড়া ধ্বংস যখন হাতছানি দিয়ে ডাকে তখন মানুষ আসল ফেলে নকলের ভুবনে লাফিয়ে পরবেই। নকলের সাথে চলতে চলতে যারা প্রকৃতই নকলের মতো হয়ে গেছে তারা তো আসল পেলেও তা ছেড়ে নকলের দিকে যাবে। কারণ হিদায়াত তো আল্লাহর হাতে।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُم مِّنْۢ بُطُوْنِ أُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

www.amarboi.org

"আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়– যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" (সূরা আন নাহল, ১৬ ঃ ৭৮)

অন্যত্র অকৃতজ্ঞ মানুষদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কঠোর শাস্তির ইঙ্গিত করে বলেন ঃ

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ.

"স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিবো আর অকৃতজ্ঞ হলেন অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।" (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ০৭)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَ مُوسٰى إِنْ تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ.

মূসা বলেছিল, "তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ।" (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ০৮)

কাজেই এ সম্পদ আমার। আমার এ আছে, সে আছে, সেটা আছে ইত্যাদি বলে অকৃতজ্ঞ আর আল্লাহকে ভুলে যাওয়া সত্যিই দুঃখজনক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পরিষ্কার ভাষায় বলেন ঃ

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَاتَكْفُرُوْنِ.

"সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হইও না।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ৫২)

মিতব্যয়ী হওয়া

সচ্চরিত্রের অন্যতম সৎ গুণাবলির দৃষ্টান্ত হলো সৎ কাজ করে আয় করবে, সৎ কাজে পরিমাণমত ব্যয় করবে। কখনোই সৎ পথে কঠোর কষ্টের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ কেউ বেশি বা আর্থিক কোনো কাজে ব্যয় করে না বরং তাদের ব্যয়ের একটা সীমা থাকে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

"তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে এবং কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।" (সূরা আল ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৭)

www.amarboi.org

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا.

"আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তাদের প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করবে না।" (সূরা বনী ইসরাইল, ১৭ ঃ ২৬)

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا.

"যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।" (সূরা বনী ইসরাইল, ১৭ ঃ ২৭)

আল্লাহ ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত পথে সম্পদ আয় করা এবং ব্যয় করার মধ্যেই রয়েছে মূলত কল্যাণ। অপব্যয় কখনো কল্যাণ ডেকে আনতে পারে না।

আত্মীয়দের বন্ধন রক্ষা করা

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন ঃ

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

"আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না।" (বুখারী শরীফ)

অন্যত্র সাদকা বা দান করা প্রসঙ্গে রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন ঃ

وَعَلٰى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

"নিকটাত্মীয়কে অর্থ দান করা হলে এক সঙ্গে দুটি কাজ হয়। একটি হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আর দ্বিতীয়টি হলো দান।"

রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে অভাবগ্রস্ত নিকটাত্মীয়কে দান করাই ব্যক্তির সর্বপ্রথম কর্তব্য। অভাবগ্রস্ত নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে দূরবর্তী লোকদেরকে দান করা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়। কেননা তাতে আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রসঙ্গে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ـ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ.

"আল্লাহর ওয়াদা ও চুক্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হওয়ার পর যারা তা ভঙ্গ করে

www.amarboi.org

এবং আল্লাহ যা মিলিয়ে রাখার আদেশ করেছেন তা ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় এবং পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, তাদের জন্য অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ পরিণতি রয়েছে।" (সূরা আর রা'দ, ১৩ ঃ ২৫)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এত শক্তভাবে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষার জন্য বলেছেন– যা সত্যিই বিস্ময়কর।

কাজেই বলব আজকের দিনে লোকজনদের সঠিক কাজের চর্চা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গাফিল হওয়ার কারণে বি.এ, এম.এ. পাশ করে চাকুরীর সুবাদে ঢাকা তথা শহরে থেকে নিজেকে বহু কিছু মনে করে আত্মীয়দেরকে ভুলে যেতে চায়। এমন মূর্খ বা জ্ঞান পাপীদের বেশি বেশি করে আল কুরআনুল কারীম পড়তে বলা উচিত। কেননা

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى.

"আল্লাহ নিশ্চিতভাবে আদেশ করেছেন সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও কল্যাণময় ব্যবহার করার এবং নিকটাত্মীয়দের হক দিয়ে দেয়ার জন্য।" (সূরা আন নাহল, ১৬ ঃ ৯০)

এ আয়াত অনুসারে বলব, যদি লোকেরা আল কুরআনুল কারীম ও হাদিস অধ্যয়ন করতো তাহলে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন তো দূরের কথা বরং তাদের নিয়ে কোনো আপত্তি বা বিতর্কের অবকাশও পোষণ করতো না। আত্মীয়দের একে অপরের প্রতি হক রয়েছে। সে হক যথাযথভাবে আদায় না করলে আল্লাহর কাছে আসামীর কাতারে কাল হাশরের মাঠে দাঁড়াতে হবে। রাসূল (সা.) বলেন ঃ

عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرِو الْخُزَاعِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوْا وَمَا جَائِزَتُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ - متفق وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لَايَحِلُّ الْمُسْلِمِ اَنْ يُّقِيْمَ عِنْدَ اَخِيْهِ حَتّٰى يُؤْثِمَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ قَالَ يُقِيْمُ عِنْدَهُ وَلَاشَيْئَ لَهُ يَقْرِيْهِ بِهِ.

"আবু শুরাইহ খুয়াইলিদ ইবনে আমর আল-খুযাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে তার হক আদায় সহকারে। সাহাবারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ তার

www.amarboi.org

হক কী? তিনি বলেন ঃ একদিন ও একরাত (তাকে সমাদর ও যত্ন করবে)। মেহমানদারির সীমা হলো তিন দিন। এর চাইতে অতিরিক্ত করা দানস্বরূপ।"

আত্মীয়-স্বজন বাসায় বেড়াতে আসলে তাদের সাথে হাসি মুখে কুশলাদি বিনিময় এবং হাত মুখ ধৌত করে বাসায় যা আছে তৎক্ষণাৎ আপ্যায়ন শেষ করে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে তার প্রয়োজনটুকু জেনে নেয়া উচিত। তাদের সাথে হাসি মুখে সুন্দর করে না পেঁচিয়ে কথা বলা উচিত। আজকাল গ্রামের বাড়ি বা বাবার পক্ষের অনেক আত্মীয়রা দারিদ্র্যতার অভিযোগে ঢাকা বা শহরের বাসায় বেড়াতে এসে অবমূল্যায়িত হওয়ার বিষয়টি ঘটে থাকে খুব বেশি। অনেক ক্ষেত্রে চোখের পানি ফেলে তাদেরকে বিদায় নিতে হয়। বাসায় খাবার ঠিকমত পায় না, মুখ কালো ছাড়া কথা বলে না, গৃহকর্তা ও গৃহকর্তীর মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি হওয়া, ছেলে-মেয়েদের সাথে চোখ রাঙিয়ে কথা বলা, ভাল চাদর বিছিয়ে বিছানায় শুইতে না দেয়া, টয়লেট ব্যবহার করতে পারে না ইত্যাদি অভিযোগ করা। অবশ্য এটা সত্য তারা গ্রাম থেকে আসার কারণে, অশিক্ষা আর বয়সের ভাড়ে কিছুটা ভুল হতেই পারে। কিন্তু তাই বলে আত্মীয়দের সাথে দুর্ব্যবহার করা কোনভাবেই ইসলাম সমর্থন করে না। এটি অসচ্চরিত্রের লক্ষণ বা প্রতিচ্ছবি।

বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করা

বয়সে যারা বড় তাদের সালাম দেয়া, বিনয়ের সাথে নম্রভাবে ক্ষীণ স্বরে কথা বলা, আদব প্রদর্শন করা, তাদের বসতে দেয়া, তাদের কথার মাঝখানে ছোটরা কথা না বলা, তাদের সাথে কোনো কথা বলতে যেয়ে নিজের কথাকে প্রতিষ্ঠিত করার বৃথা চেষ্টা না করা, তাদের সাথে মুখ কালো করে কথা না বলা, মেজাজ গরম করে অহেতুক শব্দ সংযোজন ও অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট করে কথা না বলা; তাদের দেয় উপদেশ, আদেশ, নির্দেশ তথা নসীহত শরীয়াতসম্মত হলে মেনে চলা, পড়ার সময় বই পড়া, খেলার সময় খেলা এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা ছোটদের সচ্চরিত্রের লক্ষণ।

অন্যদিকে বড়রা ছোটদের আদর-স্নেহ, যত্ন-ভালবাসা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদানের মাধ্যমে আগামীদিনে দ্বন্দ্ব-কলহ ও কলুষমুক্ত সমাজ ও দেশ গঠন করার লক্ষ্যে পড়ালেখা করে আদর্শ ও সচ্চরিত্রবান মানুষ হওয়ার জন্যে উপযোগী ভূমি, পদ্ধতি ও পরিবেশের যোগান দেবে।

আজকের শিশুরাই আগামীদিনের আগন্তুক সন্তানদের প্রতিনিধি। কাজেই তাদেরকে সৎ-সুন্দর আদর্শ ও গঠনমূলক চিন্তাশীল, মুক্ত মনের অধিকারী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সচ্চরিত্রবান আদর্শ মানুষ তথা প্রধানদের বিকল্প নেই। যারা এর ব্যতিক্রম হবে তাদের জন্য রয়েছে রাসূল (সা.)-এর কঠোর বাণী।

www.amarboi.org

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا.

"যারা ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।" (বুখারী শরীফ)

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা

তাহারাত শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিচ্ছন্নতা। ইসলামী শরীয়াত মানুষের শরীরের সুস্থতা, সৌন্দর্য ও সজীবতার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। স্বাস্থ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখাসহ খাদ্য ও পানীয়'র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ইসলাম সচ্চরিত্রবান মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে গণনা করে। কেননা সচ্চরিত্রবান হওয়া, চিন্তা-চেতনা তার বাস্তবায়ন ও কর্মে পরিপূর্ণ একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা একটি পূর্বশর্ত। ইসলামে মানব দেহের যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আর শরীরকে পবিত্র রাখার জন্য কতগুলো নিয়ম ধার্য করে দিয়েছে। বিশেষ করে যেগুলো নামাযের পূর্বে আদায় করতে হয়। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসহ করবে দু'পা গিটসহ ধৌত করবে; যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ বাথরুম থেকে আগমন করে অথবা স্ত্রীর সাথে সংগত হয় এবং পানি না পায় তবে মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে। উহা মুখমণ্ডল ও হাতে মাসহ করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও

www.amarboi.org

তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।" (সূরা আল মায়িদা, ০৬ ঃ ০৬)

এ আয়াতে ইবাদতের পূর্বে ভালভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ হুকুম প্রদান করেছেন। আমাদের একটু খেয়ালীপনা বা খামখেয়ালী বা অসচেতনতা, অসতর্কতা বা প্রকৃত জ্ঞানের অভাবের কারণে আমরা নামায পড়ছি ঠিকই কিন্তু আমাদের নামাযের যে সুফল আমরা তা বাস্তবে পাচ্ছি না।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন ঃ

مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ.

"পবিত্রতা নামাযের চাবি।"

لَاتُقْبَلُ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ.

"পবিত্রতা ছাড়া কোন নামাযই কবুল হয় না।"

কাজেই বলব, যেকোন কাজের ক্ষেত্রেই আমাদেরকে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। শরীর ও মন সুস্থ না থাকলে কোন কাজেই মন স্থির হয় না, একাগ্রতা আসে না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে মনও হবে পূতঃপবিত্র। আল কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"অবশ্যই আল্লাহ তাওবাকারীদের এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২২২)

অন্যত্র মুহাম্মাদ (সা.) কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَاَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.

"হে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি (মুহাম্মাদ)! উঠুন এবং সতর্ক করুন। আপনার রবের মহত্ত্ব ঘোষণা করুন। নিজের পরিধানের কাপড় পবিত্র রাখুন।" (সূরা আল মুদ্দাসসির, ৭৪ ঃ ০১-০৪)

রাসূল (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ.

"আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। তিনি পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতাকে ভালবাসেন।"

اَلنَّظَافَةَ تَدْعُوْ اِلَى الْاِيْمَانَ وَالْاِيْمَانَ مَعَ صَاحِبِهٖ فِى الْجَنَّةِ.

www.amarboi.org

"পরিচ্ছন্নতা ঈমানের দিকে আহ্বান জানায়। ঈমান তার অধিকারীর সাথে জান্নাতে থাকবে।"

এ সমস্ত আয়াত ও হাদিস প্রমাণ করে যে, ইসলাম ইবাদতের পূর্বেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি দেয়। কেননা পবিত্রতা হচ্ছে সৌন্দর্যের মূল, প্রত্যেক সুন্দর দৃশ্যের ভিত্তি। আর দৈহিক সুস্থতা সৌন্দর্য ও আকর্ষণ হচ্ছে এমন বিষয়াদির অন্যতম। যার প্রতি ইসলাম দান করেছে বিশেষ গুরুত্ব আর যাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে তার মূল দাওয়াতের অংশ বিশেষরূপে। কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ না তার শরীরকে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করার ব্যাপারে সচেষ্ট হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ইসলামের মানদণ্ডের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ও সর্বদিকে সম্মানিত ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে না।

আধুনিক বিজ্ঞানও পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে এবং পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। বিশেষত রোগ প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভূমিকা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য চাই সুস্থ পরিবেশ। ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি আমাদের এই পরিবেশেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই বসত-বাড়ি, রাস্তাঘাট, খোলা মাঠ ইত্যাদি আবর্জনামুক্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

نَظِّفُوْا اَفْنِيَتِكُمْ.

"তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়ির আংগিনা পরিষ্কার রাখো।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন, "আল্লাহ তা'আলা পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন, তিনি পরিচ্ছন্ন এবং পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন, নিজে সুমহান এবং মহত্ত্বকে পছন্দ করেন এবং তিনি দানশীল, দানশীলতাকে পছন্দ করেন। কাজেই তোমরা (তোমাদের বাড়ির চত্বর) পরিচ্ছন্ন রাখবে।"

হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন :

اِتَّقُو الْمَلاَ عِنَ الثَّلٰثِ الْبَرَازَ فِىْ مَوَارِدِ الْمَاءِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ.

"তিনটি লা'নতযোগ্য কাজ; পানির ঘাটে, রাস্তায় এবং ছায়ার স্থানে পায়খানা করা থেকে বিরত থাকো।"

اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.

www.amarboi.org

"রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা (সদকার মতো নেকীর কাজ)।"

حَقُّ الطَّرِيْقِ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذٰى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ.

"রাস্তার হক হলো চোখের দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, সালামের জবাব দেয়া, ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা।"

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ اَوْسَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَدْنٰهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَاَرْفَعُهَا قَوْلُ لَآاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

"ঈমানের ষাট অথবা সত্তরের অধিক শাখা আছে। এর নিম্নতম শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা এবং সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা।"

مَنْ اَذٰى الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ.

"যে ব্যক্তি লোকদেরকে তাদের চলার পথে কষ্ট দেয়, তার জন্য তাদের অভিশাপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।"

রাস্তার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সু-সভ্যতার প্রমাণ। রাস্তায় এবং জনসাধারণের বিশ্রামের স্থানে থুথু ফেলা ইসলামী সভ্যতার পরিপন্থী।

নবী কারীম (সা.) আরও বলেন, "আমার নিকট আমার উম্মতের ভাল-মন্দ সকল আমলের ফিরিস্তি পেশ করা হয়েছিল। আমি ভাল কাজসমূহের তালিকার মধ্যে রাস্তা থেকে অপসারিত কষ্টকর বস্তুকেও দেখতে পেয়েছি এবং মন্দ কাজসমূহের তালিকার মধ্যে দেখতে পেয়েছি মসজিদে নাকের ময়লা নিক্ষেপ করা যা সেখান থেকে মুছে ফেলা না হয়।"

বর্তমানকালে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। আমরা মুসলিম হিসেবে ইসলামের উপরোক্ত নির্দেশনার আলোকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতাকে যদি মেনে চলি তাহলে রোগব্যাধি ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকতে পারি।

পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা

সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের জন্য পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা বাঞ্ছনীয়। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

"তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করবে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৩১)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.

"(হে নবী) আপনার পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখুন।" (সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ ঃ ০৪)

সচ্চরিত্রবান আদর্শ ছেলে-মেয়েরা পোশাক-পরিচ্ছদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি আরেকটি বিষয় খুব খেয়াল রাখবে। সেটি হলো–

ছেলেরা কখনো রেশমী কাপড়ের শার্ট বা পাঞ্জাবী পরিধান করবে না। এটি পুরুষের জন্য হারাম। আদর্শ পরিবারের সন্তানেরা কখনো হাফ প্যান্ট (হারাম) থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট, নয়/ছয় পকেট ওয়ালা প্যান্ট, জিন্সের প্যান্ট পরিধান না করাই উত্তম। কারণ, পোশাক-পরিচ্ছদেও মানুষের সুন্দর মনের এবং সচ্চরিত্রের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে।

তেমনি মেয়েরা এমন কোনো পোশাক পরিধান করবে না; যা ছেলেদের মতো দেখায়। অনেক সময় ছেলে-মেয়েদের, মেয়ে-ছেলেদের পোশাক পরিধান করতে দেখা যায়– যা উভয়ের ক্ষেত্রেই আদর্শের বিপরীত। এ ব্যাপারে সচ্চরিত্রবান মানুষ মাত্রই হবে সচেতন ও যত্নশীল।

যেখানে সেখানে পেশাব পায়খানা না করা

যেখানে সেখানে, স্থির পানি বা বদ্ধ জলাশয় যেমন পুকুরে প্রস্রাব পায়খানা করা একেবারেই অনুচিত। কোনো বদ্ধ জলাশয়ে প্রস্রাব পায়খানা করলে তাতে রোগ জীবাণু জন্ম নেয়। ফলে সেই পানি গোসলের সময় ও অযুর সময় মুখে, নাকে, চোখে প্রবেশ করে নাক, মুখ, চোখ, খাদ্যনালী ও শ্বাসনালীতে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করতে পারে। চর্মে বিভিন্ন ধরনের এ্যালার্জি রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

لَايَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّئِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ.

"এমন যেন না হয় যে, তোমাদের কেউ বদ্ধ পানিতে পেশাব করে ও তাতে গোসল করে।"

www.amarboi.org

لَايَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحِمِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ.

"তোমাদের কোনো ব্যক্তি যেন নিজের গোসলখানায় পেশাব করে অতঃপর সেখানেই গোসল না করে। দাঁড়িয়ে শক্ত মাটি বা পাথরের উপর পেশাব না করে।"

ইসলাম ধর্ম দাঁড়িয়ে কুকুরের ন্যায় পেশাব করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এছাড়াও পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হয়ে বা পেছন দিয়ে বসে পেশাব পায়খানা করা নিষিদ্ধ। শক্ত মাটি কিংবা পাথরের উপর পেশাব করা উচিত নয়। তাহলে পেশাবের ছিটা এসে শরীর ও পোশাকে লেগে নাপাক হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে গর্তেও পেশাব করা উচিত নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ইসলামে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এটি সকলের নিকট পছন্দনীয়। সচ্চরিত্রবান মানুষ মাত্রই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। কেউ তাদের শরীর ও মুখ থেকে কোনো দুর্গন্ধ পাবে না। হাতের নখে কোনো ময়লা দেখবে না, পারত পক্ষে ময়লা কাপড় পরিধান করবে না। পেশাব পায়খানা করে টয়লেট পেপার বা ছোট কাপড়ের টুকরা, মাটির টুকরা বা পানি শুষে নেয় এমন কিছু ব্যবহার করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা মুসলিমদের জন্য আবশ্যক।

আচার-ব্যর্বহার ও আদব-কায়দা

আচার-ব্যবহার ও আদব-কায়দা হচ্ছে মানুষের একটি অন্যতম গুণ। এ পৃথিবীতে যত আদর্শ প্রচারিত হয়েছে তা সবই সুন্দর কথা, আচার-ব্যবহার ও আদব-কায়দার মধ্য দিয়ে হয়েছে। অসুন্দর কথা ও খারাপ আচার-ব্যবহার দিয়ে বা আদবের বহির্ভূত কোনো নীতি দিয়ে পৃথিবীতে কোনো আদর্শ প্রচারিত হয়নি। আর প্রচারিত হলে তা প্রতিষ্ঠিতও হতে পারত না। কাজেই একটি সুখী, সুন্দর পরিবার বা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়তে প্রত্যেক মানুষের এ গুণ অর্জন, চর্চা ও জীবনে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। এ গুণের বাস্তবায়নে তেমন কষ্ট হয় না। মূলতঃ একটু সৎ ইচ্ছাই যথেষ্ট। অপরপক্ষে এর উপর নির্ভর করে পুরো পরিবারের সকল সদস্য তথা বংশের পরিচয় (প্রচলিত প্রবাদ "ব্যবহারে বংশের পরিচয়")। আচার আচরণ মানবতার অংশ হিসেবে জন্মলাভ করেছে। মানুষের অন্তরের সুখ-শান্তি, আনন্দ ও হর্ষ বিষাদের ক্ষেত্রে আচার-ব্যবহার ও আদব কায়দা যে কত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে তা সচ্চরিত্রবান মানুষ মাত্রই অজানা নয়। এ বিশ্বকে আদর্শিক গতিময়তার দিকে পরিচালিত করার মতো যত শক্তি রয়েছে তন্মধ্যে উন্নত আচার-আচরণ অন্যতম। আর আদব-কায়দা হচ্ছে মানুষের স্বভাবেরই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। মানুষ যখন সচ্চরিত্রে উন্নীত হয় তখন তাদের মধ্যে আদব-কায়দাও পরিলক্ষিত হয়।

www.amarboi.org

এখন প্রশ্ন আসতে পারে আদব কী?

রাসূল (সা.) উপস্থিত সাহাবাদের যখন নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতেন তখন সাহাবারা একে অপরের দিকে তাকাতেন এবং জবাব না জানলে বলতেন আল্লাহর রাসূলই (সা.) ভাল জানেন। আরেকবার রাসূল (সা.) উপস্থিত সাহাবাদের একটি প্রশ্ন করলেন। হে সাহাবারা কোন্ গাছের পাতা ঝরে না? সাহাবারা সবাই উত্তর খুঁজতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কেউ ভাবছেন আফ্রিকার জঙ্গলে, আরবের মরুভূমিতে বা বিশ্বের অন্য কোথাও এমন কোনো গাছ আছে কিনা যেটি হবে সঠিক উত্তর। এ মজলিসে উমর ফারুক (রা.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ বিন উমর উপস্থিত ছিলেন। সে বলল, আমি প্রশ্নের উত্তরটি জানি কিন্তু জবাব দিবো না। কারণ এখানে আমার বাবারও বেশি বয়স্ক ও মুরব্বী সাহাবারা বসে আছেন। আমি জবাব দিলে উনারা লজ্জিত হবেন। এই যে উত্তর জেনেও চুপ করে বসে থাকা, বড়দের প্রতি সম্মান, বাবার প্রতি সম্মান এবং বাবার সাথী বা বন্ধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এটি হচ্ছে উত্তম আদব।

কাজেই বলব, যেসব লোক জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন, মর্যাদা ও সম্মানের প্রতিটি ব্যাপারে তাঁরা তাদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন; জনগণ এসব লোকের প্রতি আস্থাশীল এবং তাদের পূর্ণাঙ্গ রূপের অনুকরণ করে থাকে। কেননা মানুষ বিশ্বাস করে যে এসব লোক দুনিয়াবী সর্ববিধ গুণের অধিকারী এবং এসব লোকেরাই তাদের জীবনটাকে বাসোপযোগী করেছে। যদি বংশানুক্রমিক জন্মগত বৈশিষ্ট্য মানুষের মনোযোগ ও প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়, তাহলে উত্তম আচার-আচরণও সকল ভদ্র আচরণকারী মানুষের সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করবে। এটি এজন্য যে, প্রথমোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে জন্মগত আর শেষোক্ত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপার্জিত কর্মফল ও চিন্তা শক্তি প্রসূত। এটা হচ্ছে আমাদের বিচার শক্তি যা আমাদের উপর রাজত্ব করে এবং সমগ্র জীবনব্যাপী আমাদের কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকে।"

"যারা জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব ও উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেছেন, তাঁরা উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে মানবতার পথ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তারা মানুষকে নৈতিকতা ও ধর্মের পথে সঠিক পথ নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কোনো জাতি যত রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাই ভোগ করুক না কেন তাদের আচার-আচরণের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তারা উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে না, কোনো জাতি সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার পথে অগ্রসর হতে পারবে না, কোনো জাতিকে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্য বিরাট এলাকার অধিকারী হওয়া অত্যাবশ্যক নয়, কেননা বিপুল জনসংখ্যা ও বিরাট ভূ-খণ্ডের অধিকারী

www.amarboi.org

হওয়া সত্ত্বেও অনেক জাতির মধ্যে উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপযোগী সমস্ত কোন অত্যাবশ্যকীয় গুণবৈশিষ্ট্যের অভাব থেকে যায়। এভাবে একটি জাতির নৈতিকতা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে সে জাতি শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে।"

একদিন হযরত আলী (রা.) প্রিয় নবী (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনার সাধারণ আচার-ব্যবহার কোন নীতিগুলো দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে? প্রিয়নবী (সা.) বললেন ঃ "জ্ঞান আমার সম্পদ, যুক্তি আমার ধর্মের ভিত্তি, ভালবাসা আমার বুনিয়াদ, ইচ্ছা আমার চালিকা শক্তি, আল্লাহ্র স্মরণ আমার নিত্য সহচর, বিশ্বাস আমার পুঁজি, উৎকণ্ঠা আমার সাথী, বিজ্ঞান আমার শক্তি, সবর আমার আবরণ, পরিতৃপ্তি আমার অমূল্য সম্পদ, সংযম আমার অহংকার, আরাম-আয়েশ পরিহার করাই আমার কাজ, বিশ্বাসের দৃঢ়তা আমার পাথেয়, আনুগত্য আমার পরিতৃপ্তি, জিহাদ আমার জীবনের বৈশিষ্ট্য, ইবাদত আমার অন্তরের আলো।

এমতাবস্থায় একটি আদর্শ সমাজ নির্মাণে এর প্রভাব

সুন্দর আচার-ব্যবহার ও আদব-কায়দায় যে পজিটিভ প্রভাব পড়ে তা হলো ঃ

০১. মানুষের মনোকষ্ট দূর হয়।
০২. মানুষের হতাশা, নিরাশা, দুশ্চিন্তা দূর হয়।
০৩. মন খুশি হয়, সন্তুষ্ট হয়, তৃপ্ত হয়। একে অপরের সাথে দূরত্ব কমে যায়।
০৪. মন সচেতন হয়, বিবেক জাগ্রত হয়।
০৫. আবেগ, উৎসাহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।
০৬. মানুষের রাগ কমে যায়, গোস্বা দমে যায়।
০৭. শত্রুতা কেটে যায়, জিঘাংসা দূর হয়।
০৮. বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, শত্রু বন্ধু হয়ে যায়।
০৯. সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়, সৌহার্দ্য গড়ে উঠে।
১০. ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিনয় ভাব সৃষ্টি হয়।
১১. পরিবার ও সমাজে স্নেহ ভালবাসার সৃষ্টি হয়।
১২. মানুষের মধ্যে ঐক্য ও একতার বন্ধন গড়ে উঠে।
১৩. রাগারাগি, মারামারি; হানাহানি মিটে যায়।
১৪. একে অন্যের প্রতি প্রভাব ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।
১৫. পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

সুন্দর সকলের পছন্দীয়। আচার-ব্যবহার ও আদব-কায়দা যে কোনো মানুষের জন্য একটি মহামূল্যবান সম্পদ। কাজেই এটি একদিনে আত্মস্থ করা

www.amarboi.org

সম্ভব নয়। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ। আমাদের প্রিয় নবী রাসূল (সা.) সুন্দর আচার-ব্যবহার ও আদব-কায়দার মাধ্যমেই জয় করেছিলেন মানুষের মন, প্রচার করেছিলেন ইসলাম ধর্ম, এনেছিলেন তৎকালীন সময়ে সকলকে একই পতাকাতলে।

দেশপ্রেম

দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ এবং পরোপকার। আর এই কল্যাণ চিন্তা থেকেই উদ্রেক ঘটে প্রেম-ভালবাসা, মায়া-মমতা। যা নানারূপে বিকশিত হয়ে জগৎ সংসারকে করেছে মধুময়, উপভোগ্য। আর এ প্রেমেরই একটি অনন্য রূপ দেশপ্রেম। জন্মভূমির প্রতি, মাতৃভূমির প্রতি, শৈশবের লীলাভূমির প্রতি মানুষের এই প্রেম শাশ্বত, সহজাত, স্বভাবজাত, অপার করুণাময় আল্লাহ্ প্রদত্ত রাহমাতুল্লীল আল আমীন প্রদর্শিত মানবতার ধর্ম স্বভাব ধর্ম ইসলামেও তাই জয়গান গাওয়া হয়েছে এই দেশপ্রেমের।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে যখন মক্কার লোকেরা অত্যাচার এবং হত্যার পরিকল্পনা করে তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশে মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় অশ্রুসজল নয়নে ফিরে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন ঃ "হে আমার প্রিয় জন্মভূমি মক্কা 'দুনিয়ার জনপদগুলোর মধ্যে তুমিই আমার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং আমিও তোমাকে আল্লাহর জমিনের অন্যান্য স্থানের তুলনায় সবচেয়ে বেশি ভালবাসি।' ইসলামের দুশমনেরা যদি আমাকে বাধ্য না করত তাহলে আমি কখনোই তোমাকে ত্যাগ করতাম না।" (তিরমিযী শরীফ)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতে যাবার প্রাক্কালে এই উক্তির মধ্যে দেশপ্রেমের মহিমা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার হাবিবকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন ঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ.

"(হে রাসূল) আপনাকে ওরা আপনার যে জনপদ থেকে বের করে দিলো, তার চেয়ে অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিলো আমি সেগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছি; অনন্তর তাদের সাহায্য করবার কেউ ছিলো না।" (সূরা মুহাম্মাদ, ১৪ ঃ ১৩)

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য তৎপর হওয়া, দেশের মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা দেশপ্রেমের অন্তর্গত। ইসলাম

www.amarboi.org

এ বিষয়গুলোর উপর জোড় তাকিদ দিয়েছে। ফলে আমাদের নবী মদীনায় হিযরত করে এসে গড়ে তোলেন এক আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্র। মদীনা রাষ্ট্রের জন্য তিনি প্রণয়ন করলেন এক যুগান্তকারী সংবিধান যা "মদীনার সনদ" নামে পরিচিত।

এ সনদের প্রত্যেক পরতে পরতে দেশপ্রেমের শক্তিশালী অনুপ্রেরণা অনুরণিত হয়েছে। এতে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণের শেকড় উৎপাটিত করে ইনসাফ, আদল এবং সৌভ্রাতৃত্বের নীতিমালা প্রদান করেছে। সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতিকে ইসলামে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সকল প্রকার সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপকে ইসলামে নিষিদ্ধ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ قَالُوْا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ.

"পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১১)

আরো ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৮৮)

যারা খাদ্য, তৈল ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী মওজুদ করে কৃত্রিম বাজার সংকট সৃষ্টি করার মাধ্যমে দেশের মানুষকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয় এবং নিজেরা মুনাফার পাহাড় নির্মাণ করে; তারা মানবতার দুশমন, তারা দেশের দুশমন। হাদিস শরীফে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ "যে মজুদদার সে পাপী, শস্য আনয়নকারী ভাগ্যবান এবং মজুদদার অভিশপ্ত।" ইসলামে দেশপ্রেমের যে শিক্ষা রয়েছে তা মানবিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করে। ইসলামে দেশপ্রেম সত্যিকার মানবতার প্রেমে উদ্ভাসিত।

অন্যদিকে, দেশপ্রেমের একটি বিকৃত রূপ হলো তীব্র জাতীয়তাবাদ। অতি ভক্তি থেকে সৃষ্ট এই জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ "অভিশাপ তার উপর যে জাতীয়তাবাদের দিকে মানুষকে ডাকে, তার জন্য সংগ্রাম করে ও মরে।" তা ছাড়া অতি ভক্তি করে দেশকে আল্লাহর চেয়েও বেশি ভক্তি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। যেমন– 'ও আমার দেশের মাটি ... তোমার তরে ঠেকাই মাথা।' মাথা ঠেকানোর এই রীতি ইসলামে শিরক হিসেবে পরিত্যাজ্য।

www.amarboi.org

কাজেই বলব, সচ্চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দেশপ্রেম। কেননা ইসলাম শুধু দেশপ্রেমকে স্বীকৃতিই দেয়নি বরং একে মুমিন জীবনের সামগ্রিক ইবাদতের সাথে একাকার করে দিয়েছে। তাই আমাদের ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ভালবাসতে হবে। সেই সাথে উদ্বুদ্ধ হতে হবে বিশ্বপ্রেমে।

অসাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবোধ

সচ্চরিত্রবান মানুষ কখনো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ বা বিচ্ছেদে অংশগ্রহণ করতে যায় না বা যেতে পারে না। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও মুসলিম জনগোষ্ঠী সকলেই মানুষ। এক স্রষ্টার সৃষ্টি। যে যেখানে জন্মগ্রহণ করেছে, সেখানে রয়েছে তার অধিকার। এ থেকে বঞ্চিত করা বা ন্যায়-অন্যায় বিচার বিশ্লেষণ না করে নিজ গোত্র, বংশ, এলাকা ও জাতির যে কোনো বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব এবং সাহায্য সহানুভূতি করাকে আধুনিক পরিভাষায় সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবোধ বলে। কিন্তু ইসলাম এবং এ ধর্মের অনুসারীরা কখনোই এমন সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন করে না। সাম্প্রদায়িকতার পরিধি আজকাল ব্যাপক। যেমন ঃ ০১. বংশীয় সাম্প্রদায়িকতা ০২. জাতীয় সাম্প্রদায়িকতা, ০৩. বর্ণ ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, ০৪. ভাষা ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, ০৫. অঞ্চল ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, ০৬. ধর্ম ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, ০৭. দল ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা।

ইসলামী শরীয়াত এ ব্যাপারে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয় এবং যে আদর্শ ও নীতিমালা গ্রহণ করে, তা হলো– ন্যায়-ইনসাফের প্রতিষ্ঠা এবং যুলুম অত্যাচার ও অন্যায়ের নিরসন। সুতরাং ন্যায় ও ইনসাফের খাতিরে নিজ বংশ, গোত্র, জাত ও এলাকার লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকা এবং উহার জন্য সংগ্রাম করাকে ইসলাম সমর্থন করে এবং ইহা পুণ্য ও সাওয়াবের কাজ।

পক্ষান্তরে অন্যায়, অবিচার ও যুলুমের সহায়তাকে ইসলাম নিন্দা জানায় এবং ইহা পাপের কাজ। মোটকথা যুলুমের ক্ষেত্রে কোনো লোক তার জাতিকে সাহায্য করা জায়িয নেই। কিন্তু জাতির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্তে পারস্পরিক সাহায্য-সহানুভূতি করা কোনক্রমেই আছাবিয়্যাত বা সাম্প্রাদায়িকতা নয়। বরং অন্যায়ের সহানুভূতি করাকেই সাম্প্রদায়িকতা বলা হয়। চাই উপরে বর্ণিত যে কোনো প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা হোক না কেন?

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর কতিপয় কাফির, মুশরিক এবং কিছু নামধারী মুসলিমের ধারণা যে, মুসলিম পরম ধর্ম বিদ্বেষী ও সাম্প্রদায়িক শুধু নয়, সন্ত্রাসীও বটে। তাদের এই ধারণা ও বক্তব্য অযৌক্তিক এবং অবাস্তব।

www.amarboi.org

কেননা একজন মুক্ত বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি, তিনি যে ধর্মেরই হোন, স্বীকার করতে বাধ্য যে, ইসলাম আদৌ সাম্প্রাদায়িক নয় এবং সন্ত্রাস তো ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, একেবারে হারাম। আর পরধর্ম বিদ্বেষ বা ভিন্ন ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা বলতে যা বুঝায়, তার কোনো অস্তিত্বই ইসলামে নেই। যা আছে তা হলো, ইসলাম সর্বমানবের জন্য সর্বকালোপযোগী সর্বাধিক কল্যাণের একমাত্র জীবন বিধান, আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র বিশ্বজনীন ধর্ম।

সেহেতু এই নির্ভুল কল্যাণ বার্তা সকলের কাছে পৌছে দেয়া মুসলিমের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি নেই; অব্যাহতি গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। কারণ এটা আল্লাহ পাকের হুকুম এবং মহানবী (সা.)-এর উত্তরাধিকার। ইসলামের মূল পরিচয় ও চালিকা শক্তি হলো দু'টি। প্রথমটি ঃ আল কুরআনুল কারীম ও দ্বিতীয়টি ঃ রাসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শ। আর ইসলামের প্রকৃত ব্যবহারিক নমুনা কী ও কেমন? তার শাশ্বত অভিজ্ঞান হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমদের পূত-পবিত্র জীবন। ঘোরতর শত্রুও স্বীকার করবে, এসবের কোথাও কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার নাম-গন্ধ নেই। বরং যা আছে, আধুনিক সাম্প্রদায়িক উদারতাপ্রেমী পৃথিবী তা দেখে হতবাক হবার কথা।

তায়েফ থেকে কী অমানুষিক নির্যাতনের উপহার রক্তাক্ত শরীর মোবারক নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু একটিও কি অভিসম্পাত উচ্চারিত হয়েছে তাঁর অন্তর ও যবান মোবারক থেকে? না, হয়নি।

মাদানী জীবনে ৮৩টি যুদ্ধ হয়েছে; সব যুদ্ধে বিজয়ী এই সেনা নায়ক মহানবী (সা.) একটিবারও কি কণা মাত্র উল্লাস প্রকাশ করেছেন? করেননি। মক্কা বিজয়ের সেই চূড়ান্ত দিবসে, যেদিন মক্কাবাসীরা প্রাণ ভয়ে সন্ত্রস্ত, মহানবী (সা.) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। তিনি সুনির্দিষ্ট অপরাধে কতিপয় কুখ্যাত অপরাধীর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সাধারণ ক্ষমার আওতা বহির্ভূত বলে কাফির মুশরিকদের জন্য তিনি কি কোনো আলাদা ফয়সালা দিয়েছিলেন? দেননি। শুধু কী তাই, দশ বছরের প্রায় নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধে অমুসলিম নিহতদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে মাত্র ৮৫৯। এসব থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, কারো বিরুদ্ধে কোনো আক্রোশ নয়, অসূয়া নয়, শুধু আল্লাহর প্রেরিত দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ইসলাম।

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঃ হযরত উমর (রা.)-এর শাসনকাল

মিশরের গভর্ণর তখন হযরত আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহ তা'আলা আনহু। নিতান্তই ভুলক্রমে কোনো একজন মুসলিম সৈনিকের শরাঘাতে গির্জায় রক্ষিত

www.amarboi.org

একটি মূর্তির নাক ভেঙ্গে গিয়েছিল। খ্রিস্টানদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সব অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে গভর্ণর স্বয়ং তাঁর নাসিকা কর্তনের জন্য তুলে ধরেছিলেন পাদ্রীর সামনে। পরে অবশ্য, যাঁর দ্বারা অসাবধানতাবশত এই কর্মটি সংঘটিত হয়েছিল, তিনি নিজেই সংগে সংগে এগিয়ে এসেছিলেন। খ্রিস্টানরা হতবাক।

ইসলামে ইনসাফ আসলেই এত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে মুসলিম-অমুসলিমের জন্য আলাদা কোনো মানদণ্ড নেই। জেরুজালেম নগরীর চাবি গ্রহণের জন্য খ্রিস্টানদের অনুরোধক্রমে খলিফা হযরত উমর (রা.)-কে যেতে হয়েছিল। তিনি খ্রিস্টানদের দু'একটি গির্জাও পরিদর্শন করেন। একজন পাদ্রীর অনুরোধ রক্ষার্থে গির্জা সংলগ্ন অপর একটি নিকটবর্তী স্থানে দু'রাকাত নামায আদায় করার পর পাদ্রীকে বললেন, "আমি গির্জার মধ্যেই নামায পড়তে পারতাম, কিন্তু এই ঘটনাকে সামনে রেখে ভবিষ্যতে মুসলিমরা কোনদিন এই গির্জাকে মসজিদে পরিণত করে ফেলতে পারে। শুধু এই আশঙ্কায় পড়িনি।"

হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে এই প্রসিদ্ধ ঘটনায় এ কথাও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে আছে যে, স্বয়ং খলিফা সিরিয়া জেরুজালেম সফরকালে সওয়ারীতে সওয়ার হওয়ার পালা ক্রীতদাসের ও নিজের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন যে, যখন তিনি আরোহণ করতেন তখন ক্রীতদাস লাগাম ধরে সামনে চলতো, আবার যখন ক্রীতদাস আরোহণ করতেন তখন খলিফা উমর ফারুক রাদিআল্লাহ আনহু নিজেই উষ্ট্রের লাগাম ধরে সামনে চলতেন। পথ চলতে জলাশয় অতিক্রম করতে হবে বলে হযরত উমর নিজেই লাগাম ধরে জলাশয়ে অবতরণ করলেন এবং জুতা খুলে বগলে রাখলেন। যখন তিনি সিরিয়ার নিকটবর্তী হলেন তখন তথাকার গভর্ণর হযরত আবু ওবায়দা রাদিআল্লাহু আনহু শহরের বাহিরে এসে হযরত উমর (রা.) জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ঘটনাচক্রে তখন বণ্টন অনুযায়ী ক্রীতদাস উষ্ট্রের উপর আরোহিত অবস্থায়, আর স্বয়ং খলিফা উমর রাদিআল্লাহু আনহু লাগাম হাতে চলছেন। হযরত আবু ওবায়রা (রা.) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! জনগণ আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসবে। এ অবস্থা আপনার মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আপনি উষ্ট্রে আরোহণ করুন।

হযরত উমর (রা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। অতএব এখন মানুষ যা কিছু বলুক না কেন তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি মানুষের সমালোচনার ভয়ে বেইনসাফী করতে পারি না।

আচ্ছা বলুন, সেই ধর্মইতো আজ মুসলিমদের কাছে! যে ধর্মের অনুসারী হতে যেয়ে খলিফা উমর ক্লান্ত ভৃত্যকে অশ্বে তুলে দিয়ে তিনি নিজে লাগাম ধরে নিয়ে যেতে লজ্জাবোধ করেননি। তৃণ শয্যা ছিলো এই দেশনায়ক

www.amarboi.org

মহাপ্রতাপান্বিত সম্রাটের সিংহাসন! এঁরাই জেনেছিলেন জীবনের গৌরব কিসে হয়। এঁরাই বুঝেছিলেন ইসলাম কাকে বলে?

ইসলাম যে কত সুন্দর ধর্ম, এতে যে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্রও নেই, বরং ইহা যে পৃথিবীর সকল মানুষের কল্যাণের ধর্ম, অধিকার প্রতিষ্ঠার ধর্ম, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ সাধনের ধর্ম... এই ঘটনা তারই উজ্জ্বল প্রমাণ।

অন্য একটি ঘটনা। রোমানদের মোকাবিলায় যুদ্ধরত হযরত উবাইদা রাদিআল্লাহু আনহুর পরিচালনাধীন ইসলামী সৈন্যদল তখন সিরিয়ার হিমসে অবস্থান করছিল। অমুসলিমদের নিকট থেকে সেখানে নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা কর জিযিয়া আদায় করা হয়েছে। হঠাৎ দরবারে খেলাফত থেকে নির্দেশ এলো-পুরো সৈন্যদলকে ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। হযরত উবাইদা (রা.) সবাইকে ইয়ারমুকে যাবার নির্দেশ দিলেন এবং আদায়কৃত জিযিয়া ফেরত দিতে বললেন। অমুসলিম নাগরিকরা ব্যাকুল হয়ে যখন কারণ জানতে চাইলো, সেনাপতি হযরত উবাইদা (রা.) বললেন, আমরা এখন দূরবর্তী অন্য ফ্রন্টে যাচ্ছি, কবে এখানে ফিরবো ঠিক নেই; কাজেই আপনাদের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহীত অর্থ রাখার অধিকার আমাদের নেই। বিধর্মীরা সেদিন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। এ রকম অসংখ্য ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে ভাস্কর হয়ে আছে।

কি প্রমাণ হয়? এতে কি একথা প্রমাণ হয় না যে, ইসলাম শুধু সর্বাংশে অসাম্প্রদায়িক নয়, সর্বতোভাবে সর্বান্তঃকরণে ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি চূড়ান্তভাবে দায়িত্বশীলও বটে। একমাত্র ইসলামই সর্বমানবিক মমতায় স্নিগ্ধ এমন একটি বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম– যা সাম্প্রদায়িকতা নয়ই বরং সকল মানুষের জন্য অফুরন্ত ভালবাসার এক পরিপূর্ণ সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল, পার্থিব ও পারলৌকিক সাফল্যের এক অব্যর্থ পথ নির্দেশ।

হিজরী প্রথম শতাব্দীর সমাপ্তিলগ্ন। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) শাসনামলে, সমরকন্দ এলাকায় কিছু লোকের একটি প্রতিনিধি দল এসে খলিফার দরবারে এ মর্মে অভিযোগ পেশ করলো যে, মহাবীর কুতাইবার নেতৃত্বাধীন একদল সৈন্য তাঁদের এলাকা দখল করে শহরের ভিতরই বসবাস করতে শুরু করেছে। এতে শহরের সাবেক অমুসলিম বাসিন্দাদের অসুবিধা হচ্ছে। অভিযোগ পেয়ে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) সমরকন্দের শাসককে লিখে পাঠালেন যেন সেনাপতি কুতাইবা এবং সমরকন্দের অমুসলিম অধিবাসীদের মধ্যকার এই বিরোধটি মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ আদালত গঠন করা হয়। উক্ত আদালতের বিচারক যদি ফয়সালা করেন যে, মুসলিমগণ সেখানে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করেছেন এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে

www.amarboi.org

তাদের শহর ছেড়ে যাওয়া উচিত তবে তাই যেন করা হয়। শাসক জামী ইবনে হাজের আল বাবী নামক একজন বিচারককে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করলেন। বিচারক অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, শহরটি ইসলামী যুদ্ধনীতি অনুসরণ করে দখল করা হয়নি। সুতরাং মুসলিম সৈন্যদের এই শহরে বসতি স্থাপন করার বৈধ অধিকার নেই। মুসলিমদের এই ন্যায় বিচার প্রত্যক্ষ করার পর সমরকন্দের অমুসলিম অধিবাসীগণ মুগ্ধ হলেন এবং অভিযোগনামা প্রত্যাহার করে মুসলিম সৈন্যদেরকে তাদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করার আমন্ত্রণ জানাতে থাকলেন। মুসলিমরা যে সাম্প্রদায়িক নয়, ইসলামে যে সাম্প্রায়িকতার নাম গন্ধও নেই, বরং যা আছে তা হলো ইসলাম উদারতা ও মানব কল্যাণের ধর্ম এবং পরধর্মে সে একেবারে সহিষ্ণু। সাম্য ও ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠাই হলো ধর্ম। মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ করে না। এই ঘটনা এবং এ রকম হাজার-হাজার ঘটনা তারই উজ্জ্বল প্রমাণ ও বাস্তব উদাহরণ।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন ঃ "যে ব্যক্তি সংখ্যালঘুকে উত্যক্ত করলো, সে আমাকে উত্যক্ত করলো; আর যে আমাকে উত্যক্ত করলো, সে আল্লাহ্কে উত্যক্ত করলো।"

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "কোনো অমুসলিমের অধিকার যে হরণ করবে, যে তাঁর উপর যুলুম অত্যাচার করবে তথা তাঁর জান-মালের কোনো ক্ষতি সাধন করবে, কিয়ামতের দিন আমি (নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং আল্লাহর আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে বিচার চাইবো-মামলা দায়ের করবো।"

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "সমস্ত জগৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পরিবার। যিনি তাঁর পরিবারের যত অধিক উপকার করেন, তিনি তাঁর নিকট তত অধিক প্রিয়।"

মুসলিমদের সংগে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে কোনো বাধা নেই এবং সংখ্যালঘুদের জীবন সম্পদ ও ইজ্জতের চূড়ান্ত নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বিধান মুসলিমদের জন্য ফরয। শুধু একটিই অকাট্য শর্ত আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহর নির্ধারিত সংবিধান অনুযায়ী জীবন নির্বাহ করতে হবে। স্ব-স্ব ধর্মে, কর্মে কোনো অসুবিধা নেই, পূজা-পার্বণ, গির্জা কি গুরু-দুয়ারে গমনা-গমন, তাওরাত-ইঞ্জিল, কি বেদ মন্ত্রের পঠন-পাঠন কোথাও কোনো সমস্যা নেই, সে সকল বিষয়ের কী প্রতিফল আল্লাহ পাক নিজে তা যথা সময়ে দান করবেন। কিন্তু সমাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা ও দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয়-আন্তঃরাষ্ট্রীয় নীতিসমূহ পরিচালিত হবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী। ইহা কোনো অযৌক্তিক শর্ত নয়। আধুনিক রাষ্ট্রীয়

www.amarboi.org

ব্যবস্থাও তো একই নিয়মে পরিচালিত। মার্কিন সংবিধানকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করা যায়? কোনো রাষ্ট্রেই কি যায়? যায় না। তাহলে মুসলিমদের দেশে মুসলিম আইন বলবৎ হলে বা থাকলে, তা সাম্প্রদায়িকতা হবে কেন? আসলে সমস্যাটাই এখানে। কিন্তু যত সমস্যাই হোক, ইসলামের কোনো শর্তই শিথিলযোগ্য নয়, কারণ এটা স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পথ নির্দেশ। এই বিধান মেনে নিয়ে ধর্ম, গোত্র, বর্ণ, নির্বিশেষে সবাই ইসলামী রাষ্ট্রে পূর্ণ নিরাপত্তা, পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে বসবাস করতে পারে।

ইসলামে রাজা-বাদশা, গডম্যান-গডফাদারদের জন্য আলাদা কোনো মানদণ্ড নেই। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, ব্রাহ্মণ-হরিজন, ইহুদি-খ্রিস্টান, মুসলিম, পীর-পাদ্রী-পুরোহিত সকলের জন্য একই ফায়সালা, একই ইনসাফ। অতএব ইসলাম জয়ী হলে, প্রতিষ্ঠিত হলে, এই সর্বমানবিক কল্যাণ বার্তায় পৃথিবী কর্ণপাত করলে ও আকৃষ্ট হলে, কেউ কেউ মনে করে এটা তাদের জন্যে ভয়ের কারণ। মূলতঃ এরা-ই ইসলামকে সাম্প্রাদায়িকতার বাহন এবং মুসলমানকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে বিষোদগার করছে।

কিন্তু ইসলাম আল্লাহ্ পাকের মনোনীত একমাত্র ধর্ম। তিনিই এর হিফাযতের মালিক। ইসলামকে মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রাদায়িক ইত্যাদি বলে আক্রমণ করে বা দোষারোপ করে কোনো লাভ নেই। ইসলাম জেগে উঠবেই। তাকে বাধা দেয়ার শক্তি কারো নেই। আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে ইরশাদ করেছেন ঃ

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

"তারা আল্লাহর নূরকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু কাফেরদের অন্তর্দাহ যতই বৃদ্ধি পাক, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নূরকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। যদিও কাফিরগণ ইহা অপছন্দ করে।" (সূরা আস সাফ্, ৬১ ঃ ০৮)

এখন আমরা সরবে সুস্পষ্ট বলতে পারি, ইসলামের বিরুদ্ধে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করা একটি হতাশাগ্রস্ত মহলের মহাব্যাধি, মজ্জাগত স্বভাব- দোষ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অতীতেও হয়েছিল, ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু হাজারো ষড়যন্ত্র করে ইসলামের এই অগ্রযাত্রা কেউ কখনও বন্ধ করতে পারেনি, পারবেও না কোনদিন। যারাই ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তারাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে; নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আর ইসলামই জেগে উঠেছে। এটাই ইতিহাসের সাক্ষ্য; ইতিহাস ইহাই বলে।

তাইতো দেখা যায়, একবিংশ শতাব্দির এই উষালগ্নে সভ্যতার এই উন্নত

www.amarboi.org

যুগে, অশান্তির উত্তপ্ত রোদে ঝলসানো বিশ্বমানব আজ শান্তির ছায়া খুঁজতে ব্যস্ত; তাই আজ লক্ষ কোটি নর-নারী, সকল গবেষণা, যাবতীয় তর্ক-বিতর্কের পরিশেষে ইসলামের আদর্শকেই একমাত্র শান্তির ছায়া, মুক্তির পথ এবং ব্যথাহরি অব্যর্থ প্রতিষেধক-মহৌষধ রূপেগ্রহণ করে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে মানব জীবনকে ধন্য ও পুণ্য করছেন।

আর বাপ-দাদা ও পরদাদা কালের বংশ পরম্পরায় মুসলিম আমরা ইসলামের শিক্ষা সৌন্দর্যকে অবহেলা করে অবনতির নিম্নস্তরে নেমে যাচ্ছি। আফসোস! হায়, কবে আমাদের ঘুম ভাঙবে! হায়, কবে আমাদের ভালোর দিকে আবার যাত্রা শুরু হবে! হায়, কবে আমাদের সেই হারানো সুদিন আবার ফিরে আসবে। দূরীভূত হবে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেয়া এ অপবাদ। কখনো মুসলিমরা ছিলো না সন্ত্রাসী; বরং মুসলিমরাই প্রতিষ্ঠিত করেছিল সমগ্র বিশ্বে শান্তি-পৃথিবীর ইতিহাস তারই উজ্জ্বল সাক্ষী।

আজকে অত্যন্ত বিষণ্নতার সাথে দেখছি কোথাও কোথাও সম্প্রদায়ের নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে এক শ্রেণীর স্বার্থবাদী মহল অন্য সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করছে, তাদের হক হরণ করছে, সম্পদ কেড়ে নিচ্ছে-যা সত্যিই দুঃখজনক। এটি সচ্চরিত্রবান মানুষের কাজ হতে পারে না। ইসলামীমনা ব্যক্তিত্বরা কখনোই এমনটি করতে পারে না। এটি অসচ্চরিত্রের একটি বড় নমুনা। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে যার হাত মুখ থেকে অন্যরা নিরাপদ নয় সে কখনোই ভাল মুসলিম হতে পারে না। তার জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি ও দুনিয়া আখিরাতে কঠিন দুর্গতি।

ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হওয়া

বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার ফলে পৃথিবী আজ অনেক ছোট, একদম যেন হাতের মুঠোয়। মুহূর্তের মধ্যে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে কী ঘটেছে, কিভাবে ঘটছে, কেন ঘটছে, তার সুফল-কুফল কী আমরা তা জানতে পারছি। উপলব্ধি করতে পারছি। এক দেশে কোনো সমস্যা হলে তা পাশাপাশি অন্য রাষ্ট্রগুলোতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই আজ প্রয়োজন আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে মিলেমিশে থাকা অর্থাৎ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সুখে সুখী ও দুঃখে ব্যথিত হওয়ার মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত করা। এ ভ্রাতৃত্ব তিন ধরনের হতে পারে। যথা ঃ

এক. ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব

দুই. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও

তিন. ইসলাম বা ধর্মগত ভ্রাতৃত্ব।

ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব হলো– একই পিতার ঔরসে বা একই মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ

www.amarboi.org

করার কারণে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হওয়া। এক্ষেত্রে বড় ভাইদের কর্তব্য হলো ছোটদেরকে সচ্চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠনের লক্ষ্যে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করা। ছোটরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে ছোট অবস্থায় অজ্ঞ অর্থাৎ তাদের দূরদর্শিতা বা ভিশন সুস্পষ্ট না থাকার কারণে যেকোন কাজ বা আদর্শিক নয় বা গ্রহণযোগ্য নয়, সময়কে অবমূল্যায়ন অর্থের অপচয়করণ এবং সর্বোপরি অসৎ চরিত্রের কিছু খুব সহজেই করে বসতে পারে। এক্ষেত্রে বড় ভাইয়েরা যদি সচেতন না হয়, ভুল দেখেও না দেখার ভান করে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, চুপচাপ থাকে তাহলে ওরা কিভাবে সংশোধন হবে? বড় ভাই না হয় উচ্চ শিক্ষিত হলো কিন্তু ছোট ভাইয়েরা যদি পড়ালেখা করে মানুষ না হয় তাহলে তো তারা বড় ভাইকেই বড় হিসেবে শ্রদ্ধা করতে ভুল করবে। মৃত্যুর পর কবরে দাফন করতে ভুল করবে, জানাযার নামায আদায় করতে যেয়ে ভুল করবে। বড় ভাইয়ের চেয়ার কি তখন ঠিক থাকবে? প্রশ্নই আসে না, কাজেই ছোটদেরকে অবশ্যই আদেশ-উপদেশ ও উত্তম নসীহত প্রদানের মাধ্যমে আদর্শ সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। তবেই পরিবারের ভাব মর্যাদা বাড়বে, মা-বাবা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে, মৃত্যুর পরেও পাবে চরম শান্তির স্থান জান্নাত।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব হলো— আমরা সকলেই আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ.)-এর বংশধর। এদিক থেকে বিশ্বের সকল মানুষই ভাই-ভাই। জ্ঞানীজন মাত্রই এটি অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। সময়ের ব্যবধানে ভাই থেকে ভাই (মানুষ) বৃদ্ধির কারণে আমাদের পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে হয়। এতে আবহাওয়া ও ভৌগলিক পরিবেশের কারণে মানুষের আকার-আকৃতি, স্বভাব-প্রকৃতি এবং বর্ণ ও ভাষার মধ্যে ভিন্নতা দেখা দেয়। আর এভাবে মানুষ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا.

"হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো।" (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৩)

এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সকল মানুষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আর এ কারণেই যখন বিশ্বের কোন দেশে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বড় ধরনের আঘাত আসে, লোকজন আহত-নিহত হয়, আমরা শুনামাত্রই থমকে যাই। চিৎকার করে

www.amarboi.org

উঠি এবং মন খারাপ করে ফেলি (মনের অজান্তেই) এবং যার যার ধর্ম অনুযায়ী স্রষ্টার কাছে এ দুর্যোগ থেকে মুক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করি। পাশাপাশি আমরা জাতি-ধর্ম বর্ণ-বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সে দেশের সে অঞ্চলের ভাইদের জন্য অর্থ সাহায্য পাঠিয়ে থাকি। যা জাতিগতভাবে সচ্চরিত্রের সাথেই সম্পৃক্ত।

ইসলাম বা ধর্মগত ভ্রাতৃত্ব হলো– ইসলাম পৃথিবীর মধ্যে সর্বশেষ এমন একটি জীবনাদর্শ যা স্বয়ং আল্লাহ পাক শ্রেষ্ঠ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ জীবন আদর্শে যারা বিশ্বাসী তারা যে কোনো বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও অঞ্চলের অধিকারী হোক না কেন তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। এ ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হওয়া বা সংঘটিত হওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ.

"প্রত্যেক মুসলিম ভাই ভাই।" (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১০)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمُ لاَيَظْلِمُهُ وَلاَيَخْذُلُهُ وَلاَيَحْقِرُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَيَشِيْرُ اِلَى صَدْرِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرأ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمُ كُلُّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمَهُ وَمَالَهُ وَعِرْضَهُ.

"মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার প্রতি অত্যাচার করবে না। তিনি বুকের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন, তাকওয়া এখানে। নিজ মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা করা অন্যায়। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান সবই হারাম।" (তিরমিযী শরীফ)

ইসলামের চোখে সকল মানুষ সমান। এখানে আশরাফ-আতরাফ, সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী বিশ্বের সকল মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই একই দ্বীনসূত্রে গ্রথিত।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "অনারবগণের ওপর যেমন আরবগণের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তেমনি আরবগণের ওপরও অনারবগণের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এতই সুদৃঢ় যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) পৃথিবীর সকল ঈমানদারগণকে একটি দেহের সাথে তুলনা করেছেন। দেহের কোনো একটি অঙ্গে অসুখ হলে যেমন পুরো দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তেমনি পৃথিবীর কোন এক

www.amarboi.org

প্রান্তে একজন মুসলিম বিপদে পতিত হলে সকল মুসলিমের অন্তর ব্যথিত হয়। একজন মুসলিম কোনো বিপদে পতিত হলে তাকে সাহায্য করা অপর মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। হাত ও জিহ্বা দ্বারা কোনো মুসলিম ভাইকে কষ্ট দেয়া যাবে না। এমনকি যদি কখনো পরস্পরের মধ্যে কোনো কলহ সৃষ্টি হয় তখন অপর মুসলিম ভাইয়েরা তা মিটিয়ে দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। মুসলিম নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্যেও তা পছন্দ করতে হবে, নচেৎ সে প্রকৃত মুসলিম হতে পারবে না।

প্রিয় নবী (সা.) বলেন, ""মুমিনগণ পরস্পর মিলে একটি ইমারতস্বরূপ, এর এক অংশ অপর অংশকে মজবুত করে রাখে।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

আজকে পৃথিবীর কোথাও যদি ইসলাম ও মুসলিম জাতির উপর কোনো আঘাত আসে তখন আমরা সোচ্চার না হয়ে পারি না, প্রতিবাদ না করে পারি না; কেননা বিশ্বের এক প্রান্তে মুসলিম ভাইদের কোনো সমস্যায় যদি আমাদের হৃদয় সোচ্চার না হয়ে উঠে তাহলে আমরা যে রাসূল (সা.)-এর কথার বিপরীতে একটি দল বা গোষ্ঠী হয়ে যাব তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এমনটি মুসলিম জাতির সচ্চরিত্রের প্রতিচ্ছবি হতে পারে না। কারণ আমরা জাতিগতভাবে আমাদের প্রিয় নেতা, শ্রেষ্ঠ আদর্শ রাসূল (সা.)-কে শতভাগ মেনে চলার চেষ্টা করব এটাই স্বাভাবিক।

মানব চরিত্রের নেতিবাচক দিক

আমানত খিয়ানত করা

আমানত খিয়ানত করা অসচ্চরিত্রের প্রতিফলন। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে খিয়ানতের প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক। খিয়ানত অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর সাথেও খিয়ানত হতে পারে। যেমন মুখে মুখে ঈমানের দাবি এবং আমলী জীবনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ। দ্বীনী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অলসতা ও পরানুখতাও খিয়ানত বলে গণ্য। ব্যক্তির উপর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় যে যিম্মাদারী অর্পিত তা সঠিকভাবে পালন না করাও খিয়ানত। শুধু টাকা-পায়সা ও ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে আমানতদারী না থাকাই খিয়ানত নয়। এমনকি ব্যক্তির হাত, পা, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক, চক্ষু, জীবন ও যৌবন সবই মহান আল্লাহ্র পবিত্র আমানত। সুতরাং এসবকে শরীয়াত-সম্মতভাবে ব্যবহার না করলে অবশ্যই তা খিয়ানতের মধ্যে শামিল হবে। এসব কিছুর খিয়ানত না করার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ لاَ تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"হে মুমিনগণ তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আমানত খিয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত ও না।" (সূরা আনফাল, ০৮ ঃ ২৭)

হাদিস শরীফে মুনাফিকের আলামত হিসেবে খিয়ানতকে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَ اُوْتُمِنَ خَانَ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "মুনাফিকের আলামত চিহ্ন তিনটি– যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং তার নিকট যখন আমানত রাখা হয় সে তা খিয়ানত করে।" (বুখারী শরীফ)

গর্ব ও অহংকার করা

গর্ব ও অহংকার বা অহংবোধ হলো মানুষের মাঝে নিজেকে বড় ও মহৎ বলে মনে করার মিথ্যে অনুভূতি জাগ্রত হওয়া এবং নিজেকে সবার চেয়ে বড় বলে মনে করা। এই অহংবোধের কারণেই ইবলীস শয়তান আল্লাহ্র লা'নতে পড়েছিল এবং জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল।

অহংবোধ ব্যক্তিকে ধ্বংস করে। অহংবোধের কারণেই ব্যক্তি পৃথিবীতে উদ্ধত হয় এবং বিপর্যয় ও অনাচার সৃষ্টি করে। পবিত্র কুরআনে অহংকার, গর্ব ও দম্ভ না করার বিষয়ে স্পষ্ট সাবধান বাণী রয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلاَ تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً.

"ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনোই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৩৭)

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

"লোকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না আর জমিনের উপর

www.amarboi.org

অহংকার করে চলাফেরা করো না। আল্লাহ্ কোন আত্মঅহংকারী দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৮)

হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে কারুন নামে এক মহাঅহংকারী ও কৃপণ ব্যক্তির ভয়াবহ পরিণতির কথা পবিত্র কুরআনে সূরা কাসাসে বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস শরীফেও অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ "যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না।"

অহংকার ও আত্মম্ভরিতার বহুবিধ কারণ রয়েছে। তবে মানুষ সাধারণত বংশ-কুল, রূপ-সৌন্দর্য, ধন-দৌলত, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বন্ধু-বান্ধব ও সাহায্যকারীর আধিক্যের কারণে অহংকার করে থাকে। ইসলামে এ সবের কোনো মূল্য নেই। উপরন্তু এসব নিরেট অস্থায়ী জিনিস। সুতরাং এসবের দ্বারা অহংকার ও গর্ব হতে পারে না। কাজেই অহংকার ও গর্ব বর্জন করে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করাই ঈমানদারের কর্তব্য।

হিংসা-বিদ্বেষ

হিংসা-বিদ্বেষ অসচ্চরিত্রের দোষ এবং মানবতার জন্য একটি মারাত্মক ক্ষতিকর বিষয়। হীন মানসিকতা, সম্পদের মোহ, পদমর্যাদার লোভ থেকেই হিংসা-বিদ্বেষের জন্ম হয়। হিংসুটে ব্যক্তি কাউকে কোনো নিয়ামতে অভিসিক্ত দেখলে অন্তর জ্বালা অনুভব করে। অন্যের সুখ-শান্তি, সম্পদ বিনষ্ট করে নিজে এর মালিক হওয়ার কামনা ও বাসনা করাকে হিংসা বলা হয়। ইসলামী শরীয়াতে এ ধরনের হিংসা হারাম। ব্যক্তির চরিত্র গঠনে হিংসা-বিদ্বেষ বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এতে মানুষে মানুষে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হয় এবং বিপর্যয় দেখা দেয়।

হিংসার কারণ বহুবিধ। যেমন : শত্রুতা, অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, নিজের অসদুদ্দেশ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা, নেতৃত্বের লোভ, অনুগত লোকদের যোগ্যতাবান হয়ে যাওয়া এবং কোন সুযোগ-সুবিধা হাসিল হওয়া, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নীচুতা বা কার্পণ্য ইত্যাদি। এ সকল কারণে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি হিংসা করে থাকে। ইসলামী শরীয়াতে এগুলো নিষিদ্ধ।

হিংসার অনিষ্টকারিতার কথা উল্লেখপূর্বক রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدِ فَإِنَّ الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

"তোমরা হিংসা থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কেননা হিংসা নেক আমলকে

www.amarboi.org

খেয়ে ফেলে যেমনিভাবে আগুন লাকড়িকে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয়।" (আবু দাউদ শরীফ)

তিনি আরো ইরশাদ করেন ঃ

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَتَحَسَّسُوْا وَلاَتَجَسَّسُوْا وَلاَتَنَاجَشُوْا وَلاَتَحَاسَدُوْا وَلاَتَبَاغَضُوْا وَلاَتَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَدَ اللهِ اِخْوَانًا.

"তোমরা অন্যের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা এরূপ ধারণা জঘন্যতম মিথ্যা। আর কারো দোষ-অনুসন্ধান করো না, কারো গোপনীয় বিষয় তালাশ করো না, একে অন্যকে ধোঁকা দিবে না আর পরস্পর হিংসা করবে না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করবে না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করবে না, বরং সবাই আল্লাহ্‌র বান্দা, ভাই ভাই হয়ে থাকবে।" (বুখারী শরীফ)

কোনো কিছু নিয়ে হিংসা করতে নেই। জীবন তো আল্লাহ্‌র দান, শারীরিক সৌন্দর্য, চারিত্রিক মাধুর্য, ধন-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি সব কিছুই মহান আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামত। এ জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতে হবে। নিজের যা কিছু আছে তা নিয়েই খুশী থাকতে হবে। অপরের দিকে তাকিয়ে হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে লাভ কি? হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدِ فَإِنَّ الْحَسَدُ يَأكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا يَئكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে সাবধান থাকো, কেননা হিংসা মানুষের পুণ্যসমূহ এমনভাবে খেয়ে ফেলে বা বিনষ্ট করে যেমনিভাবে আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে।" (আবু দাউদ শরীফ)

আল কুরআনুল কারীমে যেসব বস্তু থেকে মহান আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করার তাকিদ রয়েছে, তন্মধ্যে হিংসা একটি। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

"এবং (আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি) অনিষ্ট থেকে হিংসুকের যখন সে হিংসা করে।" (সূরা আল ফালাক, ১১৩ ঃ ০৫)

মানুষ একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার বিষয়টিও বদ-অভ্যাসের মধ্যে শামিল। কোনো কারণে কারো প্রতি দুশমনীর ভাব দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ধরে রাখার নাম বিদ্বেষ। অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হারাম। হাদিসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, "প্রতি জুমু'আর (সপ্তাহে)

www.amarboi.org

সোম ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলসমূহ পেশ করা হয় এবং সমস্ত মুমিন বান্দাহদের গুনাহ্-খাতা ক্ষমা করে দেয়া হয়। কিন্তু যাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও দুশমনী আছে তাদেরকে ক্ষমা করা হয় না।

কৃপণতা

কৃপণতা মানুষের অসচ্চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। এটি এক ধরনের মানসিক ব্যাধি ও মন্দ স্বভাব। দুনিয়া ও সম্পদের প্রতি অতি লোভ থেকে এ রোগের জন্ম হয়। ধন-সম্পদ মহান আল্লাহ্র দান। বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও পরীক্ষা বিশেষ। মানুষ ধন-সম্পদ থেকে নিজের জন্য এবং প্রয়োজনে অপরের জন্য ব্যয় করবে, এটাই হলো মানবিক ও সামাজিক দাবি। কৃপণ ব্যক্তি নিজের জন্য ব্যয়ে যেমন কুণ্ঠাবোধ করে, তেমনি সমাজের প্রয়োজনে ব্যয়ে অধিক কুণ্ঠাবোধ করে। কৃপণ ব্যক্তি নিজেকে যেমন বঞ্চিত ও অপমানিত করে, তেমনি সমাজকেও বঞ্চিত এবং মানবিকতাকে করে অপমানিত ও লাঞ্ছিত।

কৃপণতা একটি মন্দ ও বদ খাসলত। কৃপণ ব্যক্তি কখনো সচ্চরিত্রবান মুসলিম হতে পারে না। ফলে এ খাসলত ত্যাগ করা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে কৃপণতার ভয়াবহতা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

"আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল– এ যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না তা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি হবে।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৮০)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهٗ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ - كَلاَّ لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ.

"যে ব্যক্তি অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে সে ধারণা করে যে, তা (অর্থ ও সম্পদ) তাকে স্থায়ী করে রাখবে, কখনো না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।" (সূরা আল হুমাযাহ, ১০৪ ঃ ০২-০৪)

কৃপণতা মানুষকে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরিয়ে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

اَلْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ.

"কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে এবং মানুষের থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু জাহান্নামের নিকটবর্তী।" (তিরমিযী শরীফ)

কৃপণের পরিণাম সম্পর্কে নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلاَبَخِيْلٌ وَلاَمَنَّانٌ.

"প্রতারক, কৃপণ এবং যে ব্যক্তি নিজ অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ায় তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (তিরমিযী শরীফ)

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللهِ وَقَرِيْبٍ مِّنَ النَّاسِ وَقَرِيْبٍ مِّنَ الْجَنَّةِ وَبَعِيْدَ مِّنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ وَبَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ وَبَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ وَقَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ وَلَجَاهِلُ سَخِيٌّ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী আর জাহান্নাম থেকে দূরে। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে, মানুষ থেকে ও জান্নাত থেকে দূরে, আর জাহান্নামের নিকটবর্তী। অবশ্যই জ্ঞানহীন দানশীল, আল্লাহ্‌র নিকট ইবাদতকারী কৃপণের চেয়ে অধিক প্রিয়।" (মুসলিম শরীফ)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"আর যারা প্রবৃত্তির লালসা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রয়েছে তারাই পরকালে সফলকাম হবে।" (সূরা আত তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৬)

অপব্যয়.ও অপচয়

অপব্যয় হারাম এবং বদঅভ্যাস। ইসলামী শরীয়াতে নাজায়িয। মানুষ যশ ও সুনাম-সুখ্যাতির জন্য সম্পদ কখনো অপব্যয় করে আবার গর্বের জন্য নিজের সম্পদ উজাড় করে দেয়। মানুষকে দেয়া ধন-সম্পদ, জীবন, সুনাম-সুখ্যাতি

www.amarboi.org

সবই আল্লাহ্‌র দান। এসবকে তাঁরই নির্ধারিত ও নির্দেশিত পথে ব্যয় না করাই আল্লাহ্‌র না-শুকরী। সম্পদের অপচয় অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় কাজ। বাতিল পথে ও কাজে ব্যয় করাও অপচয়। ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা যেমনভাবে দূষণীয় ও নিন্দনীয়, অনুরূপভাবে অপব্যয় এবং অপচয়ও দূষণীয় ও নিন্দনীয়। আরবিতে বলা হয় 'ইসরাফ', শরীয়াতের পরিভাষায় বৈধ কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয়কে ইসরাফ– অপচয় বলে। আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দাহগণ কখনো অপচয় করে না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

"(খাঁটি বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হলো) এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না এবং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।" (সূরা আল ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৭)

মহান আল্লাহ্ অপচয়কারীকে ভালবাসেন না। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

"এবং আহার করবে ও পান করবে। কিন্তু অপব্যয় করবে না। তিনি অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আল আরাফ, ০৭ ঃ ৩১)

অবৈধ ও শরীয়াত বিরোধী কাজে ব্যয় করাকে অপব্যয় বলা হয়। ইসলামে অপব্যয় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا.

"আর কোনো অবস্থাতেই অপব্যয় করবে না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ, ১৭ ঃ ২৬-২৭)

ইসলামের নির্দেশ হলো মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ

مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ.

"যে ব্যক্তি ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে সে কখনো অভাবগ্রস্ত হয় না।"

www.amarboi.org

আত্মগৌরব

অন্যের দিকে লক্ষ্য না করে কেবল নিজেকে মহতি গুণের মালিক বলে ধারণা করা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণাবলিকে নিজস্ব সম্পদ মনে করতঃ তা হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ ভয় না করাকে আত্মগৌরব বলে। আত্মগৌরবের ব্যাপারে আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَلَاتُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى.

"অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করবে না, কে মুত্তাকী এ সম্পর্কে তিনিই সম্যক জানেন।" (সূরা আন নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ৩২)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا الْمُهْلِكَاتِ فَهَوٰى مُتَّبِعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَاَعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ وَهِيَ اَشَدُّهُنَّ.

"প্রবৃত্তির অনুগামী হওয়া, কৃপণতার অনুগত হওয়া এবং আত্মপ্রশংসায় লিপ্ত হওয়া, এগুলো হচ্ছে ধ্বংসাত্মক বদ অভ্যাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তবে এ সবের মধ্যে শেষোক্তটি হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য।" (বায়হাকী শরীফ)

নিজেকে পছন্দ করা, নিজের রায়কে বিজ্ঞতম মনে করা এবং অন্যের মতামতের প্রতি কোনো গুরুত্ব প্রদান না করাতে বিভিন্ন ধরনের অকল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ ধরনের মন-মানসিকতার কারণেই পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে। কাজেই নিজের কাজ ও রায়কে নির্ভুল না ভেবে অন্যের রায়ের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। কেননা এই নীতির অনুসরণ ব্যতীত সুন্দর আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

অশ্লীল কথাবার্তা

অশ্লীল কথাবার্তা অসচ্চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَااللَّعَّانِ وَالْفَاحِشِ وَلَاالْبَذِيُّ.

"প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি কারো প্রতি ভর্ৎসনা ও লা'নত করে না এবং সে কোনো অশালীন এবং অশ্লীল কথাও বলে না।" (তিরমিযী শরীফ)

তিনি আরো বলেন ঃ

سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ قِتَالُهٗ كُفْرٌ.

www.amarboi.org

"কোনো মুসলিমকে গালি দেয়া ফিস্‌ক এবং তার সাথে লড়াই করা কুফ্‌রী।" (বুখারী শরীফ)

হযরত আনাস (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) গালিগালাজকারী, অশালীন এবং অভিশম্পাতকারী ছিলেন না। আমাদের কারো উপর তিনি নারাজ হলে কেবল এতটুকু বলতেন যে, তার কি হলো! তার কপাল ধুলাময় হোক।" (বুখারী শরীফ)

তিনি আরো বলেন, "তুমি রূঢ় ব্যবহার এবং অশালীন আচরণ বা কথা বর্জন করবে।" (বুখারী শরীফ)

ইসলামী শরীয়াতে গালিগালাজ, অশালীন, অশ্লীল কথাবার্তা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, গালিগালাজের সময় সীমালঙ্ঘন হয়ে যায়। একজনে যদি কারো বাবাকে গালি দেয়, তবে অপরজন তার বাবা-মাসহ সকলকে গালি দেয়। এভাবে সীমালঙ্ঘন হয়ে পরে মারামারির উপক্রম হয়ে যায়। অশালীন ও অশ্লীল কথা বলতে যারা অভ্যস্ত লোকেরা তাদেরকে ঘৃণা করে। কেউ তাদের সাথে মেলামেশা করতে চায় না। গালমন্দ করা অভদ্রতা ও সভ্যতার পরিপন্থী কাজ অধিকন্তু এতে অন্য মানুষের কষ্ট হয়। কোনো মুসলিমকে এমনকি কোনো মানুষকে কষ্ট দেয়াও নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ.

"প্রকৃত মুসলিম সেই, যার কথা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।" (বুখারী শরীফ)

কাম-প্রবৃত্তি তাড়িত হয়েও মানুষ অশ্লীল কথা বলে। আবার ক্রোধের বশবর্তী হয়েও লোকেরা এ ধরনের কথাবার্তা বলে থাকে। কোনো অবস্থাতেই অশ্লীল কথাবার্তা ও গালিগালাজ করা জায়িয নেই।

ধোঁকা ও প্রতারণা

মানুষের সাথে লেনদেন ও বেচা-কেনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রতারণা করা; পণ্যদ্রব্যের পরিচয় গোপন কিংবা দু'নম্বর পণ্যকে এক নম্বর বলা ইসলামে নিষিদ্ধ।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) কোনো খাদ্যবস্তুর স্তূপের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় এর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে এর অভ্যন্তরে সিক্ত পেলেন। তখন তিনি বললেন, হে খাদ্য মালিক! এটি কি? জবাবে সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বৃষ্টির কারণে এরূপ হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন ঃ

اَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّىْ.

www.amarboi.org

"তুমি ভিজা খাদ্যশস্য উপরে রাখলে না কেন? তাহলে তো ক্রেতাগণ এর অবস্থা দেখতে পেতো (প্রতারিত হতো না)। যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য হবে না।" (মুসলিম শরীফ)

ধোঁকা ও প্রতারণা হীন মানসিকতার পরিচায়ক। এর মাধ্যমে অপরকে ঠকানো হয় এবং মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, ইত্যকার ইসলামী শরীয়াতে ধোঁকা ও প্রতারণা হারাম।

খোশামোদ, তোষামোদ ও অতিশয় প্রশংসা

খোশামোদ, তোষামোদ এবং কারো প্রশংসায় অতিশয় উক্তি করা, বাড়িয়ে বলা, নীচুতা ও লজ্জাহীনতার আলামত। যারা এভাবে অন্যের খোশামোদ করে এবং অবাস্তবভাবে অপরের প্রশংসা করে তারা একই সাথে তিন ধরনের গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাকে ঃ ০১. খোশামোদকারী লোকেরা নিজের মতলব হাসিলের জন্য এমন সব প্রশংসা করে যা বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এটা নির্লজ্জ মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়, ০২. প্রশংসাকারী ব্যক্তি নিজের মুখ দ্বারা এমন প্রশংসাসূচক বাক্যাবলি উচ্চারণ করে যার প্রতি সে নিজেও বিশ্বাসী নয়। এ ধরনের কথা মুনাফিকী বৈ কি? ০৩. এভাবে প্রশংসা করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে অন্যের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করে। এতে তার নীচুতা, নির্লজ্জতা ও হঠকারিতা প্রকাশ পায়।

অতিশয় প্রশংসা করার কারণে প্রশংসিত ব্যক্তির দুই ধরনের ক্ষতি হয়ে থাকে, প্রথমতঃ সে অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, দ্বিতীয়তঃ সে এই মিথ্যা প্রশংসা শ্রবণ করে নিজের সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করে এবং অন্যান্য লোকদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের নযরে দেখতে থাকে। আর সর্বক্ষণ সমস্ত মানুষের পক্ষ হতে এ জাতীয় প্রশংসা বাণী শুনার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। পরিণামে তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যে, কৃতকর্মের উপর প্রশংসিত হওয়ার কামনা করার পাশাপাশি অকৃতকর্মের উপরও প্রশংসিত হতে চায়। এ ধরনের নির্লজ্জ কামনাকারী লোকদের পরিণাম সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا
فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"যারা নিজেরা যা করেছে তাতে প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কার্যের জন্যও প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে, এরূপ তুমি কখনো মনে করবে না। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৮৮)

www.amarboi.org

মতলব হাসিলের জন্য অবাস্তব ও মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করা অন্যায়। এহেন প্রশংসা যা উক্ত ব্যক্তির নিজের জন্যও ক্ষতিকর। এ প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে উল্লেখ ঃ রয়েছে হযরত আবু মূসা (রা.) বলেন, একদা নবী কারীম (সা.) একজনকে আরেকজনের অতিরঞ্জিত প্রশংসা করতে শুনে বললেন, "তোমরা তো লোকটিকে মেরে ফেললে অথবা বললেন, লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে। যদি কারো প্রশংসা করতেই হয়, বলবে তার সম্পর্কে আমার ধারণা এরূপ।" (বুখারী শরীফ)

কোনো ফাসিক ব্যক্তির প্রশংসা করা আরো জঘন্য অপরাধ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالٰى وَاهْتَزَّلَهُ الْعَرْشُ.

"কোনো ফাসিক ব্যক্তির প্রশংসা করা হলে আল্লাহ্ তা'আলা ক্রোধান্বিত হন এবং এতে তার আর্‌শ প্রকম্পিত হয়ে উঠে।"

দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনকারী ব্যক্তি, যে এক ব্যক্তির নিকট তার প্রশংসা করে, অন্যত্র গিয়ে আবার তার বদনাম করে এবং সম্মুখস্থ ব্যক্তির প্রশংসা করে তাদের সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন, "দুনিয়ার জীবনে যে ব্যক্তি দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করবে কিয়ামাতের দিন তার মুখে একটি আগুনের জিহ্বা লাগিয়ে দেয়া হবে।" (দারিমী)

তিরস্কার বা ভৎর্সনা

অসচ্চরিত্রের লোকের আরেকটি অন্যতম দোষ হলো তারা সমাজে বিশেষ করে প্রতিষ্ঠিত লোকদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু এতে যে তার অসচ্চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, সে যে অবাধে পাপ করে যাচ্ছে তার কোন খেয়াল নেই। আবার অনেকে অন্যের বংশগত বিষয় নিয়েও অনেকভাবে তিরস্কার করার চেষ্টা করে থাকে।

এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "বংশগত তারতম্য ও বিভিন্নতা কারও জন্যে গালি নয়। তোমরা সকলেই এক আদমের সন্তান এবং পরস্পর একে অপরের নিকটবর্তী। দ্বীনদারী ও পরহেজগারী ব্যতীত কারও উপর কারও (বংশগত দিক থেকে) প্রাধান্য নাই।" (বায়হাকী শরীফ)

অপর এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, "দু'টি বিষয় এমন রয়েছে যে, এগুলোর ইচ্ছা পোষণ করাও (প্রায়) কুফরী। এক ঃ কারও বংশের উপর কটাক্ষ ও ভৎর্সনা করা। দুই ঃ মৃতের উপর বিলাপ অর্থাৎ চিৎকার করে কান্নাকাটি করা।" (মুসলিম শরীফ)

আল কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا.

"যারা মুমিনদেরকে ইচ্ছাধীন কোনো অপরাধে লিপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও কষ্ট দেয়, বস্তুতঃ তারা অপবাদ আরোপ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা বহন করলো।" (সূরা আল আহ্যাব, ৩৩ ঃ ৫৮)

যে ব্যক্তি কাউকে বংশগত কারণে তিরস্কার করে বলে যে, সে অমুক সম্প্রদায়ের লোক অথবা অমুক ব্যক্তির পুত্র, তবে এই তিরস্কারকারী ব্যক্তিও উপরোক্ত আয়াতের হুমকির অধীন পড়বে। (যাওয়াজের)

আলোচ্য গুনাহটি কবীরা গুনাহ এবং বে-লজ্জত ও নিরর্থক একটি পাপ; পার্থিব কোনো স্বার্থ এর সাথে জড়িত নয়। কিন্তু সাধারণ লোকজন এ থেকে বড় উদাসীন। তারা বিশেষ কিছু সম্প্রদায় ও পেশাজীবিকে ছোট ও হেয় মনে করে। কখনও এমন শব্দের মাধ্যমে তাদেরকে সম্বোধন করে, যাতে তাদের নিকৃষ্টতা প্রকাশ পায়। যেমন, কাউকে নাপিত বা কসাই বা জোলা বলা। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে এ থেকে নাজাত দিন — আমীন।

ঠাট্টা ও উপহাস করা

ঠাট্টা-উপহাস করা কবীরা গুনাহ। এতে উপহাসকারীর জন্যে পার্থিব বা আর্থিক কোনো স্বার্থও নিহিত নেই। কিন্তু সাধারণ মুসলিমগণ নিজেদের গাফিলতি ও উদাসীনতার কারণে এতে লিপ্ত রয়েছে। আল কুরআনুল কারীমে হুকুম করা হয়েছে ঃ

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ.

"না পুরুষগণ পুরুষগণের প্রতি উপহাস করা উচিত, হতে পারে এরা (আল্লাহর নিকট) তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হবে। আর না নারীগণ নারীগণের প্রতি উপহাস করা উচিত, হতে পারে এরা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হবে।" (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১১)

'এস্তেহ্যা' অর্থ কাউকে হেয় ও অপমান করার জন্যে তার কোনো দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে শ্রোতারা হাসতে থাকে। এই 'এস্তেহ্যা' বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ কয়েক উপায়ে হতে পারে ঃ

০১. কারও চলা-ফেরা, উঠা-বসা, হাসা, কথা বলা ইত্যাদি ব্যঙ্গচ্ছলে নকল করা অথবা কারও হাত-পা, শরীর বা চেহারা-আকৃতি ইত্যাদি হেয় করার উদ্দেশ্যে নকল করা।

www.amarboi.org

০২. কারও কথা বা কাজের কথা বলে হাসা-হাসি করা।

০৩. চোখ কিংবা হাত-পায়ের ইঙ্গিতে কারও দোষ প্রকাশ করা।

এসব অহেতুক ও বেহুদা গুনাহ আজকাল মুসলিমদের মধ্যে প্লেগ-মহামারীর ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ লোকদের থেকে নিয়ে শীর্ষস্থানীয় লোকেরা পর্যন্ত এ ব্যাধিতে আক্রান্ত রয়েছে। অথচ আল কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত আয়াতে বিষয়টির নিষিদ্ধতা (হারাম হওয়ার হুকুম) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلاَ كَبِيْرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا.

"(তারা বলবে), হায় আফসোস! একি আশ্চর্য আমলনামা! ছোট-বড় কোন পাপই লিপিবদ্ধ না করে ছাড়ে নাই।" (সূরা আল কাহাফ, ১৮ ঃ ৪৯)

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, একদা আমি কারও বিষয়ে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নকল করে দেখিয়েছিলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এরূপ করতে নিষেধ করেছেন এবং) বলেছেন, "এইরূপে নকল করে দেখানোর বিনিময়ে যদি আমাকে বৃহত্তম কোনো সম্পদও দেয়া হয়, তবু আমি তা গ্রহণ করবো না।" (আবু দাউদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ)

এ হাদিসে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটি এমন নিরর্থক ও বে-লজ্জত গুনাহ যে, এতে কোনোই ফায়দা নিহিত নাই। আর যদি এতে কোনরূপ ফায়দা থেকেও থাকে, তবুও এর ধারে-কাছেও যাওয়া উচিত নয়।

হযরত হাসান (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যারা লোকদেরকে উপহাস করে, আখিরাতে জান্নাতের একটি দরজা খুলে তাদেরকে সেদিকে ডাকা হবে। যখন উপহাসকারী ব্যক্তি ঊর্ধ্বশ্বাসে দ্রুত সে পর্যন্ত পৌছবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর আরেকটি দরজা খুলে তাকে ডাকা হবে। সেখানে পৌছলে এটিও বন্ধ করে দেয়া হবে। এভাবে একের পর এক দরজা খোলা হবে এবং বন্ধ করা হবে। অবশেষে উপহাসকারী ব্যক্তি (জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে) নিরাশ হয়ে যাবে; সুতরাং পুনরায় তাকে সেদিকে ডাকা হলেও আর যাবে না।" (বায়হাকী শরীফ)

যে ঠাট্টা ও উপহাসে সম্বোধিত ব্যক্তি মনে কষ্ট নেয়া নিশ্চিত থাকে, এরূপ ঠাট্টা-উপহাস ইজমা (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) বলে হারাম। একে বৈধ বলে মনে করা যেমন পাপ তেমনি মূর্খতা।

গীবত

'গীবত' আরবি শব্দ। বাংলায় একে 'পরনিন্দা বলে। কোনো মানুষের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়, তাকে বলা হয় গীবত।

www.amarboi.org

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ افَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْ اَخِيْ مَا اَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, "গীবত কী, তা কি তোমরা জানো? সাহাবীরা উত্তরে বললো, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, গীবত হলো কোন ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, এটাও কী গীবত হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহলেই সেটা হবে গীবত। আর তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে না থাকে, সেক্ষেত্রে সেটা হবে মিথ্যা অপবাদ।" (মুসলিম শরীফ)

কারোর বিরুদ্ধে গীবত করা অসচ্চরিত্রের একটি মারাত্মক খারাপ দিক। গীবত বা পরনিন্দা চর্চাকারী কোনভাবেই ভাল মানুষ হতে পারে না, চাই সে হোক অত্যন্ত প্রিয়জন বা আপনজন। গীবত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী সুস্পষ্ট।

وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُم بَعْضًا ج أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ج إِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ.

"তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাই এটাকে ঘৃণা করবে। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ্ অধিক মাত্রায় তাওবা কবুলকারী এবং দয়াময়।" (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১২)

অন্যত্র এ গীবতকারীর মুখের উচ্চারিত শব্দ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

"যে শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হয়, তা সংরক্ষণের জন্য একজন সর্বক্ষণ প্রস্তুত পর্যবেক্ষক নিযুক্ত রয়েছে।" (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ১৮)

অবশ্য শুভাকাঙ্ক্ষীর দৃষ্টি নিয়ে কোনো মুসলিমকে তার দোষ-ত্রুটির কথা বললে স্বভাবত একে সে খারাপ মনে করে না। কেননা এরূপ বলার উদ্দেশ্য থাকে সংশোধন। কিন্তু যদি কাউকে সমাজের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে

www.amarboi.org

তার অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ক্রটি বর্ণনা করা হয়, তাহলে এটা হবে তার মনোকষ্টের কারণ। তাই কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চা করা জায়িয নেই। এ থেকে এ কথা ধারণা করা ঠিক হবে না যে, উপস্থিতিতে কাউকে নিন্দা বা দোষারোপ করা জায়িয আছে। কেননা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, অপমান করার উদ্দেশ্যে কাউকে কষ্টদায়ক কথা বলাকে দোষারোপ বলা হয় এবং তা জায়িয নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ.

"ধ্বংস রয়েছে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে অগোচরে নিন্দা করে এবং সাক্ষাতে ধিক্কার দেয়।" (সূরা আল হুমাযাহ, ১০৪ ঃ ০১)

গীবত ব্যভিচার হতেও গুরুতর অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "গীবত বা পরনিন্দা ব্যভিচার হতেও গুরুতর অপরাধ। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! গীবত কিভাবে ব্যভিচার থেকে গুরুতর অপরাধ হতে পারে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ব্যভিচার করার পর মানুষ আল্লাহর নিকট তাওবা করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। কিন্তু গীবতকারী ব্যক্তিকে যে পর্যন্ত সে ব্যক্তি (যার গীবত করা হয়েছে) ক্ষমা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাকে মাফ করবেন না।"

এ হাদিস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, গীবত করা কোনো অবস্থাতেই জায়িয নেই। অবশ্য কারো দ্বারা এরূপ গর্হিত অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি জীবিত থাকলে এবং তার নিকট থেকে মাফ করিয়ে নেয়া সম্ভব হলে ক্ষমা চেয়ে নিবে। কিন্তু যদি সে মারা গিয়ে থাকে কিংবা দূর এলাকায় চলে যাওয়ার কারণে ক্ষমা চাওয়া সম্ভব না হয়, তবে আল্লাহর নিকট তার গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "নিঃসন্দেহে গীবতের একটি ক্ষতিপূরণ হলো, তুমি যার গীবত বা কুৎসা রটনা করছো তার জন্য এভাবে দু'আ করবে। হে আল্লাহ! তুমি আমার ও তার গুনাহ মাফ করে দাও।"

মৃত ব্যক্তির কুৎসা রটনা করাও পাপ। হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তোমরা মৃত ব্যক্তিকে গালমন্দ করো না। কেননা তারা তাদের কৃতকর্ম পর্যন্ত পৌছে গেছে।" (বুখারী শরীফ)

এমন মারাত্মক পাপকার্য করা একমাত্র অসচ্চরিত্রের মানুষের পক্ষেই সম্ভব। যা শুনাও সচ্চরিত্রবান মানুষের জন্য ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি কাউকে গীবত করতে শুনলে তাকে বাধা দিবে এবং তাতে ভ্রূক্ষেপ করবে না বা তা করা থেকে বিরত রাখবে। সে যদি তা না পারে কিংবা পছন্দনীয় না হয় তাহলে স্থান ত্যাগ করে চলে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

www.amarboi.org

وَإِذَا سَمِعُوْا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ.

"তারা কোনো অসার বাক্য শুনলে তা উপেক্ষা করে চলে যায়"। (সূরা আল কাসাস, ২৮ ঃ ৫৫)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ.

"(তারাই মুমিন) যারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে।" (সূরা মুমিনুন, ২৩ ঃ ০৩)

অনেক সময় হয়তোবা আমরা এমন ভাবলাম যে সে বলছে তার পাপ হচ্ছে আমি শুনতে সমস্যা কী– না এক্ষেত্রেও আল্লাহ্র বক্তব্য সুস্পষ্ট ঃ

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ج إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً.

"এমন কোনো জিনিসের পিছনে লেগো না, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চিত জেনে রাখো, চোখ কান ও দিল সব কিছুর জন্যই জবাবদিহি করতে হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৩৬)

সুতরাং আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে সচ্চরিত্রবান মুসলিম হতে হলে অবশ্যই গীবত বা পরচর্চা করা ও শোনা থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْمُسْلِمِيْنَ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! মুসলিমদের মধ্যে কে সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে সে-ই সর্বোত্তম মুসলিম।"

অন্যত্র রাসূল (সা.) বলেন, "যখন আমার প্রতিপালক আমাকে মি'রাজে নিয়েছিলেন তখন আমি এমন এক শ্রেণীর লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো ছিলো পিতলের নখের মতো। যা দ্বারা তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষ খামচাচ্ছিল। আমি তাদের সম্পর্কে জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, এরা সেসব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত।" এখানে মানুষের গোশত খাওয়ার অর্থ হলো অন্যের গীবত করা ও তাদের সুনাম ও খ্যাতি নষ্ট করার চেষ্টায় রত থাকা।

তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গীবত জায়িয আছে। যেমন ঃ ০১. মাযলূম

www.amarboi.org

কর্তৃক যালিমের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ করা, ০২. মুফ্‌তীর নিকট ফতোয়া চাওয়ার সময় ঘটনার বিবরণ দিতে কারও দোষ-ত্রুটি বলার প্রয়োজন হলে তা বলা, ০৩. প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি যাতে গোটা সমাজকে মন্দ কাজে জড়িত করতে না পারে, সেজন্য তার পাপাচারের কথা প্রকাশ করা, ০৪. সাধারণ মানুষকে কোনো অনিষ্টকর লোকের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য তার সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া।

গীবত কোনো অবস্থায়ই জায়িয নেই। উপস্থিতিতে কাউকে দোষারোপ করার চেয়ে কারো অনুপস্থিতিতে তার গীবত করা অধিকতর দূষণীয়। কেননা অনুপস্থিতিতে কারো দোষের কথা বললে তার জবাব দেয়ার কেউ থাকে না। ফলে যে দোষ বা ত্রুটির কথা বলা হচ্ছে, তা সত্য না মিথ্যা বুঝার আর উপায় থাকে না। গীবত করার মতো গীবত শোনাও পাপের কাজ। কোনো ব্যক্তি যখন কারো গীবত করতে থাকে, তখন শ্রোতাদের উচিত গীবতকারীকে গীবত থেকে বিরত রাখা। এ ক্ষেত্রে গীবতের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। তাহলে পরনিন্দার চর্চা সমাজ থেকে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হয়ে যাবে।

কূটনামী বা চোগলখোরী করা

ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অন্যের কানে লাগানো কূটনামী বা চোগলখোরী। চোগলখোরী কবীরা গুনাহ্। অসচ্চরিত্রের লোকেরা সাধারণত এমনটি হরহামেশাই করে থাকে। কিন্তু তারা জানে না এতে কেমন পাপ! এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা হলো ঃ

অপরের নিকট যে কথা ব্যক্ত করা হবে, তা যদি মিথ্যা না হয় অর্থাৎ সঠিক ও সত্য হয়, তবে এতে কেবল চোগলখোরীর (একটি) গুনাহ্ হবে। আর যদি অন্যের কাছে ব্যক্ত করা কথা মিথ্যা হয় অথবা নিজের পক্ষ থেকে তাতে কিছু কমানো বাড়ানো হয় কিংবা কোনো মন্দ ভঙ্গি বা অশুভ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, তবে এটা মিথ্যারোপ ও অপবাদের শামিল হবে, যা স্বতন্ত্র আরেকটি কবীরা গুনাহ্। এমনিভাবে যে ব্যক্তির নামে চোগলখোরী করা হয়েছে, যদি এতে সে ব্যক্তির কোনো দোষ প্রকাশ করা হয়, তবে এই দোষ প্রকাশ করা হবে গীবত, যা তৃতীয় আরেকটি স্বতন্ত্র গুনাহ্। এভাবে চোগলখোর ব্যক্তি এককথায় তিনটি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। তাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَاتُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ - هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ.

"এবং অনুসরণ করো না তারা যে কথায় কথায় শপথ করে। যে লাঞ্ছিত,

www.amarboi.org

পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগাইয়া বেড়ায়।" (সূরা আল কালাম, ৬৮ ঃ ১০-১১)

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর নিকট একদা এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে কারও সম্পর্কে একটি কথা উল্লেখ করার পর তিনি বলেছেন, দেখো, তুমি যে কথা বলছো আমি এর তদন্ত করার পর মিথ্যা প্রমাণিত হলে, তুমি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا. (যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখো।) (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৬) আর যদি তোমার কথা সত্য প্রমাণিত হয়, তবে তুমি এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ. (যে পশ্চাতে নিন্দা করে এবং একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে ফিরে।) আর যদি তুমি চাও, তবে বলো, তদন্ত করার পূর্বেই আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেই এবং তোমার বিষয় এখানেই শেষ করে দেই। লোকটি আরজ করলো, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি ক্ষমা চাচ্ছি, ভবিষ্যতে কখনও এমন কাজ করবো না।

আল কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে চোগলখোরীর নিষিদ্ধতা ও নিন্দাবাদ উল্লিখিত হয়েছে।

হাদিস শরীফে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি কারা, তা আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি– যারা একজনের কথা নিয়ে অপরজনের কাছে পৌছায়, বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনদের মাঝে মন-মালিন্য ও ঝগড়া সৃষ্টি করে এবং যারা নিরাপরাধ লোকদের দোষ তালাশ করে বেড়ায়, তারাই তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম।"

وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ.

হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "চোগলখোর কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (বুখারী শরীফ)

হাদিস শরীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, "মিথ্যা অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হয় আর চোগলখোরী কবরের আযাবের কারণ হয়।" (বায়হাকী শরীফ)

এহ্ইয়াউল-উলূম কিতাবে আছে, তোমাদের কাছে যদি কেউ চোগলখোরী করতে আসে, তবে তোমাদের জন্য জরুরী হলো, নিম্নের ছয়টি বিষয়ের প্রতি খুবই খেয়াল রাখো ঃ

www.amarboi.org

এক. তার কথা বিশ্বাস করো না। কেননা সে দ্বিমুখী চরিত্রে অভ্যস্ত; তার সাক্ষ্য শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়।

দুই. তাকে এ কাজ থেকে বারণ করো এবং সদুপদেশ প্রদান করো।

তিন. তার এ কাজটিকে মন্দ বলে বিশ্বাস করো এবং ঘৃণা করো।

চার. তার কথায় অনুপস্থিত ভাইয়ের প্রতি কুধারণা পোষণ করো না।

পাঁচ. চোগলখোরের কথায় সে ভাইয়ের বিষয়ে অনুসন্ধান ও তদন্তে লেগে যেওনা, কেননা এরূপ করাও একটি স্বতন্ত্র গুনাহ।

ছয়. চোগলখোরের এহেন আচরণের কথা অন্যত্র বর্ণনা করো না, অন্যথায় এর অর্থ হবে, তুমি নিজেও চোগলখোরীতে লিপ্ত হলে।"

এখন চিন্তা করুন– ক'জন মুসলিম এই কবীরা গুনাহ এবং এতো বড় আপদ থেকে মুক্ত আছে বা এ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে।

আমাদের সভা-সমিতি ও বৈঠকাদি যেখানে কিছু লোক একত্র হয়, এগুলোতে চোগলখোরী, দোষারোপ, দোষ অন্বেষণ, গীবত, অপবাদ ইত্যাদি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অথচ এগুলো কবীরা গুনাহ; অহেতুক আমাদেরকে ধ্বংস করছে। এতে না কোনো ফায়দা বা স্বার্থ আছে, না কোনো স্বাদ বা মজা। আমাদের কোনো প্রয়োজনও এর উপর নির্ভরশীল নয়। কেবল শয়তানের ধোকা ও প্রতারণা এবং আমাদের গাফলতি ও অবহেলার দরুন নিজেদেরকে আমরা দ্বীন ও দুনিয়ার ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছি।

লাগামহীন কথাবার্তা

একটি কথা, শুধু বলা; যার জন্য হতে পারে অনেক সমস্যা, অনেক ঝামেলা, বেড়ে যেতে পারে দ্বন্দ্ব-কলহ। এমন লাগামহীন কথা-বার্তা যারা বলে থাকেন তাদেরকে অনেকেই বলে থাকেন বাঁচাল। আরেকটু মন্দভাবে স্ক্রু ঢিলা বা মাথা খারাপ বলে অপবাদ দিয়ে থাকে। তবে যে যাই বলুক না কেন এটা সত্য মানুষের জান্নাত-জাহান্নাম মূলত কথা বলার উপরই নির্ভর করে থাকে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন ঃ "মানুষের সকল কথাই তার জন্য শাস্তির কারণ এবং ক্ষতিকর হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ সকল কথা তার জন্য উপকারী হয়ে থাকে, যা সে কোনো ভাল কাজের হুকুম করার জন্য অথবা খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য বা আল্লাহ্ পাকের যিকিরের জন্য বলে থাকে।" (তিরমিযী শরীফ)

আমাদের পারিবার ও সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা মেধা না খাঁটিয়ে কোনো কিছু না বুঝেই বা বুঝার চেষ্টা না করেই যেকোন স্থানে কথা বলতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করে নিজেকে কথার মাধ্যমে অন্যদের উপরে আসীন

www.amarboi.org

করতে, যৌক্তিকতার নিরীখে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। নিজেকে অনেক জ্ঞানী ভেবে সাধারণত কতিপয় মানুষ এমনটি করে থাকে। কিন্তু এতে যে তার মনের অজ্ঞান্তেই অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা কিন্তু সে বুঝতে পারে না। এতে সমাজের লোকজনেরা যেকোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনায় তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় না এবং বিরক্তিকর ভাব পোষণ করে থাকে। কেননা তারা কথা বলতে শুরু করলে অন্যদের কথা বলার সুযোগ দিতে চায় না, সময়ের প্রতি খেয়াল রাখে না, বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিনা তা খেয়াল রাখে না আর এমন কথা বলে যা অনেকেই পছন্দও করতে চায় না। আসলে যে বেশি কথা বলবে তার ভুল বেশি হবে, কথার ধারাবাহিকতা থাকবে না। এতে ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। আজকাল যত ধরনের দ্বন্দ্ব-কলহ হয়ে থাকে তার অধিকাংশই কথা বলার জন্যে হয়ে থাকে। কাজেই কথা বলার পূর্বেই চিন্তা-ভাবনা করে বলা আবশ্যক। এতে কথার গুরুত্ব ঠিক থাকে। সম্মান পাওয়া যায়। আল্লাহও পছন্দ করেন। কথা খুব মূল্যবান। এটি একটি সম্পদ; সম্পত্তি নয়। কথায় আছে, শুধু কথার জন্যই মানুষ, মানুষকে মূল্যায়ন করে আবার কথার জন্যই অবমূল্যায়ন; অপছন্দ এবং অবশেষে বিচ্ছেদনীতিসহ ঘৃণা পোষণ করে থাকে। সুন্দর অর্থপূর্ণ কথা বলে সুন্দর পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাসহ আল্লাহর জান্নাত- নামক সুখের স্থানও লাভ করা সম্ভব।

রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

সহল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার যবান ও যৌন জীবনের জামিন হতে পারে, আমি তার জান্নাতের জামিন হবো।" (বুখারী শরীফ)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্য কথা বলিও না। কারণ আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্য কথা বেশি বললে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। নিশ্চয়ই সকল মানুষের মধ্যে কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ পাক থেকে বেশি দূরে।" (মিশকাত শরীফ)

উপরিউক্ত হাদিসসমূহ থেকে এ কথা জানা গেলো যে, প্রতিটি মানুষের উচিত নিজ জীবনের প্রতিটি মিনিট এবং প্রতিটি সেকেন্ড আল্লাহ্ পাকের স্মরণে কাটানো এবং প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের কদর করে, পরকালের জীবনকে সুন্দর করার জন্য তা ব্যয় করা। যে সকল লোকেরা আড্ডা মেরে, অহেতুক আলোচনা

www.amarboi.org

করে, সংবাদপত্রসমূহের মিথ্যা সংবাদ নিয়ে আলোচনা করে এবং অন্যান্য গল্প গুজব করে নিজের সময় নষ্ট করে থাকে, আর আল্লাহ পাকের যিকির থেকে গাফেল থাকে, এ সকল মজলিস ও কর্ম তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হবে।

হায়াত (জীবন) মানুষের নিকট মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দেয়া পুঁজি (মূলধন) স্বরূপ, যা নিয়ে সে দুনিয়ার বাজারে ব্যবসা করতে আসে। দুনিয়ার এ বাজার থেকে হায়াত নামক পুঁজি (দিন-রাত, ঘণ্টা-মিনিট ও প্রতিটি মুহূর্ত এ পুঁজির মূল্যবান অংশ, যা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে মানুষের নিকট হতে কমে যাচ্ছে) খরচ করে কেউ কেউ নেক কাজের মাধ্যমে জান্নাতের টিকেট হাসিল করছে, আবার কেউ কেউ এ মূল্যবান পুঁজির বিনিময়ে অসৎ কাজ করে জাহান্নামের টিকেট খরিদ করছে। আফসোস ঐ ব্যক্তির জন্য যে নিজের মূল্যবান পুঁজি ব্যয় করে, নিজের ধ্বংসের উপকরণ ক্রয় করে।

বিশ্বাসঘাতকতা

বিশ্বাসের স্থানে থেকে বিশ্বাস ভঙ্গ করা-বিশ্বাসঘাতকতারই শামিল। বিশ্বাসের ভিত্তি একমাত্র আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর আদর্শেই গড়ে উঠতে পারে। দীর্ঘদিন মানুষের সাথে চলা-ফেরায়, কথা-বার্তায়, চিন্তা-চেতনায়, লেন-দেনের ফলে একে অন্যের প্রতি সৃষ্টি হয়ে থাকে এ বিশ্বাসের ভিত্তি। বিশ্বাস সম্পত্তি নয়, মূল্যবান সম্পদ। যা অনেক সাধনা ও ত্যাগের ফলে অর্জন করতে হয় কিন্তু ভঙ্গ করা কোনো এক মুহূর্তে কোনো একটি ঘটনা-দুর্ঘটনার প্রয়োজন মাত্র। ব্যক্তি স্বার্থের জন্যই মানুষ বিশ্বাস ভঙ্গ করে থাকে যা ইসলামে নিষিদ্ধ। বিশ্বাস ভঙ্গের ফলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে ব্যক্তিগত জীবন; ভাঙ্গন সৃষ্টি হতে পারে পরিবারের; লাঞ্ছনা, অপমান, গুঞ্জন সৃষ্টি হতে পারে সমাজে; রাষ্ট্রীয়ভাবে হারাতে হতে পারে এমন কিছু যার ক্ষতি পূরণ হওয়ার মতো নয়। মানব চরিত্রের একটি জঘন্যতম ঘৃণিত কাজ এটি। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতনের মূলে ছিলো মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা যা সকলেরই জানা। প্রধান সেনাপতি থেকে নবাব হওয়ার কামনায় তার এ বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে প্রায় দু'শ বছর গোলামী করতে হয়েছে এ জাতিকে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে যার মূল্য আজও এ উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীকে দিতে হচ্ছে। তাই আজ আমাদের মায়েরা ভুল করেও মীরজাফর তাদের সন্তানের নাম রাখতে চান না। জেনে শুনে মীরজাফর নাম রাখে এমন কাউকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সবাই এ নামের সাথে যেন সেই বিশ্বাসঘাতকতারই সম্পর্ক খুঁজে পান। অথচ পাশাপাশি এদেশের

www.amarboi.org

অনেক মায়ের সন্তানদের নাম সিরাজ উদ্দৌলা রাখা হয়েছে। রাখা হচ্ছে অনেকের নাম আবু বকর, উসমান, উমর ও আলী হায়দার।

আমাদের প্রিয় নবী রাসূল (সা.)-এর জিন্দেগীতেও আমরা এমন বিশ্বাসঘাতকের অবস্থান দেখতে পাই। যাদের জন্যে রাসূল (সা.) অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। বিশ্বাসী হওয়া এটি রাসূলের সিফাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত আর বিশ্বাসঘাতক হওয়া রাসূলের পরিপন্থি একটি জঘন্যতম অনৈসলামিক কাজ যা সচ্চরিত্রের মানুষের জন্য বর্জন করাই আবশ্যক। আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا لاَ تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।" (সূরা আল আনফাল, ০৮ ঃ ২৭)

বিশ্বাসঘাতকতা, মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তার চিন্তা ও অনুভূতিকে বিভ্রান্তি ও ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে। লোভ-লালসা বর্তমান থাকার কারণে এটা এক ভয়াবহ হুমকি হয়ে দেখা দেয়। ঈমান ও যুক্তিজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হওয়ার কারণে কুচিন্তা তাকে নীচতা ও অপমানের পথে পরিচালিত করে। একজন শ্রমিক বা একজন ব্যবসায়ী বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা কিছু বস্তুগত স্বার্থ হাসিল করতে পারে। সম্ভবতঃ স্বল্প সময়ের জন্য সে তার ষড়যন্ত্র ও জালিয়াতি গোপন রাখতে পারে, কিন্তু একদিন গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যখন সত্য উদঘাটিত হয়ে পড়বে, তখন সে ব্যক্তি তার একমাত্র মূলধন বিশ্বস্ততা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের অপকর্মের ফলে তার সামাজিক মর্যাদাও কলঙ্কিত হয়। বিশ্বাসঘাতক লোকেরা অবিরত ভীতির মধ্যে বসবাস করে। তারা দুচিন্তা ও অস্থিতিশীলতাকে ভয় করে এবং স্বভাবতঃই তারা হতাশাগ্রস্ত।

এটা সর্বস্বীকৃত সত্য যে, জনজীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা সামাজিক নিরাপত্তার উপর নির্ভরশীল। যেহেতু সামাজিক পরিবেশ বিনষ্টকারী নিরাপত্তাহীনতা ও মারাত্মক দুশ্চিন্তা বিশ্বাসঘাতকতা হতে উৎপন্ন হয়, তাই এর ফলে সামাজিক জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বস্তুতঃপক্ষে, যেখানে বিশ্বাসঘাতকতা হতে কোনো নিরাপত্তা নেই, সেখানে মুক্তি, ভ্রাতৃত্ব বা মানবতা বলে কিছুই থাকতে পারে না। বিশ্বাসঘাতকতা কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে

www.amarboi.org

সীমিত থাকে না। এটা মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। কথা ও কাজ পরীক্ষা করা হলে এর সূক্ষ্ম ও সুস্পষ্ট সীমানা ধরা পড়ে এবং যখন কেউ এসব সীমানা হতে সামান্যতম বিপথগামী হয় সে বিশ্বস্ততা হারিয়ে ফেলে এবং একসময় মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতার ময়দানে প্রবেশ করে।

বিশ্বাসঘাতকের জন্য ইসলামে কোনো ক্ষমা নেই। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে মুসলিমের সম্পদ আত্মসাৎকারীদের জন্য ইসলাম হাত কাটার বিধানও দিয়েছে। সামাজিক অধিকার ও জনগণের নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ইসলামে দণ্ডবিধি কঠোরভাবে কার্যকর করা হয়ে থাকে। এ ব্যবস্থা সমাজে দায়িত্ববোধকে গুরুত্ব দিয়ে ন্যায়পরায়ণ দল তৈরিতে সহায়তা করে। মানব সমাজের অধঃপতনের কারণ হওয়া ছাড়াও প্রতিটি মন্দ কাজের পরিণতি এ দুনিয়া ও আখিরাতে মন্দই হয়ে থাকে।

ঈমান হচ্ছে আত্মার প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র। এটা এমন সব উপাদানসমূহের মধ্যে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান যা মানুষের অন্তরের গভীরে পৌঁছে যায়, এটা সূক্ষ্ম শৃঙ্খলার সাথে মানুষের কাজ ও আচার-আচরণসমূহকে সংগঠিত করে। ঈমান মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ববোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। সামাজিক দুর্নীতির প্রভাবের বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করে দেয় এবং সমাজকে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে পরিচালিত করে।

ঈমান দুর্নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রতিরোধ করে। এটা মাতা-পিতাকে তাদের সন্তান-সন্ততিদের ছোটবেলার অভ্যাসসমূহ সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে, তাদের মধ্যকার প্রশংসনীয় গুণাবলিকে সমর্থন করে, তাদের সন্তানদের অন্তরে ঈমানকে কার্যকরী করে– যাতে সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জীবনে পরিণত করার পথ সুগম হয়।

খ্যাতি লাভের প্রবণতা

সমাজে কিছু লোক রয়েছে যারা নিজেদের খুব প্রশংসা শুনতে না চাইলেও দোষ শুনতে শতভাগ নারাজ। সবসময় চায় খ্যাতি লাভ করতে। শ্রেষ্ঠ আসনে উচ্ছ্বসিত হতে। আজকাল শাসক, নেতা ও সম্পদশালীদের চাকচিক্য ও জৌলুসপূর্ণ পোশাক পরিধান করা, বি.এম.ডব্লিউ, ল্যাকসাস গাড়িতে চড়া, কোথাও হেলিকপ্টারে চড়ে আকাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে বিয়ে করা, সভা-সমাবেশে যোগ দেয়া, যাতে করে সাধারণ মানুষের অন্তরে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিংবা ধর্মীয় নেতা, দুনিয়া ত্যাগী দরবেশ, সন্ন্যাসী ইত্যাদি ধরনের লোকেরা দ্বীনি ও পবিত্রতার সাইনবোর্ড লাগিয়ে খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করা ইত্যাদি সবই ইসলামে নিষিদ্ধ।

www.amarboi.org

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذِلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি খ্যাতি ও প্রদর্শনীর পোশাক পরিধান করলো কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে অপমান ও লাঞ্ছনার পোশাক পরিধান করাবেন।" (আবু দাউদ শরীফ)

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ধনী ও নেতাদের বিশেষ কোনো পোশাক নেই আর ধর্মীয় শ্রেণীর আধ্যাত্মিক পবিত্রতা প্রকাশব্যঞ্জক কোনো বিশেষ ধরনের পোশাকের ব্যবস্থাও এখানে নেই।

সন্দেহপ্রবণতা

চরিত্রের অন্যতম মন্দ দিক হলো সন্দেহ প্রবণতা। এটি বন্ধু মহলে, পারিবারিক অঙ্গনে ও সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা ভাঙ্গনের ক্ষেত্রে একটি উপাদান। সন্দেহ প্রবণতা মানুষকে বিরাট বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। নিজেদের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায় সুন্দর সাজানো সুখের সংসার। এ থেকেই সূচনা হয় রাগ-অভিমানের, তারপর একদিন দু'দিন কথা বলা বন্ধ, সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে দূরত্ব যা এক পর্যায়ে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছেদের রূপ ধারণ করে। এটি ঘটতে পারে মা-বাবার সাথে পুত্র ও কন্যার, আবার মা-বাবা কর্তৃক একে অন্যের প্রতি, সৃষ্টি হতে পারে বন্ধুদের মহলে, সমাজের একজন ব্যক্তির সাথে অন্যজনের, রাষ্ট্রীয়ভাবে এক নেতার সাথে অন্য নেতার- যার পরবর্তী অবস্থান নেগেটিভ। আমাদের সমাজে এর বহুল প্রভাব লক্ষণীয়। যা সৃষ্টি করা ইসলামিক ভাষ্যমতে শয়তানের কাজ। কাজেই এটি দূরীভূত করতে যা প্রয়োজন তা হলো- খোলামেলা আলোচনা করা, কথা বলা, একে অপরকে যথেষ্ট ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করা, অন্তর থেকে ভালবাসা উপলব্ধি করা এবং বিশ্বাস করা। কখনো এমন কিছু ঘটলে যা অপছন্দনীয় বা নেগেটিভ তা হলে তার সাথে বলে বিষয়টির ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা।

একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটি হলো- নেগেটিভ সব সময় নেগেটিভ জন্ম দেয়। বিষয়টি আরেকটু সহজবোধ্য করার জন্য বলছি। মনে করুন আপনি বাবা, কোনভাবে আপনার পকেটের বা ব্যাগের কিছু টাকা পাওয়া যাচ্ছে না বা হিসাব মিলছে না, আপনি ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা না করেই সন্দেহ করলেন আপনার পোষ্যকে এবং বলেও ফেললেন। কিন্তু আসলে তারা নেয়নি। আপনি বলার পরে তারা চেষ্টা করল আপনাকে বুঝাতে কিন্তু পারল না,

www.amarboi.org

কান্নাকাটি ও মন খারাপ করল কিন্তু আপনার মনে সেই ধারণাই বদ্ধমূল থাকল তারা এটি করেছে। এক পর্যায়ে শয়তানের প্ররোচনায় আপনার পোষ্যরা মনে মনে ভাবে আমি করিনি তারপরও দোষী! ঠিক আছে তাহলে করেই দেখি। পরবর্তীতে এক সময় তারা সেটি করেই বসে যা আসলে নেগেটিভ। হয়তোবা এ ঘটনার পূর্বে এভাবে বাবার পকেট বা ব্যক্তিগত ড্রয়ার, মায়ের ব্যাগ থেকে টাকা নেয়ার কথা কোনদিন ভাবেনি। কিন্তু যেই না নিয়েই দোষী সাব্যস্ত হলো সেই ভাবলো, ঠিক আছে তা একবার করে চাইনিজ বা কক্সবাজারে ভ্রমণ করতে গিয়েই দেখি কেমন লাগে– যা সত্যিই দুঃখজনক।

তেমনি আজকের পরিবার ও সমাজ সামাজিকতার বিভিন্ন অঙ্গনে একে অপরকে এভাবে সন্দেহ করে থাকে এবং দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পরে। আবার বাস্তব ও হতে পারে আমি বাস্তবতাকেও একদম অস্বীকার করছি না, তবে দুটিই ক্ষতিকর। চরিত্রের অসৎ দিক। যা আলোচনা ও একে অন্যকে বুঝার মধ্য দিয়ে দূরীভূত করা যেতে পারে। অন্যথায় পরিবার ও সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকেও আসতে পারে প্রচুর লা'নত, দুনিয়াতে শাস্তি আখিরাতে চরম ভোগান্তি।

সন্দেহ ও বাস্তবতা এক কথা নয়। সন্দেহ অনেক ক্ষেত্রেই প্রবল ভাবনা থেকে সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় নেগেটিভ চিন্তা-ভাবনা থেকে। প্রচুর সতর্কতা থেকে, খোলামেলা আলোচনা না হওয়া থেকে, একে অপরের মধ্যে দূরত্ব থাকা থেকে। কাজেই মানব চরিত্রের উত্তম বহিঃপ্রকাশ হলো সন্দেহপ্রবণতা থেকে দূরে থাকা এবং কোন কিছু সন্দেহ হলেই তা না করা, তার প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করা আর আগে থেকে তাকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে সংশোধন করানোর চেষ্টা করা।

কথায় কথায় কসম খাওয়া ও শপথ করা

কসম শব্দের আভিধানিক অর্থ 'শক্তি'। ইসলামী পরিভাষায় কসম এমন এক শক্তিময় বন্ধনকে বুঝায় যার দ্বারা কসমকারী ব্যক্তির কোনো কাজ করা বা না করার ইচ্ছা দৃঢ় করা হয়। আমাদের সমাজে এমন বহুজন আছে যারা কথায় কথায় যেকোন সময়ে যেকোন প্রয়োজন পূরণে কসম কেটে থাকে। ওয়াদা বা শপথ করে থাকে। তাদের কাছে এটি নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র। তাদেরকে দেখলে প্রথমত খুব আত্মবিশ্বাসী মনে হয়, তারা নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণ করানোর চেষ্টায় মূলত কসম ও শপথ করে থাকে।

কসম সমাজে যথেচ্ছা ব্যবহার করা হয়ে থাকে কিন্তু সেই অনুযায়ী উভয় পক্ষের দ্বারা এর বাস্তবায়ন যথার্থ হয় না বলে অনেকেই এটিকে বিশ্বাস করতে

www.amarboi.org

চায় না। সত্য কথা বললেও অনেক ক্ষেত্রে কেউ কেউ সেটাকে সত্য মনে করে না। ফলে বেড়ে যাচ্ছে দ্বন্দ্ব-কলহ, অসন্তোষ, অমর্যাদাবোধ বা অপমান লাঞ্ছনা, এতে মানুষের মধ্যে মূল্যায়ন ও মূল্যবোধের ঘাটতি দেখা দেয়। মনের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন কথা বলা। আর এ কথার যখন কোনো মূল্য থাকে না তখন ঐ ব্যক্তি হয় সমাজে অবহেলিত যা ভবিষ্যতের জন্য চরম ক্ষতিকর।

রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِى الْبَيْعِ فَاِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ.

আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ "বেচা-কেনায় অধিক অধিক শপথ করা ও কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকো। কারণ, এর ফলে প্রথমে কারবার চলে বটে, পরে বরকত উঠে যায়।" (মুসলিম শরীফ)

এমন কসম খাওয়া এবং তাদের পরিবার প্রসঙ্গে আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ.

"এরা (পরকালীন শাস্তির ব্যাপারে মিথ্যা কসম খেয়ে) নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী।" (সূরা আত্-তাওবা, ০৯ ঃ ৪২)

যেকোন বিষয়ের ক্ষেত্রে যথেচ্ছা বারবার চিন্তা-ভাবনা না করে শপথ করা উচিত নয়। এতে শপথকারী হয়তোবা শপথ অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হতে পারে। অপরপক্ষে যাদের সাথে শপথ করা হয়েছে তারাতো মনে করবে শপথকারী অবশ্যই তা বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু ব্যত্যয় ঘটলে তার প্রতি অন্যদের ধারণা একদমই নাজুক হয়ে যায়– যা পরবর্তীতে সুন্দর সমাজ ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে অত্যন্ত কঠোরভাবে শপথ বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।" (সূরা আল মায়িদা, ০৫ ঃ ০১)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَاتَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَاتَفْعَلُوْنَ.

www.amarboi.org

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করোনা, তা কেন বল? তোমরা যা করোনা, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।" (সূরা আস সাফ্, ৬১ ঃ ২৩)

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً.

"এবং তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৩৪)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَٰئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

"যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দিবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ৭৭)

وَأَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلاً ج إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ.

"আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না। অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তা জানেন।" (সূরা আন নাহল,১৬ ঃ ৯১)

ইসলাম ধর্মে কসম খাওয়া, শপথ করা একদম নিষিদ্ধ নয়, তবে এ কসম খাওয়া ও শপথ করা যদি এমন হয় আশা দিয়ে নিরাশ করে হতাশায় পরিণত করার শামিল, কোনো রকম প্রতারণা করা, ধোঁকাবাজি করা, ঠগবাজি করে মানুষের হককে হরণ করা তাহলে তাতো অবশ্যই নিষিদ্ধ। আবার পাশাপাশি যদি ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে কসম খাওয়া ও শপথ করা হয় এবং সে অনুযায়ী যদি কাজটি বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে এ ব্যাপারে সবার দৃষ্টিভঙ্গী হবে সুন্দর ও স্বচ্ছ।

কথা ও কাজের বৈষম্য

কথা ও কাজের ঐক্য যাদের জীবনে নেই তারা কখনো সচ্চরিত্রবান মানুষ হতে পারে না। যারা বলে একটা করে আরেকটা তাদেরকে কেউ বিশ্বাস করে না। কোনো কাজের ক্ষেত্রে কেউ তাদের উপর নির্ভর করে না। আর নির্ভর করা

www.amarboi.org

ঠিকও না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদেরকে প্রশ্ন করে বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفعَلُوْنَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّٰهِ أَن تَقُوْلُوْا مَالاَتَفْعَلُوْنَ.

"হে মুমিনরা! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা তোমরা করো না? আল্লাহর কাছে এ অত্যন্ত অসন্তোষজনক যে যা তোমরা বলো তা করো না।" (সূরা আস সাফ্, ৬১ ঃ ০২-০৩)

এক সময় ছিলো, যখন মানুষ কোথাও কোনো কথা দিয়ে দিলে পরবর্তীতে এ কথা দেয়ার জন্যে তার ক্ষতি হলেও তা ভঙ্গ করত না। বরং বলত আমি যা কথা দিয়েছি তাই কথা এবং তাই হবে। এযাবৎ যত ক্ষতিই হোক এমনকি জীবন গেলেও সেই কথা অনুযায়ী কাজ করা হবে। মুসলিম উম্মাহর অর্থনীতি ও সমাজনীতি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে আজকে প্রয়োজন নেতৃস্থানীয় সকল স্তরের ব্যক্তিবর্গসহ স্ব-স্ব অফিসের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী ও সকল স্তরের কর্মকর্তাদের কথা ও কাজের বৈষম্য দূরীভূত করা। নচেৎ রাষ্ট্র উন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন এমনকি ব্যক্তিক উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا اَخَافُ عَلٰى هٰذِهِ اْلاُمَّةِ كُلَّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ.

উমর (রা.) ইবনে খাত্তাব নবী কারীম (সা.) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "এ উম্মতের এমন সব মুনাফিক সম্পর্কে আমার আশংকা হয়, যারা কথা বলে সুকৌশলে আর কাজ করে যুলুমের সাথে।" (বায়হাকী শরীফ)

এখানে মুসলিম সমাজের ঐসব নেতা ও শাসকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা মুখে কেবল ইসলাম-ইসলাম করে অথচ সুযোগ পেলে তারাই ইসলামের সীমালঙ্ঘন করে। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে ইসলামী পোশাক ও হজ্বে যেয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় কিন্তু বাস্তবে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত পথে গমন করে না। ইসলামী অনুশাসন মেনে চলে না। তাদেরকে ইসলামে জুলুমবাজ হিসেবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন ঃ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَ هُمْ اسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ.

www.amarboi.org

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ "জুলুম থেকে বিরত থাক। কারণ জুলুম কিয়ামতের দিন যুলুমাতের (অন্ধকারের) কারণ হবে। কৃপণ লোক ও সংকীর্ণমনা হওয়া থেকে মুক্ত থাকো। কারণ এটা তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ধ্বংস করেছে, রক্তপাত ঘটানো এবং সম্মানহানির কাজে প্ররোচনা দিয়েছে।" (মুসলিম শরীফ)

কী এক নারকীয় খেলা! নেই কথা ও কাজের মধ্যে সাম্য ও একতা। নেই রাষ্ট্রের উন্নয়নে চিন্তা ও কর্মের একতা। তারা নিজেরাই আইন প্রণয়ন করে আবার নিজেদের প্রয়োজনে নিজেরাই প্রথম ভঙ্গ করে। ফলে পরবর্তীতে এ আইনের প্রয়োগ আর তেমন হয় না। এভাবে সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে।

কীনা বা অন্তরে অন্তরে শত্রুতা পোষণ করা

কীনা বা অন্তরে অন্তরে শত্রুতা পোষণ করা অসচ্চরিত্রের লক্ষণ। এর ফলে কীনাকারী ব্যক্তি উত্তম কাজ করার তেমন সুযোগ পায় না। সব সময় সে অন্যকে কিভাবে ঘায়েল করবে তার চিন্তা ও সুযোগ খোঁজা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এ ধরনের ব্যক্তি প্রকাশ্য শত্রু থেকেও জঘন্য। এরা অন্যের ক্ষতি করতে পারে বেশি। তাদের চরিত্র মুনাফিকদের চরিত্রের সাথে মিলে যায়। তারা এমনিতে ভাল থাকে কিন্তু অন্তরগত দিক থেকে আরেক রকম হয়ে থাকে। তাদের পরিচয় সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক কুরআনে বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ.

"আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যার কথা-বার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃত পক্ষে সে জীবন কলহপ্রিয়।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২০৪)

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.

"তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন এবং তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১০)

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ.

www.amarboi.org

"এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, ইহা তাদের কলুষের সাথে আর কলুষমুক্ত করে এবং তাদের মৃত্যু ঘটে কাফির অবস্থায়।" (সূরা আত্-তাওবা, ০৯ ঃ ১২৫)

কাজেই অন্তরকে এক আল্লাহর দিকে রুজ্জু করে আল্লাহর কাছে রহমতের আশা করা উচিত। একমাত্র আল্লাহই আমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা। তিনিই আমাদের জীবনদাতা আর যে জীবন পেয়ে আমরা আজ তাকে ভুলতে বসেছি এ জীবন হরণ করার ক্ষমতাও তার হাতে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেভাবে দুনিয়ার জিন্দেগীতে জীবন ধারণ করতে বলেছেন ঠিক সেভাবেই আমাদের করা উচিত। আর তাহলেই আমরা জাহান্নামীদের দল থেকে মুক্তি পেতে পারবো। আল কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

"হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।" (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫৭)

যারা আল্লাহর হিদায়াত ও রহমতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কাজেই অল্প দিনের এ জিন্দেগীতে অসচ্চরিত্রের দিকে ধাবিত না হয়ে আমাদেরকে সৎ পথে ফিরে আসা উচিত। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ج فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ج وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.

"যখন তাকে বলা হয় তুমি আল্লাহকে ভয় কর (সচ্চরিত্রবান হও, অসচ্চরিত্রের চিন্তা অন্তর থেকে দূর করে দাও) তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে। সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় উহা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২০৬)

হত্যা সন্ত্রাস

হত্যা সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম কোনো কালেই কোনো জাতির জন্য কাম্য নয়। এটি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে শান্তি ও কল্যাণের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে। মানুষের অধিকারকে কেড়ে নেয়। সন্তানদেরকে করে এতিম, স্ত্রীকে করে

www.amarboi.org

স্বামীহারা বিধবা, মা-বাবাকে করে সন্তানহারা, আর রাষ্ট্রকে করে ক্ষতিগ্রস্ত। পৃথিবীর কোনো ধর্মই হত্যা সন্ত্রাসকে সমর্থন করে না। এ আচরণকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثٰى بِالْأُنْثٰى ج فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের (প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য হত্যার দাবি করা) বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। এটি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৭৮-১৭৯)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا.

"কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুনিমনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; যেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ৯৩)

কাজেই বলবো, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী যারা আল কুরআনের এ বিধান সম্পর্কে অবহিত থাকবে তারা কখনই এমন হত্যা ও সন্ত্রাসমূলক কাজ করতে পারে না। আজকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে বেশির ভাগ হত্যা সন্ত্রাস সৃষ্টি হচ্ছে—

এক. হত্যা করার মাধ্যমে কারোর সম্পদকে করায়ত্ব করা।

www.amarboi.org

দুই. যৌতুকের দাবি এবং পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হওয়ার কারণে।
তিন. অসচ্চরিত্রের কৃতকর্ম ছড়িয়ে পড়া এবং তা ঢেকে দেয়ার জন্যে।
চার. রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল ও ক্ষমতাবান হওয়ার জন্যে।
পাঁচ. আগে ভালবাসা পরে ছিদ্রান্বেষণ করা, দূরে ঠেলে দেয়া বা অন্যায়ভাবে অপমান-অপদস্ত করার কারণে।

এবার এমন ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম দূরীভূত করার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো আদর্শ শিক্ষার প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতিকে সচ্চরিত্রবান করে গড়ে তোলা। ব্যাপকভাবে এ সবের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন ও গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। কেননা, আল কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ج وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ.

"নর হত্যা বা দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারোর প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।" (সূরা আল মায়িদা, ০৫ ঃ ৩২)

চুরি ছিনতাই

জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ধন সম্পদ বিশেষ প্রয়োজন। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্যেই মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে ব্যস্ত সময় কাটায়, ছুটে বেড়ায় দেশ হতে দেশান্তরে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মানুষ নিরন্তর কষ্ট সহ্য করে ধন-সম্পদ উপার্জন করছে। ইসলাম এই ধন-সম্পদ অর্জন ও ব্যয় ভোগের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান পেশ করেছে। হালাল পথে উপার্জিত ধন সম্পদকে হালাল ঘোষণা আর হারাম পথে অন্যায় ও জুলুমের মাধ্যমে আহরিত ধন সম্পদকে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে এবং পরকালে কঠিন ও অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভয় দেখিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

www.amarboi.org

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে তোমাদের পারস্পরিক সন্তুষ্টি-সম্মতিক্রমে ব্যবসায় হলে তা নিষিদ্ধ নয়।" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ২৯)

এই ধন-সম্পদ চুরি বা ছিনতাই করে করায়ত্ব করলে তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"পুরুষ চোর, নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও। তারা যা উপার্জন করেছে এটা তারই শাস্তি ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত। আর আল্লাহ দুর্জয়-সুবিজ্ঞানী।" (সূরা আল মায়িদা, ০৫ ঃ ৩৮)

সাধারণত ধারণা করা হয়, মানুষ চুরি করে দারিদ্র্যের কারণে ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা নেই বলে কিন্তু অস্ত্রের মহড়া দিয়ে ছিনতাই তাতো আর ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য করা হয় না। তাছাড়া ক্ষুধার জঠর জ্বালা নিবারণের জন্য চুরি করার দরকার নেই। কোনো না কোনো কাজের ফলে খাদ্যের যোগান আল্লাহ করে দিবেনই, প্রয়োজন একান্ত চেষ্টা। আর ছিনতাইয়ের কাজে অগ্রসর হতে পারে কেবলমাত্র যারা ধন-সম্পদ লোভী, যারা অধিক সম্পদ করায়ত্ব করার অভিলাষী কিংবা যারা অন্যায় অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা অথবা পাপ পথে বেহিসাবে অর্থ ব্যয় করার সুযোগের লালায়িত। অতএব, তা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। তাদের ভয়ে মানুষ সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকে, রাস্তায় চলাফেরা করতে নিরাপদ বোধ করে না। মূল্যবান জিনিসপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে সাহস পায় না। অভিভাবকগণ স্কুলগামী ছোট শিক্ষার্থীদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পান, চিন্তিত হোন, ব্যবসায়ীরা পণ্য নিয়ে অবাধ ও নিশ্চিন্তে গমনা-গমন করতে সাহস পায় না। এটি একটি অমানবিক ও ঘৃণিত কাজ। ইসলামে এ ধরনের কাজকে অত্যন্ত ঘৃণিত ও পাপ বলে গণ্য করা হয়েছে।

চুরি ও ছিনতাইয়ের ফলে মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। অনেক সময় রক্তপাতও ঘটে। জান মালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কাজেই এর বিরুদ্ধে আমাদের সকলেই যদি সামাজিকভাবে সোচ্চার হই, তাদেরকে বয়কট করি, তাদের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক গড়ে না তুলি, তাহলে তারা খুব সহজেই এ পথ থেকে ফিরে আসবে এবং অন্যরাও এ পথে ভবিষ্যতে গমন করবে না। মূলত আমাদের প্রত্যেক মা-বাবা ও সমাজের মুরব্বীদের উচিত এমন সন্তানদেরকে আদর্শ

www.amarboi.org

শিক্ষায় শিক্ষিত করার চেষ্টা করা, তাদেরকে অসচ্চরিত্রের কবল থেকে বের করে সচ্চরিত্রবান করে গড়ে তোলা, আর তাহলেই সমাজ থেকে এমন অপরাধমূলক বা মন্দ চরিত্রের বিলুপ্তি ঘটবে।

নারীদের পর্দা সংরক্ষণ অসচ্চরিত্রের মুখে কালিমা লেপন

পর্দা সচ্চরিত্রবান হওয়ার ক্ষেত্রে কি আবশ্যকীয়!

ইসলাম একটি বাস্তব জীবন দর্শনের নাম। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিটি সেক্টরের জন্য রয়েছে এর সুস্পষ্ট বিধি-বিধান। ইসলাম নারীদের জীবনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছে। যেমন জীবনের শুরুতেই কন্যা, তারপর বউ, তারপর মা। আর প্রত্যেক স্তরেই দিয়েছে তাদের সম্মান ও মর্যাদা। এ তিনটি পর্যায়ের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায় হলো মা হিসেবে আসীন হওয়া। আজকে যে কন্যা, কাল সে নারী তারপর দিন সে মা। একটি বংশের ধারক, বাহক ও একটি শ্রেণীর উদগাতা। সন্তানের গর্ভধারিণী ও জননী। এবার এ শ্রেণীকে আদর্শ মানুষ করণের লক্ষ্যে আদর্শ মায়ের বিকল্প নেই। আর আদর্শ মা হওয়ার জন্যে অবশ্যই তাকে হতে হবে কন্যা থাকতেই সংযত এবং বউ হিসেবে সচ্চরিত্রবান। এবার বলবো নারীদের সচ্চরিত্রবান হওয়ার পূর্ব শর্ত হলো পর্দার বিধান। পর্দা মেনে চলা, সুন্দর করে সভ্য পোশাক পরিধান করা, নিজেদের সৌন্দর্যকে আপন করে রাখা। এ বিধান ঘোষণা করেছেন স্বয়ং আমাদের স্রষ্টা, পালনকর্তা, আল্লাহ তা'আলা। তিনিই একমাত্র জানেন, আমাদের কী প্রয়োজন, কোনো বস্তু কল্যাণকর ও কোনো বস্তু অকল্যাণকর।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কন্যা-নারীদেরকে পর্দা তথা তাদের শরীরের যেসব অঙ্গ প্রকাশ করা একান্ত জরুরী নয় তা ঢেকে রাখার যখন হুকুম করেছেন তখন এতেই প্রমাণিত হয় এই ক্ষেত্রে কন্যা-নারীদের কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে। তার সাথে সাথে মঙ্গল রয়েছে সমগ্র সমাজের। ইসলামে আনুগত্যের ভিত্তি পরিপূর্ণরূপে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যে বা যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা.)-এর উপর ঈমান রাখে, শরীয়াতের আদেশ নিষেধ তাদেরই জন্য। আর এমন প্রেক্ষাপটে পর্দা হচ্ছে নারী জাতির ভূষণ। পর্দা হচ্ছে নারীদের পোশাক, পর্দা হচ্ছে অসচ্চরিত্রের দিকে ধাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। পর্দা হচ্ছে সচ্চরিত্র ও আদর্শ পরিবার গঠন ও সমাজে শান্তি শৃঙ্খলার প্রধান উপকরণ।

যারা পথভ্রষ্ট ও ইসলাম ধর্ম থেকে বহির্ভূত এবং কাফিরদের চিন্তাধারায় প্রতিপালিত, তারা সদা সর্বদা আধুনিক সভ্যতা থেকে মুসলিমরা পিছিয়ে আছে এরকম ইঙ্গিত করছে। আর এমনটাই ইসলামের প্রতি তাদের ধারণা। তারা এই সমস্ত নিকৃষ্ট কাজ দ্বারা ইসলামের রূপকে বিকৃত করছে এবং ইতিহাসের প্রকৃত

www.amarboi.org

সত্যকে মুছে দিতে চেষ্টা করছে। মুসলিমরা যতদিন তাদের দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেছিল ততদিন পর্যন্ত তাদের সভ্যতা, মান, সম্মান ও নেতৃত্বের স্বাক্ষর বহন রচিত হয়েছিল গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সেইসাথে যতদিন ঐ সমস্ত দেশগুলো জ্ঞান বিজ্ঞানের বিদ্যাপিঠ ছিলো ততদিন তারা প্রকৃতপক্ষে মুসলিমই ছিলো।

আইয়ামে জাহিলিয়াতের অন্ধকার যুগে যখন নারীর অধিকার বলতে কিছুই ছিলো না, তখন একমাত্র ইসলামই তাদেরকে দিয়েছিল অতুলনীয় সম্মান ও ঈর্ষণীয় অধিকার। সমাজ জীবনকে সুন্দর, কলুষমুক্ত রাখার স্বার্থে, সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত করার স্বার্থে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিধি নিষেধ এসেছে। সমাজে নৈতিক অবক্ষয় রোধের জন্য প্রদত্ত হয়েছে পর্দার আদেশ যা নারী পুরুষ সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। নারী নির্যাতনে সর্বোচ্চ রেকর্ডধারী বর্তমান সময়ে পৃথিবীর চিন্তাশীল জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য যে, নারী নির্যাতন রোধে ও নারীর সামজিক সম্মান প্রতিষ্ঠায় পর্দা প্রথার বিকল্প নেই।

পর্দা সংরক্ষণ করা মূলতঃ কন্যা-নারীদের নিজস্ব ইচ্ছা বা খামখেয়ালীপনার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। আবার কেউ কেউ আছে পর্দা করতে হবে এ বিষয়টি উপলব্ধিই করে না। আবার কোথাও কোথাও স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গামী মেয়েরা বলে থাকে পর্দার বিষয়টি এখনো আমাদের বুঝে আসেনি। যখন আসবে বা যখন মা হয়ে যাবো তখন পর্দা করতে শুরু করবো।

যেসকল কন্যা বা মেয়েরা এ ধরনের অজুহাত পেশ করে তাদের উচিত, মানবীয় নির্দেশ ও আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা।

একজন মানুষের অনুরোধে বা নির্দেশ মানবীয় সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন, মানুষের কোনো কাজ মাত্রই সঠিক কিংবা ভুল হতে পারে। কোনো মানুষের কথা গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে আপনি স্বাধীন কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীর ব্যাপারে এটি প্রযোজ্য নয়। অতএব আমরা যখন মানুষের নির্দেশ নিয়ে কথা বলবো, তখন হেতু খুঁজে না পাওয়া কিংবা বিষয়টি বুঝে না আসা ইত্যাদি উক্তি করা দোষের কিছু নয়।

তবে যদি কোন ঐশী নির্দেশ হয় এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্র কুরআনে উল্লেখ থাকে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে বর্ণিত হয় তখন আমার বুঝে আসে না বা পর্দার এত আবশ্যকীয়তা কিসের বা পর্দার সাথে সচ্চরিত্রের কী সম্পর্ক রয়েছে বা পর্দা মানতে হবে কেন এ ধরনের উক্তি করার

www.amarboi.org

কোনো অবকাশ নেই। হতে পারে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত মেধাবী একজন (এ মেধা আপনাকে কে দিলো? কে আপনাকে ঐ সম্মান পাওয়ার উপযোগী করল সেদিকে খেয়াল না করে এ মেধার জোরে আপনি পর্দার বিপক্ষে যুক্তি দিতে চান কী দুঃসাহস আপনার! পর্দা সম্পর্কে বুঝে আসার দরকার নেই আপনি আপনার মেধা দেনেওয়ালার সম্পর্কে একটু বুঝার চেষ্টা করুন, পাশাপাশি আপনার অন্য বান্ধবী যার এমন মেধা নেই তার কথা একটু ভাবুন দেখবেন সমাধান পেয়ে গেছেন) শিক্ষার্থী হিসেবে পর্দার এত আবশ্যকীয়তা কিসের এমন বলা ভীষণ বিপজ্জনক। কারণ এটা ব্যক্তির অন্তরে সন্দেহ বা দুর্বল ঈমানের ইঙ্গিত বহন করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এটা জানার পরও কেউ এ ধরনের মন্তব্য করলে তার নিজের অজান্তেই ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। বরং বিষয়টি হলো দুর্বল ইচ্ছা শক্তি বা পরিবেশগত বা অনেক সময় অভিভাবকদের জোরালো সমর্থন না পাওয়া পরিপূর্ণভাবে পর্দা মানতে মন যেন কেমন চায় না। এমনটি বলে অতীতের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া আর ভবিষ্যতের জন্য সাহায্য চাইলে আল্লাহর রহমত প্রত্যাশা করা যায়। কেননা আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا.

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করার কোনো এখতিয়ার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।" (সূরা আল আহযাব, ৩৩ ঃ ৩৬)

পর্দা নারীদের সভ্য পোশাক, সচ্চরিত্রের পরিচায়ক

সভ্য পোশাক বলতে বুঝায় যেটুকু ঢেকে রাখা প্রয়োজন তা ঢেকে রাখা, যা ঢেকে রাখলে একে অপরের প্রতি হায়েনার মতো বা নেকড়ে বাঘের মতো মাথা গরম করে থাবা দেয়ার মনোভাব সৃষ্টি হবে না, অবৈধ কামাভাবে তাকাবে না, অসম্মানের দৃষ্টিতে তাকাবে না, অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকাবে না। অধিকন্তু যে সমস্ত কন্যা বা নারীদের দিকে তাকিয়ে মানুষ তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কথা ভুলে সৎ দৃষ্টি থেকে দূরে সরে অসচ্চরিত্রের অসৎ চিন্তা-চেতনার দিকে ধাবিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বারবার তাকানোর চেষ্টা করে, যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যায় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাই হলো ঐ কন্যা বা

www.amarboi.org

নারীর অসভ্য পোশাক। অসভ্য সাজ-সজ্জার বহিঃ প্রকাশ। অন্যদিকে যখন কোন বান্দাহ আল্লাহ তায়ালার অসীম জ্ঞান, শক্তি, সামর্থ্য ও প্রজ্ঞার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তার উচিত স্রষ্টার সম্মুখে অত্যন্ত বিনয়ী হওয়া এবং কোনো ঐশী নির্দেশের উপর মানবীয় যুক্তিকে স্থান না দেয়া। আসলে সত্যিকার বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ (ঈমানদার ব্যক্তিগণ) যখনই কোনো ঐশী নির্দেশের কথা শুনে তারা সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করে ঃ

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

"তারা বলে আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২৮৫)

ঐসকল সত্যিকার ঈমানদারগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ সর্বদর্শী, তাঁর জ্ঞান নির্ভুল ও সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, তিনি অনাদি, চিরঞ্জীব ও অসীম। এ কারণেই তারা ত্রুটিপূর্ণ, নগণ্য ও সীমাবদ্ধ মানবীয় জ্ঞান ও যুক্তিকে কখনোই আল্লাহর জ্ঞানের উপর স্থান দেয়া না।

সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ যখন আমাদেরকে কোনো নির্দেশ দেন তখন বুঝতে হবে, তিনি জানেন যে, সেই নির্দেশের মধ্যেই আমাদের সর্বোত্তম স্বার্থ ও চূড়ান্ত সুখ নিহিত রয়েছে। ফলে যখন তিনি নারীকে পর্দা করার নির্দেশ দেন তখন বুঝতে হবে তিনি অবগত আছেন যে, পর্দা করার মধ্যে রয়েছে নারীর সুখ, সমৃদ্ধি ও মর্যাদা।

ইসলামে পর্দা ও তার বাধ্যবাধকতা

মুসলিম কন্যা, নারী ইসলামের বিধান তথা আল্লাহর দেয়া আল কুরআনুল কারীম ও ফাতিমা (রা.) সহ অন্যান্য মহীয়সী নারীদের জীবনাদর্শ মানবে না তাতো কোনভাবেই হতে পারে না। অন্যদিকে এ সকল কন্যারাই নামায পড়ছে, সিয়াম পালন করেছে। তার মানে তারা কী আল কুরআনকে আংশিক মানে আর আংশিক মানে না, তারা কী আংশিক বিশ্বাস করে আর আংশিক বিশ্বাস করে না। অবস্থা যদি তাই হয়, তাহলে তাদের লক্ষ্য করেই আল্লাহর ঘোষণা ঃ

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

www.amarboi.org

"তবে কি তোমরা আল কুরআনের কিয়দংশ বিশ্বাস করো এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস করো! যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনো পথ নেই। কিয়ামাতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ সম্পর্কে বেখবর নন।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ৮৫)

প্রিয় বোন! ফরয নামাযসমূহকে সেগুলোর নির্ধারিত সময়ে আদায় করার ব্যাপারে তুমি অত্যন্ত সতর্ক। কারণ এটা আল্লাহর নির্দেশ। পর্দা করা তো তাঁরই নির্দেশ। তিনি ঘোষণা করছেন ঃ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ج وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক-যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্যে জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা আন নূর, ২৪ ঃ ৩১)

এখানে যাদের সাথে প্রাপ্তবয়স্ক কন্যা বা নারীকে পর্দা করতে হবে না অর্থাৎ যাদের সামনে নারীরা যেতে পারবে তাদের পরিচয় আল কুরআনুল কারীমের এ আয়াত অনুসারে স্পষ্টভাবে প্রদান করা হলো ঃ

০১. নিজ স্বামী

www.amarboi.org

০২. পিতা (আপন হোক বা সৎ হোক। দুধ পিতা ও এর অন্তর্ভুক্ত)
০৩. আপন শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও আপন নানা শ্বশুর ব্যতীত অন্য সকল প্রকার শ্বশুরের সঙ্গে পর্দা করতে হবে)
০৪. দাদা (দাদার পিতা বা আরও যত উপরে যাক এর অন্তর্ভুক্ত)
০৫. নানা (নানার পিতা বা আরও যত উপরে যাক এর অন্তর্ভুক্ত)
০৬. চাচা (আপন হোক বা সৎ চাচা হোক)
০৭. ভাই (আপন হোক বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় হোক। তবে চাচাত, মামাত, খালাত ও ফুফাতো ভাইয়ের সঙ্গে পর্দা করতে হবে। দুধ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা দেয়া যায়।
০৮. ভ্রাতুষ্পুত্র (আপন ভাইয়ের পুত্র হোক বা বৈমাত্রেয় ভাইয়ের বা বৈপিত্রেয় ভাইয়ের)
০৯. ভাগিনা (আপন বোনের ছেলে হোক বা সৎ বোনের)
১০. ছেলে (আপন হোক বা সৎ ছেলে হোক)
১১. মামা (আপন হোক বা সৎ মামা হোক)
১২. নাতি (আপন ছেলের ঘরের হোক বা মেয়ের ঘরের হোক)
১৩. জামাই (আপন মেয়ের জামাই)
১৪. নির্বোধ, ইন্দ্রিয় বিকল ধরনের লোক বা ঐসব বালক যারা বিশেষ কাজ কারবারের দিক দিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝে না, তাদের সাথে পর্দা করা জরুরী নয়-তারাও পর্দার হুকুম থেকে ব্যতিক্রম।

উল্লেখ্য, মাহরাম পুরুষ যাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হতে পারে তারা মাহরাম মহিলার শুধু মাথা, চেহারা, গর্দান দুই বাহু ও পায়ের নলা দেখতে পারে, তাও যদি শাহওয়াত না থাকে। পেট পিঠ দেখা জায়িয নয়।

এবার যারা উল্লিখিত মাহরাম পুরুষ ছাড়াও অন্যদের সাথে অবাধে সাক্ষাৎ করবে, খোড়া যুক্তি প্রদর্শন করে অবাধে সবকিছু করবে তাদের শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে রাসূল (সা.) বলেন ঃ

اِنَّ أَهْوَنَ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلٰى اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلَى مِنْهُمَا دِمَاغَهُ كَمَا يَغْلَى الْمِرْجَلُ بِالْقُمْقُمِ.

"নিশ্চয় কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কম আযাবভোগী ব্যক্তির অবস্থা হবে এই যে, তার দু'পায়ের তলায় দু'টি প্রজ্বলিত অঙ্গার রাখা হবে। তাতে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে যেমনিভাবে কাঁচ তামার পাত্রে টগবগ করে ফুটতে থাকে।"

সর্বাধিক কম শাস্তি প্রাপ্তদের অবস্থা যদি এই হয়, তবে আল্লাহর কিতাব একাংশ মানা আর অন্য অংশ না মানার কারণে যাদেরকে আল্লাহ যন্ত্রণাদায়ক

www.amarboi.org

কঠিন শাস্তির ধমক দিয়েছেন তাদের অবস্থা কি হবে? চিন্তা করে দেখুন! (যারা নামায, সিয়াম করে, কিন্তু পর্দা মানে না তাদের অবস্থা কি রকম হবে?)

পর্দা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে তবেই পারবে

কন্যা, নারীদের মাঝে অনেকেই আছে যারা পর্দা করতে চায় কিন্তু বলে মাথা গরম হয়ে যায়। প্রচণ্ড গরম লাগে শরীর ঘেমে যায়, গরম ঠাণ্ডা লাগে, জ্বর আসে অনেক কষ্ট হয় অথবা আমারতো বিয়ে হয়ে গেছে এবার আর পর্দার দরকার কী, অথবা আমিতো ব্যক্তিগত গাড়ি দিয়ে চলাফেরা করি তাহলে পর্দা লাগবে কেন অথবা ওর আব্বা বাংলাদেশে নেই আমারতো বাজারে যেতে হয়, মেহমান আসলে কথা বলতে হয়, আমি পর্দা করবো কী করে ইত্যাদি। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলব, এমন পরিস্থিতিতেও চেষ্টা করুন, আপ্রাণ চেষ্টা করুন, অবশ্যই আপনি পারবেন। আর এটাই হচ্ছে সৃষ্টি জগতে আল্লাহর নিয়ম ও বিধান। আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلاً.

"অতএব আপনি আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর রীতিনীতিতে কোনো রকম বিচ্যুতিও পাবেন না।" (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪৩)

আল্লাহর বিধান হলো যতক্ষণ না মানুষ নিজের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা করবে এবং পরিবর্তনকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা চালাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে কোনো পরিবর্তন আসবে না। ইরশাদ হচ্ছে।

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنفُسِهِمْ.

"আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" (সূরা আর রা'দ, ১৩ ঃ ১১)

পর্দার আরো কিছু বিধান– যা অবশ্যই পালনীয়

পর্দার আরো কিছু বিধি-বিধান রয়েছে। যা অমান্যকরণে মানুষ খুব সহজেই শয়তানের প্ররোচনায় অসচ্চরিত্রের দিকে ধাবিত হয়ে থাকে। আমাদের অধিকাংশ কন্যা নারীরাই বাসার বাইরে পর্দা করেন কিন্তু বাসায় এ ব্যাপারে গাফেল হওয়ার কারণে অসচ্চরিত্রের দিকে ধাবিত হওয়ার সুযোগ থাকে বেশি। তা হলো ঃ

■ নারীদের চেহারাও পর্দার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তাই মুখমণ্ডলও পর্দা করতে হবে। ইদানিং দেখা যায় কিছু মা বোন বোরখা পরিধান করেন অথচ চেহারা খোলা রাখেন, এতে পর্দার ফরয পালন হয় না।

www.amarboi.org

- অন্ধের সাথেও পর্দা করা ফরয।
- পীরের সাথেও পর্দা করা ফরয। অনেকে পীরকে বাবা বলে সম্বোধন করে, তাই তাদের ধারণা পীরের সাথে পর্দা করতে হবে না। কিন্তু আসলে তা ঠিক নয়, পীরের সাথে অবশ্যই পর্দা করতে হবে।
- দুলাভাইয়ের সাথেও পর্দা করা ফরয। (দুলাভাইকে ভাই মনে করে পর্দা না করে তার সাথে বেড়াতে যাওয়া, শপিং করতে যাওয়া, এক সাথে বসে গল্প-গুজব করা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। দুলাভাই আর আপন ভাই এক কথা নয়।)
- স্বামীর ছোট ভাই দেবর যদি নারী ও বিয়ে প্রসঙ্গে বুঝার বয়স হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই তার সাথে পর্দা করতে হবে। ফ্রি আর শিক্ষিত আধুনিক সোসাইটি বলে গল্প-গুজব করার কোনো সুযোগ নেই।
- কোনো নারী অপর কোনো নারীর গোপন অঙ্গ দেখতে পারবে না। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হলে ভিন্ন কথা। সে ক্ষেত্রেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ দেখা জায়িয হবে না। নারীর গোপন অঙ্গ (সতর) বলতে বুঝায় তার মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতীত সমস্ত শরীর।
- চলা ফেরা ও কাজ কর্মের সময় বা লেন দেনের সময় প্রয়োজন হলে নারীর জন্য মুখমণ্ডল হাতের তালু আঙ্গুল ও পদযুগল খোলার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পুরুষের জন্য বিনা প্রয়োজনে নারীর এগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়িয নয়। নারীদের আওয়াজেরও পর্দা রয়েছে। তাই যেখানে নারীর আওয়াজের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে সেখানে পর্দার অন্তরালে থেকেও বেগানা পুরুষকে আওয়াজ শুনানো এবং পর্দার সাথে কথা-বার্তা বলা নিষেধ। যেখানে এরূপ আশংকা নেই, সেখানে পর্দার আড়ালে থেকে কথা বলা জায়িয কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরালে থেকেও বেগানা পুরুষদের সঙ্গে কথা-বার্তা না বলার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত।
- নারীদের জন্য বেগানা পুরুষকে অলংকারের আওয়াজ শোনানোও জায়িয নয়। তাই যে অলংকার বাজনা হয়, এমন অলংকার পরিধান করে বাইরে যাবে না।
- নারীদের চুলের পর্দা রয়েছে। এমনকি যে চুল কেটে ফেলা হয় বা চিরুনি ইত্যাদি করতে গিয়ে যে চুল ঝরে পড়ে, তাও কোরন্ স্থানে গেড়ে রাখতে বলা হয়েছে বা এমন স্থানে তা ফেলতে হবে যাতে তা গায়ের মাহরাম পুরুষের নজরে না পড়ে।
- সুশোভিত রঙ্গিন কারুকার্যখচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও অনুত্তম।

নেশায় আসক্ত হওয়া সচ্চরিত্রের প্রতিবন্ধক

মদ-মাদকাসক্ত হওয়া

বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রেরিত সকল ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হলো ইসলাম। এ ধর্ম মানুষের প্রয়োজন, তাদের

www.amarboi.org

স্বাস্থ্য ও সুস্থতার প্রতি লক্ষ্য করে খাওয়া দাওয়া ও খেলাধুলার বিষয়কে হালাল বা হারাম পৃথকীকরণ করে বিশ্ব মানবতার প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। ইসলাম ধর্মে মানুষের প্রকৃত নিরাপত্তার মৌলিক বিষয় হচ্ছে পাঁচটি। যথা ঃ

০১. ধর্ম; ০২. ইজ্জত; ০৩. জীবন বা জান; ০৪. মাল বা সম্পদ ও ০৫. আকল বা বুদ্ধি, বিবেক।

পৃথিবীতে এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের নিরাপত্তাই হচ্ছে প্রকৃত নিরাপত্তা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, মানব রচিত আইন এই পাঁচটি বিষয়ে নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারে না।

আকলকে সংরক্ষণ করা শরীয়াতের হিকমাত। এ কথাটি স্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত হয় নেশাগ্রস্ত বস্তুগুলো হারাম করা ও নেশাখোর ব্যক্তির শাস্তির ব্যবস্থার মাধ্যমে। সবার কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, মানব জাতির কাছে ইসলামের পর সব চেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হচ্ছে যার মাধ্যমে মানুষ পার্থক্য করতে পারে ভাল মন্দ এবং উপকারী বস্তুর মাঝে।

ইসলামে হারাম দ্রব্যগুলোর উপর যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে এর মধ্যে ধ্বংসাত্মক পরিণতি ছাড়া মানব জাতির কল্যাণকর কোনো কিছুই নেই। যা-ও বা সামান্য পরিমাণে রয়েছে তা পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হওয়ার পূর্ব লক্ষণ। যে দ্রব্য জ্ঞান বুদ্ধি লোপ করে দেয়, নেশা সৃষ্টি করে ধ্বংস করে মানবীয় গুণাবলি এবং ধ্বংস করে দেয় সমাজ ও সভ্যতাকে– সেটি হচ্ছে মদ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এই জাতীয় সব জিনিস চিরদিনের জন্য হারাম করেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنْتَهُوْنَ.

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাকো যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো। শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত হবে না?" (সূরা আল মায়িদা, ০৫ ঃ ৯০ ও ৯১)

অন্য আয়াতে বলেন ঃ وَلَاتَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ.

www.amarboi.org

"তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ২৯)

وَلَاتُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ.

"তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবে না।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৯৫)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً.

"নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। আমি তাদেরকে স্থলে ও পানিতে চলাচলের বাহন দান করেছি এবং তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি। তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (সূরা বনি ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭০)

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ فِى الْخَمْرِ عَشْرَةِ : عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَاكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِىَ لَهَا وَمُشْتَرَاةَ لَهُ.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদকাসক্ত ১০ ধরনের ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন। যথা ঃ ০১. যে ব্যক্তি মদ জাতীয় বস্তুর নির্যাস বের করে, ০২. যে ব্যক্তি মদ প্রস্তুত করে, ০৩. যে ব্যক্তি মদ পান করে, ০৪. যে ব্যক্তি মদ পান করায়, ০৫. যে ব্যক্তি মদ আমদানী করে, ০৬. যার জন্য মদ আমদানী করা হয়, ০৭. মদ বিক্রেতা ০৮. মদ ক্রেতা, ০৯. অন্যকে সরবরাহকারী এবং ১০. মদের লাভের অংশ ভোগকারী।" (ইবনে মাজাহ্)

ইসলামের মাদক বিরোধিতা উপহাসের ব্যাপার ছিলো পাশ্চাত্যের অন্যান্য জাতিগুলোর কাছে। তারা নেশায় বুঁদ হয়ে তুলে ধরেছে তাদের বেহায়াপনা নোংরামি এবং নানা ধরনের সভ্যতা বিবর্জিত অমানসিক আচরণ, অশালীন কর্মকাণ্ড। তারা ইসলামের কল্যাণকর মহান বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ যখন সমাজ সভ্যতা সব কিছুকে ধ্বংস ও গ্রাস করার জন্য উঠে পড়ে লেগে অগ্রসর হয়েছে মাদক রাক্ষস তখন মহাআতংকে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে সারা বিশ্ব। আর এখন একে ঠেকাবার জন্য বিশ্ব ব্যাপী চলছে ব্যাপক অভিযান। একে প্রতিহত করার লড়াইয়ে ব্যয় করা হচ্ছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার, এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করার প্রচারনায়।

www.amarboi.org

বর্তমানে বিশ্বে শুধু মুসলিম দেশগুলো নয়, বরং অমুসলিম দেশগুলোও এই নেশাগ্রস্ত ধ্বংসাত্মক বস্তুর বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে বাঁচার লক্ষ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। আমরা মুসলিম জাতি আল্লাহর নির্দেশে দেশ ও দেশবাসীকে নেশার বিষপান থেকে বিরত রেখে ভয়াবহ রোগসমূহ থেকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

ধূমপান-ধূমপানে আসক্ত হওয়া

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ পাক দুনিয়ায় মানুষের জন্য নানা জিনিস সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা চান মানুষ তাঁর নির্দেশ মতো পবিত্র (হালাল) জিনিস খাবে এবং পবিত্র জীবন-যাপন করবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى.

"আমি তোমাদেরকে যেসব খাদ্য সামগ্রী দান করেছি, তা হতে পবিত্র জিনিস তোমরা গ্রহণ করো।" (সূরা ত্বাহা, ২০ ঃ ৮১)

মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তাই গ্রহণ করতে হবে এবং যা অকল্যাণকর তা বর্জন করতে হবে। এ ধরনের অসংখ্য আদেশ নিষেধ পবিত্র কুরআনে থাকা সত্ত্বেও এবং বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানে গবেষণার ফলাফলের নানা ক্ষতিকর বাস্তব উদাহরণ আমাদের সামনে থাকলেও অনেকেই তা মানে না। নির্দ্বিধায় যা করেই যাচ্ছে তার মধ্যে ধূমপান উল্লেখযোগ্য।

ধূমপান মানে বিষপান। এটি আরেকটি নেশা জাতীয় দ্রব্য। ফলে এ নেশার কবলে পড়ে তারা যে কোনো উপায়ে টাকা সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। এবার শিক্ষার্থী হলে অভিভাবকের কাছ থেকে নয়-ছয়-তের বলে সংগ্রহ করে, চাকুরীজীবি হলে ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে (এক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে অনেক কার্য হাসিল করা যায়) আর ছাত্রও না চাকুরীজীবিও না, তাহলেতো কিভাবে করে, টাকা কোত্থেকে পায় জানি না। তবে সিগারেট ফুঁকে বেনসন আর গোল্ডলিফ যার একটার দামই তিন টাকা। দিনে দরকার বিশ থেকে গোটা চব্বিশটা সিগারেট। এখন প্রতিদিন এ পরিমাণ টাকা কোথায় পায় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে বলে জানি না "ভূতে যোগাইয়া দেয়" কিন্তু সিগারেট লাগবে তাই পাই খাই অথবা এভাবে বলা যায় খাই তো-পাই-ই। এবার বুঝতেই পারছেন, যে সিগারেটের টাকা ভূতে জোগাড় করে দেয়; তা কি কখনো হালাল বা বৈধ হতে পারে? বলুন! এ কেমন নেশা! অথচ রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ "যে কোনো ধরনের নেশার বস্তুই হারাম।"

www.amarboi.org

এবার ধূমপান করলে মানব জীবনে, পরিবারে ও সামাজিক অঙ্গনে কী ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং কেন এটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে না তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

০১. ধূমপান, মদ, জুয়া, লটারীর মতো এক ধরনের নেশা জাতীয় কাজ। এক শ্রেণীর টিনেজ ছেলেরা ধূমপান না করলে মাথা ঠিকমত কাজ করে না, বুদ্ধি বের হয় না বলে মনে করে যার কোনো ভিত্তি নেই। অন্যদিকে বাসায় মা-বাবারা সন্তান ধূমপান করুক তা পছন্দ করে না। ফলে শিক্ষার্থীরা বাসার বাইরে যেয়ে ধূমপান করে বাসায় প্রবেশ করে।

০২. প্রায় সব স্ত্রীরাই স্বামী ধূমপান করুক তা পছন্দ করে না। ফলে বেশি বেশি বারণ করলে নেশাগ্রস্ত স্বামীরা একথা বলে থাকে প্রয়োজনে বউ ছাড়তে পারব কিন্তু সিগারেট ছাড়তে পারব না। এতে পরিবারে অনেক দ্বন্দ্ব-কলহ হয়ে থাকে।

০৩. ধূমপানে নিশ্চিত শারীরিক ক্ষতি হয় পাশাপাশি এ ধূমপান অন্যেরও সুস্বাস্থ্যের ক্ষতি করে থাকে। যেমন ঃ স্ত্রী ও সন্তানদের উপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে থাকে– যা মেডিকেল সাইন্স প্রমাণ করেছে।

০৪. ধূমপান করাকে মানুষ বদ অভ্যাস বলে চিহ্নিত করে থাকে। যা ঐ ধূমপায়ী ব্যক্তির মান সম্মানে আঘাত আনার মতোই।

০৫. এতে টাকার ক্ষতি সাধিত হয়, অপব্যয় হয়। আর এ অপব্যয় প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ.

"অবশ্যই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ২৭) অন্যদিকে, এ অর্থ যোগান দিতে গিয়ে অনেকে হারাম অর্থ উপার্জন বা ঘুষের মতো একটি ঘৃণিত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

০৬. ধূমপায়ী বাবার মুখে দুর্গন্ধ থাকার কারণে সন্তানরা বাবার কাছে আসতে চায় না, বাবাকে পাস কাটিয়ে বাসায় অবস্থান করে।

০৭. সমাজের অধূমপায়ীরা বা ভাল ভাল বন্ধুরা তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চায় না।

০৮. ধূমপানের দুর্গন্ধ মুখে থাকে দীর্ঘ সময় যা দূর না করে নামায পড়লে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। রাসূল (সা.) বলেন ঃ
"কোনো দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস খেয়ে বা পান করে মসজিদে প্রবেশ করবে না।"

০৯. মা-বাবা, শিক্ষক ধূমপান করাকে পছন্দ না করার কারণে এবং সন্তানরা তা ত্যাগ না করার ফলে মনের অজান্তেই তাদের প্রতি অভিশাপ চলে আসে যা তাদের দীর্ঘ জীবনের পথ পরিক্রমায় আঘাত হানারই শামিল।

www.amarboi.org

১০. ধূমপান খারাপ সঙ্গ বা বাজে লোকদের আড্ডায় নিয়ে যেতে সহায়তা করে।

১১. ধূমপান মানুষের চিন্তা-চেতনাকে বিকৃত মস্তিষ্কের পর্যায়ে নিয়ে যায়। ফলে ধূমপায়ীরা অবাধে আরো নেগেটিভ কাজ করতে উদ্ধত হয়ে থাকে। যেমন ঃ ধূমপায়ীরা সহজে নামায আদায় করে না, ধূমপানের টাকা যোগাড় করতে গিয়ে সত্য তাদের কাছ থেকে বিদূরিত হয়ে থাকে। এভাবে মিথ্যা বলা ধূমপায়ীদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে থাকে।

১২. ধূমপানের কারণে অন্য ধূমপায়ীদের সাথে সম্পর্ক হয়। একজনে একটি দেয় আরেকজন খায়। কিন্তু অন্যদিন যদি সেজন না দেয় তাহলে তাদের মাঝে সম্পর্কে টানাপোড়ন সৃষ্টি হয়। বলে অন্যদিন আমার কাছে ছিলো আমি তাকে দিয়েছি আর আজ সে আমাকে দিলো না। আসলে সে কৃপণ বা বখিল। মানুষ ভাল না। সে শুধু তার স্বার্থই বুঝে। সে নেয় কিন্তু দেয় না সুতরাং সে মানুষ ভাল না। এভাবে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় ও সম্পর্ক নষ্ট হয়।

এবার দেখুন, বিষ পান করলে মানুষের একক মৃত্যু নিশ্চিত হয় আর ধূমপান করলে মানুষের একক নয় পুরো পরিবার, সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। তাছাড়া যে খাবারটি পবিত্র নয় যারা ধূমপায়ী তারাও জানে আমাদের স্রষ্টা, আমাদের রাসূল (সা.) যেখানে এ সমস্ত খাবার খাওয়াকে নিরুৎসাহিত করেছেন সেখানে আরতো কোনো যুক্তি-তর্কের দরকার নেই। তা আমরা গ্রহণ করব না। ব্যাস! তা হলেই তো হয়। আর এ জন্যেই এটি হারাম। এতে কোনো সন্দেহ নেই। ধূমপান কখনও সচ্চরিত্রবান মানুষের কাজ হতে পারে না। সুতরাং বক্তব্য সহজ ধূমপান কখনই আদর্শ মানুষ তথা সচ্চরিত্রবান মানুষের সুস্থ চিন্তার প্রতিফলন হতে পারে না। মুসলিমদেরকে কেবল নাফসের দাবি পূরণের কাজ করলেই চলবে না, তার দ্বীন, মিল্লাত, জীবন, স্বাস্থ্য, ধন-মাল ও আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত ও তার কাছে আমানতস্বরূপ রক্ষিত সে সবের হকও আদায় করতে হবে। এগুলোর কোনো একটাকে খাটো করা, অন্য জাতি বা ধর্মাবলম্বীদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলা কোনো মুসলিমের অধিকার নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

"তোমরা নিজেদের সত্তাকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অতীব দয়াময়।" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ২৯)

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ.

"তোমরা নিজেদের হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবে না।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৯৫)

রাসূল কারীম (সা.) বলেছেন ঃ

www.amarboi.org

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ.

"নিজেও ক্ষতি স্বীকার করবে না, অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।" (ইবনে মাজাহ্)

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِضَاعَةِ الْمَالِ.

"ধন-মালের অপচয় ও অকারণে বিনষ্ট করতে নবী কারীম (সা.) নিষেধ করেছেন।" (বুখারী শরীফ)

ধূমপানের এত ক্ষতিকর দিক— যা এককথায় সচ্চরিত্রবান আদর্শ মানুষ হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এবং কুরআন ও হাদিস মুতাবিক এগুলো বিস্তারিত আলোচনা থেকে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো এটি হারাম। এটি সচ্চরিত্রবান আদর্শ মানুষ হতে হলে অবশ্যই পরিত্যাজ্য বা এটি ত্যাগ করা, এটি থেকে মুক্ত থাকা সচ্চরিত্রবান মানুষ হওয়ার পূর্বশর্ত। আর এ দিকে লক্ষ্য রেখেই বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ বাংলাদেশ সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কোটি কোটি টাকা ইনকাম ট্যাক্স ও ভ্যাট আকারে আয় হওয়া সত্ত্বেও একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ও দেশের মানুষকে আদর্শ জাতি হিসেবে গঠন করার লক্ষ্যে, আমাদের জাতীয় চরিত্রকে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন পাশের মাধ্যমে তা বন্ধ করার এক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঘোষণা করেছে প্রকাশ্যে ধূমপান নিষেধ, কিন্তু তবু ধূমপায়ীরা কতটা বিবেক বর্জিত আর বিকৃত রুচির মানুষ তারা এখন বাথরুমে যেয়ে সিগারেট টানে একটা নয় এক সাথে দু-দুটা। ফলে পাবলিক টয়লেটে ও রেলওয়ের টয়লেটে দুর্গন্ধের জন্যে বসা যায় না। পায়খানার গন্ধকেও হার মানায় এ গন্ধ সুতরাং বুঝতেই পাছেন এ কেমন মহাদুর্গন্ধ !

ধূমপান থেকে মুক্তির উপায় বা করণীয়

০১. বাবা ধূমপান করলে সন্তান ধূমপায়ী হয় কাজেই বাবা অতীতে ধূমপান করে থাকলেও সন্তান জন্মলাভ করার পর আর না করা উচিত। তা না হলে দেখবেন আপনার প্যাকেটের সিগারেট চুরি, পকেটের টাকা চুরি হচ্ছে রীতিমত আর আপনি হচ্ছেন চোর গঠনকারী, চোরের রক্ষক, আরেকটু এগিয়ে চোরের বাবা।

০২. ধূমপায়ী বন্ধুদের সাথে চলাফেরা ত্যাগ করা।

০৩. অবাধে টাকা পয়সা ছাত্রজীবনে সন্তানদেরকে না দেয়া।

০৪. পরিবারে মা-বাবার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ না হওয়া— এতে সন্তানরা টেনশন

www.amarboi.org

মুক্ত থাকায় বাসার বাইরে চায়ের দোকানে বাজে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে না।

০৫. এমন কোনো সংগঠনের আওতাভুক্ত না হওয়া যে সংগঠন প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট দিয়ে কিশোর ও যুবকদেরকে সংগঠনের পক্ষে প্রচার প্রচারনার কাজে নিয়োজিত রাখতে চায়।

পরিশেষে বলব, ধূমপান ত্যাগ করার জন্য স্ব-স্ব ব্যক্তির ইচ্ছা শক্তিই যথেষ্ট। আপনি যদি বলেন আমার অভ্যাস হয়ে গেছে আমি অতীতেও চেষ্টা করেছি কিন্তু ছাড়তে পারছি না। তখন আপনাদেরকেই আমি বলব, মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, মানুষ পারেনা এমন কিছু কী আছে পৃথিবীতে! তাছাড়া অভ্যাস আপনার চাকর না আপনি অভ্যাসের চাকর। অভ্যাস আপনার অধীন না আপনি অভ্যাসের অধীন। অভ্যাস আপনার দ্বারা পরিচালিত হবে না আপনি অভ্যাস দ্বারা পরিচালিত হবেন।

এবার যদি আপনি বলেন আপনি অভ্যাসের চাকর, আপনি অভ্যাসের অধীন, আপনি অভ্যাস দ্বারা পরিচালিত হবেন তাহলে তো আপনি মানুষ কিনা তাই ভাবতে অবাক লাগবে। হয়তোবা তারপরও আপনি মানুষ দাবি করলেও আমি বলব হ্যাঁ দেহ অবয়বে আপনি মানুষ কিন্তু মনুষত্ব, বিবেক আর ন্যূনতম জ্ঞান আপনার না থাকার কারণে পরিপূর্ণ মানুষ বলতে যেন আমার বিবেক বাধা দিচ্ছে। আর যারা বলবে আপনি মানুষ তারাও হয়তোবা আপনার মতোই একজন মানুষ। মনুষত্ববিহীন মানুষ দুনিয়ার চাকচিক্যময়তাকে নিয়ে ব্যস্ত। আমি তাদের দলে নই।

সচ্চরিত্র গঠনে খেলাধুলার প্রভাব

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন-বিধান। এতে মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছু রয়েছে। এটি মানুষের মন মেজাজ ও চাহিদার প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল। ইসলামে যেমন ইবাদতের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে তেমনি মানুষের মন-মানসিকতাকে প্রফুল্ল রাখার লক্ষ্যে খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনকেও সমর্থন করেছে। অথচ আজকাল অনেক সার্টিফিকেটধারী শিক্ষিত মানুষও ইসলাম সম্পর্কে ভালভাবে না জেনেই সরাসরি মন্তব্য করে ইসলামে খেলাধুলা সম্পর্কে তেমন কিছু বলা নাই। ইসলাম খেলাধুলাকে সমর্থন করে না। যদি তাই সত্য হয়; তাহলে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন-বিধান হলো কি করে? যে সমস্ত লোকজন শিক্ষিতও দাবি করেন আবার এমন কথাও বলেন তারা একটু ভেবে দেখবেন কি? এছাড়া তাদেরকে লক্ষ্য করে আমরা যদি বলি ঐ সমস্ত লোকজন আদর্শ শিক্ষার

www.amarboi.org

ঘাটতির ফলে খেয়াল খুশীমত নিজেদেরকে, চরিত্রকে ব্যবহার করার জন্য এমনটি বলে থাকে, তাদের ব্যক্তি স্বার্থে হাত পড়বে এ জন্যে তারা ইসলামের ঘোষিত খেলাধুলার নিয়ম-নীতির বিপক্ষে কথা বলে থাকে তাহলেতো ভুল হওয়ার কথা নয়। আবার কেউ কেউ বলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম মেনে চলা কঠিন। এবার ইসলাম কি সংকীর্ণ! সত্যিই কঠিন! এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য দ্বীনের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।" (সূরা আল হজ্জ, ২২ ঃ ৭৮)

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَايُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

"আল্লাহ তা'আলা চান তোমাদের জন্য সহজ করতে, তিনি তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করে না।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৮৫)

নবী কারীম (সা.) হাবশী বাচ্চাদের সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

اِلْهَوْا وَالْعَبُوْا فَاِنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ يُرِىٰ فِىْ دِيْنِكُمْ غِلْظَةٌ.

"তোমরা খেলাধুলা করতে থাকো। কারণ, তোমাদের দ্বীনে কঠোরতা প্রকাশ পাক, সেটা আমি পছন্দ করি না।" (বুখারী শরীফ)

খেলাধুলা সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য

খেলাধুলা প্রসঙ্গে ইসলামের বক্তব্য সুস্পষ্ট। খেলাধুলায় হার-জিতের বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে এটি ব্যায়াম বা সুস্থ দেহ সুস্থ মন, এ দেহ এ মন হালাল কাজে পরিশ্রম করতে পারে সারাক্ষণ– এমনটি ইসলাম সমর্থন করে। তবে ইসলাম কস্মিনকালেও কোনো কিছুকে বেশি বেশি করা সমর্থন করে না। এখানে শরীয়াত মুতাবিক খেলাধুলা প্রসঙ্গে বক্তব্য হলো ঃ

০১. খেলাধুলা হতে হবে বিনোদন এবং শারীরিক ও আত্মিক প্রশান্তিদায়ক।

০২. এটি শারীরিক ও আত্মিক অলসতা দূর করে কর্মে উদ্যমী করে।

০৩. মানুষের চিন্তা-চেতনা সচ্চরিত্রের দিকে ধাবিত হওয়ার কঠোর কামনা বাসনা জাগ্রত করে।

০৪. এ বিনোদন ও খেলাধুলা হতে হবে শরীয়াতের দৃষ্টিতে নির্মল, নিষ্কলুষ, প্রদত্ত আনন্দদায়ক বিষয়ক।

www.amarboi.org

খেলাধুলায় সচ্চরিত্রের প্রতিবন্ধকতা

বর্তমানে খেলাধুলা সমগ্র বিশ্বের মানব জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। মানুষ প্রতিদিন মেধা খাঁটিয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা আবিষ্কার এবং তা বাস্তবায়ন করে চলছে। এতে এক শ্রেণীর মানুষ খেলার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত, এক শ্রেণী খেলতে ব্যস্ত, আরেক শ্রেণী খেলা দেখায় ব্যস্ত। সবকিছু মিলে রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকাও এ খেলার আয়োজনে ব্যয় হচ্ছে। কাজেই এ খেলা যেন আমাদের তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের সচ্চরিত্র গঠনে প্রতিবন্ধক না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে

০১. শরীয়াতের বিধান লঙ্ঘন হয় এমনভাবে হাফপ্যান্ট বা হাঁটুর উপরে কাপড় পরিধান করে খেলা উচিত নয়।

০২. যে সমস্ত খেলা দীর্ঘ সময় ধরে হয় এতে নামায, সিয়াম বাধাগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ থাকে তা পরিত্যাজ্য বা হারাম।

০৩. যে সমস্ত খেলায় নেশা দেখা দেয়, খেলা ছেড়ে যেতে মন চায় না তা নিষিদ্ধ।

০৪. আল্লাহর দেয়া এ মূল্যবান সময় বেশি অপচয় করে খেলা দেখা ঠিক নয়।

০৫. টাকা বেশি ব্যয় হওয়া, যার জন্য হারাম অর্থের উপর (চাঁদা তুলে খরচ নির্বাহ করা) নির্ভর করতে হয়।

০৬. নারী পুরুষ এক সাথে খেলা বা দেখা ঠিক নয়।

০৭. টাকা দিয়ে খেলা ঠিক নয়।

০৮. মানুষের হক নষ্ট করে খেলা ঠিক নয়।

০৯. ফরয কাজ যেমন পড়ালেখার সময় খেলাধুলা করা বা পড়ালেখার ক্ষতি করে খেলা নিষিদ্ধ।

১০. মা-বাবা, শিক্ষক ও বড়দের কথা অমান্য করে খেলা নিষিদ্ধ।

১১. সচ্চরিত্র গঠনে বাধা বা নিছক আনন্দের জন্য কোনো খেলা ইসলামে নিষিদ্ধ।

১২. খেলোয়াররা খেলার সময় গালাগালি ও অশ্লীল কথা-বার্তা বলা ইসলামে নিষিদ্ধ (২০০৬ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলায় ফ্রান্সের জিনেদিন জিদান-এর সাথে ইটালীর মাতারাজ্জি কর্তৃক অশ্লীল কথা-বার্তা এবং তাদের দু'জনের আচরণ বিশ্ববাসীকে হতবাক করেছে।)

১৩. যে সমস্ত খেলার দ্বারা অন্যের হক নষ্ট হয় এমন খেলা নিষিদ্ধ। (অন্যের ঘুড়ি লুটে নেয়া ও ঘুড়ির সুতলি লুট করা)।

১৪. যেসব খেলা অর্থহীন, উদ্দেশ্যবিহীন (সৎ উদ্দেশ্য) শুধু সময় কাটানোর জন্য খেলা হয়, সেসব খেলা নাজায়িয।

১৫. খেলাধুলায় হার জিতের প্রশ্ন নিয়ে বাজি ধরা, ব্যানার, পতাকা তৈরি করে টাকা ব্যয় করা, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া ও মারামারি করা ইত্যাদি অসচ্চরিত্রের পরিচায়ক।

www.amarboi.org

খেলাধুলার প্রভাবে সচ্চরিত্র গঠনের উপায়

প্রত্যেক বাসায় ছেলে-মেয়েরা একটা বয়সে বিনোদনের নামে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত হতে চায় বেশি। এতে তাদের শিক্ষা জীবন বিঘ্নিত হয়, মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, জীবনের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তৈরি হয়। এমন সন্তানদের প্রতি মা-বাবার দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকাই বেশি। মা-বাবাকে সন্তানদের সামনে বসে ঠাণ্ডা মাথায় প্রতি শুক্রবার বা দিনের যে কোনো সময় এক সাথে বসে সুন্দর সুন্দর কথা, জ্ঞানপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে অতীত এবং বর্তমানের প্রাপ্তি ও হতাশার স্মৃতি রোমন্থন করে ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষা, কিভাবে তা পরিপূর্ণ হতে পারে? এজন্যে কার কী করণীয়? তা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়া, সব সময় তাদেরকে সেই আশা আকাঙ্ক্ষা ভণ্ডুল হতে পারে এমন কোন বিষয় দেখলে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া। সেই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য একনিষ্ঠ হয়ে মা-বাবা তাদের সকল কিছুর যোগান দেয়া, কখনোই তাদের সাথে মেজায গরম না করা, মা-বাবার ভয় দেখিয়ে কথা বলা আবার বাবা-মায়ের ভয় দেখিয়ে কথা বলা, অনেক ক্ষেত্রে, প্রিয় শিক্ষকের কথা শিক্ষার্থীরা খুব মেনে চলে এক্ষেত্রে মা-বাবা শিক্ষকদের কাছে তাদের ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা সন্তানদের অগোচরে বলে দেয়া এবং শিক্ষকদের এ ব্যাপারে কথা বলে তাদের সংশোধন করানোর চেষ্টা করা উচিত।

যে বা যারা খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে বেশি তাদের কাছ থেকে সন্তানদের হেকমতে দূরে রাখার চেষ্টা করতে হবে। আর বন্ধু-বান্ধবদের কথা তো আগেই বলেছি তাদেরকে ঐ রকম খেলার সাথে সম্পৃক্ত বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে আশা করা যায় সুফল পাওয়া যাবে।

সচ্চরিত্র গঠনে কালচার বা সংস্কৃতির প্রভাব

কনসার্ট ও গানের প্রভাব

আজকাল পাশ্চাত্যের ন্যায়, গান-বাজনা, নাচ-গান, চাল-চলন, তাহযীব তামাদ্দুনের সর্বক্ষেত্রেই কনসার্টে যা পরিলক্ষিত হয় তা হলো এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীর সম্মিলনে এমন গান পরিবেশন করা যে গানকে এক কথায় ডিসকো গান বলা যায়। আর এ ডিসকো গানের তালে তালে শ্রোতারা লাফালাফি করে ডিসকো ষ্টাইলে নাচানাচি করে। এ ডিসকো কোনো বিনোদন নয়, এটি হচ্ছে আমাদের তাহযীব-তামাদ্দুন বিধ্বংসী মারণাস্ত্র। সংস্কৃতি তার লেবাস, পরিণতি এর সর্বনাশা রাহুগ্রাস। ইসলামে এরূপ ডিসকো নাচ গান ও ডিসকো সভ্যতার কোনো স্থান নেই। বিকট শব্দ সম্বলিত বাজনার সমন্বয় ঘটিয়ে যুবক যুবতীদের অধিক আনন্দ দেয়ার নেশায় যৌবনের শুড়-শুড়িমূলক গান

www.amarboi.org

পরিবেশনের মাধ্যমে "খাও দাও ফুর্তি করো– যা ইচ্ছা তাই করো" এমন মনোভাব গঠনে যেকোন গান পরিবেশন করা আদর্শ সমাজ, আদর্শ মানুষ কখনোই তাদের সংস্কৃতি হিসেবে মেনে নিতে পারে না। আবার পাশাপাশি এ কনসার্টেই যদি হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর ভীড়ে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে মহান স্রষ্টা ও রাসূলের গুণকীর্তন করে আদর্শ গান গাওয়া হয়, তাহলে ঠিক সেই সকল তরুণ-তরুণীরাই মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং বাধ ভাঙা হাসি ফুর্তিতে না ডুবে চিন্তা করে সুন্দর জীবন গড়তে সক্ষম হবে। আর এভাবে আমাদের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী ও বালক সুলভ আচার-আচরণকারী সকলকে কনসার্টের মাধ্যমেও সচ্চরিত্রবান হওয়ার প্রতি ধাবিত করা যায়।

ভালবাসা দিবস

১৪ ফেব্রুয়ারী ভ্যালেন্টাইন দিবস বা ভালবাসা দিবস। এ নিয়ে হৈ চৈ 'র কমতি হয় না কথিত সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। কেননা ভালবাসা প্রিয় এ মানুষগুলোর কাছে মনে হয়, ভালবাসা ছাড়া মানব জীবন অচল। আসলেও ঠিক তাই সন্তান বেড়ে ওঠে মায়ের ভালবাসার কোমল ছোয়ায়। জীবন সায়াহ্নে আবার এই মা-বাবাই চরম নির্ভরশীল হয়ে পড়েন সন্তানের ভালবাসার উপর। স্ত্রীর অকৃত্রিম ভালবাসায় গর্বিত পুরুষ মন, চিন্তা, বল ও সামর্থ্য উজাড় করে দিয়ে নির্মাণ করে সংসার- সমাজ- দেশ- পৃথিবী; স্বামীর সোহাগী ভালবাসায় উদ্বেলিত নারী সংসারে সুখের ফুল ফোঁটায়; গড়ে তুলে আগামীদিনের জাতির কাণ্ডারীরূপে আজকের শিশুকে। মালিকের ভালবাসা পেয়ে কর্মচারী আরও কর্মোদ্দীপ্ত হয়, হয় সৎ ও উদ্যমী। শ্রমিকের ভালবাসা মালিককে করে মানবিক গুণে উদ্ভাসিত। শাসিতের ভালবাসা শাসকের গৌরব সম্মান ও মর্যাদাকে উজ্জ্বল করে আর শাসকের ভালবাসা জাতি ও দেশকে করে মর্যাদাশীল, স্বনির্ভর ও অগ্রসরমান। ভালবাসার অবদান ও প্রয়োজনের এই ফিরিস্তি দীর্ঘ-অতিদীর্ঘ। আর এ কারণেই মানব ও মানবতার চিরন্তন গৌরব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যদি পরস্পর ভালবাসার বন্ধন গড়ে তুলতে না পারো, তাহলে তোমরা মুমিনই হতে পারবে না।

অতএব, মানব জীবনে ভালবাসা কোনো অতিথি পাখি নয়, যে শীতে এলো আর গ্রীষ্মে চলে গেল। বরং জীবনের সুখ, পরস্পর বন্ধনের স্থিতি, সমাজ-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও নির্মাণ এবং অগ্রসরমান জীবন ও চিন্তার সকল ক্ষেত্রে এক অনিবার্য প্রয়োজন এই ভালবাসা। কিন্তু ওই অনিবার্য প্রয়োজন ভালবাসাকে যখন দিবস বন্ধ সংস্কৃতির আওতায় এনে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, কালের চাতুর্যপূর্ণ শুভংকরী শিল্পে যখন অংকিত হয় ভালবাসা– যে ভালবাসা অসহায় কৃষ্ণকায় হেরোইন খোরের মতো সমাজের কথিত উচ্চমাত্রার ফ্রি মাইন্ডের বড়ি খাওয়া তরুণ-তরুণীদের নরম হৃদয়ে চব্বিশ ঘণ্টা বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। হাজার চেষ্টা করেও জননীর বুক, শিশুর কোমল হৃদয়, বাবার মন আর ভাই-বোন

www.amarboi.org

আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে মালিক-শ্রমিক, অফিসার-কর্মচারী আর শাসক-শাসিতের কোথাও একবিন্দু ভালবাসা খুঁজে পাওয়া যায় না। সর্বত্রই ভালবাসার মহা আকাল যেমন কারবালার পানি-পানি আর্তনাদ। নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত, নতুন আদলে চিত্রায়িত। এই ভালবাসাকে পেতে হলে যেতে হবে গাছতলায়, বাসা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে দূরে কোথাও বহুদূরে সমুদ্রের বেলাভূমিতে, পার্কে আর উদ্যানে, অশ্লীল আনন্দ আর উপচে পড়া ভালবাসার আদলে আজ হরণ হচ্ছে যুব সমাজ ও এক শ্রেণীর নারী পুরুষের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি।

একটি দিন ও রাত প্রেম সরোবরে ডুব দেয়া সাঁতার কাটা চরিত্রের নৈতিক ভূষণ খুলে প্রেম সরোবরের সলিলে যুগলদের হারিয়ে যাওয়ার এ দিবসটির নাম ভ্যালেন্টাইন দিবস বা ভালবাসা দিবস। বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে থেকে এ দিবস পালিত হচ্ছে এদিনে প্রেমপত্র, প্রেমকার্ড বিনিময়, ফুল ও বই বিনিময়, প্রেমিক-প্রেমিকার একান্ত আড্ডা, প্রেম ভালবাসা ও বিয়ের প্রস্তাব বিনিময় হয়ে থাকে। সেই সাথে লজ্জাহীন অবৈধ জুটিদের হৈ হুল্লোড় চারদিক মাতোয়ারা হয়ে উঠে।

আধুনিক এই ভালবাসা; কথিত এই ভালবাসা কি কাঙ্ক্ষিত না অনাকাঙ্খিত, সে সিদ্ধান্তও পরিষ্কার। এর বিস্তারিত ফলাফল প্রতিদিনকার পত্রিকাগুলোতে আমরা পড়ি। আমরা পড়ি, এই আবছা অন্ধকারে বেড়ে ওঠা ভালবাসা (পরকিয়া) দোষে দুষ্ট স্ত্রীকে খুন করেছে পাষণ্ড (?) স্বামী। আমরা পড়ি, স্ত্রীর এই একই ভালবাসায় বাঁধা দেয়ার কারণে স্ত্রীর বন্ধুগণ (?) স্বামীকে গলা কেটে হত্যা করেছে। এসব ঘটনায় মানবতার জন্য এতটুকু সান্ত্বনা আছে, এখানে অন্ধ জগতে সৃষ্ট ও বেড়ে ওঠা পাপী ভালবাসাকে দোষী করা হয়। কিন্তু যখন একই ভালবাসার শিকার কোনো তরুণী এসিড দগ্ধ হয় কিংবা কোনো তরুণ হয় বিপথগামী, সেখানে আর ওই দুষ্ট ভালবাসাকে, দুষ্ট ভালবাসার তলের সভ্যতাটাকে দোষী করা হয় না। খোঁজও করা হয় না। কারণ, ওটা সকলেরই জানা। আবার বললে এই আধুনিক ভালবাসার জনক সত্তার জাত যাবে। আধুনিক ও ফ্যাশনজাত এই ভালবাসার ক্ষিপ্র তাপে ঝলসে যাওয়া (এসিডদগ্ধ) চেহারার বিচরণ যেমন প্রচুর, তেমনি একই ভালবাসার দমকা হাওয়ায় পথ হারিয়ে ওরে যাওয়া তরুণের সংখ্যাও অসংখ্য।

বর্তমানে স্যাটেলাইট চ্যানেলের বদৌলতে অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতি যে সমাজে কতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, তা বিপথগামী যুব সমাজের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি নিবন্ধ করলে খুব সহজেই বুঝা যায়। বর্তমান বাজারে পত্র পত্রিকা, চলচ্চিত্র, টিভি স্যাটেলাইট চ্যানেলে যুবকদের রুচি অনুযায়ী অনুষ্ঠান সূচী সাজানো হয় এবং এসব কিছুতে যে মূল বিষয়টি থাকে তা হলো অবৈধ প্রেম ভালবাসা, আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা নয়।

www.amarboi.org

অথচ মুসলিমদের জন্য ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। সেই বিধানে পরস্পর বিবাহ বৈধ। বিয়ের উপযুক্ত দু'সাবালক ছেলে-মেয়ে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা বলা সম্পূর্ণ অবৈধ। এই অবৈধকে বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে যত শিক্ষা, শিক্ষা পদ্ধতি ও সভ্যতা– সবই অবৈধ। অতএব অবৈধজাত যে কোনো ফসল যে অবৈধই হবে, এটা কি বলার দরকার আছে? কিন্তু এ কথা বলতে গেলেই শুরু হবে হৈ চৈ। বলবে, আমরা কূপমণ্ডুক। বলবে, আমরা মধ্যযুগীয় বর্বরতার দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছি জাতিকে। আজকের আধুনিক রঙিন জাতকদের কাছে আমাদের প্রশ্ন পর্দা যদি সংকীর্ণতা হয়, ভালবাসার নামে অবৈধ ঢলাঢলি যদি ফ্যাশন হয়, আর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা যদি হয় মধ্যযুগীয় বর্বরতা- তাহলে আজকে ভালবাসার নামে যা হচ্ছে তা কী সভ্যতা?

অনদিকে মজার ব্যাপার হলো নিউজ মিডিয়ার চরম উৎকর্ষতার এ যুগে অন্যদেশে যা হচ্ছে তা পালনের ব্যাপারে আমাদের দেশের যুবক-যুবতী ও সমাজের কথিত আধুনিক সংস্কৃতিবাদী উপর শ্রেণীর লোকেরা প্রায় সকলেই এই নয়া ভালবাসার সুতোয় গাঁথা। মোবাইল থেকে ইন্টারনেট পর্যন্ত সকল পথই এখন এই সভ্যতায় বিজি। কারো কারোর জীবন এর প্রকৃষ্ট নজির। আজ একজনের বউ তো কাল আরেকজনের। বুড়ো বয়সে কনের বান্ধবীকে বন্ধু বানাতেও বিবেকে বাধে না যাদের, তারাই দেখি বলে ইসলাম এই আধুনিক যুগে অচল। কথায়-কথায় তারাই বলে ইসলাম মানেই সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ। আর এই বকর সানার ফষ্টিনষ্টি কি পরম প্রার্থনীয় সভ্যতা? তাহলে সভ্যতা কাকে বলে? মূলত পাপ ঢাকার পাপী মানসে যারা সভ্যতার নামে প্রসব করছে এই নতুন বিস্ময়কর দর্শন; কার্ম, স্বার্থ, অর্থ ও গদি অর্জনের অন্ধ নেশাই যাদের প্রধান প্রেরণা– সেই দর্শনেরই নিষ্ফল সাম্রাজ্যবাদী মদ্যপ, কিলার, সন্ত্রাসী, ঘুষখোর চাঁদাবাজ ও তাদের হাতের কারিশমা বোমা হামলা থেকে শুরু করে গ্রেনেড হামলাসহ সকল দুর্ঘটনা। এই সত্য এখন দিবস সূর্যের মতো জ্বলজ্বলমান। কিন্তু যারা এই পাপের জনক, তারাই যখন হর্তাকর্তা, তারাই যখন হয়ে যান সংস্কৃতির ধারক-বাহক, তারাই যখন বহু গ্রন্থের লেখক তখন মনে একটি প্রশ্নই বুককে বারবার বিদ্ধ করে ঐ সমস্ত গ্রন্থ পারবে কী আজকের কোমলমতি মেধাবী এবং আগামীদিনের সম্ভাবনাময় সৈনিকদের সচ্চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখতে, পারবে কি তাদের চিন্তা-চেতনায় আদর্শিক কোনো ছোয়া লাগাতে, পারবে কি তারা আদর্শ সমাজ ও দেশ গঠনে কোনো ভূমিকা রাখতে?

দুঃখজনক ব্যাপার হলো, আজ অবৈধ, নোংরা নাজায়িয প্রেম-ভালবাসার কবলে পড়ে কত শত সম্ভাবনাময় যুবক-যুবতীর জীবন যে অন্ধকার অমানিশার কোলে ঢলে পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। তাছাড়া এর কুপ্রভাব সমাজের উপরও অহরহ অবক্ষয়রূপে প্রতীয়মান হচ্ছে।

www.amarboi.org

মূলতঃ ভালবাসা দিবসের এ সংস্কৃতি তো মুসলিম সংস্কৃতি নয়। ২৭০ খ্রিষ্টাব্দ, সেন্ট ভ্যালেন্টাইন নামক একজন গির্জার পাদ্রী ও চিকিৎসক ছিলেন। খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের অভিযোগে রোমের দ্বিতীয় ক্লাডিয়াসের আদেশে তাকে কারাবন্দী করা হয়। জেলে থেকে তিনি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রচুর ভালবাসার চিঠি পেতেন এবং জেলে থেকেই তিনি কারারক্ষীর এক অন্ধ মেয়ের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনেন চিকিৎসার মাধ্যমে। এতে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে ঈর্ষান্বিত হয়ে রোমান সম্রাট তাকে হত্যা করেন। সেদিন ছিলো ১৪ ফেব্রুয়ারী। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সেই মেয়েটিকে একটি চিঠি লিখেন। এতে লেখা ছিলো "ফ্রম ইয়োর ভ্যালেন্টাইন।"

অনেকের মতে, সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের নামানুসারে পোপ প্রথম জুলিয়াস ৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ ফেব্রুয়ারী দিনটিকে "সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে" হিসেবে ঘোষণা দেন। সুতরাং মূল কথা হলো, এটি খ্রিষ্টানদের অনুষ্ঠান, তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়, মুসলিমদের নয়। বছরের একদিন মুসলিমদের মধ্যে এমন ভালবাসার কোনো সুযোগ নেই। আমরা সবসময়ই একে অপরকে ভালবাসি। কাজেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এ দিবসের গুরুত্ব তেমন প্রকট নয়। এটি এদেশের মানুষদের চরিত্রকে ধ্বংস করে রাস্তায় লেলিয়ে দেয়ার এক গভীর ষড়যন্ত্র। আমাদের ইজ্জত-আবরু, ঈমান-আকীদা, কুরআন ঘোষিত পর্দা প্রথা এসব কিছুর বিরুদ্ধে এক গভীর চক্রান্ত। আজকে যারা এগুলোর সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে সাময়িক আনন্দ পেতে চায়, তারা আসলে ইসলামের হুকুম জানে না। কাজেই, সরকার এবং সকল মিডিয়া কর্তৃপক্ষ দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আমাদের জাতীয় চরিত্র সংরক্ষণ করে আদর্শ মানুষ গঠনে ভূমিকা পালন করা উচিত।

৩১ ডিসেম্বর বা থার্টি ফাস্ট নাইট কালচার

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ। অগণিত আলিম-ওলামা পীর মাশায়েখ ও বুযুর্গের আগমনে এদেশের মাটি যেন আজও এ ভূমিতে ভূমিষ্ঠ সন্তানদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে আদর্শের দিকে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের সফল ঈমানী ফসল আজও আমাদের অন্তরে প্রবাহমান। আর তাই এদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতি হলো ইসলামী সংস্কৃতি; আদর্শ সংস্কৃতি। যা গড়তে সক্ষম আদর্শ জাতি, সচ্চরিত্রবান জাতি।

যুগে যুগে এ সংস্কৃতি, এ সংস্কৃতির ধারক-বাহক, তাদের চিন্তা-চেতনা, ঐতিহ্য, মনন ও মননশীলতা, তাদের গাম্ভীর্য ও বীরত্বকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে পরিকল্পিতভাবে এখানে প্রবেশ ঘটানো হয়েছে অপসংস্কৃতির। যা মানুষের অতীত ঐতিহ্য, আদর্শ শিক্ষা ও সচ্চরিত্রবান জাতির চিন্তা-চেতনার অবনতি ঘটিয়ে মানুষদেরকে আজ নিয়ে গেছে অপসংস্কৃতির দিকে, ফলে মুসলিম জাতি

www.amarboi.org

বিজাতীয় নাচ, গান, অশ্লীল ছবি, পোশাক-পরিচ্ছদসহ নানা অপসংস্কৃতির তালে মাতাল হয়ে নিজেদের গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস, স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। আমাদের মধ্যে নেমে এসেছে নৈতিক অবক্ষয়। পরিণতিতে পাশবিক যাতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে আমাদের শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও ইজ্জত সম্ভ্রম।

একটি জাতির হাতিয়ার হলো, তরুণ ও যুব সমাজ। তারাই দেশের ভবিষ্যৎ। আগামী পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজানোর দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত। তেমনিভাবে সমাজ সৌধের ভিত্তি হলো মাতৃজাতি।

এ সৌধের ভিত্তির ইটগুলো যদি সেই সৌধের তলা হতে বেরিয়ে আসে, নিজেকে দেখাবার জন্য এদিক-ওদিক নড়াচড়া ও ঘুরাফেরা করে, তাহলে সৌধটি যেমনি খাড়া হয়ে থাকতে পারবে না, ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সেই সৌধটি মানুষের দেহকে রোদ-বৃষ্টি, ঠাণ্ডা-বাতাস হতে, ধন-রত্নকে চোর-ডাকাত হতে এবং মানুষের মান-ইজ্জতকে গুণ্ডা-পাণ্ডা ও সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা করতে অক্ষম হবে। তেমনি মাতৃজাতি যদি সমাজের আগায় ও মাথায় ভর করে হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, কাচারি-দরবারে, টিভি, স্যাটেলাইট এবং বিভিন্ন অপসংস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য মিলিয়ে দিতে তৎপর হয়; তবে সেই সমাজ আর টিকে থাকতে পারে না। টি এস সির 'বাঁধন' (২০০১) প্রকৃতির সেই নারী জাতির এ লাগামহীন চলাফেরা, লাগামহীন বিচরণে পরিবেশ হবে দূষিত, উস্কে উঠবে শয়তানিয়্যাত। এর ফলে জাতির হাতিয়ার যুব ও তরুণ সমাজ নৈতিক অধঃপতনের শিকার হয়ে অকালে ঝরে যাবে নিঃসন্দেহে যার বাস্তব চিত্র আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করছি। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের তরুণ-তরুণীরা সেই ধ্বংসের পথেই পা বাড়াচ্ছে- "থার্টি ফাস্ট নাইট এর মতো বিরূপ কালচারের খড়স্রোতে নিজেদের গা ভাসিয়ে দিয়ে।

পহেলা জানুয়ারীর প্রাক্কালে ৩১ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে ১২:০১ মিনিটে গভীর নিশিতে পাশ্চাত্যের ঢং-এ যুবক-যুবতী ও তরুণ-তরুণীদের "হ্যাপি নিউ ইয়ার" বুলির আড়ালে বিরূপ উচ্ছৃংখলতা ও কুরুচিপূর্ণ বেহায়াপনা বেহেল্লাপনার মধ্য দিয়ে থার্টি ফাস্ট নাইট নামক পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি এখন বাংলাদেশে প্রতি বছর উদযাপিত হচ্ছে। যার অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, এটি যেন প্যারিস নিউইয়র্ক বা যাদের সংস্কৃতি তাদের দৃশ্যকেও হার মানাচ্ছে।

থার্টি ফাস্ট নাইটে আমাদের তরুণ-তরুণীরা মদ, গাজা, ভাং, ফেনসিডিল, বিয়ার, হুইস্কি ইত্যাদি পান করে এবং নেশার ঘোরে মাতাল হয়ে অশ্লীল গান বাজনার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে সারা-রাত ধরে নাচানাচি করে। আতশবাজীতে বাংলার আকাশ বাতাসকে রঙিন ও বিমর্ষ করে তারা যা ইচ্ছা তাই করতে চেষ্টা করে।

www.amarboi.org

কাজেই বলব, সংস্কৃতির নামে এ অপসংস্কৃতি ও বিজাতীয় কালচার থেকে আমাদের যুব সমাজকে ফিরিয়ে রাখার লক্ষ্যে আজ যা প্রয়োজন তা হলো, সকলেই সোচ্চার হওয়া। যে যেই স্তরে আসীন সেখান থেকে সকলকেই যুব সমাজ তথা ভবিষ্যৎ জাতির ধারক-বাহকদের চরিত্রকে সচ্চরিত্রে ধাবিত করার লক্ষ্যে ভূমিকা রাখা উচিত। সেই সাথে তাদের সামনে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও তামাদ্দুনকে পরিচিত করে দিয়ে এদিকে সকলকে এগিয়ে নিয়ে আসা প্রয়োজন। তা না হলে এ অপসংস্কৃতির কালো থাবা থেকে এদেশ, জাতি ও দেশের মানুষের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বরণ

পহেলা বৈশাখ বাংলা বার মাসের প্রথম মাসের সূচনা বা প্রথম দিন। নতুন বছর শুরু। ফসলী সন হিসেবে মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে এ সনের প্রবর্তন হয়। এদিনে এক শ্রেণীর নারী পুরুষ, যুবক-যুবতী, "এসো হে বৈশাখ এসো এসো" বলতে বলতে রমনার বটমূলে জড়ো হয়। তাদের কপালে থাকে চন্দন অথবা বিভিন্ন রঙের তিলক আর গণ্ডদেশে থাকে অনেক আল্পনা আঁকা। বাসন্তী শাড়ী পরিধান করে দল বেধে নৃত্যগীত ছড়িয়ে দিয়ে এদিনে উপরের তলা থেকে শুরু করে নিচ তলার যুবক, বৃদ্ধ, তরুণেরা সবাই মিলে সানকিতে করে পান্তা ভাত, কাঁচা মরিচ আর ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে বাঙালী সেজে বাঙালীত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে রাস্তায় ভীড় করে থাকে। ছেলে-মেয়েরা একত্রে বিশেষ রং ও ঢং-এর টুপী পরে মাথা বেঁধে স্রোতের মতো চলে গায়ে পাঞ্জাবী পরিধান করে। নাচ-গান চলে দিনব্যাপী, বাংলা গানের আসর জমে এখানে সেখানে শিশু পার্কের সামনে, সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের সামনে রাস্তায় এবং রমনাসহ আরো যে সমস্ত পার্ক লেক ও বিনোদন কেন্দ্র আছে সেখানে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম বিনোদনকে অনুৎসাহিত করে না কিন্তু বিনোদনের নামে অপবিত্র কোনো কাজ-কর্ম ইসলাম সমর্থন করে না, আর তাই এ ধরনের অনুষ্ঠান উদযাপনে নর-নারীকে পর্দা করেই পৃথক আঙিনায় চলতে উৎসাহিত করে। কাজেই এমন দিবসগুলোতে মুসলিম পরিবারে মা-বাবাদের আরো সচেতন থেকে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাসায় কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের মতো তাদের সংস্কৃতিকে ধারণ করার সুযোগ যেন না পায় সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। কেননা, ঐদিন মুসলিম সন্তানদের অসচ্চরিত্রের দিকে ধাবিত হওয়ার সবগুলো উপকরণ ওঁত পেতে বসে থাকে, যারা এ অনুষ্ঠানে যায় তাদের সকলের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনাকে বিকৃত করে তোলে, যুবক-যুবতীদের মন উদাস হয়ে থাকে, সচ্চরিত্র গঠন বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের সকলের যত্নবান হওয়া উচিত।

www.amarboi.org

ছায়াছবি ও নাটক

মনকে আকৃষ্ট করে এমন নাচ-গান রং-ঢং-এর সম্মিলনে সুন্দর সুন্দর ডায়ালগ বা সুদৃশ্য স্থানের মহড়া আর নাফসের পশু প্রবৃত্তির সমর্থনে যে বিষয়টি আমাদের টিনেজ বয়সীদের মনে ধুলা দেয় তা হলো ছায়াছবি। অনেকে একে কথায় কথায় সিনেমা সম্বোধন করে থাকে। আসলে সিনেমা শব্দের অর্থ হলো প্রেক্ষাগৃহ, আর সেখানে যা প্রদর্শিত হয় তার নাম ছায়াছবি। অর্থাৎ যে স্থানে বা ভবনে ছায়াছবি প্রদর্শিত হয় তার নাম সিনেমা। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার ফলে বিনোদন ও আনন্দ ফুর্তির নামে মনকে আকৃষ্ট করে এমন কিছু বিষয় এ ছায়াছবির সাথে জুড়িয়ে দিয়ে তা ব্যাপক ভিত্তিতে প্রচার করা হচ্ছে। ফলে আজকের দশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সী দেশের প্রাণশক্তি এ সন্তানেরা বাসায় টেলিভিশনের সামনে বসে বা সিনেমা হলে যেয়ে এসব ছায়াছবির দিকে একনিষ্ঠভাবে দু'চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে, দু'কান খাড়া করে সব কথা ও ডায়ালগগুলোকে শ্রবণ করে মুখে মুখে উচ্চারণ ও গানের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সুরের তালে তালে তার সাথে নিজেরদেরকে আপন করে নেয়। এতে ছায়াছবির দর্শক ও শ্রোতা হিসেবে এগুলো তারা শিখে পরিবার, সমাজ ও সামাজিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে। আর এটা করাই স্বাভাবিক; এটা করা ছায়াছবির দৃষ্টিকোণ থেকে পজিটিভ। কিন্তু দুঃখজনক হলো, ঐ ছায়াছবি যে ঘটনার বা সমাজ চিত্রের প্রতিফলন তা যে অনাদর্শিক বিবর্জিত সমাজ সামাজিকতাকে অশ্লীলতা আর যুব সমাজকে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করার এক মারণাস্ত্র। অন্য কথায় এভাবে বলা যায়, নৈতিক চরিত্র ধ্বংস এবং মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ হত্যাকারী সচিত্র প্রশিক্ষণের মাধ্যম হলো এ ছায়াছবি। কিন্তু কিভাবে? দেখুন!

০১. ছায়াছবি ছেলে-মেয়েদের অবাধে মেলা-মেশা, গল্প-গুজব, হাসি-ফুর্তি করার এক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে তাদেরকে সেদিকে ধাবিত করছে।

০২. "লজ্জা ঢেকে রাখা ঈমানের অঙ্গ।" এ লজ্জা-শরম নামক ঈমানের অঙ্গটি গলাটিপে আস্তে আস্তে হত্যা করে দিয়েছে ছায়াছবি।

০৩. পরিবার, সমাজ ও সামাজিক অঙ্গণে একে অপরের প্রতি মূল্যায়ন, মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিয়েছে এ ছায়াছবি।

০৪. রাতারাতি জিরো থেকে হিরো হওয়ার লক্ষ্যে যা-যা করতে হয় তা শিক্ষা দিচ্ছে সেই শুরু থেকে আজও ছায়াছবি– যার বাস্তব প্রতিচ্ছবি ১৯৭১ সালে অনেকে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া।

০৫. এ ছায়াছবি শিখিয়েছে কিভাবে মানুষের সাথে প্রতারণা, অশ্লীল কথা বলা আর নিছক হাসি ঠাট্টায় মানুষকে মশগুল রাখতে হয়।

০৬. ছায়াছবির কারণেই মানুষ আজ বুঝতে শিখেছে কিভাবে মানবিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে পাশবিকতা আয়ত্ত করে হিংস্রতা প্রদর্শন করে সম্পদশালী ও নেতা হতে হয়।

www.amarboi.org

০৭. এ ছায়াছবি শিখিয়েছে যুবকের বড় বড় চুল, কানে দুল, হাতে বেসলেট, পরনে জিন্স আর জিন্সে তালি দিয়ে কিভাবে পরিধান করতে হয় ইত্যাদি .... ইত্যাদি।

০৮. ছায়াছবি শিখিয়েছে কিভাবে মা-বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে অথবা তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করে বা রাগ করে অন্যত্র চলে যেতে হয়? অনেক কিছু আদায় করতে হয়।

০৯. ছায়াছবি শিখিয়েছে কিভাবে মার-পিঠ, ছিনতাই, খুন-খারাবি করতে হয়।

১০. এটি শিখিয়েছে কিভাবে মানুষের সাথে ছলনা করে, কথা ঘুরিয়ে নিয়ে কোনো কিছু আত্মসাৎ করা যায়।

১১. এ ছায়াছবি শিখিয়েছে কিভাবে অবৈধ প্রেম ভালবাসা আর বেহায়াপনা করতে হয়।

১২. এ ছায়াছবি যুবক-যুবতীদেরকে অবৈধ প্রেম ভালবাসা, ছলনা, প্রতারণা, স্বার্থবাদী ভালবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এদেশে ছায়াছবি আরেকটি ভিন্ন নামে নাটক বা টেলিফ্লিম— এসব অনুষ্ঠানে মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো একটু আনন্দ, একটু বিনোদন যার অন্তরালে থাকে অবৈধ প্রেম ভালবাসা। এমন কোনো ছায়াছবি বা নাটক নাই যার মধ্যে প্রেম ভালবাসার কোনো দৃশ্য বা ডায়ালগ নেই।

আর এমন ছায়াছবি নির্মাতাদের লক্ষ্য করে আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আকরাম (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে ছবি নির্মাতাদের।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

কাজেই বলব, যুব সমাজের এ যে চরিত্রের নৈতিক ধস, অবক্ষয় তা রোধ করার লক্ষ্যে এদেশের ছায়াছবির জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আদর্শ জীবন ও সংস্কৃতির সুস্থ বিনোদন। আমি বিশ্বাস করি, যে ছায়াছবি আমাদের যুব সমাজকে সামগ্রিকভাবে ধ্বংসমুখী করে তুলতে পারে সে ছায়াছবিই আমাদের সেই যুব শক্তিকে গঠনমুখী করে তুলতে পারে। এবার কেউ কেউ হয়তোবা বলবেন তাহলে ব্যবসা হবে না, মানুষ দেখবে না তাদের লক্ষ্য করে বলতে চাই –

আদর্শ পছন্দ করে না এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল। যারা অনাদর্শিক তারাও আদর্শ জীবন পছন্দ করে। এবার অনাদর্শের আদলে গড়া এ ছায়াছবি দেখে অনাদর্শের সাথে সম্পৃক্ত এক শ্রেণীর গোষ্ঠী যা মোট জনগোষ্ঠীর একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আর যদি আমরা আদর্শ ছায়াছবি নির্মাণ করতে পারি তাহলে দেখবে সবাই। কথা বুঝে আসে না একটা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করি – আজকেও

www.amarboi.org

যখন কোনো একটা ভাল ছবি কোনো সিনেমা হলে প্রচারিত হয় সেখানে কী দর্শকের ঢল নামে না? বলুন, সুতরাং এর দ্বারা কী প্রমাণিত হয় না আদর্শ সংস্কৃতির আদলে ছায়াছবি নির্মিত হলে মানুষ আরো বেশি বেশি দেখবে। আদর্শ সমাজ গড়তে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করবে এবং করবে দেশের উন্নয়ন।

সচ্চরিত্র গঠনে প্রিন্ট মিডিয়ার প্রভাব

সংবাদ পত্র

দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ষান্মাষিক ও বার্ষিক

ফজর নামাযের পর মুক্ত বায়ুতে শারীরিক ব্যায়াম শেষে দেশ-বিদেশের কোথায়? কখন? কিভাবে? কী ঘটল? এ সকল কিছু জানার অধীর আগ্রহে যে কাগজটি আমরা হাতে নেই তার নাম সংবাদ পত্র। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কপি ছাপা হয়ে দেশ বিদেশের সর্বত্র লিখিতভাবে (বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ছবিসহ) যে পত্রটি মানুষের কাছে বিভিন্নভাবে সংবাদ নিয়ে হাজির হয়, তার গুরুত্ব সমাজ সামাজিকতার অঙ্গণে আর মানুষের কাছে কাছে বলাই বাহুল্য। পৃথিবীতে যে কোনো ঘটনা দুর্ঘটনা মানুষের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার মতো এত কার্যকর আর কোনো মাধ্যম নেই। ফলে এদেশে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বার্ষিক বা এক বছরের আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে শত সহস্র পত্রিকা ছাপা হয়ে থাকে। আর এর চাহিদা বা জনপ্রিয়তা এর প্রকাশনা বৃদ্ধিই প্রমাণ করে।

অধিকন্তু মানুষ যতই শিক্ষিত হবে তার জনপ্রিয়তা আরো বাড়বে আরো বেশি মানুষ তাকে গ্রহণ করবে। সংবাদ পত্র দেশ, দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, আমাদের প্রিয় ভাষা বাংলা ও পতাকা সুউচ্চে তুলে ধরে এ জাতিকে আদর্শে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে যা করতে পারে তা হলো ঃ

০১. সকল ক্ষেত্রে গঠনমূলক খবর পরিবেশন করে দেশের জনগণকে আরো সচেতন করে তুলতে পারে।

০২. জাতীয় সমস্যা সমাধানে (ঘুষ ও দুর্নীতি, সুদ থেকে মুক্তি, ইনকাম ট্যাক্স ভ্যাট ও যাকাত আদায়) কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস কী বলে তা মুতাবিক সমাধান দেয়ার লক্ষ্যে লেখা ছাপাতে পারে।

০৩. মানুষকে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে পারে। তাদের বিবেককে জাগ্রত এবং নিজের কৃত অপরাধ নিজে নিজে বুঝার মতো লেখা ছাপিয়ে মানুষকে অপরাধমূলক কাজ করার আগে থমকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। যাতে মানুষ নিজের বিবেক দ্বারা তাড়িত হয়েই সংশোধনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

www.amarboi.org

০৪. হত্যা, সন্ত্রাস ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপের বিপরীতে কুরআন, সুন্নাহ অনুযায়ী সহজবোধ্য ও সকলের বোধগম্য এবং হৃদয়স্পর্শী করে বক্তব্য উপস্থাপন করে লেখা ছাপালে এ লেখা তাদের বিবেকের পশুত্বকে ধ্বংস করে মনুষত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হতে পারে।

০৫. বিভিন্ন কুরুচিসম্পন্ন বক্তব্য, জাতিসত্তার প্রতি অবমূল্যায়ন বা অসম্মানজনক লেখা না ছাপিয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করতে পারে এমন লেখা ছাপানো হলে ভাল হবে।

০৬. সচ্চরিত্রের সহায়ক এবং কিভাবে অর্জিত হতে পারে সমসাময়িক ঘটনার আদলে অসচ্চরিত্রের সকল দোষ-ক্রটিগুলোর ফলে মানুষের হক হরণ করা হচ্ছে– এ যে অমার্জনীয় অপরাধ তা লিখে এ থেকে মুক্তির উপায়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করলে জাতি উপকৃত হবে।

০৭. সংবাদ পত্রে অশ্লীল ও বেহায়াপনা, কুরুচিপূর্ণ ধবংসাত্মক ও অন্য পক্ষ নিরপেক্ষ মানুষদেরকে কোনো কিছু সম্পর্কে জাগ্রত করার নামে উস্কানি দিয়ে বক্তব্য লেখা পরিহার করে দেশ ও দেশের জনগোষ্টীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখলে জাতীয় চরিত্র যেমনি সংরক্ষিত হবে তেমনি জাতিগতভাবে আমরাও হবো উন্নত।

০৮. সংবাদপত্র জাতীয় নেতৃবৃন্দের মর্যাদা বৃদ্ধি তথা তাদের মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

০৯. মানুষের মেধা, মনন ও চিন্তা আদর্শ খাতে প্রবাহিত করতে পারে।

১০. মানব জীবনের শুরু থেকে তাদের চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা ও জীবনবোধ গঠনে তাদের পড়ালেখায় আকৃষ্টকরণে, দেশের প্রতি আজকের তরুণ, কিশোর ও যুবকদের ভূমিকা এবং করণীয় বিষয় সম্পর্কে জাগ্রত করে তোলার লক্ষ্যে তাদের উপযোগী লেখা ছাপিয়ে দেশ গঠনে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারে।

১১. সংবাদ পত্র জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি ও বিভেদ দূরীভূত করে দিতে পারে।

১২. সকল প্রকার অনৈতিকতা অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে মতামত সৃষ্টি এবং মানুষকে সজাগ করে দিতে পারে।

১৩. এ মাধ্যম এত শক্তিশালী যে, এটি খুব সহজেই জাতিকে আদর্শবান করার লক্ষ্যে সকল প্রকার সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তা সমূলে উৎপাটন করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

কিন্তু আজ জাতির কি দুর্ভাগ্য! যে সংবাদ পত্র জাতি গঠনে দেশ ও দেশের পতাকাকে সুউচ্চে তুলে বিশ্বের বুকে আদর্শ ও উন্নত রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মতো কার্যকর ভূমিকা পালন করে সে সংবাদ পত্রই আজ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন নামে বাচ্চা সাইজে

www.amarboi.org

বাচ্চাদেরকে (এক একজন ফিরিশ্‌তা সমতুল্য কোমলমতি সন্তান যারা আগামীদিনের জাতির নেতৃত্বদানকারী আদর্শ মানবতাবাদী মানুষ) বদমায়েশ, বেয়াদব এবং বিকৃত মস্তিষ্কের, বিকৃত রুচির, বিকৃত চিন্তার, অস্থির পাগল এবং পড়ালেখা বিমুখ বানানোর নেশায় মত্ত হয়ে পড়েছে। যা আজ শিক্ষিত ও সভ্য পরিবারে আদর্শবাদী মা-বাবাকে প্রতিনিয়ত লজ্জিত করে থাকে। এ সমস্ত বাচ্চাদের বেয়াদব বানানোর বিশেষ বুলেটিনগুলোর কারণে আমার জানামতে আদর্শ বাবা-মায়েরা বাসায় কোন সংবাদ পত্রটি রাখবেন তা নির্বাচন করতে হিমশিম খেতে হয়। বর্তমানে কতিপয় পত্রিকা কোমলমতি আগামীদিনের সন্তানদের চরিত্রকে ধ্বংস করার জন্যে একশতভাগ আট সাট বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছে এবং আজকে সফলও হচ্ছে। ছোটদের কথা-বার্তা আচার-আচরণ আর চিন্তা-ভাবনার প্রসারতা দেখে মা-বাবাই বলেন ছেলে-মেয়েরা এমন কথা কোত্থেকে শিখল ইত্যাদি। মূলতঃ এক শ্রেণীর উদ্ভট ও বিকৃত মস্তিষ্কের অসচ্চরিত্রের, অসৎ ধ্যান-ধারণার ও অসৎ মানুষদের জন্য লেখার সম্মিলন– যা ওদের জন্যই ফিট। যারা এত বিকৃত ও বেহায়াপনার কথা লেখতে পারে তারা যে কেমন মা-বাবার সন্তান তা না হয় নাই বললাম তবে নিজেরা যে আদর্শ সচ্চরিত্রবান মানুষ নয় তা তাদের চিন্তা-চেতনা আর লেখনী থেকেই বুঝা যায়। যেমন বুঝা যায় গোলাপ ফুল কেমন তা তার গন্ধ থেকে; আর পায়খানা কেমন তাও বুঝা যায় তার গন্ধ থেকে। কাজেই মা-বাবারাও অগ্রহণযোগ্য অসম্মানের তাও বলা যায় খুব সহজেই। কারণ সন্তান ভাল ফলাফল অর্জন করলে যদি আপনাদের গলায় ফুলের মালা আসতে পারে; কুরআনে হাফিয হলে যদি আখিরাতে হাশরের ময়দানে আপনাদের চেহারা নূরানী আলোতে আলোকিত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের মাথায় নূরের টুপি পরিয়ে পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত দিতে পারেন তাহলে বিপরীতভাবে সন্তান অমানুষ হলে আপনাকে দুনিয়ার জীবনীতে অপমান, লাঞ্ছনাস্বরূপ হাতকড়া পড়িয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করানো আর আখিরাতে জাহান্নামে প্রেরণ এতো আপনাদেরই প্রাপ্য।

অন্যদিকে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পত্রিকার কথা আর কি বলব! কয়েকটি পত্রিকাতো আছে সেগুলো শুধু অশালীন আর নোংরা কথা ও ছবি ছাপানো নিয়ে ব্যস্ত। এ সমস্ত পত্রিকাগুলোর সাথে যারা যারা জড়িত তারা কেমন মানুষ হতে পারে তাই প্রশ্ন জাগে মনে! আবার মনে হয় মানুষও কী এমন হতে পারে? উফ কি দুর্ভাগ্য! আর বুঝি কোনো ব্যবসা পেলো না। এসব হারাম ব্যবসা করে টাকা পয়সা উপার্জন করে মানুষ শান্তি পেতে চায় কিভাবে আমি বুঝি না। তারা মৃত্যুর কথা ভুলেই গিয়েছে আমার যা মনে হয়। তা না হলে তারা হতো আরো সচেতন এবং সচ্চরিত্র গঠনের, ভাল মানুষ গঠনের

www.amarboi.org

অংশীদার। আর তাদেরকে হুঁশিয়ার করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ج وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

"যারা পছন্দ করে যে ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা প্রসার লাভ করুক তাদের জন্য রয়েছে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ তা'আলা জানেন, তোমরা জানো না।" (সূরা আন নূর, ২৪ ঃ ১৯)

সুতরাং বলব এ ঘৃণিত অভিশাপ ও লা'নতপূর্ণ কর্ম ছেড়ে তাওবা করে মুসলিম হলে ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী আর অন্য ধর্মাবলম্বী হলে স্ব-স্ব ধর্ম অনুযায়ী আপনার স্রষ্টার কাছে ক্ষমা চান হয়তোবা রাহমানুর রাহীম মাফ করেও দিতে পারেন। আপনাদের পেশা অত্যন্ত মহৎ সম্মানজনক আপনারা সহজেই জাতিকে আদর্শের দিকে ধাবিত করতে পারেন। মানুষকে পরিচিত করে তুলতে পারেন পৃথিবীবাসীর কাছে আবার ইচ্ছা করলে আস্তাকুঁড়েও নিক্ষেপ করতে পারেন। কাজেই বলব, হলুদ সাংবাদিকতা না করে আদর্শের সাথে পত্রিকায় লেখা ছাপিয়ে এ দায়িত্ব পালন করলে মানুষ আপনাদেরকে স্মরণ করবে যুগ যুগ ধরে শতাব্দী কাল।

আজকের পৃথিবীতে যত দ্বন্দ্ব-কলহ আর অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে তার প্রধান ও একমাত্র কারণ হলো মানুষ দ্বারা মানুষের হক বা অধিকার হরণ। শোষক দ্বারা শোষিতের উপর অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চালানো, শক্তিধরদের দ্বারা শক্তিহীন বা দুর্বল মানুষের উপর নানা ধরনের অত্যাচারের লোমহর্ষক ঘটনা কাজেই এ সকল বিষয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসের আলোকে সকল সমস্যার সমাধান যদি সংবাদ পত্রে ছাপানো হয় তাহলে জাতি আরো উপকৃত হবে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা জানি, আমাদের সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে এমন গ্রন্থ, পরিপূর্ণ গ্রন্থ সেটি হচ্ছে আল কুরআনুল কারীম।

এ পৃথিবীতে আল কুরআনুল কারীম একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন বিধানমূলক গ্রন্থ আর অদ্বিতীয় কোনটি নেই। এটিই পারে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান দিতে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন আসতে পারে আজ কেন পারছে না, উত্তরে বলব আজ না পারার কারণ সর্বক্ষেত্রে তার চর্চা ও ব্যবহার না হওয়া, না জানার কারণে মানুষ গাফেল হয়ে পড়েছে। তবে এটিও সত্য যদি আমরা সবাই যে যে ক্ষেত্রে আছি সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে আল কুরআনের চর্চা ও সেই মুতাবিক সবকিছুর সমাধান করার চেষ্টা করি তাহলে অচিরেই আমরা সুফল পাবো ইনশাআল্লাহ। জাতিতে হবো আমরা আবারো আদর্শ জাতি। আর সে জন্যেই লেখা এ গ্রন্থটি।

www.amarboi.org

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিকী ও ম্যাগাজিন

এদেশে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর শিক্ষার্থীদের মেধাকে শানিতকরণ; তাদের মধ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি; আগামীদিনের দায়িত্ব ও নেতৃত্বশীল আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠন করার লক্ষ্যে বার্ষিকী ও ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়ে থাকে। এতে শিক্ষকসহ শিক্ষার্থীদের প্রবন্ধ জ্ঞান বিচিত্রা, কৌতুক, কবিতা ও ছড়া চিত্রাংকন ভ্রমণকাহিনী, তথ্য বিজ্ঞান ধাঁ-ধাঁ ও প্রতিষ্ঠানের পরিচয় সম্বলিত লেখা ও ছবি স্থান পেয়ে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীদের জীবনে লেখার হাতখড়ি এখান থেকেই চর্চা শুরু হয় এবং শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত যত্নের সাথে শিক্ষা ও লেখা জীবনের স্মৃতি হিসেবে এগুলোকে সংরক্ষণ করে থাকে।

সাহিত্য জাতির দর্পণ– এ কথা সর্বজনবিদিত ও চিরায়ত। অন্যদিকে বার্ষিকী ও ম্যাগাজিন ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দর্পণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের চিন্তা-চেতনা মন-মানসিকতার ফসল আর সে জন্যেই সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অপসংস্কৃতির যে ছোয়া আমাদের কোমলমতি আগামীদিনের ভবিষ্যৎ প্রত্যেক পরিবারের কলিজার টুকরা সন্তানগুলোর চরিত্রকে ধ্বংস করে দিয়ে অমানুষে পরিণত করছে এ থেকে মুক্তি বা উদ্ধার প্রাপ্তির জন্যই আজ প্রয়োজন একদল একনিষ্ঠ আদর্শবাদী সচ্চরিত্রবান যোগ্য কলম সৈনিকের যারা তাদের ক্ষুরধার লেখনির সাহায্যে জাতিকে পথ দেখাবে সুস্থ সংস্কৃতির দিকে, মূল্যবোধ ও মনুষত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে অপসংস্কৃতির লৌহ কপাট ভেঙ্গে চুরমার করে রুচিশীল সংস্কৃতির ভীত রচনার ক্ষেত্রে এমন কলম যোদ্ধারা ভূমিকা রাখবে অত্যন্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সম্মিলনে যাদের কলমের নিপুণ ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে শান্তির সোনালী সমাজ।

বার্ষিকী ও ম্যাগাজিনে কী ধরনের লেখা স্থান পাওয়া উচিত

বার্ষিকী ও ম্যাগাজিন একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মনের ও জ্ঞানের ক্ষুধা নিবারণ এবং আদর্শ জ্ঞান আদান-প্রদানের একটি তথ্যবহুল মাধ্যম। এটি স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের অতীত ঐতিহ্য, ফলাফল, শিক্ষর্থীদের পরিচয় ও তাদের চিন্তা-চেতনার সমাবেশ ঘটিয়ে বর্তমান ও আগামী শিক্ষার্থীদেরকে আদর্শ শিক্ষার আলোতে আলোকিত করে সচ্চরিত্র ও নৈতিকতায় উত্তীর্ণ আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠনে যে সমস্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে তা হলো ঃ

০১. আদর্শ শিক্ষা কী ও কেন? কিভাবে তা অর্জন করতে হবে– এ সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা সম্বলিত প্রবন্ধ থাকলে ভাল হবে।

০২. আদর্শ শিক্ষার্থীরা কেমন হয় বা হবে? তাদের কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা ইত্যাদিকে পজিটিভ করে গড়ে তোলার পথে সহায়ক শক্তি হিসেবে জ্ঞানপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনা তাদের সামনে পেশ করতে পারে।

www.amarboi.org

০৩. শিক্ষকদের প্রতি মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ এবং তাদের সাথে শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক কথোপকথনের ধরন কেমন হবে তা সংক্রান্ত আলোচনা থাকতে পারে।

০৪. শিক্ষার্থীদের জ্ঞান উৎসুক ও জ্ঞানের রাজ্যে একনিষ্ঠ করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণমূলক লেখা থাকা উচিত।

০৫. মানুষ, মানুষের জন্যে এমন মানবতাবোধে উজ্জীবিত হয়ে কল্যাণমূলক সৎ কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিতকরণের লক্ষ্যে সুন্দর প্রবন্ধ ছাপানো যেতে পারে।

সর্বোপরি শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এবং স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত লেখার সম্মিলন ঘটিয়ে এক একটি ম্যাগাজিন বা বার্ষিকী হতে পারে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্যে আদর্শ গাইড লাইনমূলক ম্যানুয়াল। শিক্ষা জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সফলতার সাথে পৌঁছার এক অমোঘ কবচ।

সচ্চরিত্র গঠনে স্কুল ও কলেজ বার্ষিকীর ভূমিকা

বহু টাকা ব্যয় করে অফসেট পেপারে ছাপানো এ বার্ষিকী ও ম্যাগাজিনে এমন লেখা থাকা উচিত যার প্রতিটি পাতায় পাতায় থাকবে তাদের গঠনমূলক আদেশ, উপদেশ এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের জয় জয়োগান। এটি শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় মনোনিবেশের পাশাপাশি যে ভীত তৈরি করে দিতে পারে তা হলো ঃ

০১. সুন্দর মন মনন গঠনে সহায়তা করতে পারে।

০২. মনকে সজীব সতেজ করতে পারে।

০৩. শিক্ষার্থীদের বিকৃত চিন্তা, কুরুচিপূর্ণ বক্তৃতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে মুক্ত রাখতে পারে।

০৪. লেখায় আরো বেশি মনোযোগী করে দিতে পারে।

০৫. সত্যকে প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার প্রতি ঘৃণার ঝড় তুলে দিতে পারে।

০৬. আদব-কায়দা শ্রদ্ধা ও স্নেহভাবাপন্ন মনোভাব গঠন করে দিতে পারে।

০৭. স্রষ্টার মহত্ত্ব ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূল (সা.)-এর প্রতি আরও অনুসন্ধিৎসু করে দিতে পারে।

০৮. মেধাবী ও আদর্শ ছাত্রদের সাথে বন্ধুত্ব গড়তে সহায়তা করতে পারে।

০৯. নিছক মিথ্যার ঝুলিতে ভরপুর গল্প কৌতুক ধাঁ-ধাঁ তে ডুবিয়ে শুধু শুধু আনন্দ দেয়ার নামে ছলনা এবং মহামূল্যবান সময়কে নষ্ট না করার উপকরণ হতে পারে।

১০. সর্বোপরি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আদর্শ সচ্চরিত্রবান ও সকলের প্রিয় মানুষ হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে— এ বার্ষিকী ও ম্যাগাজিন যেন মূখ্য ভূমিকা রাখতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে ছাপানো উচিত। আর তাহলেই শিক্ষার্থীরা এমন ম্যাগাজিন থেকে উপকৃত হবে এবং এক একজন শিক্ষার্থী মানুষ

www.amarboi.org

হিসেবে গড়ার অভিপ্রায়ে সচ্চরিত্রের সৎ গুণাবলি অর্জন ও অসচ্চরিত্রের অসৎ দোষাবলিগুলো জেনে এ থেকে মুক্ত থাকার অভিপ্রায়ে এটি হবে এক একজনের জন্যে সংগ্রহে রাখার মতো গাইড লাইন বা আদর্শ ছাত্র জীবন গঠনমূলক গ্রন্থ।

সচ্চরিত্র গঠনে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রভাব

বেতার (রেডিও)

গ্রাম প্রধান এদেশের আনাচে-কানাচে লোকজনের কাছে বিনোদনের নামে যে জিনিসটি খুব পরিচিত তা হলো বেতার বা রেডিও। গ্রাম-গঞ্জে এখনো বেতারের বহু ভক্ত রয়েছেন যারা বেতার বুকে নিয়ে ঘুমায়, মাঠে কাজ করতে যায়, দোকানে পণ্য সামগ্রী বিক্রি করে, দুপুরে অবসর সময়ে পল্লীগীতি, নজরুল গীতি, রবীন্দ্র গীতি আর ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী গানের সুরে সুরে নিজেকেও একনিষ্ঠ প্রেমিকে পরিণত করে। সেই সাথে পরিবারের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, মা-বাবা, ভাই-বোন সকলেই বেতারের অনুষ্ঠান শ্রবণ করে বলে তাদের মধ্যে লজ্জাবোধ অনেকটা বিলীন হয়ে যায়। আনন্দ দান তথা নিছক মানব ভালবাসায় আকৃষ্ট করার জন্য বেতারে আজকাল এমন কিছু সংগীত পরিবেশন করা হয়– যা সত্যিই বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার শামিল। এতে ছোটদের পক্ষ থেকে বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি বড়দের পক্ষ থেকে কোনো দায়িত্ববোধ ও আদর ভালবাসা থাকে না। ধ্বংস হয়ে যায় একে অপরের প্রতি মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছাটুকুও।

মুসলিম জনগোষ্ঠী যে সময় আল কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত, দুরূদ, তাওবা ইস্তেগফার, যিকির ও অন্যান্য সৎ কর্মে মশগুল হওয়ার কথা সে সময়টুকু আজকাল বেতারের বিভিন্ন নাটক, কথিকা, গান শ্রবণে ব্যয় করে থাকে। এটি প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য অপূরণীয় ক্ষতিবিহীন কিছুই নয়। ফলে সওয়াব তো নাই বরং পাপ হচ্ছে। কাজেই সকলকে এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। যতটা সম্ভব আমাদের বাসা বাড়িতে বেতার না কেনার চেষ্টা করতে হবে। আর একান্তই কিনে নিলে ব্যবহারে সংযত হওয়া চাই, সেই সাথে এই বেতারকে যদি বাংলাদেশ বেতারের কর্তৃপক্ষ শুধু গান, বাজনা, নাটক, কৌতুক আর বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার না করে তার ফাঁকে ফাঁকে সৎচিন্তা, সৎচেতনা, স্বদেশ প্রেম ও আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসের বাণী দ্বারা মানুষকে মানুষের জন্য কাজ করার প্রতি আহ্বান জানানো হয় তাহলে এর ব্যবহার সার্থক হবে।

এবার জাতিকে আদর্শ মানুষ ও সচ্চরিত্রবান দেশ প্রেমিক নাগরিক হিসেবে গঠন করার জন্যে বেতারের করণীয় বা ভূমিকা আলোচনা করা হলো ঃ

www.amarboi.org

০১. গ্রামে-গঞ্জে দরিদ্র ও খেটে খাওয়া মানুষদের কাছে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বেতার অন্যতম। কাজেই গানের ফাঁকে ফাঁকে দেশ ও জাতির স্বার্থে জনগণের ভূমিকা কেমন হবে তার ব্যাপারে আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসের আলোকে বাণী প্রচার করতে হবে।

০২. বেতারে খবর পরিবেশনের আগে ও পরে অতীব জরুরী ও জনগুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত কাজগুলো জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন তার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী বাণী আকারে প্রচার করা ।

০৩. আযানের ধ্বনি প্রচারের আগে ও পরে ইবাদত আল্লাহর হক আর সচ্চরিত্র মানুষের হক– এ ব্যাপারে সচেতনতার লক্ষ্যে বাণী প্রচার করা।

০৪. অশ্লীল নাটক, সংলাপ ও প্রেমাবেগ জাগিয়ে দেয় এমন সব প্রোগ্রাম প্রচার না করে বরং নাটকের সংলাপ আদর্শ ও সচ্চরিত্র গঠনের অনুকূল হওয়া উচিত।

০৫. বেতারে মানুষের কথা, মানুষের চিন্তা, মানুষের প্রয়োজন ও করণীয় সম্পর্কে কথা বা বাণী প্রচার করতে হবে। আর তাহলে মানুষ শুনবে শিখবে।

০৬. অসাম্প্রাদায়িকতা, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ যেন মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্য ঐরকম সুন্দর সুন্দর উজ্জীবনমূলক প্রোগ্রাম, বাণী প্রচার করা।

০৭. বেতার হচ্ছে দেশের অন্যতম একটি প্রচার মাধ্যম যার সাহায্যে দেশ ও মাতৃভূমির স্বার্থে যে কোনো আহ্বান প্রচারের মাধ্যমে জাতিকে জাগ্রত করে তোলা যায়, সজাগ করে তোলা যায়, ঐক্যবদ্ধ করে তোলা যায়, অন্যায় ও অসৎ কর্ম, অবৈধ উপার্জন, সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে মানুষকে, কিশোর ও তরুণ-তরুণীদেরকে সজাগ ও সুশিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা যায়।

পরিশেষে বলব, অতীতে বেতারে প্রায়ই প্রচারিত একটি বাণী ছিলো "আপনি শিক্ষিত আপনি জাতির কাছে ঋণী, জাতিকে শিক্ষিত করে আপনার ঋণ কিঞ্চিৎ হলেও শোধ করুন।"- যা আমাকে অনেক সচেতন করেছে এবং আজও তা প্রতিধ্বনি আকারে কানে বেজে উঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আজকাল তা আর বেতারে বেজে উঠে না।

টেলিভিশন

বিশ্বব্যাপী টেলিভিশন এক শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। যা বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এই মুহূর্তে যা কিছু ঘটছে তা নিমিষেই সচিত্র প্রতিবেদনসহ আমরা দেখতে পাই। যদিও আমরা অবস্থান করছি ঘটে যাওয়া ঘটনার স্থান থেকে দূরে বহু দূরে। আধুনিক মানব জীবনের সাথে টেলিভিশন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার অবস্থান যেন প্রত্যেকের বাসার ড্রয়িং রুমে, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, ছোট মাঝারি, বড় আরো বড় পর্দায় ভরপুর। এ সমস্ত টেলিভিশন অনেকের জীবনে একটি অদৃশ্য জীবন সঙ্গী।

www.amarboi.org

বর্তমানে এ টেলিভিশন- গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শহরের প্রত্যেকটি কক্ষে, আর কয়েকদিন পরে মানুষের পকেটে পকেটে ঢুকে পড়বে। কাজেই এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। সেইসাথে আমাদের সন্তানরাও হচ্ছে অতিমাত্রায় মা-বাবা বিমুখ। কারণ ছেলে-মেয়েরা স্কুল থেকে এসে হাতমুখ ধৌত না করেই টিভিতে কার্টুন ছবি দেখতে শুরু করে বা দেখল মা টিভিতে অনুষ্ঠান দেখছে যেই তারা বসে পড়ল মা টিভি বন্ধ করে দিলো, বলল হাত মুখ ধৌত করে খাবার খাও। ছেলে-মেয়ে দিলো চিৎকার, করল মন খারাপ, রাগ অভিমান। অন্যদিকে বাবা শুক্রবার টিভিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত ছায়াছবিও দেখছে কিন্তু ছেলে-মেয়েরা দেখতে চাইলে নিষেধ করছে, স্বভাবতই তাদের মাথায় নেগেটিভ হিট। সুতরাং ওরাও যখন সুযোগ পায় তখনই টিভি সেটের সামনে বসে পড়ে।

■ **এ টেলিভিশনের পজিটিভ দিক হলো ঃ**

০১. এটি জাতি সত্তার কৃষ্টি কালচার, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি তথা আমাদের সংস্কৃতির সাথে সবাইকে পরিচিত করে দিতে পারে।

০২. টিভি আমাদের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, কৃষিনীতি এসব কিছু সম্পর্কে আলোচনা, অভিমত এবং তর্ক-বিতর্ক থেকে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়।

০৩. দেশ-বিদেশে কখন, কোথায়, কি ঘটছে, কেন ঘটছে এ সমস্ত খবরা-খবর পাওয়া যায়। এতে নাগরিক সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ফলে আজ ও আগামীদিনে জাতির করণীয় কী তা সহজেই অনুমেয়।

■ **নেগেটিভ দিক হলো ঃ**

০১. টেলিভিশন বিনোদনের নামে অত্যধিক বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির এক অন্যতম উপকরণ।

০২. এটি মানুষকে আচার ব্যবহার ও নমনীয় আদব-কায়দা শিখানোর বিপরীতে উগ্রবাদিতা শিক্ষা দেয়।

০৩. টেলিভিশন দেখে আমাদের শিক্ষার্থীরা কথা-বার্তায় চরম পটু হয়ে থাকে। আর সাথে সাথে হারিয়ে ফেলে কখন, কোথায় কি বলা ঠিক নয় এ বোধটুকু।

০৪. টেলিভিশনে প্রচারিত নাটক এবং এর সংলাপ মানুষের চরিত্রকে অসচ্চরিত্রের দিকে ধাবিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

০৫. এটি অনেক সময় মিথ্যা, বানোয়াট বা কোথাও যা ঘটে তার চেয়ে বেশি করে প্রচার করে থাকে– এতে মানুষের মনে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে - যা দুঃখজনক।

০৬. অতিমাত্রায় টেলিভিশন দর্শনে মানুষ আল্লাহর বাণী আল কুরআনুল কারীম,

www.amarboi.org

রাসূল (সা.)-এর চরিতাদর্শ প্রাকটিস এবং নামায পড়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে– যা দুঃখজনক।

০৭. শালীনতা বিরোধী নাচ ও গান নাগরিক জীবনকে চরমভাবে অনাদর্শিকতার জালে আচ্ছন্ন করে তোলে।

এত সব নেগেটিভের কারণে টেলিভিশন বাসায় রাখা যাবে কি না ইত্যাদি নিয়ে চলছে আমাদের আদর্শবাদী অভিভাবক তথা মা-বাবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব।

এ দেশে আদর্শবাদী সংগঠন ও অনেক আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও মসজিদের ইমাম সাহেবদের বাসায় টেলিভিশন নেই। কারণ এত সব নেগেটিভ দিক। তাদের বাসায় টেলিভিশন থাকা মানে সমালোচনার ঝড় উঠা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, টেলিভিশন না রেখে কেমন আছেন তারা? প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ অভিভাবক তাদের সন্তান-স্ত্রীর তোপের মুখে কোনো রকমে যুদ্ধ করে টিকে আছেন। বাকী পাঁচ শতাংশ হয়তোবা পরিবারের সবাই একই মন-মানসিকতার আদলে গড়া হওয়ার কারণে তারা টিভি না কিনেও ভাল আছেন।

এবার যারা যুদ্ধ করছেন তাদের কথা বলি, যে কোনো যুদ্ধে দু'পক্ষ অংশ গ্রহণ করে এক পক্ষ জয়লাভ করে অন্যপক্ষ হারে। এ সকল পরিবারের অভিভাবকরা হেরে টিকে আছেন কোনো রকমে– যা তাদের সন্তানদের চারিত্রিক অবস্থানের দিকে তাকালে প্রতীয়মান হয়। এখানে তাঁদের সন্তানদের যুক্তি হলো টেলিভিশনে অনেক শিক্ষণীয় প্রোগ্রাম আছে। দেশ-বিদেশের খবর আছে, টেলিভিশন না থাকার কারণে পৃথিবীর কোথায়, কখন, কেন, কিভাবে, কি হচ্ছে আমরা তা দেখতে পারছি না। কাজেই আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। জ্ঞানের জগতে ভাল করব কি করে? অন্যদিকে কেন এক শ্রেণীর মানুষ যে টেলিভিশন বাসায় রাখতে পারছে না, তার প্রসঙ্গে সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে চাই বলুন! আসলে কি টেলিভিশন বাক্সটির কোনো ক্ষমতা আছে বাজে অনুষ্ঠান বা আমাদের মানব চরিত্রকে ধ্বংস করার? একটু চিন্তা করুন। আজকে যে টেলিভিশনকে নিয়ে এত অভিযোগ! এত সমালোচনা! এত নেগেটিভ ধারণা তাতো এদেশের মানুষ দ্বারাই পরিচালিত। বিশ্বের অন্য কোনো দেশ বা পাশ্চাত্যের কোনো মানুষতো এর পরিচালক বা অনুষ্ঠান নির্মাতা নয়! এদেশের গণমানুষের টাকা দিয়েই পরিচালিত হয় বিটিভি। তাহলে বিটিভি কর্তৃপক্ষ কি পারে না এর প্রোগ্রাম সূচিকে সমগ্র দেশবাসীর পছন্দনীয় করে তুলতে? তাদের উপযোগী করে তুলতে?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে এমন দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকজনকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَن تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

www.amarboi.org

"যেসব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।" (সূরা আন নূর, ২৪ ঃ ১৯)

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করো। গোনাহ্ ও সীমালংঘনমূলক কাজে সহযোগিতা করো না।" (সূরা আল মায়িদা, ০৫ ঃ ০২)

সুতরাং সকলকে আল্লাহর কাছে যেতেই হবে। আর সেদিন যেন আল্লাহর আদালতে সঠিক জবাব দিয়ে মুক্তি পাওয়া যায় সেদিকে খেয়াল রেখে বিটিভির সকল অনুষ্ঠানকে আদর্শের ছাঁচে ঢেলে সাজালে এই বিটিভি চ্যানেলই হতে পারে সকলের গ্রহণযোগ্য। যে টেলিভিশনের কতিপয় অনুষ্ঠান সন্তানদের জীবন নাশে ভূমিকা রাখতে পারে সেই টেলিভিশনের সব অনুষ্ঠানগুলোই হতে পারে গঠনমূলক যা লিখেও শেষ করা যাবে না। নাটকের ক্ষেত্রে নাটকের সংলাপগুলোকে সুন্দর সামাজিক এবং মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে একটু গুছিয়ে বললে আজ এবং আগামীতে যারা শুনবে, তারা শিখবে, গঠন করবে অসচ্চরিত্র নয় সচ্চরিত্র। এভাবে এ টেলিভিশনই হতে পারে আমাদের কৃষ্টি, কালচার ও সকলের মন মননের প্রতীক। এ গায়কদের গানই পারে আমাদের মনের মধ্যে আল্লাহপ্রেম, দেশপ্রেম মানবতাবোধের প্রেমে উত্তীর্ণ করে মানুষ মানুষের জন্য এমন মন মানসিকতায় উজ্জীবিত করতে, আদর্শ পছন্দ করে না এমন কোনো মানুষ কি এ পৃথিবীতে আছে? নিশ্চয়ই নয়। কাজেই আদর্শিক চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা সম্বলিত অনুষ্ঠানমালা ঢেলে সাজিয়ে এই টেলিভিশনকেই আমরা সকলের গ্রহণযোগ্য এবং তার হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করে দিতে পারি। শুধু প্রয়োজন সদিচ্ছা আর ভাল দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণ মানুষের সমন্বয়।

আমি টেলিভিশন বাসা থেকে বের করে দেয়ায় কথায় বাবার সাথে মায়ের দ্বন্দ্ব, বাবার সাথে সন্তানদের দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে চলার পক্ষে। তবে থাকতে হবে টেলিভিশনে মা-বাবাদের নিয়ন্ত্রণ। কখন টেলিভিশন দেখবে, কখন দেখবে না তা আপনাদেরকেই নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। সন্তানদের পড়ালেখা, প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহর হুকুম মেনে সালাত আদায় করা, আল কুরআনুল কারীম প্রয়োজনে অর্ধপারা বা এক পারাকে চারভাগে ভাগ করে আজকে এক অংশ এভাবে প্রতি চারদিনে একপারা করে কুরআন পড়ার প্রতি তাদেরকে রুটিন এবং বাস্তবায়নে আপনারা মা-বাবারা হতে হবে যথেষ্ট সচেতন। আর আচার-ব্যবহার নিজেরাই শিক্ষা দিতে হবে কথোপকথনে।

www.amarboi.org

সিডি, ভিসিডি ও এমপি থ্রি প্লেয়ার

বিজ্ঞানের এ উৎকর্ষতার যুগে প্রতিনিয়ত গবেষণার মাধ্যমে মানুষ আজ হাতের মুঠে নিয়েছে সমগ্র পৃথিবীর সকল বিনোদন জগতকে; সাথে সাথে ঠেলে দিয়েছে আদর্শিক দিকসমূহকে, আদর্শিক চিন্তা-চেতনাকে– যা আগামীদিনের জন্য বড়ই ভাবনার বিষয় এবং দুঃখনজক। তবে আমরা যদি বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কারের দ্রব্যগুলোকে পজিটিভ ব্যবহার করি তা মানব জাতির কল্যাণে মূখ্য ভূমিকা রাখবে। তেমনি এমন আবিষ্কারই হলো– সিডি, ভিসিডি ও এমপি থ্রি প্লেয়ার। যেগুলোও মানব চরিত্র গঠনে সঠিক ব্যবহার হতে পারে। যেমন ঃ

০১. সিডি, ভিসিডি ও এমপি থ্রি প্লেয়ারে যদি আমরা কুরআন তিলাওয়াত অর্থসহ শুনি তাহলে আমাদের কুরআনিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি জীবনবোধ সম্পর্কে আমরা সজাগ হতে পারব। এসমস্ত আবিষ্কারের সুবাদে কর্মময় জীবনে একটু বিশ্রাম ও বিনোদনের নামে এগুলো অনাদর্শিক ছবি, নাটক ও গানে গানে মুখরিত করে তোলে। ফলে বহু কষ্টার্জিত অর্থের বিনিময়ে ক্রয়কৃত এ সমস্ত জিনিসগুলো মানুষের জাহান্নামের কারণ হয়ে থাকে। যার কারণে অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকগণ এগুলোর বিরোধিতা করে থাকেন। অন্যদিকে এ সমস্ত জিনিসগুলোকে যদি আমরা আদর্শিকভাবে, আদর্শ ও সচ্চরিত্র গঠনে সহায়ক করে ব্যবহার করতে থাকি তাহলে তার ফলাফল তো পজিটিভ হতে বাধ্য। অর্থাৎ আমি এগুলো বাসায় রাখার ঘোর বিরোধী নই। আমি বলতে চাচ্ছি, আমি এগুলোতে নেগেটিভ বা চরিত্র বিধ্বংসী ও মূল্যবান সময় নষ্টকারী অনাদর্শিক প্রোগ্রাম পরিচালনার বিপরীতে আদর্শিক প্রোগ্রাম দেখব।

০২. ইসলামিক সঙ্গীত এবং শিশু কিশোরদের সুন্দর সুন্দর কথা ও আদর্শ জীবন গঠন সম্বলিত নাটকগুলো যদি সিডি, ভিসিডি ও এমপি থ্রি প্লেয়ারের মাধ্যমে আমরা শ্রবণ ও দর্শন করি তাহলে খুব সহজেই আমাদের বাসার ছোটরা তা আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে।

০৩. বিভিন্ন তাফসীর মাহফিল বা কুরআনিক জলসার সুন্দর সুন্দর জীবনবোধসম্পন্ন আলোচনা সিডি, ভিসিডিতে করে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ও স্থানান্তর করা যায়- যা আমাদের জন্য, আগামী জাতির জন্য পজিটিভ ভূমিকা রাখতে পারে।

০৪. সিডি, ভিসিডির মাধ্যমে আমাদের অতীত ঐতিহ্য ও মুসলিম নিদর্শনাবলি, রাসূল (সা.)-এর পবিত্রভূমি মক্কা ও মদীনার বিভিন্ন দৃশ্য ধারণ করে যারা দূরে অবস্থান করে তাদের কাছে পাঠানো এবং জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দেয়া যায়।

০৫. আদর্শ জীবন, আদর্শ চিন্তা-চেতনা, সমসাময়িক কালে ঘটে যাওয়া ঘটনার ইসলামী সমাধান ও চিত্র মানুষের চোখের সামনে নাটক ও কথিকা উপস্থাপন করার একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে এগুলোকে ব্যবহার করা।

www.amarboi.org

পরিশেষে বলব, বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি আবিষ্কারের দু'রকম ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে একটি পজিটিভ অন্যটি নেগেটিভ। এবার মানুষ কোন্‌টি কিভাবে ব্যবহার করবে তা তাদের উপর বর্তাবে। তবে সচ্চরিত্র গঠন ও আদর্শ মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে মা-বাবা বাসায় ভাল ভাল প্রোগ্রামের সিডি, ভিসিডি ক্রয় করে সপরিবারে ছুটির দিনে বা শুক্রবারে বাসায় বা গৃহে বসে দেখলে সন্তানদের আদর্শ সচ্চরিত্র গঠন সহজ হবে।

স্যাটেলাইট বা ডিশ কালচার

স্যাটেলাইট বা ডিশ কালচার আমাদের জাতি সত্তার মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এর ফলে বাইরের আগ্রাসী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশে আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার ও মুসলিম সংস্কৃতি ক্ষতিকর, বিপজ্জনক এবং সর্বগ্রাসীরূপ ধারণ করছে।

এ স্যাটেলাইটে পরিচালিত প্রোগ্রাম আমাদের ঈমান, আকীদা ও বিশ্বাসের উপর আঘাত হানছে। এর মাধ্যমে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী, ধ্যান-ধারণা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর আঘাত হানা হচ্ছে। আমাদের উপর বস্তুবাদী চিন্তা ধারা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। জীবনের মহান লক্ষ্য পথে অগ্রসর হবার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। চরিত্র ও নৈতিকতার উপর আঘাত হানা হচ্ছে। আমাদের সমাজে অশ্লীলতা কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। বিকৃতিকে সুকৃতির আবরণ দিয়ে মাতিয়ে তোলা হচ্ছে। আমাদের রীতিনীতি, প্রথা ঐতিহ্য ইত্যাদিকে পদদলিত করা হচ্ছে। আমাদের সাহিত্য, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানকে আমাদের নৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি করা হচ্ছে, অশ্লীলতা পঙ্কিলতা নীতিহীনতা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ধ্বংস করার চেষ্টা হচ্ছে, আমাদের পরিবার ও পারিবারিক বন্ধনকে। নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে নামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে রাস্তায়। ফলে আজ পরিবার অঙ্গনে অশান্তির আগুন জ্বলতে শুরু করছে-যা সত্যিই একটি আদর্শ জাতির জন্য কাম্য হতে পারে না।

কাজেই স্যাটেলাইটের যে সমস্ত চ্যানেলে নোংরা, চরিত্র বিধ্বংসী প্রোগ্রাম প্রচার করে সে সমস্ত চ্যানেলগুলো সরকারিভাবে আইন করে বন্ধ করে দেয়া উচিত। আমার দেশের কৃষ্টি কালচার ও দেশপ্রেম জাগ্রত হবে না, আদর্শ সচ্চরিত্রবান মানুষ গড়তে হলে যে সমস্ত চ্যানেলগুলো প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে, আমাদের শিশু কিশোরদের মনকে নষ্ট করে দিচ্ছে, তাদেরকে নেশার দিকে আকৃষ্ট করছে, আল্লাহর প্রেমের বিপরীতে অবৈধ নারী প্রেমে আসক্ত ও পাগলামী করা শিক্ষা দিচ্ছে তা খুব শক্ত হাতে প্রতিহত করার জন্য সরকারকে আন্তরিক ভূমিকা পালন করতে হবে। কিছু কিছু চ্যানেল যেমন বিবিসি, সিএনএন ও ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলগুলো খুব ভাল আর পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব চ্যানেলতো আছে এগুলোকে আমাদের আদলে সাজিয়ে আগামীদিনে এ জাতিকে কিভাবে দেশ গঠনে সক্রিয় ও যোগ্য

www.amarboi.org

নাগরিক হিসেবে গঠন করা যায় সেজন্য উৎসাহ ও উজ্জীবনমূলক প্রোগ্রাম বেশি বেশি করে প্রচার করা উচিত। আজকাল গ্রামেও এ স্যাটেলাইট সংযোগ আছে কাজেই জাতিকে সংঘটিত করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ, শিক্ষায় আরো সচেতন এবং আদর্শ ও সচ্চরিত্রবান হিসেবে গঠন করার ক্ষেত্রে এ স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এ চ্যানেলগুলো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারে অন্যায় অপকর্ম ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে, দেশ ও দেশের মানুষের বিরুদ্ধে যারা কাজ করে, ব্যক্তির স্বার্থকে যারা চরিতার্থ করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে এবং দেশের এ বিশাল মানব সম্পদকে কর্মীর হাতিয়ারে পরিণত করে এদেশকে অতীতের সুজলা সুফলা, শস্য শ্যামলা আমাদেরই সোনার বাংলায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্র থেকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করে এ দেশের পতাকাকে সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিত করে দিতে পারে।

কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের কু-প্রভাব

ইন্টারন্যাশনাল কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সার্ভিস বা ইন্টারনেট বিজ্ঞানের এক নবতর আবিষ্কার। আজ মানুষ বিজ্ঞানের এ আবিষ্কারের ফলে বিশেষ জ্ঞানের সহায়তায় জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বাবস্থায় রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে। বিজ্ঞান মানুষকে জীবনযাত্রার সুকঠিন নিগড় থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। মানুষকে মানবিক চেতনা ও গুণে উন্নত করে প্রেরণা দিয়েছে উন্নত সমাজ গড়ার। ইন্টারনেট আধুনিক বিজ্ঞানের সেরকম একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত গতিময়তার এক মাইলফলক ইন্টারনেট। ইন্টারনেটকে কাজে লাগিয়ে গবেষণার কাজে সংগ্রহ করা যায় নতুন নতুন তথ্য, জানা যায় তার সমাধান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যোগাযোগ করা যায় নিমিষের মধ্যেই, শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদান প্রদানে ইন্টারনেট এখন সমগ্র বিশ্বে অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। ফলে আজ মানুষ একে হাতের মুঠো সেল ফোনে রাখতে আনন্দবোধ করছে। এর মাধ্যমে ছবিসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান-প্রদান করে শিক্ষার্থীরা নিমিষের মধ্যে পৃথিবীর যে কোনো দেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে নিজেদেরকে বিশ্ব উপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে ডাক্তারী প্রেসক্রিপসান গ্রহণসহ ইন্টারনেট আমাদের জীবনযাত্রায় এক নব উদ্যম যোগ করেছে।

অন্যদিকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় ইন্টারনেট আমাদের টিনেজার (তের থেকে উনিশ বছর বয়সীদের) বা ভবিষ্যৎ জাতির ধারক বাহক সন্তানদের চরিত্রকে কিছু অপসংস্কৃতি এবং পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে অবলীলাক্রমে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এদেশে আজ অলিতে-গলিতে অন্ধকার প্রকোষ্ঠের ন্যায় ছোট ছোট ইউনিটে একটি কম্পিউটার ও দু'জনকে বসার ব্যবস্থা করে চ্যাট করা, গল্প করা,

www.amarboi.org

ও পর্নোগ্রাফির ছবি দেখার সুযোগ করে দেশের এ কোমলমতি সন্তানদের মেধাকে কিছু বলার ও বুঝে উঠার আগেই মেধাশূন্য বানিয়ে জীবন নাশ করতে সহযোগিতা করছে। অনেক ক্ষেত্রে এমন সাইবার ক্যাফেগুলো পরিণত হচ্ছে অবৈধ প্রেমের আখড়া ও গল্প গুজবের নীরব নিস্তব্ধ স্থানরূপে, ফলে সেখানে দীর্ঘ সময় থেকে ক্ষুধা নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে ফাস্ট ফুড জাতীয় খাবারও পাওয়া যাচ্ছে।

আজকাল মহামারী আকারে এ সাইবার ক্যাফে ও কম্পিউটারের সিডি চালিয়ে ছায়াছবি দেখে জীবন ও চরিত্র ধ্বংস করে দিচ্ছে এ সমস্ত বয়সের সন্তানেরা। কাজেই এদেশের টিনেজারদের চরিত্র সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে আজ যা প্রয়োজন তা হলো ঃ

০১. সরকারিভাবে বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল করা। এতে ইন্টারনেটে সহজে অশালীন স্থিরচিত্র বা পর্নোগ্রাফি প্রবেশ করতে পারবে না। মুহূর্তেই ব্লক করে দেয়া যাবে। ফলে ব্রাউজিংয়ের নামে নুড চর্চা সম্ভব হবে না বরং ফাইলগুলো খোলার চেষ্টা করলে একটি কারণ দর্শানো তথ্য নির্ভর ফরম স্কিনে ভেসে আসবে। যা পূরণ করে সেন্ড করলে এবং তথ্যগুলো কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হলে তবেই তার নাম্বারে বাইপাস করা হবে।

০২. পাড়ায় মহল্লায় অলিতে গলিতে যেসব অশ্লীল ভিডিও সিডি খোলামেলা বিক্রি হচ্ছে সেগুলো রোধ করার জন্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

০৩. সরকার দেশে আইন করে আইন বাস্তবায়নকারী বাহিনীকে দিয়ে শক্ত হাতে এমন সিডি উৎপাদনকারী ও বিক্রেতাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাদের লাইসেন্স থাকলে বাতিল করে দিতে হবে।

০৪. সাইবার ক্যাফেগুলো অন্ধকার প্রকোষ্ঠ না বানিয়ে খোলামেলা বানানোর লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেয়া এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে তালিকা করে তা সব সময় তদারকি করার ব্যবস্থা করতে হবে।

০৫. দেশের আগামীদিনের সম্পদ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীদের মেধা ও চরিত্র সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

০৬. মা-বাবাদের অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে। কম্পিউটার ছেলে-মেয়েদের ব্যক্তিগত রুমে না দিয়ে হিকমত স্টাইলে মা-বাবার রুমে বা ড্রয়িং রুমে সেটআপ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে পর্নোগ্রাফি ও ছায়াছবিসহ নাচ গান দেখা ও শুনা অনেকটা রোধ হবে।

০৭. এ বয়সী ছেলে-মেয়েদের কোথাও বাসার বাইরে থাকার অনুমতি না দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

আজকে আমাদের এ বয়সী সন্তানদের মেধাশূন্য হওয়া; মন-মেজাজ, চিন্তা-চেতনা, বিকৃত রুচির হওয়াসহ স্বল্প বয়সে চরিত্র হননের মতো যত

www.amarboi.org

ধরনের জঘন্যতম ধ্বংসাত্মক কাজগুলো হচ্ছে তা যেন কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহারেরই বিষবাষ্প, যা আজই হিফাযত করা প্রয়োজন। বর্তমানে সাইবার অপটিক ক্যাবল প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আমরা যে আগামীতে আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের মাথায় রাখতে হবে, একটি দেশের উন্নয়ন ও জাতির উন্নতির জন্য সচ্চরিত্রবান মেধাবি মানুষের বিকল্প নেই।

মোবাইল সমাচার বা কালচারের প্রভাব

মোবাইল ফোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমাদেরকে দিয়েছে এক অকল্পনীয় অগ্রগতি। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের সাথে যোগাযোগ করার বিনিময়ে দিয়েছে আমাদের অনেক স্বস্তি। কিন্তু পাশাপাশি এ মোবাইল আবার বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের অনেক দুর্গতি। বিষয়টি হচ্ছে এমন, দুষ্টের দমনে যেমন, লালনেও তেমন ব্যবহার হচ্ছে– এ আধুনিক প্রযুক্তি। আরেকটু ব্যাখ্যা করে এভাবে বলা যায়, সুকর্মে-অপকর্মে, মন্দ রোধে-বিস্তারে, সমভাবে অবদান রেখে চলেছে এ জিনিসটি। বিশেষতঃ এর কল্যাণে এমন কিছু অকল্যাণেরও দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে– যা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হলে, আমাদেরকে চরম মাশুল দিতে হবে।

মোবাইল ফোন ও আজকের তরুণ সমাজ

মোবাইল ছাড়া আমাদের তরুণ যেন অচল, হাতে অথবা পকেটে মোবাইল না থাকলে তাকে বলা হয় 'আনস্মার্ট' অথবা 'খ্যাত'। কাঁধে বইয়ের ব্যাগ এক হাতে বার্গার অথবা স্যান্ডউইচ, অন্য হাতে মোবাইল ফোন। রিক্সা, গাড়িতে অথবা হেঁটে যাচ্ছে। একটু খেয়াল করলেই দেখবেন দারুণ ব্যস্ত সে। খাচ্ছে, মোবাইল ফোনে কথা বলছে আবার হেঁটে যাচ্ছে– হ্যাঁ বলো। কী বললি? আজ বিকেলে? না দোস্ত পারব না। আমার জরুরি একটা কাজ আছে। কোচিং করে এক জায়গায় যাবো..... কেউ হয়তো একটু বলে কেটে দিল লাইন। আবার কেউ হয়তো রিং বাজতেই রিসিভ করে বলল– হ্যাঁ, আমি রওয়ানা দিচ্ছি। তুই আয়। আবার কেউ হয়তোবা বলল– জ্বি, আমার ফিরতে একটু দেরি হবে। বুঝা গেল বাসায় বাবা বা মায়ের সাথে কথা বলছে। কীরে ব্যাটা ফোন করিস নাই কেন? শোন, আজ একটা মজার ঘটনা ঘটেছে.....। বুঝা গেল বন্ধুর সাথে কথা বলছে। স্যার আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। আপনার কাছে আসতে চাই। কাল সকালে আসি? বুঝা গেলো শিক্ষকের সাথে কথা বলছে।

আরেকজন আড্ডায়। একই রুমের এক পাশে বসে অন্যের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে মোবাইলে ম্যারাথন কথা বলা শুরু করেছে। থামছে না। তার গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না, বুঝা গেলো সে তার বান্ধবীর সাথে কথা বলছে। এবার বলুন! মোবাইল ফোন কেন? মোবাইল ফোন কী খুব জরুরি? এটি কী সবার প্রয়োজন?

www.amarboi.org

মোবাইল ফোন ব্যবহারে সৃষ্ট সমস্যা

মোবাইল ফোন বাড়িয়ে দিয়েছে পরিবার ও সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহ। ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ। আর ভবিষ্যৎ কর্ণধার যুবক-যুবতীদের সচ্চরিত্র গঠনে প্রবল প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে– যা সত্যিই দুঃখজনক।

প্রশ্ন আসতে পারে কিভাবে? সে বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো ঃ

০১. মোবাইল ফোন ব্যবহার করার ফলে জবাবদিহির ছকে পড়ে প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সাথে কর্মচারীর, মা-বাবার সাথে সন্তানের, স্ত্রীর সাথে স্বামীর (বাবার), স্বামীর (বাবার) সাথে স্ত্রীর (মায়ের), বন্ধুর সাথে বান্ধবীর, বান্ধবীর সাথে বন্ধুর, ছাত্র শিক্ষক একে অপরের সাথে অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেই মিথ্যার ব্যাপক প্রসার আর সত্যের অপলাপ ঘটছে। আসলে মিথ্যা বলায় দৃশ্যমান কোনো লাভ নেই; শুধু তৎক্ষণাৎ মনের শান্ত্বনা। অথচ এমন মিথ্যা কথা না বললেও তেমন সমস্যা হতো না। আর এভাবে মিথ্যা বলায় তারা হয়ে পড়ে অভ্যস্ত। যা তাদেরকে অবিশ্বাসী ও মিথ্যাবাদীতে পরিণত করে দুশ্চরিত্রের দিকে ধাবিত করে থাকে।

০২. মা-বাবা বিশেষ প্রয়োজনে রিং করছে কিন্তু ছেলে-মেয়ে বাথরুমে, মিটিং রুমে, ইটিং রুমে। (নেগেটিভ নাই বললাম) এতে মা-বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। ফোন বাজছে রিসিভ করছে না। না জানি কোন সমস্যা হলো ইত্যাদি।

০৩. গান বাদ্যের বিস্তার। (সচ্চরিত্র হননমূলক অবৈধ প্রেম-ভালবাসামূলক গানের বিস্তার)

০৪. ইভটিজিং বৃদ্ধি ও অশ্লীলতার বিস্তার। (ইন্টারনেট, ই-মেইল, ভিডিও, ক্যামেরার মাধমে অন্যায়ভাবে ছবি উঠানো ও তা সংরক্ষণ– যা সুস্পষ্ট আদর্শের লংঘন সচ্চরিত্রের প্রতিবন্ধক অচ্চরিত্রের পরিচায়ক)

০৫. অপরাধের বিস্তার। (সন্ত্রাসীদের মধ্যে তথ্য বিনিময়)

০৬. পারিবারিক অশান্তি। (স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহপ্রবণতা যেমন ঃ ফোন ব্যস্ত কেন? ফোন বন্ধ করে রাখছ কেন? আমাকে ফোন করনি কেন?

০৭. অবৈধ আয় তথা ঘুষের দিকে ধাবিত হওয়া। (সেট বদলানো, নতুন নতুন সেট নেয়া, ফোন অবাধে ব্যবহার করার ফলে ফোনের বিল পরিশোধ করতে নিম্ন আয়ের মানুষগুলো অসচ্চরিত্রের মারাত্মক খারাপ দিক ঘুষের সাথে জড়িয়ে পড়ে)

০৮. অবৈধ সম্পর্কের অবাধ বিস্তার। (যুব সমাজ ধ্বংস হচ্ছে এর প্রভাবে)

০৯. মানুষের ব্যস্ততা বাড়িয়ে মানুষকে যান্ত্রিক করে তোলেছে। (যেখানে প্রয়োজন নাই সেখানেও এমনিতেই ফোন করে মানুষকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে)

১০.সর্বোপরি শিক্ষার্থীদেরকে সময়ের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে পড়ালেখা করে

www.amarboi.org

সচ্চরিত্রবান মানুষ হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তাই আজ প্রয়োজন মোবাইল ফোনের অপব্যবহার রোধ করা।

মোবাইল ফোন অপব্যবহার রোধে আমাদের কার কী করণীয়

মোবাইল ফোন মূলত জরুরি কথা বলার মাধ্যম। বিপদে বন্ধুও বটে। ব্যস্ত অফিসিয়ালদের জন্য যোগাযোগ ও নির্দেশ আদান প্রদানের জন্য এটি একটি সুন্দর ও সহজ মাধ্যম। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য এ জাতির! মোবাইল ফোন কোম্পানীগুলো আমাদের টিনেজারদের হাতছানি দিয়ে ব্যবসার স্বার্থে অসচ্চরিত্রের প্রতিচ্ছবির সমন্বয়ে বিজ্ঞাপন তৈরী করে, কথা বলার ক্ষেত্রে সময়কে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে, বিলের ছাড় দিয়ে কেমন যেন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের মেধা ও সচ্চরিত্রকে হনন করার এক অশুভ প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তারা অর্থ উপার্জনের জন্যে বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার বা অপকৌশল আবিষ্কার করছে– যা সত্যিই দুঃখজনক। রীতিমত হাস্যকর এবং সবচেয়ে বড় কথা তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের চরিত্রকে সচ্চরিত্রের বদলে অসচ্চরিত্রের দিকে ধাবিত করে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অস্থিতিশীল এক পরিবেশ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। নৈতিকতাবোধ আজ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এর ব্যবহারে বিলের টাকা আর না প্রাপ্তিতে মোবাইল ফোন কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া ইত্যাদি জড়িয়ে মা-বাবার সাথে দ্বন্দ্ব চরমে। ফলে আচার-আচরণে নমনীয়তা, শ্রদ্ধাশীলতা, মান্যতা আজ পরিবার থেকে বিদায় নিচ্ছে। এ মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতার ফলে সব সময় একে অপরের সাথে কথোপকথন, একটু বাঁকা কথা হলেই মন খারাপ, মাথা গরম, টেম্পারেচার হাই, পড়া বন্ধ, অফিস ফেলে দিয়ে রাস্তায়, পার্কে, লেকে এক শ্রেণীর অসচ্চরিত্রবান মানুষদের ভীড়ে। ফলে মা-বাবা বা সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল আদর্শ শিক্ষিত মানুষগুলো যেন আজ চিন্তায় উদ্বিগ্ন। তাই এর অপব্যবহার রোধে আমাদের কার কী করণীয় সে বিষয়েই আলোকপাত করা হচ্ছে ঃ

মুহতারাম-মুহতারেমা অভিভাবকদের করণীয়

মোবাইল ফোন ব্যবহার রোধে আমাদের অভিভাবকগণ ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

০১. স্কুল-কলেজগামী সন্তানদের মোবাইল ফোন কিনে না দেয়া উত্তম। সন্তানের প্রতি ভালবাসা চিরন্তন। এটি আছে এবং থাকবে। অতীতে আপনাদের মা-বাবারাও আপনাদের ভালবেসেছেন। তখনকার দিনে আজকের মতো এত রাগ অভিমান বা বেয়াদবির ঘটনা ঘটত না, যতটা আজকাল সন্তান মা-বাবার সাথে কথায় কথায় করছে। কাজেই সন্তান স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.amarboi.org

পড়ালেখা করে, দূরে থাকে তাই বলে তাদেরকে ফোনের ব্যবহার নিশ্চিত না করে ফোন কিনে দিতে হবে কেন, একটু ভেবে দেখবেন কী?

০২. ফোন একান্তই যদি কিনে দেয়া হয় তাহলে তা এত দামী সেট অর্থাৎ ভিডিও, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ক্যামেরা ও গান ডাউনলোড করা যায়, খেলা যায় এমন সেট না দিলে কী হয় না? শিক্ষার্থীদের হাতে এত দামী সেটের লোভে পথিমধ্যে দুষ্কৃতিকারীর আক্রমণে কোনো বিপদের কারণও হতে পারে।

০৩. আদর-স্নেহ, ভালবাসা ও মহব্বত দিয়ে সন্তানের সেটের আউট গোয়িং ও ইনকামিং রিং নম্বর সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলে ভাল হবে।

০৪. মোবাইল ফোন ব্যবহারে দীর্ঘসময়কে কমানোর লক্ষ্যে অভিভাবকগণ সন্তানদেরকে একটা-একটা করে (এক সাথে দু'টার বেশি নয়) আদর্শবাদী লেখকদের লেখা ভাল ও জীবন গঠনমূলক গ্রন্থ এবং সাথে একটা লাল ও একটা সবুজ বা টপস্টার কলম কিনে দিয়ে তাদেরকে বলুন, ছেলে হলে বাবা আর মেয়ে হলে মা তুমি এ বইটি পড়ে যে অংশ বুঝবে না তার নিচে লাল দাগ আর যে অংশ গুরুত্বপূর্ণ তার নিচে সবুজ দাগ বা টপস্টার কলম দিয়ে চিহ্নিত করে দাও যাতে আমরা পরবর্তীতে অল্প সময়ে বইটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ পড়ে শেষ করতে পারি। এতে তারা মনে করবে বাবা বা মা পড়বে; কাজেই বই পাঠে মনোযোগী হবে। এভাবে মোবাইল ফোন রাতে ও দুপুরে ব্যবহারবিধি কিছুটা হলেও কমবে।

০৫. স্বামী স্ত্রীকে মোবাইল ফোন কিনে দেয়ারই দরকার নেই। আর তাহলে সন্দেহ ও পরিবারে দ্বন্দ্ব-কলহ অনেকটা কমে যাবে। (আদর্শবান স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে) এতে অর্থ কষ্ট লাঘব হবে। অন্যকথায়, এর বাজেটের টাকাটা সঞ্চয়ের মাধ্যম হতে পারে।

মোবাইল ফোন কোম্পানীগুলোর করণীয়

ফোন কোম্পানী কর্তৃপক্ষের মধ্যে এদেশের মানুষও রয়েছে। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলব, এদেশ– এদেশের যুব সমাজের সচ্চরিত্র গঠনে রয়েছে আপনাদেরও অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে আজকের সন্তানদেরকে গঠনে আপনাদের সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশা করে সবিনয়ে বলব ঃ

০১. রাতে বিল চার্জ কমিয়ে এক শ্রেণীর যুবক-যুবতীদের অহেতুক গল্প করার সুযোগ না দিয়ে আপনারা কি সব সময় এ সুযোগ দিয়ে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারেন না।

০২. এ যুব সমাজ, তরুণ সমাজের আজকের সন্তানরাতো এদেশেরই নাগরিক। তাদের সচ্চরিত্র গঠন করে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়তে কি আপনাদের মন চায় না? এটি কি আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না?

০৩. ভালবাসার গান, হিন্দি গান, ইংলিশ গান ডাউনলোড করার সুযোগ দিতে পারেন, আপনারা কী হামদ-নাত, কুরআনের বিভিন্ন সূরার বিশেষ অর্থবোধক আয়াত ও ইসলামিক সংগীত দিতে পারেন না।

০৪. অশ্লীল ছবি আসার সুযোগ কি বন্ধ করে দিতে পারেন না।

আমরা আশাবাদী অবশ্যই আপনারা দেশের প্রয়োজনে যুব সমাজের সচ্চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখবেন। মহান আল্লাহ আপনাদেরকে সে সুযোগ দিয়েছেন। আপনারা তার অপব্যবহার করবেন না। দেশ ও মাতৃভূমি গঠনে আপনারাও হবেন সচেতন, পালন করবেন দায়িত্ব ও সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করবেন যুব সমাজের চরিত্র।

দেশের সরকারের করণীয়

সরকার হচ্ছে সমগ্র দেশবাসীর অভিভাবক, সংরক্ষক ও সংগঠক। দেশে যা কিছু ঘটবে- ঘটার আগে, যা কিছু হবে- হবার আগে, যিনি বা যারা জানবেন তিনি বা তাঁরা হলেন সরকার বা স্ব-স্ব ক্ষেত্রের প্রধান কর্তৃপক্ষ। এ মোবাইল ফোন আজকে এদেশের যুব সমাজের চরিত্রকে ধ্বংসসহ আমি যে যে প্রতিবন্ধকতাগুলোর কথা বলেছি তা যে একে একে বিস্তার লাভ করছে তাতে বোধহয় ভুক্তভোগীরা ছাড়াও অনেকেই আমার সাথে একমত পোষণ করবেন। কাজেই এ পর্বে সরকারের দায়িত্ব এর অপব্যবহারের বিস্তার রোধে সম্যক সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; তা না হলে জাতির এ ধস রোধ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রের সকল জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা সুসংহতকরণ, সুসংঘটিতকরণ ইত্যাদি সরকারের হাতেই ন্যস্ত। কাজেই সরকারকে হতে হবে আরো বেশি কঠোর এবং সচেতন ও দায়িত্বপ্রবণ।

ফোন ব্যবহারে সৌজন্যবোধ

টেলিফোনে কথোপকথনের মাধ্যমেও সচ্চরিত্রের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতে পারে। কিন্তু কিভাবে?

০১. ফোন রিসিভ করেই হ্যালো! কে বলছেন? প্রশ্ন না করে যদি আমরা বলি, "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।" তারপর প্রশ্ন করি, আপনি কে বলছেন? যদি ওপার থেকে অন্য কাউকে চায় তাহলে বলি প্লিজ একটু হোল্ড করুন, আমি ডেকে দিচ্ছি বা দেখছি। তারপর দেয়ার সময় বললাম জ্বি অমুকের সাথে কথা বলুন। এভাবে স্পষ্ট ভাষায় বললে ওপারে যিনি ফোন করেছেন তিনি কি খুশী হবেন না অথবা আপনার সাথেই কথা হলে শেষে আপনি যদি আবারও সালাম এবং আল্লাহ হাফিয বলে লাইনটি কাটেন তাহলে কি অপর পক্ষ খুশী হবেন না? আবার ঠিক এভাবে চিন্তা করুন ঃ

■ ফোন আপনি রিসিভ করেছেন, সালামতো দিলেনই না, অধিকন্তু ধরেই

www.amarboi.org

বললেন হ্যালো কে? কাকে চান? কেন চান? কেন? নাই বলেই কেটে দিলেন। বলুনতো! অপর পক্ষ কী মনে করবে?

■ ফোন রিসিভ করলেন অপর পক্ষের প্রশ্নের জবাব ঠিকমত দিলেন না এবং কথা শেষ না করেই হঠাৎ কেটে দিলেন, বলুনতো অপর পক্ষের মনোভাব কেমন হবে?

০২. অযথা মিস কল দেয়া, বারবার দিয়ে বিরক্ত করা, মনে কষ্ট দেয়া গুনাহের কাজ।

০৩. নামাযের সময় ফোন দেয়া দুঃখজনক।

০৪. গভীর রাতে ফোন দেয়া দুঃখজনক।

০৫. দু'থেকে তিনরার রিং বাজার পর ফোন রিসিভ না হলে এমন ধরে নেয়া তিনি ব্যস্ত বা বাথরুমে বা নামাযে বা ঘুমে। আর যদি এমন মনে হয় নামায বা ঘুমে হওয়ার কথা না তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার করুন। তারপর রিসিভ করলে সুন্দরভাবে কথা বলুন। অন্যথায় আপনার কথার আঘাত তার জন্য জীবন নাশের কারণও হতে পারে।

পার্ক, উদ্যান ও লেক সংলগ্ন পরিবেশের প্রভাব

শত ব্যস্ততার মাঝে কর্মক্লান্ত দেহকে একটু বিশ্রাম আর মনকে একটু প্রশান্তি, ব্রেনকে একটু ঠাণ্ডা নিজেকে আরো কর্মোদ্দমী করার লক্ষ্যে উন্মুক্ত প্রজাতির মুক্ত বায়ুতে কিছুক্ষণ বসতে, সকালে ব্যায়াম করতে, একটু হাঁটা হাঁটি করতে, পরিশুদ্ধ নির্মল স্বচ্ছ বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করতে চায় অধিকাংশ মানুষ। কিন্তু এক শ্রেণীর আনাগোনা, উৎপাত (ছিনতাইকারী) আরেক শ্রেণীর সময় কাটানোর প্রবণতা, গল্প-গুজব হাসি ঠাট্টা অবাধে ছেলে-মেয়ে এক সাথে বসে হাতাহাতি করা, ইত্যাদি যে পুরো পরিবেশটাকেই বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন করে দেয়। যা দেখলে মনে হয় পার্কে ভাল মানুষ যাওয়ার কোনো অবকাশ নেই এবং আসলেও তাই মা-বাবাদের লজ্জায় সেখানে যাওয়ার কোনো সুযোগই নেই।

বর্তমানে পার্ক উদ্যান ও লেক সংলগ্ন পরিবেশ এমন যা দেখলে মনে হয় সরকারি ব্যবস্থাপনায় দেশের সমস্ত জনগণের টাকায় এ এমন এক অঙ্গন যেখানে এসে মানুষ মনে করে খাঁও দাও ফুর্তি কর যা ইচ্ছা তাই করো। আরেকটু বাকা করে যদি বলি তাহলে হবে এমন শত সহস্র কোটি টাকা ব্যয়ে বিনোদনের নামে আজকাল যা প্রত্যক্ষ করা যায় তা হলো, পার্ক উদ্যান ও লেক হলো রাগ ঢাকবিহীন প্রেমাঙ্গণ যা অবৈধ বা শরীয়াত বিহীনভাবে মন দেয়া নেয়ার মাধ্যমে টিনেজ বয়সের ছেলে-মেয়েদের চরিত্রকে ধবংস করে দেয়ার এক নিরব ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার কথাতো বলে লাভ নেই। কারণ এক শ্রেণী ব্যক্তিগতভাবে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে একটু বিনোদনের বিনিময়ে ব্যবসা করার জন্য গড়ে তুলেছে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিদিন সূর্য

www.amarboi.org

উদয় থেকে শুরু করে রাত বারোটা পর্যন্ত এখানে লোকজন থাকে কিসের প্রয়োজনে কিসের টানে? এ পার্ক, উদ্যান আর লেকের মাটি গাছতলা আর বসার স্থানগুলো কত যে ঘটনা দুর্ঘটনার নীরব সাক্ষী তাই বা কে জানে? অসৎ চরিত্রের দিকে ধাবিত হওয়া এবং তার প্রাকটিসের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে পরিণত এ স্থানগুলোর বছর বছর উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা বাজেট আর সংরক্ষণের নামে লোক নিয়োগ করে প্রচুর টাকা খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু এর উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কী সঠিকভাবে হচ্ছে? এটি কী জাতির মন-মানসিকতা চিন্তা চেতনায় কোনো পজিটিভ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে? নাকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাপনায় জাতীয় চরিত্রকে ধ্বংস করে তাদের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে ভেঙ্গে চুরে চুরমার করে দেয়া হচ্ছে? যাক সেসব প্রশ্ন। এবার পরামর্শ ঃ

০১. পার্ক, উদ্যান ও লেকের পাড়ে বৃক্ষ থাকবে কিন্তু ঝোপঝাড় না থাকাই উত্তম। এখানে ঝোপঝাড় যারা পছন্দ করেন তারা হয়তোবা বলবেন এতে সমস্যা কী সুবিধাইতো বেশি। এখানে এসে বলবেন চল না হারিয়ে যাই। আমি বলি হারাবেন আর কোথায় সবইতো আল্লাহ দেখতে পায়। কাজেই এমন বেড়ানোর জন্য ঝোপঝাড় লাগবে কিসে? অন্যদিকে এতে সুফল হলো ছিনতাইকারী ও অসচ্চরিত্রের লোকের প্রভাব কমে যাবে।

০২. মাগরিব নামাযের আযান কানে ভেসে আসার সাথে সাথে সাইরেন বাজিয়ে সকলকে এসব স্থানগুলো থেকে বাসায় ফিরে যাওয়ার প্রতি আহ্বান জানালে ভাল হবে। অন্যথায় কেউ কেউবা এখানে এসে কথা বলতে বলতে হারিয়ে যাওয়ার ফাঁকে মা-বাবা সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে সন্তানরা এখনো বাসায় ফিরছে না বলে দারুন উৎকণ্ঠায় পড়ে থাকে।

০৩. মানুষ এখানে আসে নির্মল বায়ু, বৃক্ষরাজি, মানসিক প্রশান্তি, বন্ধুত্ব গঠন এবং অকস্মাৎ কোনো বিষয়ের টেনশন দূর করতে। এক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ স্থানে মানুষ যা-যা করতে এখানে আসে তার সাথে সম্পর্ক রেখে আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসে পাকের বাণী বিভিন্নভাবে স্থায়িত্বের ভিত্তিতে সাইনবোর্ড আকারে পার্কের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেটআপ করা যেতে পারে।

০৪. অত্যন্ত লজ্জার বিষয় এ স্থানে নানা অপকর্ম হয়- যা সত্যিই দুঃখজনক ও রীতিমত লেখতেই লজ্জাবোধ হচ্ছে, সেদিকে কর্তৃপক্ষের খেয়াল রেখে তা দূর করতে আশু কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

০৫. শত সহস্র দুঃখ-কষ্ট আর গ্লানি থেকে মুক্তির জন্যে অনেকে পার্কে আসে কিন্তু আসলে কী এভাবে ভবঘুরের ন্যায় ঘুরাফেরা করলে মুক্তি পাওয়া যাবে? কখনো নয়, মুক্তি আসতে পারে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া আর আদর্শ জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজেদের জীবনের সকল কর্ম সাজালে। কাজেই

www.amarboi.org

আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও মাথা নত করে সাহায্য চাওয়ার জন্যে প্রয়োজন এমন বিনোদন কেন্দ্রের সাথে মসজিদ নির্মাণ করা।

০৬. পার্ক, উদ্যান ও লেকের পাড়ে হোটেল ও ফাস্টফুডের দোকান না থাকাই উত্তম। যারা বেশি বেশি সময় থাকবে তারা খাবার নিয়ে ঢুকবে। তাদের জন্য সারাদিন "খাও দাও ফুর্তি কর যা ইচ্ছা তাই করো"– এমন ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে না করাই উত্তম। পার্ক, উদ্যান ও লেকে কোনো অবস্থাতেই সন্ধার পর লোকজনকে অবস্থান করতে না দেয়া এবং দিনে সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে লোকদেরকে অসৎ কাজ করতে না দেয়ার মধ্য দিয়ে এখানকার পরিবেশকে সুন্দর ও কলুষমুক্ত রাখার প্রতি সকলকে হতে হবে সোচ্চার। তাছাড়া এগুলো সকলের সম্পদ, জাতীয় সম্পদ এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সকলের। তাই জাতীয়ভাবে প্রত্যেককে দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়ে আজকের ও আগামীদিনের সন্তানদের সচ্চরিত্র গঠনে প্রাণান্তকর চেষ্টা করা উচিত আমাদের সকলের।

কর্মজীবনে প্রবেশ ও এ পর্বে সচ্চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে প্রত্যেক মানুষ কর্মজীবনে স্ব-স্ব মহিমায়, স্ব-স্ব যোগ্যতায় প্রবেশ করবে এটা স্বাভাবিক। কর্মজীবনে অফিসে বা কর্মস্থলে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সকলের সাথে সকলের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে শিক্ষা, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার বিচারে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের উপরের স্তর থেকে শুরু করে নিম্নস্তরের সকল ব্যক্তি মানুষের সাথে সকলের এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের সাথেও সুসম্পর্ক রাখা, হাসিমুখে সেবাদান করে নির্ধারিত সময়ে অফিসে গমন ও প্রস্থান, কর্মে একনিষ্ঠতা, হাদিয়া তোহ্ফা বকশিসের নামে বেতনের অতিরিক্ত টাকা নেয়া, অফিসের দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন সময়ের খরচের পরিমাণকে বেশি করে দেখানো, ভুয়া টিএ, ডিএ বিল দেখানো, অধীনস্থদের সাথে সব সময় আদেশ নির্দেশমূলক নীতি অবলম্বন করা, বকাবকি বা অসুন্দর করে কথা বলা সচ্চরিত্রের প্রতিবন্ধক। বর্তমান শিল্পায়নের যুগে জীবন ধারনের জন্য প্রত্যেক মানুষকেই অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। বিভিন্ন স্তরে এক ব্যক্তির অধীনে একাধিক ব্যক্তিবর্গ কাজকর্ম আঞ্জাম দিয়ে থাকে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সকল দায়িত্বশীল ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং তাদের উপর কোন প্রকার যুলুম-অত্যাচার না করে।

ইসলামী জীবন বিধানে মর্যাদার পার্থক্য হয় কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে। তাই উর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তা নিম্ন পদস্থদের প্রতি কোনো প্রকার যুলুম ও বেইনসাফী করতে পারবে না।

www.amarboi.org

আজকের সমাজে ক্রীতদাস প্রথা নেই সত্য. তবে অধীনস্থদের প্রতি যুলুম-অত্যাচার চলতে থাকে বিভিন্নভাবে। তাই নবী কারীম (সা.)-এর নির্দেশ এ যুগের সকল প্রকার শ্রমিক ও অধীনস্থদের বেলায়ও একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে একটি হাদিসে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন ঃ

هُمْ اَخٌ لَّكُمْ جَعَلَ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ مِمَّا يَاْكُلُ مِمَّا يَلْبِسُ وَلَايُكَلِّفَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَايَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَايُغْلِبُهُ فَلْيُعِنْ عَلَيْهِ.

"তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীনস্থ করে দিয়েছেন, তার উচিত তাকে তাই খাওয়ানো যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো যা সে নিজে পরিধান করে থাকে। আর তাকে এমন কর্মভার দিবে না, যা তার সাধ্যাতিত। যদি কখনো তার উপর অধিক কর্মভার চাপানো হয় তবে যেন তাকে সাহায্য করে।" (তিরমিযী শরীফ)

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.)-এর খাদেম হযরত আনাস (রা.)-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূল (সা.)-এর খেদমত করেছি। তিনি আমার সম্পর্কে কখনো উফ শব্দটি বলেননি এবং কোনো দিন বলেননি, এটা করো নি কেন? ওটা করো নি কেন? আমার বহু কাজ তিনি নিজে করে দিতেন।" (মিশকাত শরীফ)

হযরত উমর (রা.) জেরুজালেম সফরে উটে চড়া ও উট টেনে নেয়ার ব্যাপারে সাম্য ও মানবতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজের ও ভৃত্যের মধ্যে পালাক্রম ঠিক করে যার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। একজন ভৃত্যকে দৈনিক কয়বার ক্ষমা করা যেতে পারে? বিদায় হজ্বে এক প্রশ্নের জবাবে নবী কারীম (সা.) ঘোষণা করেছিলেন- فِىْ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً. "প্রত্যহ সত্তর বার।"

আজকাল অফিসের গাড়ি টেলিফোন ও অন্যান্য উপকরণ অনুমতি ব্যতীত ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হয়– যা ইসলাম সমর্থন করে না। মূলত সরকারি বেসরকারি যে কোনো অফিসের ব্যবহার্য জিনিসগুলো শুধু অফিসের কাজের স্বার্থেই ব্যবহার করা উচিত। এর বিন্দুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করা মানেই হলো দেশের সম্পদ অন্যকথায় জনগণের সম্পদ হরণ করা, অন্যদের অধিকার ভুলুণ্ঠন করা। যার জন্যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে। এগুলো সচ্চরিত্রের বিপরীত চরিত্র অর্থাৎ অসচ্চরিত্রের নিদর্শন।

www.amarboi.org

উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ

সৎ কাজে সহযোগিতা ও অসৎ কাজে বারণ

সৎ কাজ ও অসৎ কাজ বলতে কি বুঝায়

সৎ কাজ হলো তাই, যা আল্লাহ্ পাক আমাদের মঙ্গলের জন্য পছন্দ করেন। আর অসৎ কাজ হলো ঐ সমস্ত কাজ যা আল্লাহ্ পাক অপছন্দ করেন। কেননা, অসৎ কাজে আমাদের অমঙ্গল সাধিত হয়। আমাদের জন্য কল্যাণকর যে সমস্ত কাজ, সেগুলো সৎ কাজ; আর আমাদের জন্য অকল্যাণকর যে সমস্ত কাজ, সেগুলো অসৎ কাজ। মানুষের যে কোনো কাজ, হয় তা সৎ কাজ, না হয় তা অসৎ কাজ। এ যেন একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ।

নামায পড়া সৎ কাজ, আর নামায না পড়া অসৎ কাজ। কোনো বিষয়ে সত্য কথা বলা সৎ কাজ, আবার সত্যকে গোপন করা বা মিথ্যা বলা অসৎ কাজ। চুরি করা অসৎ কাজ; অন্যদিকে চুরি না করে আমানতদারী রক্ষা করা বা প্রতিবেশীকে আমার দ্বারা তার সম্পদ চুরি যাওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত রেখে তার দিল প্রশান্তিতে রাখা সৎ কাজ। স্ত্রীর হক আদায় করা সৎ কাজ, অন্যদিকে স্ত্রীর হক আদায়ে উদাসীন থাকার ফলে স্ত্রীর উপর জুলুম হয় বলে তা অসৎ কাজ। নবীজি (সা.) বললেন ঃ

"যে কাজে আল্লাহ পাক খুশী, তাই সৎ কাজ এবং যে কাজে আল্লাহ পাক অখুশী, তা অসৎ কাজ। আর আল্লাহ্ পাক সেই কাজে খুশী যে কাজে তাঁর বান্দার কল্যাণ সাধিত হয় এবং সেই কাজে অখুশী যে কাজে তাঁর বান্দার অকল্যাণ হয়।"

সৎ কাজ ও অসৎ কাজ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর আদেশ–

وَادْعُ اِلىٰ رَبِّكَ.

"তুমি তোমার রবের দিকে ডাক দাও।" (সূরা আল কাসাস, ২৮ ঃ ৮৭)।

اُدْعُ اِلىٰ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

"তুমি তোমার রবের পথের দিকে সুকৌশলে ও সদুপদেশের মাধ্যমে ডাক দাও।" (সূরা আন নাহল,১৬ ঃ ১২৫)।

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى.

"তোমরা সৎ কাজ ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করো।" (সূরা আল মায়িদা, ০৫ ঃ ০২)

www.amarboi.org

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ.

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করো, অসৎকাজে নিষেধ করো এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১১০)।

আল কুরআনের এ নির্দেশ দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো পথভ্রষ্ট মানুষকে সৎ ও ন্যায়ের পথ দেখানো। এরপর হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ.

"আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন কোনো খারাপ কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগে) প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের (কথার) দ্বারা (জনমত গঠন করে) তা প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে যেন অন্তরের দ্বারা (পরিকল্পিত উপায়ে) এটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে বা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম (নিম্নতম) স্তর।" (তিরমিযী শরীফ)

নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব ছিলো আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁদেরকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে হয়েছে। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী ও রাসূল এ কাজ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবত কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি পথভ্রষ্ট জাতিকে তদানীন্তন বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত জাতিতে পরিণত করেছেন। তাঁর পরে আর কোনো নবী পৃথিবীতে আসবে না। এ অবস্থায় কারা এ দায়িত্ব পালন করবেন। সে প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ج وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

www.amarboi.org

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকবে যারা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে, তারাই সফলকাম।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১০৪)।

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, মুসলিম জাতির অন্ততপক্ষে একদলকে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন অত্যন্ত কঠিন। যে কেউ এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে তাকে অমানুষিক নির্যাতন ও উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। এ কাজ করতে গিয়ে বিশ্বনবী (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে চরম কুরবানী দিতে হয়েছে। বিরোধীদের নির্যাতন ও অত্যাচারে তাঁদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। যুগে যুগে যাঁরাই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন তাদেরকে অপরিসীম বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সৎ কাজের আদেশ নিজ পরিবার থেকে শুরু করতে হবে; কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে অগ্নি থেকে রক্ষা করো।" (সূরা আত তাহরীম, ৬৬ ঃ ০৬)

সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার উদ্দেশ্য

মানুষ সৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহপাকের নিকটবর্তী হতে থাকে, আর অসৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ পাক থেকে দূরে চলে যায়। তাই সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর দিকেই ডাকা হয়ে থাকে। যখন মানুষ আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়, তখন আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে, আল্লাহর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এর মাধ্যমে সে আল্লাহর গুণাবলির পরিচয় লাভ করে। সে আল্লাহ পাকের প্রতিনিধিত্বের গুণ ও যোগ্যতা অর্জন করে। এভাবে মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতে বলা হয়েছে।

সৎ কাজে আদেশ কিভাবে করবেন

সৎ কাজে আদেশের মাধ্যমে অসৎ কাজে নিষেধ করা হয়। অসৎ কাজে নিষেধের মাধ্যমে সৎ কাজে আদেশ করা হয়। আর সৎ কাজে আদেশের প্রয়োজন হয় যখন কারো মধ্যে সৎ কাজের প্রবণতা কমতে থাকে অথবা কোনো অসৎ কাজের প্রবণতা থাকে বা কাউকে অসৎ কাজে লিপ্ত হতে দেখা যায়। সুতরাং সৎ কাজে আদেশের মধ্য দিয়ে অসৎ কাজ যেমন বন্ধ হয়, তেমনি সৎ কাজের প্রচার, প্রসার ও প্রচলন সাধিত হয়।

অবশ্য সৎ কাজের প্রতি মানুষকে আদেশ করার অর্থ উপদেশ প্রদান (নসিহত)। প্রতিটি মানুষের মান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে সৎ কাজে আদেশ প্রদান করা কতর্ব্য। এই বিষয়ে নবী কারীম (সা.)-এর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ

www.amarboi.org

করতে হবে। নবী কারীম (সা.) আল্লাহ্ পাকের নিকট থেকে বাণী প্রাপ্ত হয়ে তা তাঁর উম্মতের নিকট পৌঁছিয়েছেন, ঐ বাণী মুতাবিক নিজে আমল করেছেন এবং অন্যদেরকে আমল করা শিখিয়েছেন। তিনি মানুষদের ভালবাসতেন এবং তাদের কল্যাণ কামনা করতেন। মানুষকে ভালবাসা ও তার কল্যাণ কামনায় যেভাবে সৎ কাজে আদেশের কাজ সম্পাদন করা মানুষের মর্যাদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেভাবে তিনি সৎ কাজে আদেশের দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।

যারা বয়সে বড়, জ্ঞানবুদ্ধিতে বড়, যারা সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তিতে বড় তাদের প্রতি সৎ কাজে আদেশের দায়িত্ব কিভাবে সম্পাদন করা যাবে, তার শিক্ষা নবী কারীম (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জীবন থেকে গ্রহণ করা যায়। কাউকে নির্দিষ্টভাবে আদেশ বা উপদেশ দিয়ে কথা না বলা ভাল। নিজেকে উদ্দেশ্য করে কথা বলে অপরকে সংশোধনের চেষ্টা করা যায়। যেমন কাউকে সালাতের প্রতি আদেশ দিতে গিয়ে বলা– আল্লাহ্ পাক বড়ই খুশী হন যখন আমরা সালাত কায়েম করি। এভাবে কথা বললে শ্রোতা আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যে সালাতে অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হবে। আর এ ধরনের কথায় আল্লাহ্ পাক বরকতও দান করেন।

নবী কারীম (সা.) সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধে এমন ভাব, আচার-আচরণ ও বাক্যাবলি ব্যবহার করেছেন, যা মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সৎ কাজ করতে বা অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো এসব কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ যেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবী কারীম (সা.)-এর নিকট থেকে মানুষকে সৎ কাজে আদেশের শিক্ষা ও দীক্ষা সঠিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। মানুষকে সৎ কাজে আদেশে এমন বাক্যাবলি ব্যবহার বা আচরণ করেছেন, যা তাদেরকে শুধু আল্লাহর দিকে অনুপ্রাণিত করে এবং তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ হয় বা ঐ অসৎ কাজে বিরত থাকে।

স্বামী স্ত্রীর অভিভাবক। সেই সুবাদে অনেক স্বামী কখনো কখনো স্ত্রীকে আদেশ দিয়ে কথা বা আচরণ করে থাকে। অপরদিকে স্ত্রী যে অন্যান্য মানুষের মতোই একজন মানুষ, তাকেও যে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেয়া প্রয়োজন সেদিকে হয়তো কারো কারোর খেয়ালই নেই। অথচ স্ত্রীর প্রতি সাহাবায়ে কেরাম (রা.) খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদেরকেও আদেশ দিয়ে কথা বলতেন না। তাঁরা এমন কথা বা ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন যার ফলে তাঁরা (স্ত্রীগণ) যেন আল্লাহর প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে অভিষ্ট কাজটি করেন। এতে তাঁরা (স্ত্রীগণ) যেন কাজটির সুফল দুনিয়াতেও লাভ করেন এবং আখিরাতেও লাভ করেন।

www.amarboi.org

উমর (রা.) তাঁর খিলাফতের যামানায় রাতে মরুভূমি অতিক্রমকালে এক তাঁবুর মধ্যে একাকিনী এক মহিলার প্রসব বেদনার কথা জানতে পেরে বাড়িতে ফিরে এসে তাঁর এক স্ত্রী উম্মে কুলসুম (রা.)-এর উদ্দেশ্যে বললেন-তোমার সামনে বড় একটি সাওয়াবের কাজ এসেছে। উম্মে কুলসুম (রা.) বিস্তারিত জানতে চাইলে উমর (রা.) বললেন– একজন মরুবাসিনীর প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে। উম্মে কুলসুম (রা.) বললেন– হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার অনুমতি হলে আমি তৈরি। এরপর প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সেখানে গেলেন।

এই ছোট ঘটনাটিতে শিক্ষণীয় অনেক বড় বড় বিষয় আছে। তার মধ্যে একটি এই যে, উমর ফারুক (রা.) তাঁর স্ত্রীকে ঐ সৎ কাজ করার জন্য আদেশসূচক বাক্য ব্যবহার করেননি। বরং তাঁর স্ত্রী আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় সৎ কাজে আপনা থেকে অগ্রসর হয় এমন ধরনের সংলাপ করেছেন।

তাই সৎ কাজে আদেশ বা অসৎ কাজে নিষেধে যেমন ইলম্ ও হিকমত থাকতে হবে, তেমনি আল্লাহর দিকে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তা সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে এমন বাক্য বা শব্দ প্রয়োগ করে কথা বলতে হবে। তবেই সেসব দাওয়াতে আল্লাহ পাক সুফল দান করবেন।

অসৎ কাজে নিষেধে তিনটি বিশেষ নীতি অবলম্বন

ভাল কাজে আহ্বান এবং অসৎ কাজে নিষেধ কিভাবে করবে সে সম্পর্কে পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ.

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো ইলম ও হিকমত (জ্ঞান ও কৌশল), সদুপদেশ (নম্র ব্যবহার) এবং তাদের সাথে তর্ক করো উত্তমভাবে (সত্য ও সুন্দরের প্রসার ঘটানো)।" (সূরা আন নাহল, ১৬ ঃ ১২৫)

এখানে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকা, অসৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রেখে তাদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে সুপরিবর্তন আনয়ন, অসচ্চরিত্রের দোষাবলি থেকে ফিরিয়ে সচ্চরিত্রবান করার লক্ষ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে প্রথমতঃ ইলম ও হিকমত (জ্ঞান ও কৌশল) অবলম্বন করতে অর্থাৎ জ্ঞানের মাধ্যমে কথা বলতে হবে, বুঝাতে হবে, প্রকৃত জ্ঞানের উপকরণ (বই) প্রদান করতে হবে, গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, বার বার বলতে হবে, দ্বিতীয়তঃ সদুপদেশ (নম্র ব্যবহার) অর্থাৎ সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সৎ ও অসৎ কাজের পজিটিভ নেগেটিভ দিক ধৈর্যের সাথে ঠাণ্ডা মাথায় বলার চেষ্টা করতে হবে, তৃতীয়তঃ তাদের সাথে তর্ক কর উত্তমভাবে। (সত্য ও সুন্দরের প্রসার ঘটানো) অর্থাৎ মূর্খদের ন্যায় অযথা তর্ক করা বা যুক্তি প্রদর্শন করতে চাইলে হবে না, যুক্তি দিতে হবে জেনে শুনে প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তিতে, উপস্থাপন করতে হবে সুন্দরভাবে হৃদয়গ্রাহী করে। আর তাহলে ধারণা করা যায়, মানুষ অসৎ কাজ থেকে ফিরে সৎ কাজে উৎসাহী হবে।

www.amarboi.org

আমরা রাসূল (সা.)-এর জীবনীতে দেখি তিনি এমন আহ্বান জানানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বের ভিত্তিতে তিন তিনবার করে সজোরে কথা বলতেন যাতে উপস্থিত সাহাবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয় এবং তা তাঁদের মাথায় থাকে।

মূল্যায়ন, মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতার মনোভাব গঠন

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

পৃথিবীতে ইসলামই প্রথম ধর্ম, যা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা 'সকল সৃষ্টির সেরা' বলে সাব্যস্ত করেছে এবং নিখিল জগতের উপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلىٰ كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً.

"আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি এবং জল ও স্থলের শক্তিসমূহকে তাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছি যা তাদেরকে বহন করে চলে এবং তাদেরকে পাক-পবিত্র জিনিস দ্বারা রিযিক দিয়েছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭০)

জমিন ও আসমান, চন্দ্র-সূর্য, সাগর-মহাসাগর, জল-স্থল সবকিছুই মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ.

"আল্লাহ সেই পরম সত্তা, যিনি জমিন ও আসমানকে সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর তার সাহায্যে তোমাদেরকে রিযিক পৌঁছানোর জন্য নানা প্রকারের ফল-মূল সৃষ্টি করেছেন। তিনি নৌযানকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন, যেন তা তাঁর হুকুমে নদী ও সমুদ্রে চলাচল করে এবং তিনি নদ-নদীসমূহকে তোমাদের অধীন ও নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন।" (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩২)

মানুষ স্বীয় মূর্খতাবশতঃ যে চন্দ্র সূর্যকে পূজা করতে শুরু করে দিয়েছিল, সেগুলোকে পর্যন্ত তাদের জন্য অধীন ও নিয়ন্ত্রণ করে দেয়া হয়েছে ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

"তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রাত্র ও দিবসকে।" (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৩)

www.amarboi.org

এইসব বস্তুকে মানুষের সুবিধা ও উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পূজা উপাসনার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন এবং তার মাথায় সর্বাপেক্ষা বড় পদ 'আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব'-এর গৌরব-মুকুট স্থাপন করেছেন। তার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করার কারণে ইবলীস চিরদিনের জন্য বিতাড়িত প্রতিপন্ন হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُوْنِيْ بِأَسْمَاءِ هٰؤُلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ. قَالُوْا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ. قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُوْنَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلاَّ إِبْلِيْسَ أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ.

"আর সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের রব ফিরিশতাদেরকে বললেন যে, আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক। তারা বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন একটি জীব সৃষ্টি করবেন, যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা আপনার প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ নিশ্চয়, আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ৩০-৩৪)

এ আয়াতগুলোর আলোচনা দ্বারা একটি বিষয় সুস্পষ্ট মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন অত্যন্ত মহব্বত করে, ভালবেসে। ফলে অন্যান্য সৃষ্টির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে তাদেরকে সম্মানের আসনে আসীন করেছেন। মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সবকিছুর উপর নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য দিয়েছেন মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম। এ কুরআনের বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে পাঠিয়েছেন। এসব কিছুর উদ্দেশ্য একটাই মানুষ যাতে কোনোভাবেই দুনিয়াতে অসম্মানিত, লজ্জিত ও অভিশপ্ত না হয়। তারা যেন পৃথিবীর অন্য কোনো প্রাণীর বা কোনো অপশক্তির কাছে মাথা নত না

www.amarboi.org

করে। তারা যেন রয়েল বেঙ্গল টাইগারের খাবারে পরিণত না হয়। বরং টাইগারও যেন তাদেরকে দেখে সম্মান করে, বেয়াদবি না করে নির্দিষ্ট এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় সেজন্য। (রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামদের জীবনী এর সাক্ষী) অথচ আজ কী দুর্ভাগ্য! কী নির্বুদ্ধিতা! এক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের কর্মের ফলে সৃষ্ট সমস্যার মুখোমুখি হয়ে বলে কেন আল্লাহ আমাদের দুনিয়াতে পাঠালেন ইত্যাদি? উফ! আল কুরআনুল কারীম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, আদর্শ জ্ঞান অর্জনে ঘাটতি থাকলে যা হয়, তা যেন তারই বাস্তব প্রতিফলন।

মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ কেন প্রদর্শন করব?

একে অপরের মূল্যায়ন, অপরের গ্রহণযোগ্য কাজকে সমর্থন, উৎসাহ ও পরামর্শ দেয়া রাসূল (সা.)-এর চরিতাদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে কেউ যে পেশায়ই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন তাদের সেই পেশার মূল্যায়ন ও ব্যক্তিকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বান্দাহ এবং জগৎ শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মত হিসেবে সম্মান প্রদর্শন এবং মূল্যায়ন করা আবশ্যক। কিন্তু কেন? এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কায়েম করা সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করবে, এটা তার নিজের জন্যই তার প্রভুর নিকট খুবই কল্যাণকর হবে।" (সূরা আল-হজ্জ, ২২ ঃ ৩০)

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে; আর তা (সম্মান প্রদর্শন) দিলের তাকওয়ার ফল।" (সূরা আল-হজ্জ, ২২ ঃ ৩২)

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

"মুমিনের প্রতি তোমার বিনয় ও নম্রতার ডানা সম্প্রসারিত করো" (সূরা আল-হিজর, ১৫ ঃ ৮৮)।

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْۤ إِسْرَائِيْلَ أَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا.

"যদি কেউ কোনো ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধ অথবা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়া (অন্যায়ভাবে) হত্যা করে, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে জীবন দান করে (অন্যায়ভাবে

www.amarboi.org

নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করে) তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করল।" (সূরা আল মায়িদা, ০৫ ঃ ৩২)

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে কোনো না কোনো যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা, রয়েছে মনুষত্ববোধ ও মানবিকতা। সমাজের একদম বিকলাঙ্গ মানুষটিও কোনো না কোনোভাবে আল্লাহ তা'আলার রহমতের অধীনে– তা আমাদেরকে বুঝেই নিতে হবে। আল্লাহ্ পাক যেভাবে তাঁর সকল বান্দাদেরকে মহব্বত করে সৃষ্টি করেছেন ঠিক সেভাবেই দুনিয়াতে সুন্দরভাবে জীবন ধারণের উপকরণ প্রদান করেন, যেখানে কিনা মানুষ একে অপরকে করে থাকে ঘৃণা অসম্মান, কথোপকথনে অবমূল্যায়ন– যা সত্যিই দুঃখজনক।

আজকের বাস্তব চিত্র ও আমাদের করণীয়

একজন রিক্সা চালকের বয়স বেশি হওয়া সত্ত্বেও কম বয়সীরা যখন "ঐ রিক্সা" বলে ডেকে রিক্সা থামায় এবং বলে যাইবা? চল.....। তখন রিক্সা চালকের অনুভূতি কেমন হবে? আসলে কি লোকটির নাম ঐ রিক্সা? আমরা কি একটু সুন্দর করে আদবের সাথে ভাই যাবেন? আমি অমুক স্থানে যাব, কত টাকা ভাড়া নিবেন? এভাবে কথা বলতে পারি না? বাসে উঠে কনডাক্টরের বয়স বেশি হওয়া সত্ত্বেও তুই-তুমি করে কথা বলা, ভাড়া দুই-তিন বার চাইলেই অমানুষ, জানোয়ার, বাপের ঠিক নেই এমন অকথ্য ভাষায় বকা দেয়া, ড্রাইভারকে বকা দেয়া– এ যে রীতিমত অনেকের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আসলে তারাও মানুষ এ বিষয়টি মনে রেখে তো আমরা তাদের সাথে সুন্দর করে কথা বলতে পারি। সে না হয় আমার দৃষ্টিতে খারাপ কিন্তু আমি তো ভাল। এখন আমি কি তাহলে কারোর সাথে এমন খারাপ আচরণ করতে পারি? (ধরুন, কুকুর না হয় আমার পায়ে কাঁমড় দিয়েছে কিন্তু তাই বলে কি আমিও কুকুরের পায়ে কাঁমড় দিতে পারি?)

যারা শিল্প কারখানা, গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান ও বাসায় কাজ করে (বুয়া) তাদের নাম বিকৃত করে ডাকা, বয়সে বড় হলেও তুই-তুমি করে কথা বলা অনুচিত। আজকে পেশার কারণে আমরা তাদের সাথে খারাপ আচরণ করছি, তাদেরকে অবমূল্যায়ন করছি কাল আমার জীবনে না হয় নাই হলো (কারোর কারোর ধারণা যে ধন-সম্পদ উপার্জন করেছি তাতে আমার জীবনে কোনো সমস্যা নেই সুন্দরভাবে খেয়ে পরে জীবন কাটাতে পারব) কিন্তু আমার বংশেরও তো কারোর কোনো দুর্ঘটনার কারণে এমন অবস্থান ঘটতে পারে। কেননা নদীর এপার ভাঙে ওপাড় গড়ে এইতো নদীর খেলা, সকাল বেলার ফকিররে তুই আমীর সন্ধ্যা বেলা (২০০৬ সালে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশ : ঢাকার নবাব বাড়ীর বংশধর এখন ঝি'র কাজ করে)। এ যে আল্লাহরই লীলাখেলা।

কাজেই সকলের প্রতি মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ প্রদর্শন করে কথা বলা জরুরী। আর এটিই শ্রদ্ধাবোধ ও স্নেহের দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তব প্রতিফলন।

www.amarboi.org

ছোটরা বড়দের প্রতি মূল্যায়ন ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে সুন্দর করে শ্রদ্ধার ভিত্তিতে কথা বলবে। পাশাপাশি বড়রাও ছোটদের মাঝে মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শন করে কথা বলবে।

শিক্ষকদের সাথে আদবের চূড়ান্ত রূপ প্রদর্শন করে কথা বলা এবং শিক্ষকরাও শিক্ষার্থীদের আগামীদিনের এক একজন আদর্শ মানুষ ও আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে গঠন করার লক্ষ্যে আন্তরিকতাপূর্ণ চেষ্টা করবে।

মা-বাবাকে মূল্যায়ন করে কথা বলা, মা গর্ভধারিণী, বাবা জনক তাদের সম্মিলনেই সন্তান-এ বিষয়টি মাথায় রেখে তাদের মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ প্রদর্শন করা উচিত। বর্তমানে পৃথিবীর আর কোনো ব্যক্তি এদের চেয়ে বেশি বা এদের সমমানসম্পন্ন সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত নেই। আজকের অনেক পরিবারে যখন দেখা যায়, মা অশিক্ষিত সন্তান শিক্ষিত, মা বৃদ্ধ-সন্তান নব জোয়ান, বাবা আগের মতো কর্মক্ষম নয়- সন্তান কর্মক্ষম, বাবা অনেক কিছু করতে পারে না সন্তান পারে– এ পর্যায়ে তাদের অবমূল্যায়ন হয়ে থাকে তখন অন্তর থেকে ব্যথা অনুভব করে, দুঃখ হয়। সন্তানরা থাকে এসি রুমে, বাবা থাকে স্টোর রুমে, মা থাকে বুয়ার সাথে অথবা সন্তানরা থাকে ধানমন্ডি, গুলশান বনানীর ঐ সুউচ্চ অট্টালিকাতে মা-বাবা থাকে প্রবীণ হিতৈষী ভবনের আশ্রয়ালয়ে বা ওল্ড কেয়ার হোমে অথবা গ্রামের কোনো এক নিভৃত পল্লীতে (না আজকের এ আধুনিকতার কালে মা-বাবার এমন করুণ অবমূল্যায়ন চিত্র লিখে শেষ করা যাবে না)। এ কেমন দৃশ্য! কেমন বাস্তবতা! মা নয় মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে কত কষ্ট, কত যাতনা সহ্য করেছেন তা বলাই বাহুল্য। তবে এটুকু বুঝি স্বয়ং আল্লাহ পাক ও রাসূল (সা.)ও যখন তাদের এত মর্যাদা দিয়েছেন তখন আমি আর কী লিখব? কতটুকু লিখতে পারি? বাবা কঠোর পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দুপুরে খাবার না খেয়ে, পায়ে হেঁটে অফিস বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গমন করে ফেরার সময় সন্তানের চোখে মুখে একটু হাসি ফুটানোর জন্য যখন চকলেট, কমলা, আপেল, কলা আর আম (হালাল ও স্বল্প উপার্জনকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) কিনে ঘরে এসে সন্তানের হাতে-মুখে তুলে দেয়, নিজেরা খায় না, বলে কত যে খেয়েছি, নিজেরা নতুন কাপড় কিনে না সন্তানের গায়ে নতুন কাপড় জড়িয়ে দিয়ে মা-বাবা একত্রে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে আর খুশীতে সব কিছু ভুলে যায়। সেই মা-বাবাকে নিয়ে যখন মুসলিম দেশেও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে মা দিবস, বাবা দিবস পালন করা হয়, তখন সত্যিই আমি নির্বাক হয়ে যাই। ভাষা হারিয়ে ফেলি। আমার খুব কষ্ট হয়। আর মনে প্রশ্ন জাগে একি মুসলিমদের সন্তানদের দ্বারা হওয়া উচিত?

একদিন সময়ের ব্যবধানে আজকের সন্তানরাও মা-বাবা হবে সেদিন যদি এমনটি হয় কেমন লাগবে? তা বোধ হয়, আজ ভেবে দেখাই প্রয়োজন। তাই বলব আদর্শ ও সচ্চরিত্রবান সন্তানরা সবসময়ই মা-বাবা এবং সকল বয়সীদের শ্রেণীমত মূল্যায়ন করবে, সম্মান প্রদর্শন করবে– এটাই স্বাভাবিক।

www.amarboi.org

সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, স্ব-স্ব স্থানের প্রধান ও রাষ্ট্রের কর্ণধার যে যে মনোভাবেরই হোক না কেন তাদের ভাল কর্ম ও চিন্তার প্রতি সমর্থন প্রদর্শন এবং সেভাবে সকলকে মূল্যায়ন করা উচিত। কারোর অতীতের কোনো ভাল কর্মের কথা মাথায় রেখে বর্তমানেও তাকে মূল্যায়ন করা বা অন্ততপক্ষে অবমূল্যায়ন দরকার নেই, মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা সচ্চরিত্রের লক্ষণ।

জবাবদিহি

প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্ম এবং অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়াই হলো জবাবদিহি। এ জবাবদিহি প্রত্যক্ষ করা যায় দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় ক্ষেত্রেই। বিশ্বের অনেক দেশেই নেতা-নেত্রীদের মুখে জবাবদিহির কথা শুনা যায় যদিও মানার ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় তাঁদের যতসব গাফিলতা বা ব্যতিক্রম। হাদিসে রয়েছে ঃ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ اَلْاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ اَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِيْ مَال سَيِّدِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَّمَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ.

“তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল, সকলকেই জিজ্ঞেস করা হবে স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে। ইমাম বা শাসনকর্তা দায়িত্বশীল, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। পুরুষ তার ঘরে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার স্বামীর গৃহে দায়িত্বশীল, তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে। খাদিম তার কর্তার সম্পদে দায়িত্বশীল, তার সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। আর পুরুষ তার পিতার সম্পদে দায়িত্বশীল, তাকে প্রশ্ন করা হবে দায়িত্ব সম্পর্কে। সুতরাং তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল আর সকলকেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।” (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ শরীফ)

এ পৃথিবীতে সবকিছু একে অপরের কাছে আমানতস্বরূপ। সবকিছুর জন্যই আমাদের আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পরিষ্কারভাবে আল কুরআনে বলে দিয়েছেন ঃ

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ.

“অতঃপর যাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে

www.amarboi.org

আমি জিজ্ঞাসা করবই এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করব।" (সূরা আল-আ'রাফ, ০৭ ঃ ০৬)

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِيْنَ.

"অতঃপর তাদের নিকট পূর্ণ জ্ঞানের সাথে তাদের কার্যাবলি বিবৃত করব, আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।" (সূরা আল আ'রাফ, ০৭ ঃ ০৭)

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ج فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"সে দিনের ওজন করা সত্য। যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম।" (সূরা আল আ'রাফ, ০৭ ঃ ০৮)

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُوْنَ.

"আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার নির্দেশসমূহ প্রত্যাখ্যান করত।" (সূরা আল আ'রাফ, ০৭ ঃ ০৯)

সেদিন কিয়ামত দিবসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে মর্যাদা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেককে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সচেতন ও কর্ম তৎপর হতে হবে, নিজেকে তৈরি করে তুলতে হবে জবাবদিহির জন্যে। আর এ জবাবদিহির পজিটিভ ফলাফলই হলো দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠাকরণের একমাত্র চাবিকাঠি।

জবাবদিহি কার কার কাছে করতে হবে?

জবাবদিহি কার কাছে, কোথায়-কোথায় করতে হবে এ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। জবাবদিহিতা মানে ঃ

০১. আল্লাহর কাছে জবাবদিহি;
০২. আমাদের শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে জবাবদিহি;
০৩. স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উপরস্ত ব্যক্তির কাছে জবাবদিহি;
০৪. স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অধীনস্থ তথা দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী ও বিশ্বের জনগোষ্ঠীর কাছে জবাবদিহি;
০৫. নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহি;

আমরা যদি জবাবদিহির এ পাঁচটি ক্ষেত্রের কথা চিন্তা করে দুনিয়াতে জীবন ধারণ করি তাহলে আমাদের দ্বারা অসচ্চরিত্রের সহায়ক কোনো কথা, কর্ম সংঘটিত হবে না, কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, কেউ কষ্ট পাবে না, কারোর চোখের পানি ঝরবে না। আজকে আমরা এ জবাবদিহির কথা ভুলে বসে আছি বা এভাবে বুঝতে পারিনি বলে আমরা শুধু সরকারের কাছে বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে জবাবদিহির কথাই বুঝি। যার জন্যে সরকার ও আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে বা পক্ষ নিয়ে দিব্যি যা ইচ্ছা করে যাচ্ছে এক শ্রেণীর নৈতিকতা

www.amarboi.org

বিরোধী বাটপার, চতুর লোক। কে, কাকে, কিভাবে ঠকাবে, পরাজিত করবে বা দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন ও অনুন্নয়নমূলক কর্মের ফলাফলে একে অপরকে দায়ী করার প্রতিযোগিতা দেখে সত্যিই মনে হয়, তারা সকলেই উপরে; আসলে দেশ ও দেশের অবস্থা যাচ্ছে রসাতলে। কিন্তু জবাবদিহি সম্পর্কে আল্লাহর আদেশ বলে ক্ষমা নাই কোন কালেও, কোনো জাহানেও।

জবাবদিহি প্রসঙ্গে আল কুরআনুল কারীমের বক্তব্য

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.

"আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ভয় রাখতে হবে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না।" (সূরা আন নাযিয়াত, ৭৯ ঃ ৪০)

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ج إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً.

"এমন কোনো জিনিসের পিছনে লেগো না, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চিত জেনে রাখ, চোখ, কান ও দিল সবকিছুর জন্যই জবাবদিহি করতে হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৩৬)

مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

"যে শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হয়, তা সংরক্ষণের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত পর্যবেক্ষক নিযুক্ত রয়েছে।" (সূরা কাফ্, ৫০ ঃ ১৮)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ.

"আল্লাহ চোখের চুরিকেও জানেন, আর বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গোপন কথাও জানেন।" (সূরা আল মুমিন, ৪০ ঃ ১৯)

জবাবদিহি সরকার জনগণ সবার জন্যই।

জীবন জবাবদিহির এক ছকে বাঁধা। আর এটি থাকাটাও স্বাভাবিক। জবাবদিহি আসলে পজিটিভ। এটি সকলের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ বয়ে আনে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক দেশে সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধি ও নেতৃত্বদানকারী। জনগণের দেয়া দায়িত্বের ভিত্তিতে জনগণের সম্পদ হিফাযতকারী, জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে গড়ে উঠা রাজস্ব তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবহারকারী, সুষ্ঠু নিরাপত্তাদানকারী। এভাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে কোথায়, কখন, কেন, কিভাবে যেকোন বিষয় ঘটা, না

www.amarboi.org

ঘটার ব্যাপারে সরকারের জবাবদিহি অত্যন্ত স্বচ্ছ থাকা উচিত। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)ও সরকার প্রধান ছিলেন। তিনি সরকারের দায়িত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কে বলেন ঃ

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتُرُ عَبْدَ اللهِ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطُّهَا بِنَصِيْحَةٍ اِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

"যাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রজা সাধারণের উপর শাসক বানিয়েছেন সে যদি তাদের পূর্ণভাবে কল্যাণ কামনা না করে তবে সে জান্নাতের সুবাসও পাবে না।" (বুখারী শরীফ)

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারুক (রা.) বলেন ঃ

لَوْ هَلَكَ حَمَلٌ مِنْ وَلَدِ الضَّانِ ضِيَاعًا بِشَاطِرِ فُرَاتٍ خَشِيْتُ اَنْ يَسْئَلَنِيَ اللهُ تَعَالٰى.

"যদি ফোরাতের তীরে একটি ছাগলের বাচ্চাও হারিয়ে যায় তবে আমার ভয় হয়, হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।"

মোটকথা হচ্ছে, খলীফা (বর্তমানে সরকার) ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে সর্বাবস্থায় ইসলাম ও সমগ্র জাতি সত্তার কল্যাণ চেষ্টায় নিয়োজিত থাকবে।

একাধিক হাদিসের মধ্যে দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاِمَامَ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) যিনি সর্বসাধারণের উপর শাসক হিসেবে নিয়োজিত, তিনিও দায়িত্বশীল, তিনিও তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবেন।" (তিরমিযী শরীফ)

ন্যায়পরায়ণ খলীফা আল্লাহ্ তা'আলার খুবই প্রিয় ব্যক্তি। পক্ষান্তরে যালিম রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর নিকট খুবই ঘৃণিত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ

اِنَّ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَقْرَبُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ عَادِلٌ وَاِنَّ اَبْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَشَدُّهُمْ عَذَابًا وَاَبْعَدُهُمْ مَجْلِسًا اِمَامٌ جَائِرٌ.

www.amarboi.org

"ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা খলিফা বা সরকার কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয় এবং সর্বাধিক নৈকট্য প্রাপ্ত হবেন। আর যালিম রাষ্ট্রপ্রধান কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ও সর্বাধিক শাস্তি প্রাপ্ত হবেন। অধিকন্তু সে আল্লাহর দরবার থেকেও বহু দূরে অবস্থান করবে।" (বুখারী শরীফ)

অন্যদিকে, জনগণের জবাবদিহি তো অবশ্যই। জনগণ যখন ইচ্ছা তখন, যা ইচ্ছা তা করার, রাষ্ট্রীয় সম্পদ দখল বা অবৈধ ভোগ দখল করতে শুরু করবে, নিজেরা নিজেরা মারামারি করবে, রাষ্ট্রের সম্পদ, অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সম্পদ আগুন দিয়ে পুড়বে, ভাঙচুর করবে, যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বসে পড়বে, শুয়ে পড়বে, চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে অন্য মানুষদেরকে চলাচলে বাঁধা দিবে আর সরকার তাদের আচরণ অন্যায় হলে তাদেরকে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন না তা তো হতেই পারে না। সরকার তো এজন্যেই যে সকলের সমস্যার সমাধান দিবে। এ ভূখণ্ডে যখন যা ঘটে তা সরকারকেই জানতে হবে, দেখতে হবে, সমাধান দিতে হবে (বোমা হামলাকারীদের আদালতে দাঁড় করিয়েছে) বিশৃঙ্খলাকারীদের যথাযথ প্রমাণ সাপেক্ষে বিচার করতে হবে সে যেই হোক না কেন? অপরাধীতো অপরাধীই বরং তা না করলে তো হবে আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়ার নামান্তর। আর আইনে আশ্রয়দানকারীও শাস্তি পাবার যোগ্য।

সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার, গণতান্ত্রিক দেশে সরকার ও জনগণ উভয়ই জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এটি প্রত্যেকের অন্তরে বদ্ধমূল রেখে উভয় পক্ষ সকল ধরনের কাজ করলে দেশে শান্তি নিশ্চিত হবে, মানুষ হবে সচ্চরিত্রবান।

জবাবদিহিতার মনোভাব গঠনে প্রস্তাবনা

মানুষকে জবাবদিহির আওতাভুক্তকরণের লক্ষ্যে আজ প্রয়োজন, জবাবদিহি প্রসঙ্গে ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ, সকলকে জীবনের শুরু থেকেই সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে পাঠ্য বইতে এ প্রসঙ্গে চ্যাপ্টার সংযোজন ও বাস্তবভিত্তিক সুন্দর আলোচনা উপস্থাপন, অপরাধী যেই হোক তাকে জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জবাবদিহির পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং সর্বোপরি সচ্চরিত্রবান মানুষ গঠনের জন্য পরিকল্পিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, আর তাহলেই বর্তমান ও আগামীদিনের মানুষেরা হবে সচেতন ও দেশপ্রেমিক। তারা দেশকে ভালবাসবে, গড়তে উদ্যোগী হবে, দেশে যে কোনো ধরনের অপতৎপরতা বা দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ডকে শক্ত হাতে প্রতিহত করবে। আজ এভাবে আদর্শ নাগরিক গঠন করতে পারলেই পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে দূরীভূত হবে দ্বন্দ্ব-কলহ, জেদ ও রাগ প্রবণতা, কথা দিয়ে আহত করা, পিস্তল, বুলেট-বোমা ও কামান দিয়ে নিহত করা এবং সবশেষে সম্পদ লুট-পাট ও দেশ দখলের প্রবণতা। প্রতিষ্ঠিত হবে আল কুরআনেরই সেই শাশ্বত বাণী ঃ

www.amarboi.org

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

"সকল মুসলিম ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় করো। খুবই আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।" (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১০)

সবর বা ধৈর্য

উত্তম চরিত্র বহিঃপ্রকাশের অন্যতম একটি গুণ হলো সবর। এর আভিধানিক অর্থ ধৈর্য, দৃঢ়তা, বিরত থাকা ইত্যাদি।

দৈনন্দিন জীবন ধারণে, চলাফেরার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিপদে-আপদে সুখ-দুঃখ-কষ্ট ও বালা-মুসিবতে অবিচল চিত্তে সবকিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর ন্যস্ত করে মেনে নেয়া এবং ধৈর্যধারণ করাকে সবর বলে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ.

"অতএব তুমি ধৈর্যধারণ করো, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।" (সূরা আল আহ্কাফ, ৪৬ ঃ ৩৫)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো, সদা (যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ২০০)

পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের আলোকে সবরকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি বিশেষ দিক স্পষ্ট হয়ে উঠে ঃ

এক. হারাম তথা স্বীয় আবেগ ও প্রবৃত্তিকে আয়ত্তে রাখা।

দুই. কঠিন অবস্থায় সত্যের উপর দৃঢ় ও অটল থাকা।

তিন. বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করা।

আবেগ ও প্রবৃত্তিকে প্রশমন

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

"আর তুমি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও

www.amarboi.org

সন্ধ্যায় ডাকে তাদের প্রতিপালককে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না।" (সূরা আল কাহ্ফ, ১৮ ঃ ২৮)

সত্যের উপর দৃঢ় ও অটল থাকা

اَسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.

"আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো এবং ধৈর্যধারণ করো, জমিন তো আল্লাহরই, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন।" (সূরা আল আ'রাফ, ০৭ ঃ ১২৮)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ.

"আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো, যাতে করে তোমাদের মধ্যকার মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে চিনে নিতে পারি।" (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩১)

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ج وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ.

"আর তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, তুমি তারই অনুসরণ করো এবং তুমি ধৈর্যধারণ করো যে পর্যন্ত না আল্লাহর বিধান আসে এবং আল্লাহই সর্বোত্তম বিধানকর্তা।" (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০৯)

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন। আমাদের পা অবিচলিত রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান করুন।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২৫০)

বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করা

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ.

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা করবো। আর তোমাদের জান, মাল ও শস্যের ক্ষতিসাধন করেও পরীক্ষা করবো, ধৈর্যশীলদেরকে সুখবর দাও।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৫৫)

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ.

www.amarboi.org

"এবং বিপদে-আপদে ধৈর্যধারণ করবে, এই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।" (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৭)

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلاً.

"এবং লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার করে চলো।" (সূরা আল মুয্যামমিল, ৭৩ ঃ ১০)

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ.

"আর যারা তোমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে (তারাই বুদ্ধিমান)।" (সূরা আর রা'দ, ১৩ ঃ ২২)

اَسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ ج إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ.

"ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো। আল্লাহ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৫৩)

মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ নিত্যসাথী। আর এ সকল অবস্থায় তাকে ধৈর্য বা সবর করতে হয়। ইমাম গাযালী (রহ.) সবর বা ধৈর্যকে আমাদের বুঝার সুবিধার্থে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরো পাঁচটি বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি পূর্বোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও আরো তিনটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

এক. আল্লাহর নির্দেশ পালনে সবর;

দুই. আনন্দ ও খুশীর সময় সবর;

তিন. যুলুম ও অত্যাচারের সময় সবর।

আল্লাহর নির্দেশ পালনে সবর

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে দ্বীনী জীবন-যাপন থেকে মানুষ দূরে সরে যাওয়ার কারণে দ্বীন মেনে চলাই যেন হয়ে গেছে অনেক দুরূহ। তাই অনেকের মুখে শুনা যায় বাসায় গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের সংযোগ আনার জন্য অফিসে আবেদন করা হয়েছে। অফিসের অসৎ কর্মচারীরা আজ সংযোগ দিব, কাল দিব বলে কালক্ষেপণ করছে। এক্ষেত্রে ঘুষ দিলে তাড়াতাড়ি অর্থাৎ একদিনের মধ্যে সংযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু ঘুষ দেয়াতো আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে হারাম। এমন ক্ষেত্রে কেউ যদি মনে করে আমি ধৈর্যধারণ করে, বারবার অফিসে তাদের মুখোমুখি হব কিন্তু তবুও আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করে ঘুষ দিব না, তাহলে কিছুদিন বিলম্বে হলেও সংযোগ পাওয়াতো কাগজ পত্র ঠিক থাকলে একদিন না একদিন অবশ্যই সম্ভব। সুতরাং এমনভাবে আল্লাহর নির্দেশ পালনে আমরা সবাই যদি তৎপর হই, ধৈর্যধারণ করি, তাহলে সমাজ

www.amarboi.org

থেকে এক সময় না এক সময় আল্লাহর নির্দেশ লংঘন দূরীভূত হবে। আদর্শ ও কল্যাণকামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ.

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "এমন সব জিনিস জাহান্নামকে পরিবেষ্টন করে আছে, যা মানুষের অপছন্দনীয়-কষ্টকর। আর জান্নাতকে ঘিরে আছে এমন সব জিনিস যা আকর্ষণীয়।" (মিশকাত শরীফ)

আনন্দ ও খুশীর সময় সবর

আনন্দ ও খুশীর সময় সবর করা বুদ্ধিমানের বা জ্ঞানীদের কাজ। অনেকেই আনন্দে গাঁ ভাসিয়ে দেয় ঠিক তার পরেই যে রয়েছে নিরানন্দ তা ভুলে যায়– যা দুঃখজনক! আবার অনেকে অধিক আনন্দে মশগুল থেকে আল্লাহর কথা ভুলে যায় অথচ আনন্দ যিনি দিলেন বা সফলতা যিনি দিলেন তার কাছে মাথা নত করে না, নামায আদায় করে না– এটি কি বুদ্ধিমানের বা জ্ঞানীর কাজ হতে পারে?

এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেছেন ঃ

عَنْ اَبِىْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ اَصَابَتْهُ ضَارَّءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

সুহাইব ইবনে সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মুমিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্যের ব্যাপার এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কোনো কিছু হলে সে আল্লাহর শোকর করে। তাতে তার মঙ্গল হয়। আবার ক্ষতিকর কোনো কিছু হলে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।" (মুসলিম শরীফ)

যুলুম ও অত্যাচারের সময় সবর

এ সকল ক্ষেত্রে সবর করা বড়ই কষ্টকর। কেননা, এতে অত্যাচারীর অত্যাচারের মাত্রা আরো তীব্রতর হতে থাকে। তাছাড়া দুর্বল গোষ্ঠীর উপর সবলের অত্যাচার সত্যিই দুঃখজনক। সহ্য করা আসলেই বড় ঈমানের পরীক্ষা

www.amarboi.org

দেয়া। কিন্তু তারপরও যারা সহ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করার ঘোষণা পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন ঃ

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ.

"যে ব্যক্তিই ধৈর্যধারণ করে এবং মাফ করে দেয় সেটা দৃঢ় মনোভাবেরই অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আশ শূরা, ৪২ ঃ ৪৩)

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِىْ نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ.

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছি, তিনি নবীগণের মধ্যকার এক নবীর কাহিনী বলছিলেন যে, তার জাতি তাঁকে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল আর তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন এবং বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা জানে না।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

প্রতিশোধোন্মুখ উত্তেজনায় সবর বা ধৈর্য

অত্যাচারীর অত্যাচার যখন চূড়ান্ত সীমায় উত্তীর্ণ তখন প্রতিশোধ আসন্ন। আর এ প্রতিশোধ হয় মারাত্মক কষ্টের কিন্তু এক্ষেত্রে যদি কেউ আল্লাহর দরবারে তার বিচারের ভার ন্যস্ত করে নিজের ক্ষমতা দিয়ে প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমার বাণী উচ্চারণ করে সবর বা ধৈর্যধারণ করে তাহলে তা সত্যিই হবে পুরস্কারের যোগ্য।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلٰى عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ هِىْ يَابْنَ الْخَطَّابَ فَوَاللّٰهِ مَاتُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلَاتَحْكُمْ فِيْنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتّٰى هَمَّ اَنْ يُّوْقِعَ بِهٖ فَقَالَ الْحُرُّ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّهٖ خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَاجَاوَزَهَا عُمَرُحِيْنَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ.

www.amarboi.org

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উয়াইনা ইবনে হিসন উমার ইবনে খাত্তাবের নিকট এসে বললো ঃ "হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহর শপথ, তুমি আমাদের অধিক মাল-সামান দান করোনা এবং ইনসাফের সাথে আমাদের মধ্যে ফায়সালাও করোনা। শুনে উমার ভীষণ রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাকে মারধর করতে উদ্যত হলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে হোর (হিসন এর ভাতিজা) বলে উঠলো ঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্ তা'আলা তার নবীকে বলেছেন ঃ ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, মারূফের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না" (বর্ণনাকারী বলেন) কসম আল্লাহর! এ আয়াত শুনে উমার আর বিন্দুমাত্র অগ্রসর হননি। আর তিনি এমন ব্যক্তি ছিলেন যে আল্লাহর কিতাবের হুকুম শুনা মাত্র থমকে দাঁড়াতেন। (বুখারী শরীফ)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّنْفِذَهُ دَاعَاهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنُ الْحُوْرِ الْعِيْنِ مَاشَاءَ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

"মুআয ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ কার্যকর করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা দমিয়ে রাখে, তাকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সব মানুষের উপর মর্যাদা দিয়ে ডাকবেন, এমনকি তাকে তার ইচ্ছামত বড় বড় চোখবিশিষ্ট হূরদের মধ্য থেকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিবেন।"

সবরের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব

সবর বা ধৈর্য এমন একটি মানবিক গুণ, যার অনুশীলন ব্যতীত ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সাফল্য আশা করা যায় না। যদিও ধৈর্যধারণ করা খুবই কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ, তথাপি ইহা এমন এক মহৎ গুণ, যা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা ও কল্যাণকর জীবনযাপনের জন্য সবরের গুরুত্ব অপরিসীম।

আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনুল কারীমে ধৈর্যশীলদের অফুরন্ত প্রতিদান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّ الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

www.amarboi.org

"বস্তুত ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার পুরোপুরিভাবেই দেয়া হবে।" (সূরা আয যুমার, ৩৯ : ১০)

ইসলামের যে পাঁচটি মূল স্তম্ভ আছে, সেগুলো পালনের জন্য সবরের প্রয়োজন। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য, সিয়াম পালনের জন্য, যাকাত প্রদান ও হজ্জ্ব পালন করতে হলে সবরের প্রয়োজন। শরীয়াতের অন্যান্য হুকুম আহ্‌কাম পালনের জন্যও ধৈর্যের প্রয়োজন। বস্তুত ধর্মহীন জীবন যাপন যেমন স্ফূর্তিদায়ক, ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন তেমনি কষ্টকর। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) সবরকে ঈমানের পরিচায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। সবরের গুরুত্ব প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন :

اَلصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ.

"ধৈর্যের বিনিময় হলো জান্নাত।"

পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনে সত্তরেরও অধিক জায়গায় সবর ও ধৈর্যের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"যারা ধৈর্যধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যা করে তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।" (সূরা আন নাহ্‌ল, ১৬ : ৯৬)

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. خَالِدِيْنَ
فِيْهَا ج حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا.

"তাদের (আল্লাহর প্রিয়ভাজনদের) প্রতিদানস্বরূপ দেয়া হবে জান্নাত, যেহেতু তারা ছিলো ধৈর্যশীল। তাদেরকে সেথায় অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেথায় তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট।" (সূরা আল ফুরকান, ২৫ : ৭৫-৭৬)

ব্যক্তিগত জীবনেও সবরের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা উপার্জন করে। এ ক্ষেত্রে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা একজন মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। কিন্তু এ দায়িত্ব সহজভাবে পালন করা সম্ভব হয় না; যদি না লোভ ও হুমকির মুখে ধৈর্য ও সাহসিকতার মাধ্যমে ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ.

www.amarboi.org

"আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৪৬)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

"নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথী।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৫৩)

وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّنْ كُلِّ بَابٍ. سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ج فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

"এবং ফিরিশ্তাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দ্বার দিয়ে। বলবে, তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি, কত ভাল এই পরিণাম।" (সূরা আর রা'দ, ১৩ ঃ ২৩-২৪)

পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনে মহান আল্লাহ্ মুমিনদের কতক গুণাবলি বিবৃত করেছেন। তারপর তাদের পুরস্কার ও প্রতিদানের বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথা বলা হয়নি যে ঐসব গুণের এই প্রতিদান; বরং বলা হয়েছে এ তাদের ধৈর্যের প্রতিদান। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ধৈর্য শুধু চারিত্রিক সৌন্দর্য নয় বরং অন্যান্য সৌন্দর্য ও গুণাবলির ভিত্তি।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَلصَّبْرُ ضِيَاءٌ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "সবর বা ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতি।" (মুসলিম শরীফ)

مَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِيَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করতে চায় আল্লাহ্ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোনো কিছু কাউকে দেয়া হয়নি।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

বিপদের প্রথম অবস্থায়ই ধৈর্য ধারণ করতে হয়। নবীজী (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى.

"সবর তো প্রথম আঘাতের সময়ই হয়ে থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

হাদিসে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ اَنْ اَمْرَهُ كُلُّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ

www.amarboi.org

اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شُكْرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ.

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "মুমিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক? তাঁর সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্যের ব্যাপারে এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কোনো কিছু হলে সে আল্লাহর শোকর করে। তাতে তার মঙ্গল হয়। আবার ক্ষতিকর কোনো কিছু হলে সে ধৈর্যধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।" (মুসলিম শরীফ)

এভাবে সমাজ, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক জীবনেও সবরের প্রয়োজন অনেক বেশি। বর্তমান পারমাণবিক যুগে পরাশক্তিসমূহের যে কোনো একজন শাসকের অধৈর্য অঙ্গুলির টিপেই বিশ্বময় পারমাণবিক অস্ত্রের বিধ্বংসী খেলা শুরু হয়ে যেতে পারে, যার ফলে মানব সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধৈর্যের চর্চা এবং ধৈর্যের উপর অটল থাকার প্রয়োজনীয়তা অতীতের যে কোনো সময়ের চাইতে বর্তমানে অনেক বেশি।

সদাচারী হওয়া। সুন্দরভাবে কথা বলা।

اَلرَّحْمٰنُ - عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

"পরম করুণাময় আল্লাহ্। তিনি শিখিয়েছেন আল কুরআনুল কারীম, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই (মনের ভাব প্রকাশ করার) কথা বলতে শিখিয়েছেন।" (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ০১-০৪)

কথা বলার মাধ্যমেই মানুষ নিজেদেরকে একে অপরের কাছে প্রকাশ করে। কথায় মানুষ একজনের প্রিয়-অপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে। মানুষ মরে যায় কিন্তু তার কথা থেকে যায়। এ কথার জন্যেই মানুষ মানুষকে মনে রাখে, শ্রদ্ধা করে, আবার ঘৃণাও করে। আর তাই কথা বলার ক্ষেত্রে প্রত্যেককে হতে হবে অত্যন্ত সচেতন।

কোন্ ধরনের কথা বলা উত্তম

মানুষ প্রতিনিয়ত চার ধরনের কথা বলে থাকে। তা হলো ঃ

এক. কিছু কথা আছে যা সর্বতোভাবে ক্ষতিকর;

দুই. কিছু কথা উপকার ও অপকার উভয় গুণ সম্বলিত;

তিন. কিছু কথা একদম অনাবশ্যক (অমুক এ রকম, অমুক সেই রকম, অমুক দেখতে সুন্দর, অমুকের জামাই কাল, অমুক ফর্সা, হাসি সুন্দর ইত্যাদি)।

www.amarboi.org

চার. কিছু কথা যা কেবল উপকারজনক, ভাল ও আদর্শসূচক।

এ চার শ্রেণীর কথার মধ্যে প্রথম তিন শ্রেণীর কথা বলতে সকলের সংযত হওয়া উচিত। কেবলমাত্র শেষোক্ত প্রকারের কথা বলা উত্তম। এ শেষোক্ত কথা বলা সম্পর্কে আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন ঃ "যে চুপ করেছে সে পরিত্রাণ পেয়েছে।" তাছাড়া মানুষ যখন যা বলে সবকিছুই লিখে রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।" (সূরা কাহাফ, ৫০ ঃ ১৮)

আর এ জন্য রাসূল (সা.) বলেন ঃ

مِنْ حُسْنِ اِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكَةُ مَالاَ يَعْنِيْهِ.

"যা কিছু অনাবশ্যক, তা পরিত্যাগ করা ইসলামী সৌন্দর্যের অন্তর্গত।"

সুন্দর কথা বলার ধরন বা রীতি

সুন্দর কথা; অসুন্দর কথা। ভাল কথা; মন্দ কথা। দু'টিরই পৃথিবীতে সহাবস্থান। একটি পজিটিভ অন্যটি নেগেটিভ। একটি অর্জনে অনেক কিছুর প্রয়োজন হয় অন্যটিতে তেমন কিছু লাগে না। একটি সত্য অন্যটি মিথ্যার সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই সুন্দর কথা বলতে পারা মানে সদাচারী হওয়া– এ যে সচ্চরিত্রবান আদর্শ মানুষের পরিচয়। সুন্দর কথা বলতে পারা এ যে একটি কৌশল আর দীর্ঘ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। সুন্দর কথা দিয়ে যেকোন অসাধ্যকে জয় করা যায় তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন ইসলাম বিরোধী বা সীমালঙ্ঘনের পর্যায়ে না যায়, তাহলে তার ফলাফল আবার খারাপ হতে বাধ্য। সুন্দরভাবে কথা বলে ছোট থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের মনের মনিকোঠায় স্থান লাভ করা যায়। এ ক্ষেত্রে কথা বলার ধরন বা রীতি সুন্দর শব্দ চয়ন ও ভাষার অলঙ্কার শ্রেণীভেদে প্রয়োগ করতে হবে। এ শব্দ চয়নের মধ্যে নিহিত রয়েছে ভাষার মাধুর্যতা, কার্যকারিতা ও পজিটিভ ফলাফল। সেগুলো হলো ঃ

এক. আপনি,

দুই. তুমি ও

তিন. তুই।

বড়দের সাথে কথা বলতে যেয়ে ইসলামী রীতি অনুযায়ী আদবের প্রতি

www.amarboi.org

খেয়াল রেখে, শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ "আপনি" সংযোজন করে কথা বলা উত্তম। উদাহরণস্বরূপ ঃ মা আমারে এইটা দাওতো। মা তুমি ভাত খেয়েছ? মা আমার জন্য তুমি বই কিনে আনলা না যে? এ বাক্যগুলো আজকের সমাজে বিভিন্ন পরিবারের মায়ের সাথে সন্তানের কথোপকথনের খণ্ড চিত্র। পাশাপাশি এ বাক্যগুলো যদি এভাবে ব্যক্ত করা হয়, মা আমাকে এইটা দেবেন? মা আপনি ভাত খেয়েছেন ? মা আপনার সাথে ভাত খাব। মা আমার জন্য বই কিনে আনেননি? এভাবে "আপনি" সংযোজন করে ব্যক্ত করাতে ভাষার মাধুর্যতা আগের বাক্যগুলোর চেয়ে বেশি সংরক্ষিত হয়েছে বা বলা যায় আগের বাক্যগুলোতে বিনয়ের অভাব, ভদ্রতা-নম্রতার অভাব, শ্রদ্ধা প্রদর্শন অনুপস্থিত রয়েছে অথবা তা কি অনুপস্থিত পাঠকের বিবেকের কাছে ছেড়ে দিলাম। তবে একটি বিষয়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেশির ভাগ জনগোষ্ঠী বোধ হয় "আপনি" সংযোজন করে বড়দের সাথে কথা বলাকে সমর্থন করবেন। কারণ সুন্দর করে কথা বলা কে না পছন্দ করে? আর এটি বুঝতে শিক্ষিত হতে হয় না। কাজেই বলব কে দরিদ্র, কে কোন্ পেশার সাথে সম্পৃক্ত ইত্যাদি বিচার্য বিষয় নয় বরং বড় হিসেবে শ্রদ্ধার সাথে কথা বলাই হচ্ছে সচ্চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে ড্রাইভার, বাবার অফিসের অধীনস্থ, বাসার কাজের বুয়া, ভিক্ষুক তাদের সাথে তুই-তুমি করে কথা বলা হয়; কিন্তু না! যদি বয়সে বড় হয় তাহলে তাদের সাথেও সুন্দর করে "আপনি" সম্বোধন করে কথা বলা সচ্চরিত্রবান হওয়ার শিক্ষা।

আজকাল কোথাও কোথাও সন্তানেরা মা-বাবার সাথে তুমি শব্দটি প্রয়োগ করে কথা বলে থাকে। আর এভাবে তুমি বলার চর্চাটা মূলতঃ মা-বাবার অধিক আদর থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। ফলে তারা এভাবে কথা বলাকে আদরের খেলাফ বা বেয়াদবী কিনা তা একদম বুঝতে পারে না। কাজেই আমাদের মা-বাবাদের উচিত বড়দের, মা-বাবার সাথে কথা বলতে গিয়ে "তুমি" বলার এ রীতি পরিবার থেকে দূর করে দেয়া। এটা দারুণ দৃষ্টিকটূ। মুসলিম সংস্কৃতির পরিপন্থী। যে কেউ শুনলে প্রথমত আশ্চর্যান্বিত হয় তারপর বুঝে নেয়-এটা হচ্ছে অধিক আদরের সন্তানদের প্রতি অত্যাধুনিকতার ছোঁয়া। মর্ডান পরিবারের নামে বিজাতীয় সংস্কৃতির চর্চা আর ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অশোভনীয় আচরণ।

"তুমি"– এ শব্দটি সমবয়সী, সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধবদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে মা-বাবার মধ্যেও আজকাল তুমি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য কোথাও কোথাও আপনি বলার প্রচলনও রয়েছে। এতে দ্বন্দ্ব-কলহ কম হয়, শ্রদ্ধাবোধ বেশি সৃষ্টি হয় বলে অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদদের অভিমত।

"তুই"– এ শব্দটি অনেক ক্ষেত্রে সম বয়সীদের ক্ষেত্রে আর ছোটদের ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন করা, কোনো উপদেশ, আদেশ নিষেধ বাক্য প্রয়োগে ব্যবহার হয়ে

www.amarboi.org

থাকে; কিন্তু আমি বলি এ শব্দটি হচ্ছে কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অর্থে ব্যবহার করা। উদাহরণস্বরূপ ঃ ছোটদেরকেও যদি তুই শব্দ ব্যবহার করে কথা বলেন তখন দেখবেন তাদের মুখমণ্ডলে একটা কালো ছাপ পড়ে গেছে। তারা ঠিকভাবে প্রতি উত্তর দিতে চায় না। কারণ তারাও ন্যূনতম তাদের সম্মানটুকু বুঝে। তারা মনে করে ছোট বলে তাদের অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। পরবর্তীতে তারাও আপনাকে অবমূল্যায়ন করে জবাব দিতে চেষ্টা করবে। এভাবে ভাষার মাধুর্যতা ও অলংকারবিহীন ব্যবহারের ফলে কথার আক্রমণের দিকে আজকের সন্তানরা ধাবিত হচ্ছে খুব বেশি, অথচ এমনটি না করে যদি ছোটদেরকে তুমি করে কথা বলা হয় তাহলে তারা অত্যন্ত খুশী হয় এবং সুন্দর করে জবাব দেয়। ফলাফলও হয় পজিটিভ। এটি আজকাল অশিক্ষিতদের মুখে বেশি শুনা যায়, তবে তা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের বর্জন করা উত্তম বলে আমি মনে করি। কারণ এতে একে অপরের প্রতি মূল্যায়ন ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, আর এভাবে সুন্দর করে কথা বলা আমাদের স্রষ্টারও আদেশ।

সদাচারী ও সুন্দরভাবে কথা বলা প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে আদেশ প্রদান করে আল কুরআনে বলেন ঃ

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا.

"মানুষের সাথে ভাল কথা বলো; সুন্দর করে কথা বলো।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ৮৩)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন ঃ

وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا.

"স্পষ্ট, সোজাসুজি ও সম্মানজনক কথা বলো।" (সূরা আল আহযাব, ৩৩ ঃ ৩২)

এ সুন্দর কথা বলতে পারার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো আদর্শ পরিবেশ, আদর্শ শিক্ষা– যা শতভাগ পরিপূর্ণ করে তুলতে পারেন আমাদের অত্যন্ত আপনজন গর্ভধারিণী 'মা'। তারপর 'বাবা', তারপর পরিবার নামক সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম যে কথা শিখে তাই হচ্ছে মায়ের শেখানো বুলি, তারপর শৈশব, বাল্যকাল একদমই মায়ের আঁচলের কাছে থেকে শিখা। তারপরেও তো আছেই। তবে তারপরে ব্যবহার বেশি। সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত সহজ। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের কতিপয় পরিবারের মায়েরাই আজ পিতার বাড়ির দাম্ভিকতায়, অর্থের প্রাচুর্যতায়, অনাদর্শিক শিক্ষার ছত্র-ছায়ায়, অহংকারবোধ আর আমিত্বের বড়াইয়ের বলয়ে দু'দিনের এ দুনিয়ায়

www.amarboi.org

সম্পদ আর প্রতিপত্তির লোভে নিজেরাই যেন সুন্দর সুন্দর কথা বলা ভুলতে বসেছে। অথচ দুনিয়াতে সম্মানের সাথে জীবন ধারণ আর আখিরাতে শান্তি প্রাপ্তির জন্য সুন্দর কথা বলার বিকল্প নেই।

তাই আজ প্রয়োজন মায়েদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে তাকিয়ে আদর্শিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ (আপনার জীবন হয়তোবা সংকীর্ণতার মধ্যে অতিবাহিত করতে পেরেছেন কিন্তু সন্তানদের জীবনতো মাত্র শুরু) আল্লাহ তা'আলার কাছে বেশি বেশি করে সাহায্য চাওয়া এবং সন্তানদের মাঝে আদর্শিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা।

সুন্দর কথা বলতে পারার জন্য যা প্রয়োজন

আদর্শিক জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, বিবেচনা, আদব-কায়দা, মন-মানসিকতা, মনন, মনীষা, মহত্ত্ব, মনোযোগ, মহব্বত, মমত্ব, অনুভূতি, ঔদার্য, আশা, অভিলাষ, অভিপ্রায়, অভিরুচি, অমায়িকতা, অন্তরঙ্গতা, প্রসন্নতা, প্রাণাবেগ, প্রাণবন্তুতা, সৌজন্য, সুরুচি, সুধারণা, সুবাসনা, শিষ্টতা, শালীনতা, সদিচ্ছা, সংযম, সহানুভূতি, শ্রদ্ধাবোধ, সহজতা, সজীবতা, সরলতা, সচেতনতা, সমঝোতা, সহমর্মিতা, সত্যবাদিতা, সংবেদশীলতা, সহৃদয়তা, হৃদ্যতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, সততা, স্বকীয়তা, সক্রিয়তা, উদারতা, বন্ধু সুলভতা, কৃতজ্ঞতা, সভ্যতা, ভদ্রতা, নম্রতা, শ্লীলতাবোধ, দয়া, মায়া, মানবিকতা, বদান্যতা, মহানুভবতা, সহনশীলতা, স্নেহপরায়ণতা, শ্রদ্ধাশীলতা ও কল্যাণকামিতা ইত্যাদি। যার প্রভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে সুন্দর সুন্দর কথা, যার সুফল সুবাতাস উপভোগ করবে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের লোকজন। ফেলবে স্বস্তির নিঃশ্বাস। শুকরিয়ায় মাথা নত করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি, গড়ে উঠবে সুখী কল্যাণকামী ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র।

অসুন্দর কথা মানে অশান্তি সৃষ্টি

অসুন্দর কথা মানে সর্বত্র অশান্তি সৃষ্টি হওয়া। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এর ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে পারে না। ফলে অস্থির হয়ে উঠতে পারে জনগোষ্ঠী, ভূ-লুণ্ঠিত হতে পারে দুনিয়ার শান্তি। কিন্তু কিভাবে –

- অসুন্দর কথায় মানুষ অসন্তুষ্ট হয়।
- পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।
- সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়।
- প্রতিবেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, বিপদে এগিয়ে আসতে চায় না
- আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়।
- একে অপরের সাথে অন্তরঙ্গতা নষ্ট হয়। বন্ধুত্ব বিনষ্ট হয়।
- পরিবারের ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়, সন্তান অমানুষ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

www.amarboi.org

■ রাগারাগি, মারামারি ও হানাহানির সৃষ্টি হয়।

■ মান-ইজ্জত, সম্মান, পজিশান বিনষ্ট হয়।

■ সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহ, ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়।

■ ঐক্য ও একতা বিনষ্ট হয়।

■ পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহবোধ বিলীন হয়ে যায়।

■ এমন ব্যক্তিরা মৃত্যুবরণ করলেও প্রতিবেশীরা লাশ দাফন করতে যেতে চায় না।

■ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি দানা বেঁধে উঠে।

■ সর্বোপরি দুনিয়ায় অশান্তি এবং আখিরাতে জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া অবধারিত হয়ে যেতে পারে।

এমন অনিষ্টতা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে আমাদের সমাজে বিস্তার ঘটানো উচিত সুন্দর করে কথা বলা, আমাদের হওয়া উচিত সদালাপী।

কিভাবে সুন্দর কথা বলা যায়?

সুন্দর বা অন্যের পছন্দনীয় কথা কিভাবে বলা যায় তা আমাদের জানা প্রয়োজন। কারণ সুন্দর কথাই হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম মাধ্যম। কাজেই এ বিষয়ে আমাদের অভ্যাস গঠন করা অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং দৃষ্টিপাত ঃ

■ বাঁকা চোখে তাকিয়ে, ভ্রু কুঞ্চিত করে, বাঁকা-বাঁকা, পেচানো, কথায় কথায় বাশ মারামারি না করে সোজা করে বলতে চেষ্টা করা।

■ ভাষার ও কথার জটিলতা বা কৃত্রিমতা পরিহার করে সহজ, সকলের বোধগম্য করে কথা বলা।

■ সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন করে কথা বলতে চেষ্টা করা। অসুন্দর, অসামাজিক, আশ্রাব্য মন্দ ভাষাগুলোকে কথোপকথনে ব্যবহার না করা।

■ যেকোন কথা প্রকাশ্যে মুখ কালো করে না বলে স্বাভাবিকভাবে বা হেসে হেসে বলা। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলা একটি দান।"

■ কোমল ভাষায় কথা বলা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ.

"এটা আল্লাহরই দয়া যে, তুমি তোমার সাথীদের প্রতি কোমল। তা না হয়ে তুমি যদি কঠোর হতে তাহলে, তারা তোমার চারদিক থেকে দূরে সরে যেতো।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৫৯)

■ সুন্দর শ্রুতিমধুর শব্দ ব্যবহার করা।

www.amarboi.org

- স্পষ্ট ও উপস্থিত শ্রোতার বা যার উদ্দেশে কথা তার বোধগম্য করে বলা।
- ঘ্যান-ঘ্যান, প্যান-প্যান ও অস্পষ্ট করে কথা না বলা।
- আঞ্চলিকতা, সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণতা পরিহার করে বইয়ের ভাষায় বিশুদ্ধ কথা বলা,
- শ্রোতার বা উপস্থিত সভ্যদের কল্যাণকামী, হিতকর কথা বলা।
- বাসায়, সামাজিক পরিমণ্ডলে এবং অফিস কর্মস্থলে একইভাবে সবসময় কথা বলার চেষ্টা করা।
- সদালাপী ও মিষ্টভাষী হওয়া।
- অর্থবহ কথা বলা, অর্থহীন বাজে কথা না বলা।
- তর্ক-বিতর্ক না করা, তর্কে কোন সমাধান হয় না।
- শুধু যুক্তি দেখিয়ে কথা না বলা, সব বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করা যায় না। কাজেই অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে জ্ঞানগর্ভ কথা বলা– যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে।
- একজনের পেছনে বা অনুপস্থিতিতে আরেকজনের কাছে তার প্রসঙ্গে মন্দ কথা না বলা। এটি গীবতের সাথে সম্পৃক্ত। আর যারা গীবত করে তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি অবধারিত। তাছাড়া নিজের মান, মর্যাদা, সম্মান, পজিশানই হয়ে উঠে প্রশ্নাতীত।
- কথা বলার ক্ষেত্রে এমন মনে করা আল্লাহর দেয়া যবানকে আল্লাহর নির্দেশমত ব্যবহার করছি। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকা।
- কটু কর্কশ, রুক্ষ, আঘাত বা হিট করামূলক, অপমানসূচক কথা না বলা।
- অপ্রাসঙ্গিক, বেশি কথা, অনর্গল কথা না বলা।
- শ্রোতাকে কখনো উপহাস, বিদ্রূপ, ঠাট্টা ও তিরস্কার করে কথা না বলা।
- মিথ্যা কথা না বলা কারণ মিথ্যা সকল পাপ কাজের জননী।
- কারোর নামে অপবাদ না দেয়া, কারণ এমন অপবাদ একসময় আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে তা মনে রাখা।
- শপথ না করা কারণ সময়ের ব্যবধানে বিপদ কেটে গেলে বা উদ্ধার হয়ে গেলে বা সুসময়ে সে শপথের কথা অনেকেরই মনে থাকে না। যদিও এটি মানার ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কঠোর।
- কথায় কথায় চেঁচামেচি করা, জোরে কথা বলা, মেজাজ গরম করে কথা না বলা।
- অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে না বেড়ানো।
- মেয়েরা মেয়েদের মতো, মহিলারা মহিলাদের মতো, ছেলেরা ছেলেদের মতো, পুরুষেরা পুরুষের মতো কথা বলা।
- স্থান-কাল পাত্রভেদে কথা বলা।

www.amarboi.org

- ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা, অশ্লীল, গালি বা বকা দিয়ে কথা না বলা।
- কখনো কখনো আনন্দদায়ক, বৈধ রসিকতা করে কথা বলা।
- কারোর কথা বলতে যেয়ে নেতিবাচক বিশ্লেষণ গাধা, গর্দভ, বোকা, পাগল-ছাগল, গরু-ছাগল, বলদ ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে কথা না বলা।
- লোকজনের ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয়া, প্রশংসা করা। বিরোধিতার কারণে বিরোধিতা না করা।
- যে আপনার উপকার করেছে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ হয় না।" (আবু দাউদ শরীফ)
- সুন্দর ভাষায় সহজ করে উপদেশ বা পরামর্শ দিন, আপনার ব্যাপারে শ্রোতার কোনো কথা, কোনো পরামর্শ আছে কিনা জানতে চাওয়া এবং পরামর্শ দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো।
- ভাষা আল্লাহর মহিমাঃ সুতরাং সব সময় তার পবিত্রতা রক্ষা করা।
- শ্রোতার জন্যে দু'আ করা, আপনার শুভ কামনার কথা তাকে বলা।
- ভুল করে ফেললে বা ভুল হয়ে গেলে আমি দুঃখিত কথাটি প্রথমেই বলার চেষ্টা করা।

সর্বোপরি এমন কথা না বলা যাতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কষ্ট পায়- এ নীতিতে প্রতিদিন প্রত্যেক বিষয়ে সচেতনতার সাথে স্রষ্টা ও মানুষের পছন্দনীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও মন-মেজাজে কথা বলার চর্চা এবং বাস্তবায়ন করা সচ্চরিত্রের উত্তম বহিঃপ্রকাশ। যা সকল মানুষ একে অপরের কাছে প্রত্যাশা করে এবং পাওয়ার অধিকারও রাখে।

তিন দিনের অধিক কথা-বার্তা বন্ধ রাখা নিষেধ

জীবনের গতিময়তায় একে অপরের সাথে চলাফেরা ও সুসম্পর্ক রক্ষায় কথা-বার্তা আচার-আচরণ ব্যবহার পদ্ধতি একটি সেতুর ন্যায়। পরিবার ও সমাজ সামাজিকতার অঙ্গনে একজনকে অন্যজনের সাথে কথা বলতেই হয়। এক্ষেত্রে চিন্তা-চেতনার ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞান আমাদের মধ্যে না থাকার কারণে বা দ্বীন মানা থেকে দূরে থাকার কারণে মানুষ এমন কিছু করে বসে যা আল কুরআনুল কারীম ও হাদিস সমর্থন করে না। অকস্মাৎ আভিজাত্য, উঁচু বংশ, নীচু বংশ ও সম্পদের প্রাচুর্যতায় নিজের কথাকে সবার উপরে স্থান দিতে চাওয়ার অযৌক্তিক লড়াইয়ে একে অপরের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়া ইসলাম ধর্ম কখনো সমর্থন করে না। বরং পবিত্র কুরআন ও হাদিসে ঘোষণা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

www.amarboi.org

وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"পুণ্য ও আল্লাহভীতিমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো, গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। কেননা তাঁর দণ্ড অত্যন্ত কঠিন।" (সূরা আল মায়িদা, ০৫ ঃ ০২)

وَعَنْ اَنَس رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقَاطَعُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَاتَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ اِخْوَانًا وَلَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করো না, পরস্পরের পিছনে লেগো না, হিংসা বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে থাকো। কোনো মুসলিমের জন্য তার মুসলিম ভাইকে তিন দিনের বেশি ত্যাগ করা হালাল নয়।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هُجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "কোনো মুসলিমের জন্য তার কোনো ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা হালাল নয়। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে মারা গেল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (আবু দাউদ শরীফ)

عَنْ اَبِىْ خِرَاشٍ حَدْرَدِ بْنِ اَبِىْ حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِىِ وَيُقَالُ السُّلَمِىُّ الصَّحَابِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ هَجَرَ اَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ.

আবু খিরাশ হাদরাদ ইবনে আবু হাদরাদ আল আসলামী বা আস সুলামী আস সাহাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে এক বছর যাবৎ সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকলো সে যেন তাকে হত্যা করলো।" (আবু দাউদ শরীফ)

www.amarboi.org

তাছাড়া কথা বলা বন্ধ করে কী লাভ হবে? কতদিন থাকা যাবে। জীবনে চলার বাঁকে বাঁকে কোনো ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটার ফলে কথাতো বলতে হতেই পারে। অন্যদিকে আপনদের সাথে কথা না বলে কী থাকা যায়? আপন কি কখনো পর হয়? আপন আপনই থাকে চিরদিন। আপন লোকজনদের সাথে দীর্ঘদিন রাগ করে না থেকে কুরআন ও হাদিসের বিধান মেনে চলা উচিত সকলের আর তাহলেই পরিবার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

অন্যদিকে কথা বন্ধ করে দেয়া ইসলামী বিধি-বিধান সমর্থন করে বা জায়িয সে ক্ষেত্রগুলো হলো ঃ বিদআত ও গুনাহের কাজ প্রকাশ পেলে বা যদি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় কেউ কুরআন ও হাদিসের বিপক্ষ অবস্থানে তথা সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, অপরের হক হরণনীতি, গীবত, চোগলখোরী, অহেতুক হারাম সম্পদের প্রাচুর্যতায় অন্যকে ভুলে যায়, কথা বলতে চায় না তাহলে এক্ষেত্রে সে পাপী। সে মুমিন নয়। এমন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ইসলামে জায়িয।

ইমাম আবু দাউদ উত্তম সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যদি এই সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে তবে কোনো দোষ হবে না।

কম হাসুন! একটু ভাবুন!!

জীবনতো একটাই। খাও দাও ফুর্তি কর যা ইচ্ছা তাই করো– পাশ্চাত্যের শিখানো আর আমাদের মাঝে বহুল প্রচলিত এ বাক্যের সমার্থে যখন মানুষ নিমজ্জিত ছিলো তখনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যিনি আমাদের স্রষ্টা, প্রতিপালক যে পৃথিবীর পৃষ্ঠে মানুষ ফুর্তি করছে, যে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রা, আসমানী কিতাব আল কুরআনুল কারীমের মাধ্যমে বাণী ঘোষণা করলেন ঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ.

"আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে কোনো কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।" (সূরা আদ দুখান, ৪৪ ঃ ৩৮)

অন্যত্র মহান স্রষ্টা ও আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ. مَا اُرِيْدُ مِنْهُم مِّنْ رِّزْقٍ وَمَا اُرِيْدُ اَن يُطْعِمُوْنِ.

"আমি মানুষ ও জিন জাতিকে শুধু আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের নিকট কোনো রিযিক চাই না এবং কোনো কিছু খেতেও চাই না।" (সূরা আয যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫৬-৫৭)

এ ঘোষণা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ ও জিনকে শুধু

www.amarboi.org

আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ ইবাদত তথা ভাল কাজের সফলতার মধ্যদিয়ে মানুষ হাসবে, শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে এটা স্বাভাবিক এবং সে হাসাও হবে শরীয়াতসম্মতভাবে। কিন্তু দ্বীন ছেড়ে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে সৎ ও আদর্শ মানুষদের (সব কিছুতে আল কুরআনুল কারীম ও হাদিস নিয়ে আসে, এই বয়সে এত ইসলাম -ইসলাম বললে হয়! জীবন যেন একদম পানসে হয়ে যাচ্ছে এমন অভিযোগ) দূরে ঠেলে অনাদর্শিক পন্থায় হারাম উপায়ে উপার্জিত অর্থের মোহে অসচ্চরিত্রের লোকের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করে হাসি-তামাসা করে রঙ্গ-মঞ্চে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখার মধ্যদিয়ে সময় ব্যয় করা কতটুকু বুদ্ধিমানের কাজ আর ইসলামসম্মত তাতো অন্তত দিনের শেষে ভেবে দেখাই উচিত। দুনিয়াতে অন্ততপক্ষে সম্মানের সাথে টিকে থাকা আর আখিরাতে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত থাকার সৌভাগ্যকে দূরে ঠেলে ইটের ঘেরা প্রাচীরে শান্তিতে আছি মনে করলেও তা যে অস্থায়ী– এ বিষয়টি আল্লাহর ঘোষণা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُوْنَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيْدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ج كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ.

"দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত তো এরূপ যে, আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম। সেই পানির সাহায্যে জমির গাছপালা, যা মানুষ ও পশুরা খায়, বেশ ঘন হয়ে উঠল, এমনকি যখন সেই জমি পূর্ণ সজীবতা প্রাপ্ত হয়ে বেশ সুসজ্জিত ও সুশোভিত হয়ে উঠল, আর জমির মালিকরা ভাবল যে, তারা এখন ঐ জমি নিজেদের আয়ত্তাধীন করে ফেলেছে, ঠিক এই সময় কোনো রাত অথবা দিনে আমার কোনো ধ্বংসাত্মক হুকুম হলো। তারপর আমি সেগুলো এমন শুকনো খড়ে পরিণত করলাম যেন তা গতকালও সেখানে ছিলো না, এভাবে আমি চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনগুলো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি।" (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৪)

সবকিছুর পরে চিরন্তন সত্য হচ্ছে জীবন একদিন থেমে যাবে সেদিন দাঁড়াতে হবে জবাবের মুখোমুখি। তাই হাসতে হাসতে জীবনকে পাপগ্রস্ত না করে হাসিকে সাওয়াবে পরিণত করতে চেষ্টা করার লক্ষ্যে আমাদের জানার পরিধিকে বিস্তৃত করা আবশ্যক।

www.amarboi.org

কোন্ ধরনের হাসি উৎকৃষ্ট

কোন ধরনের হাসি উৎকৃষ্ট সে বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই হাসির প্রকারভেদ জানা দরকার। সুতরাং হাসি তিন প্রকার। যেমন ঃ ০১. তাবাস্সুম, ০২. যেহ্ক, ০৩. কাহ্কাহা। যে হাসির দ্বারা চেহারা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। কিন্তু দাঁতের কোনো অংশ প্রকাশ পায় না এবং কোনো শব্দও হয় না উহাকে তাবাস্সুম হাসি বলে। এরূপ হাসি সুন্নত।

যে হাসির দ্বারা দাঁত দেখা যায় এবং শব্দ হলেও খুব ছোট ও ক্ষীণ স্বরে শব্দ হয় উহাকে 'যেহ্ক' হাসি বলে। এরূপ হাসি সুন্নত নয়।

যে হাসি দ্বারা মুখের ভিতরের আলাজিহ্বা পর্যন্ত দেখা যায় এবং এতে জোরে আওয়াজও হয় উহাকে কাহ্কাহা বা অট্টহাসি বলে। এরূপ হাসি মাকরূহ তথা নাজায়িয।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আমাদের সমাজে কয়েক প্রকার হাসির প্রচলন দেখা যায়।

০১. অনেকে, বিশেষ করে পুরুষরা হা- হা- হা করে হাসে। এ হাসিকে বলে প্রাণ খোলা হাসি। যে এ ধরনের হাসে সে ছোট-বড় সবার কাছেই প্রিয়।

০২. মেয়েরা সাধারণত পুরুষদের মতো এভাবে হা- হা- হা করে হাসে না। তারা বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো খিল খিল করে হাসে। এ হাসিকে বলে খিলখিল হাসি।

০৩. যাত্রা এবং ছায়াছবির খল নায়কেরা যে হাসি হাসে– যা শুনলে পিলে চমকে উঠে। এ হাসিকে বলে উদ্ভট হাসি। যেমন হু! হু! হু!, হো! হো! হো!, হা! হা! হা!– এ হাসি বড় ভয়ঙ্কর।

০৪. অনেক নারী-পুরুষই মুচকি হাসে। মুচকি হাসিতে শব্দ থাকে না। মুচকি হাসি আবার দু'রকম। একটিতে দাঁত দেখা যায়, আরেকটিতে দাঁত দেখা যায় না। দাঁত সুন্দর ঝকঝকে হলে দাঁত দেখানো মুচকি হাসির কোনো তুলনাই হয়না। এ হাসি মানুষের মন কাড়ে। এতে অনেকে ফাঁদে পড়ে যায়। এ হাসি বড় বিপজ্জনক।

০৫. মোসাহেব বা চাটুকাররা যে হাসি হাসে, সে হাসিকে বলে তেলতেলে হাসি বা তৈলাক্ত হাসি। অনেকে আছে তৈলাক্ত হাসি উপহার দিয়ে তৈল খরচ করা ছাড়াই কার্যসিদ্ধি করে ফেলে।

০৬. অনেকে হাসে না, যেন কাশে। শব্দ শুনে বোঝার উপায় নেই এটা হাসি না কাশি। এ হাসিকে বলে খকখক হাসি। এ হাসি বড় বিরক্তিকর।

০৭. অনেকে দু'ঠোট চেপে দু'চোখ হালকা হাসির আভা ছড়িয়ে, মাথা সামান্য ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সাউন্ডলেস হাসি হাসে। এ হাসিকে বলে মিনমিনে শয়তানে হাসি বা মিচকা শয়তান হাসি।

www.amarboi.org

০৮. অনেকে গা দুলিয়ে খেঁকশেয়ালের মতো খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে। এ হাসিকে বলে খেঁকশেয়াল মার্কা হাসি।

০৯. অনেক সময় মনে হাসি না থাকলে বহু কষ্টে জোর করে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে মুখে হাসি আনতে হয়। এ হাসিকে বলে কাষ্ঠ হাসি।

১০. অনেকে চৌত্রিশ দন্ত (আক্কেল দাঁতসহ) এবং মাড়ি বের করে হাসতে হাসতে হঠাৎ সাউন্ড অফ করে দিয়ে এ অবস্থাতেই ফ্রিজ হয়ে যায়। এ হাসিকে বলে ভেটকি হাসি।

১১. মেয়েরা সাধারণত হি- হি- বা খিলখিল করে হাসে। তবে অনেক 'দুষ্প্রাপ্য মেয়ে' আছে যাদের হাসি আশ্চর্য সুন্দর। কানে মধু বর্ষণ করে। দেহ মনে এনে দেয় সুহানুভূতি। মগজের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে। মাথা ঝিমঝিম করে উঠে। দেহ মন অবস হয়ে আসে। এ হাসিকে বলে রিনিঝিনি হাসি বা কাঁচভাঙ্গা হাসি। এই হাসিকে মনপোড়ানো ও প্রাণ জ্বালানি হাসিও বলা হয়। এ হাসি বড় সর্বনাশি।

উপরে বর্ণিত যাবতীয় হাসির মধ্যে শুধু মুচকি হাসি - যে হাসিতে দাঁত দেখা যায় না, কেবল উহাই শরীয়াতে প্রশংসিত ও সুন্নত বলে স্বীকৃত। যে মুচকি হাসিতে দাঁত দেখা যায়, উহা সুন্নত নয়, তবে বৈধ। বাকী সকল ধরনের হাসি শরীয়াতে নিষিদ্ধ ও অবৈধ।

এ কথাও ঠিক যে, হাসি কখনও বাসি হয় না। হাসির আবেদন চিরকালীন। বড়সড় অপরাধ করেও মন ভোলানো চমৎকার হাসি দিয়ে পার পেয়ে যায় অনেকে। সুন্দর করে যিনি হাসতে পারেন তিনি সবার কাছেই প্রিয়। সবাই তাকে পছন্দ করে; তার কথা শুনতে চায়, তার হাসি দু'চোখ ভরে উপভোগ করতে চায়।

সুতরাং বক্তার কথায় বা উক্তিতে হাসি কৌতুকের কথা থাকলে তা অবৈধ নয় এবং অনৈসলামিক যুগের কোনো ঘটনা আলোচনা করাও নাজায়িয নয়। তবে যেন সেই হাসি কাহ্কাহা বা অট্টহাসির পর্যায়ে না পৌছে এবং উহার বৈধ সীমা অতিক্রম না করে।

হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "আমি কখনো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, অট্টহাসিতে তাঁর মুখ গহ্বর বা কণ্ঠস্বর পর্যন্ত দেখা গিয়েছে; বরং তিনি কেবল মুচ্কি হাসতেন।" (বুখারী শরীফ)

কাজেই বলব, জীবন মানে পুষ্পশয্যা নয়, পুতুল খেলাও নয়। অনৈসলামিকভাবে শুধু হেসে খেলে জীবন পরিচালনা করা অত্যন্ত বোকামী। এর মধ্যে সার্থকতাও থাকে না। বরং হাসির পর কান্না আসবে এটি সত্য।

www.amarboi.org

সুতরাং সচ্চরিত্রবান মানুষ কখনো এমন কোনো কিছু করবে না যা হবে অতিরঞ্জিত এবং রাসূল (সা.) বিরোধী।

ক্রীড়া-কৌতুক ও চিত্ত বিনোদন

ক্রীড়া-কৌতুক ও চিত্ত বিনোদন মানে আমোদ-প্রমোদ, অবসর সময়ে বিনোদন, খোশগল্প এবং মনকে একটু বিশ্রাম দেয়া, টানা কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকা– এগুলো মানব জীবনের স্বাভাবিক চাহিদা। তবে বিশেষভাবে খেয়াল রাখার বিষয় হলো– ক্রীড়া-কৌতুক যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় অর্থাৎ দেবর-ভাবীকে ঠিসারা, হাসাহাসি, ক্রীড়া-কৌতুক বা দুষ্টামী করে কথা বলে যা কোনো কোনো সমাজে প্রচলিত তা ইসলামে জায়িয নয়। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কোনো অনুষ্ঠানে, শিক্ষক, মুরব্বী ও নেতৃস্থানীয় মানুষদেরকে হাসানোর জন্য এমন কৌতুক না বলা যা আদবের খেলাফ বা শুনতে-দেখতে দৃষ্টিকটু ও তাদের সম্মানে আঘাত করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য হলো ঃ

مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ج أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

“এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশে অবান্তর কথা-বার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।” (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ০৬)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَلْعَبُوْنَ. يَوْمَ يُدَعُّوْنَ إِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ.

“সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে যারা ক্রীড়াচ্ছলে মিছে মিছি কথা বানায়। সেদিন তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে ধাক্কা মেরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বলা হবে এই সে অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।” (সূরা আত তূর, ৫২ ঃ ১১-১৪)

আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ ج وَإِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ج لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

www.amarboi.org

"এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক (সময় ক্ষেপণের বৃত্তি) বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের আবাসই প্রকৃত জীবন।" (সূরা আল আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৪)

এ আয়াতগুলো থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে যে, মানুষের জীবন অনর্থক নয়। আল্লাহ প্রদত্ত এ জীবনের রয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। অনর্থক ক্রীড়া-কৌতুক হেলায়, খেলায় এ জীবন নষ্ট করার মতো নয়। উদ্দেশ্য-বিহীন ক্রীড়া-কৌতুকে জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করা কাফির ফাসিকদের কাজ। এটা তাদের বৈশিষ্ট্য। একজন ঈমানদার ব্যক্তি পার্থিব জীবনের আনন্দ-উল্লাসে মেতে থাকে না, থাকতে পারে না। কারণ, তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের মূল্যবান সময়টুকু অর্থপূর্ণ কাজে ব্যয় করে মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করা। ফলশ্রুতিতে নিজের আখিরাতের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করা।

মহানবী (সা.) আমাদের জীবনের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। এতে তাঁর মুবারক পা দু'খানি ফুলে যেত। আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অন্যদের সাথে কৌতুকও করতেন। হাসি-খুশি থাকা পছন্দ করতেন। প্রিয় নবী (সা.) হালকা রসিকতাও করতেন। ইমাম বাগাবী (রহ.) তাঁর সনদে বর্ণনা করেন ঃ

اَتَتْ عَجُوْزَةٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ يَدْخُلَنِى الْجَنَّةَ فَقَالَ يَاأُمَّ فَلَنٍ اَنَّ الْجَنَّةَ لَايَدْخُلُهَا عَجُوْزَةٌ قَالَ فَوَلَّتْ تَبْكِىْ قَالَ اَخْبِرُ وَهَا اَنَّهَا لَاتَدْخُلُهَا وَهِىَ عَجُوْزَةٌ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ اِنَّا اَنْشَانَا هُنَّ اِنْشَاءً فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا.

"এক বৃদ্ধা মহিলা নবী কারীম (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে জান্নাতে দাখিল করেন। তখন নবী কারীম (সা.) বললেন, হে অমুকের মা! বৃদ্ধা তো জান্নাতে যাবে না। এ কথা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যেতে লাগলেন। নবী কারীম (সা.) বৃদ্ধার এ অবস্থা দেখে লোকদেরকে বললেন, তাকে জানিয়ে দাও, কেউ বৃদ্ধ অবস্থায় জান্নাতে যাবে না। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "আমি বান্দাদের সৃষ্টি করব নবতর রূপে। আমি তাদের কুমারী বানিয়ে দেব।"

এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, শরীয়াতের আওতায় থেকে হাসি-কৌতুক করতে কোন দোষ নেই। তবে তা যেন দীর্ঘ সময় ধরে না হয়। আজকে আমরা হাসি-ঠাট্টা ক্রীড়া-কৌতুক করতে যেয়ে অনেক সময় নিজের ফরজ কাজ সম্পর্কেও গাফেল

www.amarboi.org

হয়ে যাই। নিষিদ্ধ কথাও বলতে শুরু করে দিই। বিশেষ করে আমাদের মুহতারেমা মায়েরা যখন কথা বলতে বসে তখন হাসি শুনা যায় ড্রয়িং রুম বা গ্রামের বাড়ি হলে মেহমানের বৈঠক খানা থেকেও। আর কথা-অমুক সুন্দর, অমুক কালো, অমুকের সবকিছু আমার ভাল লাগে, আর অমুক খুব খারাপ। কিভাবে অমুক সম্পর্কে এত কিছু জানল, বুঝল জানি না (নাউযু বিল্লাহ)। বরং এমন গল্প গুজব হাসি-ঠাট্টা, আলোচনা, সমালোচনা (মহিলারা একত্রিত হলেই হয় একদম মশগুল, অন্যদিকে ছেলে বন্ধুরা কয়েকজন একত্রিত হলেও অমুক সুন্দর, অমুকের চাহনি সুন্দর ইত্যাদি) ইসলাম ধর্ম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। কেননা ইসলাম মানবতার ধর্ম। ইসলামে সে কী তা আল্লাহর কাছে বিবেচ্য নয় বরং বিবেচ্য হলো আমল ও সচ্চরিত্র। তবে হ্যাঁ, মনকে বিশ্রাম দেয়ার লক্ষ্যে কৌতুক প্রয়োজন। কিন্তু এমন কৌতুক নয়, আপনি যাকে অসুন্দর বলছেন সে হয়তোবা আপনার চোখে অসুন্দর কিন্তু অন্যের চোখেতো সুন্দর হতে পারে। আর এটিইতো স্বাভাবিক। বাজারের পঁচা মাছটাও বিক্রি হয়। হয়তোবা আপনি কিনছেন না, কেউ কেউ রাত ১০টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে সেটি ক্রয়ের জন্য কাজেই কেন অমুক সুন্দর, অমুক অসুন্দর বলছেন? সবইতো আল্লাহর সৃষ্টি। সবচেয়ে কালো মেয়েটারওতো কোথাও না কোথাও বিয়ে হয়। আপনার কাছে হয়তোবা কালো কিন্তু কারো কারোর কাছেতো শুনি কালো গলার মালা, সুন্দর পায়ের তলা– এ ক্ষেত্রে কি বলবেন? থাক সেসব কথা। শুধু শুধু সময় নষ্ট করে পাপ অর্জন করার কোনো দরকার নেই। আল্লাহর কাছে সুন্দর অসুন্দরের কোনো দাম নেই। দাম হলো আমলের, সচ্চরিত্রের।

হযরত আনাস (রা.) থেকে মহানবী (সা.)-এর কৌতুক সম্পর্কিত অপর একটি হাদিস বর্ণিত আছে ঃ

اَنَّ رَجُلاً اِسْتَحْمَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ حَامِلُكَ عَلَىْ وَلَدِ نَاقَةٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ مَا اَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَلِدُ الْاِبِلُ اِلاَّ النُّوْقَ.

"কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট একটি সাওয়ারীর জন্তু চান। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, একটি উটনীর বাচ্চা তোমাকে দেব। তখন ঐ ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি উটনীর বাচ্চা দিয়ে কী করব? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, প্রত্যেক উটই তো উটনীর বাচ্চা।" (তিরমিযী শরীফ)

উল্লিখিত হাদিসসমূহ থেকে বোঝা যায়, কৌতুক ও রসিকতা করা মুবাহ। ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, যে হাসি-ঠাট্টা বা কৌতুকে অশ্লীলতা নেই তা

www.amarboi.org

হালাল। তবে অধিক মাত্রায় কৌতুক করা এবং সবসময় কৌতুকে নিয়োজিত থাকা নিষিদ্ধ। কারণ অধিক মাত্রার কৌতুক অধিক হাসি-ঠাট্টার উদ্রেক ঘটায়। আর অধিক হাসি অন্তর থেকে আল্লাহর ভয়-ভীতি দূর করে দেয়। কোনো কোনো অবস্থায় তা প্রতিহিংসা সৃষ্টি করে। যে হাসি-ঠাট্টায় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ।

মহানবী (সা.) বলেন ঃ

وَيْلٌ لِلَّذِىْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثُ يُضْحِكُ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ.

"ধ্বংস তার, যে লোক হাসাবার জন্য মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস।"

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, সময় অত্যন্ত মূল্যবান। যে সময় আজ চলে যায় তা আর ফিরে আসে না, একজন বরফ বিক্রেতা সময়মত বরফ বিক্রি করতে না পারলে তা যেমন গলে পানিতে পরিণত হয়ে মূলধন হারানোর ভয় থাকে, ফলে তার কাছে সময় যেমন মূল্যবান তেমনি আমাদের জীবনেও সময় খুব মূল্যবান। কাজেই এ মূল্যবান সময় হাসি-ঠাট্টা ও চিত্তবিনোদনে নিমগ্ন না থেকে আদর্শিক গ্রন্থ অধ্যয়ন, যিকির করা, আল কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করা উত্তম বলে প্রতীয়মান হয়। এতে আমল সুন্দর ও সচ্চরিত্রবান হওয়ার সুযোগ থাকে।

চরিত্রের মারাত্মক খারাপ দিক

সম্পদের মোহ বা লোভ

দুনিয়াদারদের নিকট দু'টি জিনিস খুবই প্রিয়। এ দু'টি জিনিস অর্জনের জন্যই তারা জীবন-মরণ প্রচেষ্টা চালায়। ০১. ধন-সম্পদ। ০২. নাম-ডাক তথা প্রসিদ্ধি, পদ। ধন-সম্পদের লোভে পড়ে তারা হালাল-হারামের প্রতি খেয়াল করে না এবং শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত মালের হকও আদায় করে না।

সম্পদের লোভে এ সকল লোক এমনভাবে অন্ধ হয়ে যায় যে, মৃত্যু ব্যক্তির স্ত্রী ও কন্যাদেরকে মীরাছ (প্রাপ্য অংশ) পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে দেয়। মীরাছ থেকে কোনো কোনো লোক এতীম বাচ্চাকে পর্যন্ত বঞ্চিত করে দেয়। অথচ এ এতীম তারই ভাই-ভাতিজা বা অন্য কোনো আত্মীয় হয়ে থাকে। এ এতীমের অংশ নিজেই হজম করে ফেলে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

كَلاَ بَلْ لاَ تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ وَلاَ تَحَاضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَمًّا. وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا.

"এটা অমূলক, বরং তোমরা এতীমকে সম্মান করো না এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না। তোমরা মৃত্যুর ত্যাজ্য সম্পত্তি

www.amarboi.org

সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাসো।" (সূরা আল ফজর, ৮৯ ঃ ১৭-২০)

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّهَا لَظَىٰ. نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ. تَدْعُوْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ. وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ.

"নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি, যা চামড়া তুলে দিবে। সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ট প্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল, সম্পদ পুঞ্জিভূত করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল, সম্পদ পুঞ্জিভূত করেছিল, অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল।" (সূরা আল মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১৫-১৮)

লোকদের হক মেরে, শ্রমিকদের পাওনা টাকা আটকে রেখে, এতীম ও বিধবার সম্পদ হনন করে, (অর্থাৎ শরীয়াতের হুকুম মতো এদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন না করে) অফিসারদেরকে ঘুষ দিয়ে অন্যের মাল নিজের বানিয়ে, ঘুষ খেয়ে, সুদী টাকা আদায় করে, এছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে, সম্পদের পাহাড় জমা করে মনে করে যে, আমরাই সফলকাম। আচ্ছা! অভিশপ্ত কাজ করে আবার কিভাবে সফলকাম হওয়া যায়? সফলতা তো হালাল সম্পদ ও কাজ দ্বারা অর্জিত হয়, হারামে নয়। হারাম সম্পদ ও কাজের মধ্যে নিজের সন্তানও বংশধরদের ধ্বংস অনিবার্য। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করবে, অতঃপর তা থেকে সাদকা করবে, তার সাদকা হবে না। আর তা থেকে খরচ করলে তাতে বরকত হবে না। এ মাল রেখে যদি মারা যায় তাহলে, তা তার জন্য দোযখের পুঁজি হবে।" (মিশকাত শরীফ)

হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "ঐ গোস্ত (শরীর) জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার লালন-পালন ও প্রবৃদ্ধি হারাম খাদ্য দ্বারা হয়েছে। আর যে গোস্ত (শরীর) হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত হয়েছে, দোযখ তার যোগ্য বাসস্থান।" (মিশকাত শরীফ)

মুমিন বান্দার জন্য জরুরী হলো, হালাল উপার্জনের চিন্তা করা। হালাল কামাই করা। অল্প-বিস্তর যা কিছু হালালভাবে উপার্জন হয়, তা দিয়েই নিজের এবং নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণ করা অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করবে না। আর প্রচুর উপার্জনের জন্য ব্যস্ত হবে না। আজকাল বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় যে, বিল্ডিং এবং আধুনিক বাংলো বানানোর ব্যাপারে লোকেরা প্রতিযোগিতা করে, কারখানা ও ফ্যাক্টরী খোলার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করে, বড় বড় পদ ও পোষ্ট দখল করার জন্য প্রতিযোগিতা করে, এ প্রতিযোগিতায় যে আগে বেড়ে যায়, সে নিজেকে সফলকাম মনে করে থাকে। বিয়ে শাদীতে কেউ হাজার হাজার, কেউ লাখ লাখ টাকা খরচ করে। বিয়ে বাড়িতে (হাজারো পাপের

www.amarboi.org

সয়লাবে ভেসে) বরযাত্রী আসে, বাজনা বাজে, ভিডিও রেকর্ডিং হয়ে লাখ লাখ টাকা "মহর" নির্ধারণ করা হয়ে থাকে, এ সকল কাজের উদ্দেশ্য হলো রিয়াকারী বা লোক দেখানো। এ সকল অবৈধ কাজে যে ব্যক্তি বেশী অর্থ ব্যয় করতে পারে, মানুষেরা তাকেই সফলকাম মনে করে। আর সে নিজেও মনে করে আমিই একমাত্র সফল ব্যক্তি।

বিশ্ব স্বীকৃত লোভী কারূনের শেষ পরিণতি

কারূন একবার তার সম্পদের প্রাচুর্যের অহঙ্কার করে লোকদেরকে দেখানোর জন্য মিছিল বের করেছিল। পবিত্র কুরআনে তার কথা এভাবে আলোচিত হয়েছে ঃ

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِيْ زِيْنَتِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُوْنُ إِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ.

"অতঃপর কারূন জাঁকজমকসহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বললো, হায় কারূন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেয়া হতো! নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান" (সূরা আল কাসাস, ২৮ ঃ ৭৯)

অতঃপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلاَ يُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُوْنَ.

"আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বললো ধিক্ তোমাদেরকে যারা ঈমানদার এবং সৎকর্মী, তাদের জন্যে আল্লাহর দেয়া সাওয়াবই উৎকৃষ্ট। এটা তারাই পায়, যারা সবরকারী বা ধৈর্যশীল।" (সূরা আল কাসাস, ২৮ ঃ ০৮)

কারূন নিজের ধনাঢ্যতা প্রদর্শন এবং নাম কামানোর জন্যে মিছিল বের করলো, যে মিছিল দেখে (লোভী) লোকদের লোল পড়তে লাগলো এবং তারা এ আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলো যে, আমরাও যেন এরূপ সম্পদশালী হতে পারি, যেরূপ এ ব্যক্তি (কারূন) হয়েছে। এ সকল লোকদেরকে আলিমগণ বললেন এটা কোনো (লোভনীয়) জিনিস নয়। ঈমান এবং নেক আমলের যে প্রতিদান আল্লাহ পাক দান করবেন, তা অনেক বেশি উত্তম। কারূনের (অহংকারের) পরিণতি যা হয়েছে, তা সবার জানা আছে। নিজের ঘর-বাড়ি প্রাসাদসহ জমিনে ধ্বসে গেছে, তার সম্পদও কাজে আসেনি, তার দলবলও কাজে আসেনি।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

www.amarboi.org

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ.

"অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোনো দল ছিলো না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারলো না।" (সূরা সূর কাসাস, ২৮ ঃ ৮১)

সুদ

সুদ হচ্ছে শোষণের হাতিয়ার। ধনী ও দরিদ্র সৃষ্টির এক অভিনব কৌশল। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ নির্যাতনের এবং তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিকারী যত প্রকার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে সুদ তাদের মধ্যে অন্যতম। এটি সম্পদ ও সম্পদের প্রতি লোভ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এটি এতই মারাত্মক যে, সুদ গ্রহীতা যে কোনো সময় যে কোনো কাজ করতে পারে। সুদের সাথে সম্পৃক্ত মানুষ বিবেকহীন হয়ে থাকে। আর বিবেকহীন মানুষ (মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব ঘোষণা করা হয়েছে বিবেক বুদ্ধির জন্যে) পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট আচরণ করতে পারে। ভাবছেন কিভাবে? এটা কিভাবে সম্ভব? দেখুন! একটি কুকুর তার মনিবের বাড়ি পাহারা দেয়, মনিব যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়ি না ফিরে আসে কুকুরটি যত রাত্রই হোক বাড়ির সামনে পথের ধারে বসে থাকে। মনিব আসলে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তার পিছে পিছে বাড়িতে আসে কিন্তু ঘেউ ঘেউ করে না, বা না বুঝে ঘেউ ঘেউ করলেও যখন মনিব তাকে ধমক দেয়, সে কণ্ঠ শুনে তখন লেজ নামিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ বন্ধ করে দুঃখ প্রকাশ করে কিন্তু আমাদের সমাজে যারা সুদ দেয় ও নেয় তারা তাদের বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী তাদের সাথে টাকাটা ঠিকমত না দিতে পারলে কি বা কেমন আচরণ করে? তারপর কড়ায় গণ্ডায় টাকা উসুল করে। এরপরও বলে টাকা পয়সা সম্পর্ক নষ্ট করে কাজেই আর দেয়া যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু আসলে কি ঠিক তাই? মানুষ মানুষের বিপদে এগিয়ে আসবে না, তাহলে মানবতাবোধ আর থাকল কোথায়? এভাবে সুদের ফলে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ যেমন মানবতা বিরোধী হয়ে উঠে তেমনি সমাজেও শুরু হয় নানা বিশৃঙ্খলা ও অসামাজিক কার্যকলাপের হোলি খেলা, দয়া, মায়া, ভালবাসা ও মহব্বত সৃষ্টির বিপরীতে হয় অপমৃত্যু, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে দেশের অর্থনীতি, অস্থিতিশীল হয়ে উঠে জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো। আর এ অবৈধ অর্থের প্রভাবে রাজনীতিতে সৃষ্টি হয় অযোগ্য অথর্ব নেতার আধিপত্য। যার কারণে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যে

www.amarboi.org

চারটি বড় আসমানী কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবতাবোধের সাওগাত নিয়ে এসেছে তার প্রত্যেকটিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ববাদের প্রচার প্রসারে যত নবী-রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন তাদের সকলেই এর বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন। পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি গোষ্ঠী ও প্রচারিত ধর্ম নেই যারা সুদ মানুষ ও মানুষের কল্যাণের বিপক্ষে তা জানে না। আর এ কারণেই যুগে যুগে মানুষ এটাকে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন সাজে, বিভিন্ন নামে, রঙিন করে সমাজে প্রচলন করেছে। শুধু একটাই নেশা টাকা চাই আরো টাকা, চাই সুন্দর বিল্ডিং, গাড়ী, বাড়ি আর প্রচুর জমি-জমা, সম্মান ও আধিপত্য।

অথচ স্রষ্টার বক্তব্য সুস্পষ্ট। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لاَ يَقُوْمُوْنَ إلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ج ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰٓئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ.

"যারা সুদ খায় (কিয়ামতের দিন) তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। আর তা এজন্য যে তারা বলে, বেচাকেনা তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ তায়ালা বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং যে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে, তারাই হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা

www.amarboi.org

মুমিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রাখ যে, এ আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২৭৫-২৭৬, ২৭৮-২৭৯)

এছাড়াও সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৩০, সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ১৬১ ও সূরা আর রূম, ৩০ ঃ ৩৯ সহ সবগুলো আয়াতের মূল সূর একই, তা হলো সুদ হারাম।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বদানকারী আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ৪০ টিরও অধিক হাদিস দ্বারা সুদ নিষিদ্ধ হওয়া এবং ইজমা কিয়াস দ্বারা আলেম ওলামাগণ সুদে টাকা আদান-প্রদানকে নিরুৎসাহিত করেছেন। সুতরাং এখানে অবশ্যই বুঝতে হবে এটি কতটা মানবতা বিরোধী এবং জঘন্যতম। এখানে রাসূল (সা.)-এর চারটি হাদিস মাত্র উল্লেখ করা হলো ঃ

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

০১. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, "আল্লাহর রাসূল (সা.) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের লেখক এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিশম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, তারা সকলেই সমান অপরাধী।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلٰثٌ وَّسَبْعُوْنَ بَابًا اَيْسَرُهَا مِثْلُ اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ.

০২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "সুদের মধ্যে তিয়াত্তরটি গুনাহ রয়েছে। আর সর্বনিম্ন গুনাহটি হলো নিজের মাতাকে বিয়ে করার সমতুল্য।" (মুসতাদরাকে হাকিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ بَابًا اَدْنَاهَا كَالَّذِىْ يَقَعُ عَلٰى اُمِّهِ.

০৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "সুদের ভিতর সত্তর প্রকার গুনাহ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন

www.amarboi.org

গুনাহ হলো নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সমতুল্য।" (বায়হাকী ও ইবনে মাজাহ শরীফ)

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هَنْزَلَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِيْنَ زَنْيَةٍ .

০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, "জেনে শুনে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশ বার যিনা করা (ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া) অপেক্ষা মারাত্মক অপরাধ।" (মুসনাদে আহমদ ও তাবারানী)

উল্লিখিত হাদিস থেকে যা বুঝা যাচ্ছে তা হলো, সুদের সর্বনিম্ন পাপ হচ্ছে নিজের গর্ভধারিণী মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকাল এক শ্রেণীর মানুষ সুদের সাথে বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতিতে সম্পৃক্ত হতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। এছাড়া সুদী ব্যাংক, ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান, সুদী বীমা প্রতিষ্ঠান, মহাজনী প্রথা, সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রচলিত সুদ প্রথাসহ মেধা খাটিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সুদের আদলে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারেও থেমে নেই। আরো অন্য নামে, অন্যভাবে তা সমাজে প্রচলিত করার জন্য তারা সক্রিয়। তেমনি এমন একটি পদ্ধতি হলো একখণ্ড জমি এক বছরের জন্য পত্তনের মূল্য ধার্য করে ৮,০০০ টাকা দেয়া হলে গ্রহীতা এক বছর পর দাতাকে ১০,০০০ টাকা দিবে (এখানে জমি নয় মূলত টাকায় টাকা দেয়া, জমিকে কাল্পনিকভাবে ধরে নেয়া) টাকা ফেরত দিবে বা ব্যবসা করতে টাকা নিয়ে (সে কী ব্যবসায় করবে জানার দরকার নেই বা লাভ কী লোকসান হলো তাও জানার দরকার নেই) মাস, বছর শেষে সে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাসহ মূলধন ফেরত দিবে- এমন লেনদেনটি সুদের সাথেই সম্পৃক্ত।

কাজেই বলা যায়, সুদ দেয়া নেয়ার সাথে যারা সম্পৃক্ত তারা যে পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট কাজটি করছে তাতো রাসূল (সা.)-এর হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত। কারণ পশুও তার জন্মদাত্রী মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, মাকে বিয়ে করে এমন ঘটনা নজিরবিহীন। মানুষের বিবেক আজ কতটুকু ধ্বংস হলে, স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনা থেকে দূরে সরে গেলে, আর আল্লাহর পক্ষ থেকে কতটুকু গজব-লানত তাদের প্রতি অবধারিত হয়ে গেলে তারা এ সুদ সম্পর্কে জানার, বুঝার পরও এর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে তা যেন আজ বড়ই ভাবনার বিষয়। আর এমন ক্ষেত্রে তাদেরকে তা থেকে দূরে সরিয়ে আল্লাহর আদালতের কাঠগড়া থেকে মুক্তির লক্ষ্যে যে কথা বলবে সে যে কেমন তার বলা ও লেখার মাধ্যমেই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। সমগ্র পৃথিবী যদি এক হাতে এনে দিয়ে দেয়া হয়, তাহলেও যে বা যারা এ সুদ সম্পর্কে কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করে জানতে পেরেছে সে সুদের কাছে, সুদ খোরদের সাথে তা থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত সম্পর্ক স্থাপন

www.amarboi.org

করতে পারে না। অন্যদিকে যে বা যারা তা জানা সত্ত্বেও (বিশ্বে সুদ হারাম তা জানে না এমন মানুষ বিরল, জেনেও না জানার ভান যে করে সেই গরল) নিজেকে, নিজের মা-বাবা ও আত্মীয় পরিজনকে, প্রতিবেশীকে, তা থেকে মুক্ত করার সমুদয় ব্যবস্থা করছে না, বলছে না, সে যে কেমন তাও আদর্শবান পাঠকরা বুঝে নিবেন বলে আশা করছি। তবে বলব, ঘনিষ্ঠজনদেরকে এমন পাপাচার থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করতে হবে। আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আপনার চোখের সামনে তারা অপদস্ত হবে, লাঞ্ছিত হবে, আর আখিরাতে আগুনে পুড়বে তা কি করে হয় ভাবুন! ভেবে চিন্তে আবার বলুন! তারা আপনাকে ভালবাসে আপনি তাদেরকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, তারা হয়তোবা আপনাদের জন্যই এ সম্পদ বাড়ানোর অপচেষ্টা করছে। জানি, তাদেরকে এর বিরুদ্ধে বলতে গেলে, বুঝাতে গেলে তারা রাগ করবে। স্বল্প সময়ে দুনিয়ায় সম্পদের ঘাটতি বা আপাতদৃষ্টিতে সম্পদ কমে যাচ্ছে দেখে আপনাকে ভর্ৎসনা করবে, ভালবাসার স্থলে বকাঝকা দিবে, এ সময়ে শয়তান তাদের গাঁয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়ার ফলে তাদের মাথা ঠিক থাকে না তারা আবোল-তাবোল বলতে থাকবে। অপবাদ দিবে, বলবে পাগল ছাড়া কেউ কী এমন কথা বলে, টাকা ছাড়া আজকাল কিছু হয়? তারপর বললে দূরে সরিয়ে দেবে, বাবা হাজী মা নামাযী তারপরও দুনিয়ার প্রতি অহেতুক অন্ধ আর আকৃষ্ট তাদেরকে উদ্ধার করতে না পারার কারণে দূরে থেকে চোখের পানি ফেললে তারা হাসবে, উপহাস করবে, মাথায় হাত বুলিয়ে আগের ন্যায় আদর করবে না কিন্তু তবু কী কথা বলা বন্ধ হলেও লিখে অনন্ত নিকটজনকে উদ্ধার করতে চাইবে না? বরং এ চাওয়া যে আল্লাহরই আদেশ রাসূলের চরিতাদর্শের বাস্তব প্রতিফলন। আর মা-বাবারূপী এমন ব্যক্তিদের প্রতি চিরন্তন শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ।

সুদ দেয়া নেয়া অসচ্চরিত্রের প্রতিচ্ছবি

সুদের সাথে সম্পৃক্ত লোকজনকে নয় বরং সুদকে ঘৃণা করতে হবে। কেননা সুদ মানুষের মন থেকে মনুষত্বকে গলাটিপে হত্যা করে সম্পদ বৃদ্ধির নেশায় পাগল করে দেয়। সুদের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পায় সত্য কিন্তু মানুষের মন থেকে দয়া, মায়া, ভালবাসা ও মহব্বত যা আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর সিফাতের সাথে সম্পৃক্ত তা দূর হয়ে যায়। তারা তখন যে কোনো কাজ করতে পারে এবং আগন্তুক বংশধর, সমাজ ও রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীর অনেক ক্ষতিসাধন করে থাকে। অধিকন্তু ধর্মের লেবাস পরিধান করে, রাসূল (সা.)-এর উম্মত হিসেবে নিজেকে দাবি করে তারা রাসূল (সা.)-এর অন্তরকেই কষ্ট দিয়ে থাকে। আর এ সমস্ত মানুষগুলো যখন রাসূল (সা.)-এর কবরের পাশে গিয়ে সালাম দেয় আমি জানি না আল্লাহর হাবীব তাদের সালামের জবাব কিভাবে দেন বা কী, তবে এটুকু উপলব্ধি হয়, নিশ্চয়ই সেই রাসূল (সা.)-এর শিক্ষার বিপরীতে দুনিয়ার জীবন যাপন– কর্ম করার কারণে রাসূল (সা.) খুশী হয়ে জবাব দিবেন না, দিতে

www.amarboi.org

পারেন না। কারণ সুদ এত মারাত্মক খারাপ জিনিস যে এমন সুদখোরের আওতাধীন যে বা যারা আসে তারা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। বিশেষ করে অন্য সুদখোর ছাড়া তাদের সাথে সুদ পছন্দ করে না, সুদের বিপরীতে কথা বলে এমন আদর্শবান মানুষের মিলতো হতেই পারে না (সুদখোর সুদখোর মিলতে পারে, বীজ গণিতে যেমন প্লাসে প্লাসে-প্লাস হয় ঠিক তেমন)। এখানে সুদের মতো এমন অভিশপ্ত ও লানতপূর্ণ একটি কাজের সাথে মানুষের সম্পৃক্ততার কারণে তাদের চরিত্রে শয়তানের প্রভাবেও যে ধরনের কুচরিত্র, আচার-আচরণ প্রদর্শিত হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

০১. সুদ মানুষের মধ্যে নির্মমতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা জন্ম দেয়।

০২. সুদ মানুষের সচ্চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক।

০৩. সুদ মানুষকে কর্মবিমুখ করে। কারণ বিনা পরিশ্রমে টাকা পাওয়া যায় বলে জনগণ অর্থকে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ না করে সুদী ব্যাংকে জমা রাখে।

০৪. সুদ মানুষকে পরস্পরের প্রতি উদার হবার পরিবর্তে কঠোর এবং প্রয়োজনে অত্যাচারী হতে শিক্ষা দেয়।

০৫. সুদ মানুষের হিতাহিত জ্ঞানকে হ্রাস করে।

০৬. সুদ মানুষকে দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে রাখে (কিভাবে আরো বাড়ানো যায়? বাড়িটা করা যায়? জমিটা কেনা যায়? এতে চিন্তা রোগ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফলে ব্রেন ক্যান্সারসহ অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে) এতে তাদের কর্ম ক্ষমতা হ্রাস পায়।

০৭. সুদখোররা কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হবার পরিবর্তে তার বিপদ ও অসহায়ত্বের সুযোগে অধিক সুদ তথা অবৈধ মুনাফা অর্জনের চেষ্টায় মত্ত থাকে।

০৮. সুদ মানুষের মধ্যে অর্থ লালসা সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দেয়। অধিক অর্থ (সুদ) পাবার আশায় সে এত মত্ত হয়ে পড়ে যে, ভালমন্দেরও জ্ঞান থাকে না।

০৯. সুদ মানব চরিত্রের মহৎ গুণাবলি তথা দানশীলতা, মহানুভবতা; উদারতা, সহানুভূতি ও আত্মত্যাগকে হ্রাস করে দেয়।

১০. সুদখোর ব্যক্তি অপরের উপকার করাতো দূরের কথা অপরকে নিজ চেষ্টায় ও নিজ পুঁজি দিয়ে তার সমতুল্য হতে দেখলে তাও সহ্য করতে পারে না।

এ পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধর্মের জন্য নয়। বরং ধর্ম ও কর্ম বা ব্যবসায় সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের জন্য। এখন যে কর্ম বা ব্যবসায় মানুষের বিপক্ষে, মানবতার কল্যাণের বিপক্ষে অর্থাৎ এমনিতেই দরিদ্র, সে জন্য চাইল আপনার কাছে অর্থ, আপনার দেয়ার ক্ষমতা আছে আপনি দিলেন কিন্তু আদায় করলেন বেশি এতে কি সে কখনো দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে পারে? আর এতে কি মানবতার কিছু থাকল। সুতরাং মানবতার দাবি যার কাছে উপেক্ষিত, সংরক্ষিত হয় না সেতো আর যাই হোক সচ্চরিত্রবান মানুষ হতে পারে না।

www.amarboi.org

সুদের ক্ষতিকর দিক

ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত চিরন্তন কল্যাণকর পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, নৈতিকতা, চিন্তা-চেতনা বিশ্বাস, কর্ম, আচার-আচরণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মূল্যবোধ তথা সমগ্র জীবন ধারার সাথে সমন্বিত ও সম্পৃক্ত রেখে আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা উপহার প্রদান ইসলামী জীবন দর্শনের বৈশিষ্ট্য। মানব জীবনে অর্থ খুব প্রয়োজন। অর্থ ছাড়া জীবন ধারণ অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তাই বলে ইসলাম মানুষকে অর্থ উপার্জনের অবাধ সুযোগ দেয় না। উপার্জনের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ-অবৈধতার পার্থক্য সৃষ্টি করে সম্পদ উপার্জন সমাজ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর প্রবণতা ও কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসলাম। এর মধ্যে সুদ সম্পর্কিত নিষেধ সবচেয়ে বেশি কঠোর। তারপরও যারা এতে সম্পৃক্ত হয় তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হয়। ফলে তাদের সম্পদের বরকত যেমনি কমে যায় তেমনি নানা ধরনের জটিল রোগ (ক্যান্সার, কিডনি নষ্ট হওয়াসহ........ইত্যাদি) আর শোকের রেশ তাদেরকে পৃথিবীতে আচ্ছন্ন করে তোলে। অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা তাদের নিত্য সঙ্গী হয়ে থাকে যা পরিবার ও পারিবারিক জীবন ছেদ করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কাজেই আজ প্রয়োজন সুদের সাথে যারা ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, জেনে না জেনে সম্পৃক্ত হয়েছে বা হতে পারে তাদেরকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনা এবং ভবিষ্যৎ নাগরিকদেরকেও এমন অসচ্চরিত্রের নগ্ন থাবা থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও গণসচেতনতা সৃষ্টি করা, যারা এ সম্পর্কে বলে তাদেরকে বুকের কাছে টেনে নেয়া, মহব্বত করা (অবশ্য এর জন্য সৌভাগ্য প্রয়োজন) কারণ তারা যে আপনার মুক্তির জন্যই কথা বলে, আপনার শান্তির জন্যই কথা বলে তা মনে করে ঠাণ্ডা ও সুন্দর মেজাজে কিভাবে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা জানার ও মানার চেষ্টা করা। আর তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ্ কঠোর শাস্তি থেকে মাফ করে দিবেন।

সুতরাং সুদ বর্জন করতে হবে এবং অতীতের কৃতকর্মের জন্যে সর্বান্তকরণে তাওবা করতে হবে। উপরোক্ত আয়াতে সুদের যে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে কুফর ব্যতীত অন্য কোনো বৃহৎ গুনাহের কারণে কুরআন পাকে এত বড় শাস্তির কথা উচ্চারিত হয়নি।

সুদ থেকে মুক্তির উপায় কী

০১. সুদের লা'নত বা আল্লাহ্ প্রদত্ত গজব থেকে সমগ্র জাতিকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হলো সরকারীভাবে আইন

www.amarboi.org

প্রণয়নের মাধ্যমে দেশে পরিচালিত সকল সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এভাবে দেশে পঁচানব্বই শতাংশ মানুষকে সুদ থেকে মুক্ত করা যাবে বলে আশা করা যায়।

০২. কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসভিত্তিক ব্যাংক বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বেশি বেশি করে স্থাপন করা এবং মানুষদেরকে এদিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিটিভিতে অনুষ্ঠান প্রচার করা। এতে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও সেবা গ্রহণকারী জনগোষ্ঠীসহ আগন্তুক সন্তানেরা সুদী প্রতিষ্ঠানে লেনদেন করা থেকে অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেই মুক্তি পেতে পারে।

০৩. সরকারী ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় ও বণ্টনের সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এতে দু'টি কাজ হবে। যেমন-

ক. ধনী দরিদ্রের বৈষম্য কমে যাবে,

খ. যাকাত ব্যবস্থা সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন হলে মানুষ তাদের সঞ্চয়ী অর্থকে অলস বা অব্যবহৃত রেখে দিবে না; বরং সকলেই সচেষ্ট থাকবে তার অর্থকে উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ করার জন্যে, এতে কর্মসংস্থান বাড়বে। আর যাকাতের টাকা দরিদ্রদের হাতে পৌঁছার কারণে তারা পরমুখাপেক্ষী হবে না,

০৪. সমাজের দরিদ্র কিন্তু যে যে কাজে দক্ষ, যোগ্য তাদের কর্মসংস্থান কিংবা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা স্বরূপ তাদের জন্যে কর্জে হাসানা (শুধু মূলধন ফেরত দেয়ার শর্তে অনির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণ) এবং মুদারাবা পদ্ধতি চালু করতে হবে। অন্যদিকে যারা বেকার আছে তাদের সহজ শর্তে কর্জে হাসানার বিপরীতে যে কোনো টেকনিক্যাল কাজে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য ও দক্ষ করে তোলা যেতে পারে,

০৫. সুদের বিপরীতে লাভ-ক্ষতিভিত্তিক পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেশের সকল ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত করা, সেবার মান গ্রহণে মানুষকে উৎসাহিত করে তোলার লক্ষ্যে সহজ শর্ত এবং মার্জিত ও সহনশীল আচরণ প্রকাশকারী আদর্শ মানুষদের নিয়োগ দিয়ে সেবার মান উন্নত করা,

০৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণিত ও পাঠ্যবই থেকে সুদ কষা (সুদভিত্তিক) অধ্যায় বাদ দিয়ে সেখানে যাকাত, নামায, ইনকাম ট্যাক্স ও লাভ ক্ষতিভিত্তিক অধ্যায় বেশি করে সংযোজন করা। তাহলে কোমলমতী শিক্ষার্থীরা যারা আগামীদিনের দেশের ভবিষ্যৎ তাদের হাতে কলমে শিক্ষা দানের মাধ্যমে এ সমস্ত বিষয়গুলোকে অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়া যাবে,

০৭. ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থনীতির করুণ চিত্র

www.amarboi.org

আলোচনা করে ইসলামী অর্থনীতির উপর সম্যক জ্ঞান লাভের জন্যে বিস্তারিতভাবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা,

০৮. ইসলামী অর্থনীতির সাথে সবাই পরিচিত হওয়া ও বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ ঘটানোর লক্ষ্যে অর্থনীতির অংশ থেকে সুদ ও সুদের আলোচনা বাদ দেয়া বা জানাতে চাইলেও এর কুফল আলোচনা, সমাজে তার ক্ষতিকর প্রভাব পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতির বিস্তারিত আলোচনা করা,

০৯. সুদ ও সুদের কুফল থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্যে গণসচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন-

ক. সকল ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক সুদের কারণে সমাজচিত্রের করুণ দৃশ্য অবলম্বনে বাস্তবভিত্তিক নাটক, টেলিফ্লিম, বিশেষ ছবি ইত্যাদি প্রচার করার মাধ্যমে সুদের বিপরীতে কথা বলা,

খ. পত্র পত্রিকায় লেখনীর মাধ্যমে,

গ. এদেশে আড়াই লক্ষ মসজিদের ইমাম সাহেবদের জুমআর নামাযে খুতবা দানের মাধ্যমে,

ঘ. দেশে লক্ষাধিক কওমী মাদ্‌রাসা, আলীয়া মাদ্‌রাসা, হিফযুল কুরআন মাদ্‌রাসা, গণশিক্ষা কেন্দ্রসহ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের আলোচনা পেশ করার মাধ্যমে,

ঙ. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন ঃ ঈদে মিলাদুন্নবী, শবে মেরাজ, শবে বরাত, শবে কদর ও আরো অন্যান্য দিবসে পোষ্টার, লিফলেট, ব্যানার, সেমিনার সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি করে মানুষকে আদর্শিক জ্ঞানদানে উৎসাহিত করা,

চ. যাকাত বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত যাকাতের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি ও সুদের প্রতি নিরুৎসাহিত করে ব্যানার পোষ্টার, লিফলেট বিতরণ করার মাধ্যমে,

ছ. ইসলামিক ফাউণ্ডশন কর্তৃক ইমাম প্রশিক্ষণ, মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ সেন্টার টঙ্গী কর্তৃক শিক্ষক প্রশিক্ষণের সিলেবাসে সুদ ও এর কুফল বা মারাত্মক ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তাদের কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক আলোচনা পেশের মাধ্যমে জাতিকে অবহিত করার এ দায়িত্ব কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে মনে করিয়ে দেয়া,

জ. সুদবিহীন লাভ লোকসানভিত্তিক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা, সুদের খারাপ দিকগুলো জানানোর জন্যে বিভিন্ন প্রচার যন্ত্রে বিভিন্নভাবে অনুষ্ঠান প্রচার করা,

ঝ. ইসলামিক সংগঠনগুলো থেকে পরিকল্পিতভাবে এ সমস্ত বিষয়ের বিপরীতে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম করা,

www.amarboi.org

ঞ. বেতারের মাধ্যমে বিশেষ নাটক, গুরুত্বপূর্ণ সময় যেমন খবরের আগে ও পরে বিশেষ গুরুত্বের সাথে সুদের বিপরীতে বা নিরুৎসাহিতকরণে সুন্দর উপস্থাপনায় কুরআন ও হাদিসের বাণী প্রচার করা,

১০. গণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেমন-

ক. সুদের প্রতি ঘৃণা পোষণের মাধ্যমে প্রতিরোধ,

খ. সুদখোরদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক না করা,

গ. সামাজিকভাবে তাদেরকে একটু বাঁকা চোখে দেখা,

ঘ. সুদখোরদের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা,

ঙ. পার্লামেন্টে আইন পাশের মাধ্যমে তা সর্বত্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি।

ঘুষ ও দুর্নীতি অসচ্চরিত্রের প্রতিচ্ছবি

ঘুষ ও দুর্নীতি হলো একটা সামাজিক ব্যাধি। এটি এমন এক ধরনের অপরাধ যা গোপনীয়ভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। পাঁচ পাঁচবার দুর্নীতির শীর্ষে থাকা এদেশের মানুষ আজ হতাশাগ্রস্ত। আজ কতটা অসচ্চরিত্রের লোক জায়গামত চেয়ার দখল করে রাখার কারণে প্রত্যেক স্তরে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে তা যে বড়ই চিন্তার বিষয়। এ দুর্নীতির মূল মাধ্যম হলো ঘুষ। তারপর ক্ষমতার অপব্যবহার করে অর্থ আত্মসাৎ, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে অনীহা, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি যেন আজ অসচ্চরিত্রের প্রতিচ্ছবি। এর ফলে দরিদ্র মানুষেরা হয় নিগৃহীত নিষ্পেষিত ও শোষণের কবলে কবলিত। অধিকার বঞ্চিত মানুষেরা তখন অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে অনেক ক্ষেত্রেই সচ্চরিত্র থেকে ছিটকে পড়েছে।

পবিত্র কুরআনে এমন ঘুষ ও দুর্নীতিবাজদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৮৮)

আলোচ্য আয়াতে হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করা নিষিদ্ধ করা

www.amarboi.org

হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ج إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

"হে মানব জাতি! জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুসমূহ খাও। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৬৮)

অনুরূপ সূরা নাহলে ইরশাদ হয়েছে ঃ "তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে পবিত্র ও হালাল রুজী দান করেছেন তা থেকে তোমরা খাও এবং আল্লাহর নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তারই উপাসক হয়ে থাক।"

অন্যদিকে রাসূল (সা.) বলেছেন, "ঘুষদাতা, ঘুষ গ্রহীতা এবং ঘুষের লেনদেনে সহযোগিতাকারীরা অভিশপ্ত।" তিনি আরো বলেন ঃ

الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِى النَّارِ.

"ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামী।"

সুবহানাল্লাহ! যে অপরাধের কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) অপরাধীর ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছেন জাহান্নামী, তা কত বড় অপরাধ হতে পারে এবং এ ধরনের অপরাধীদের দুনিয়াবী কি ধরনের শাস্তি দেয়া যেতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ঘুষখোররা মানুষের রক্ত চুষে নেয়, তারা রাষ্ট্রীয় কাজের পরিবেশ, শৃঙ্খলা ও নিয়মনীতিকে বিনষ্ট করে, তারা মানুষের প্রয়োজন ও দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে শোষণের হাতকে প্রসারিত করে।

সুতরাং ঘুষ দুর্নীতি সমাজের নৈতিক ভিত্তি এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। দুর্নীতির প্রভাবে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গঠন হতে পারে না। সমাজে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ ব্যাপক দুর্নীতির শিকারে পরিণত হয়ে নীরবতা পালনে বাধ্য হয়। সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ডেকে আনে এ ঘুষ ও দুর্নীতি। দুর্নীতি সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও কলহ সৃষ্টি করে।

দুর্নীতি চক্রাকারে ক্রিয়াশীল আত্মঘাতী সামাজিক ব্যাধি। দুর্নীতিপূর্ণ সমাজে যে ব্যক্তি দুর্নীতির আশ্রয়ে অন্যকে প্রতারিত করে; সেও আবার অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় যিনি ঘুষ গ্রহণ করেন, ক্ষমতাচ্যুত হবার পর তিনিও ঘুষ প্রদানে বাধ্য হন। এভাবে চক্রাকারে দুর্নীতি সমাজে প্রসারিত হয়।

এবার এ দুর্নীতির প্রধান উপকরণ ঘুষের টাকার প্রভাবে মানুষ কিভাবে সচ্চরিত্রবান হওয়া থেকে ছিটকে পড়ে দেখুন ঃ

www.amarboi.org

০১. ঘুষ ও দুর্নীতি মানুষের মধ্যে উদারতা, সহনশীলতা, দানশীলতা, সহযোগিতা ও উপকারিতার মনোভাবের পরিবর্তে স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, কৃপণতা, নির্মমতা ও প্রতিশোধমূলক মনোভাবের জন্ম দেয়,
০২. ঘুষ ও দুর্নীতি মানুষের মধ্যে সীমাহীনভাবে লোভ সৃষ্টি করে এবং দানশীলতার মতো মহৎ গুণকে দূর করে দেয়,
০৩. ঘুষ ও দুর্নীতি হচ্ছে মানুষের উন্নত ও আদর্শ চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক,
০৪. ঘুষখোররা কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হবার পরিবর্তে তার বিপদ ও জরুরী প্রয়োজনের সুযোগে তার নিকট হতে মোটা অংকের ঘুষ আদায় করার চেষ্টায় মত্ত থাকে,
০৫. ঘুষ ও দুর্নীতি সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক। ফলে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা, গুম, রাহাজানি ইত্যাদি বেড়ে যায় এবং আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

ঘুষ ও দুর্নীতি থেকে মুক্তির উপায় কী

ঘুষ ও দুর্নীতি এদেশের মানুষের মাথায় জেঁকে বসেছে। প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষ আজ ঘুষ ও দুর্নীতির শিকার। এমনকি মানুষ হত্যার পর লাশ ও কবরের চিহ্ন মুছে দেয়া পর্যন্ত ঘুষ ও দুর্নীতির করাল ছোবল থেকে আজ এদেশে মুক্ত নয়। ফলশ্রুতিতে তা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে স্বাধীন দুর্নীতিদমন কমিশন গঠন করেছে সরকার কিন্তু বিধির কি বাম যেই কমিশন গঠিত হয়েছে দুর্নীতি রোধ করার জন্যে সেই কমিশনের কর্তৃপক্ষই যেন অজানা এক দুর্নীতির চাদরে আচ্ছন্ন হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাই আজ প্রয়োজন আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসভিত্তিক সমাধান ও তা থেকে মুক্তির স্থায়ী কোন পথ নির্দেশ। যা নিম্নরূপ ঃ

০১. আদর্শ শিক্ষা বাস্তবায়ন করা।
০২. সমাজ জীবনে দুর্নীতির ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।
০৩. দুর্নীতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা ও অনুভূতি সৃষ্টি করা।
০৪. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে তাকওয়ার অনুশীলন করা।
০৫. সৎ ও দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলা।
০৬. আখিরাত কেন্দ্রিক জীবন গঠনের প্রতি জনগণকে উৎসাহ দান।
০৭. জীবন-যাপনে আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।
০৮. সন্তানদেরকে এমন পরিবেশে গড়ে তোলা যাতে তারা স্বভাবগতভাবে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন হয় এবং অন্যায়কে ঘৃণা করতে শেখে।
০৯. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা।
১০. সৎ ও দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল, নেতৃত্ব ও কর্মী গড়ে তোলা।

www.amarboi.org

১১. বিচার ব্যবস্থায় ইসলামী শরীয়াতের যথাযথ অনুসরণ।
১২. রাষ্ট্রীয়ভাবে নামায ও যাকাত কায়েম করা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা।
১৩. কর্মজীবী মানুষের সম্মানজনক, ন্যায়সঙ্গত ও দ্রব্যমূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পারিশ্রমিক লাভের ব্যবস্থা করা।
১৪. জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
১৫. দ্রব্যমূল্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ।
১৬. অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনকারী ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ ও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১৭. মুনাফাখোর ও কালোবাজারীদের নিয়ন্ত্রণ ও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১৮. প্রশাসনে সৎ, তাকওয়াবান, দায়িত্বশীল ও দক্ষকর্মী নিয়োগ।
১৯. প্রশাসনে জনগণের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করে প্রশাসনকে জনগণের কাছে জবাবদিহির ব্যবস্থা করা।
২০. প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ ও আত্মিক পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করা।
২১. দুর্নীতিপরায়ণদের ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক শাস্তিদান নিশ্চিত করা।
২২. সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোকজনকে সামাজিকভাবে সর্বাধিক মর্যাদাবান ও পুরস্কৃত করা।
২৩. দুর্নীতিপরায়ণদের সামাজিকভাবে ঘৃণা প্রদর্শন, বয়কট ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করা।
২৪. বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে, আস্থাভাজন নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ইত্যাদির যৌথ উদ্যোগে দুর্নীতি বিরোধী জনমত গঠন ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলাম মূলতই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের মৌল ভাবধারা, ঈমান, আকীদা, মূল্যমান ও জীবন বিধানের ব্যাপক শিক্ষাদানের মাধ্যমে সে অনুযায়ী সমাজ গঠন করা ইসলামের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যা সত্য, যা কল্যাণকর তাই হয় তাদের নিজ নিজ জীবনে একমাত্র সত্য ও কল্যাণকর। পক্ষান্তরে কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে যা মিথ্যা, বাতিল, অন্যায় ও পাপ তাদের মন-মানসিকতা ও জীবনের কর্মতৎপরতায় তা-ই হয় সম্পূর্ণ বর্জিত ও প্রত্যাখ্যাত। এভাবে তৈরি করা লোকেরা প্রথমোক্ত জিনিসকে অগ্রাহ্য করতে এবং শেষোক্ত কার্যাবলি গ্রহণ ও অবলম্বন করতে কোন অবস্থায়ই প্রস্তুত হয় না। এভাবেই ইসলাম তার যাবতীয় মূল্যমান ও নিয়ম-বিধানসহ উক্ত ব্যক্তিদের জীবন এবং সেই ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সমাজের ক্ষেত্রে পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত করা হয়। বস্তুত ইসলামের এ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় কেবলমাত্র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। এজন্য ইসলামে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে

www.amarboi.org

তা সংঘটিত না হওয়া বা সংঘটিত হতে না দেয়ার উপর বা তার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে দেয়ার উপর। এ ক্ষেত্রে ইসলাম যেসব উপায় অবলম্বন করেছে, তন্মধ্যে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দান ব্যাপকতরকরণ অন্যতম। এ ব্যাপারে ইসলাম সব দিকে একটি সর্বোত্তম ব্যবস্থা নিয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রভৃতির মধ্যে কোনো একটা দিককেও ইসলামে বাদ দেয়া হয়নি। যে যে ছিদ্র পথে দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করতে পারে ও করার সুযোগ পায়, তার প্রত্যেকটি বন্ধ করে দিতে ইসলাম আগ্রহী এবং সচেষ্ট। এ কারণেই এ সত্য কারো অস্বীকার করার অবকাশ নেই, মানুষ সমাজের মধ্যে দুর্নীতির সর্বনিম্ন মাত্রার দিক দিয়ে এখনও ইসলামী সমাজ অনন্য ও অতুলনীয়। আর তার কারণ হচ্ছে ইসলাম চতুর্দিক দিয়েই এ লক্ষ্যে অগ্রসর হয় এবং দুর্নীতি নির্মূল বা তার ক্ষেত্র সংকীর্ণকরণে বাস্তব কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করে।

দুনিয়ার মহব্বত

যে বস্তুর মধ্যে উপস্থিত ক্ষেত্রে আনন্দ পাওয়া যায় এবং পরকালে তার কোনো ফলাফল প্রতিফলিত হয় না, তাই দুনিয়া। সাধারণের পরিভাষায় যে অবস্থা আখিরাতের অন্তরায়, তার নাম দুনিয়া। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের জীবনের যত অবস্থা কাজ কারবার, ঝামেলা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, ধন-সম্পদ ও বিদ্যমান বস্তুসমূহের সাথে অন্তরাত্মাকে আবদ্ধ করার নামই দুনিয়ার মহব্বত।

মূলত দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের সম্পদ সংগ্রহ করার ক্ষেত্র বা জায়গা। দুনিয়া মানুষের স্বল্পকালের আবাস, চাহিদা বা প্রয়োজন পূর্ণ করার স্থান। দুনিয়ায় সফলতা মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। বরং মানব জীবনের উদ্দেশ্য হলো আখিরাত। এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে এমনভাবে আত্মহারা হয়ে যায় যে, সে কোথা থেকে আসছে এবং তার গন্তব্য স্থান কোথায়? এ ব্যাপারে সে উদাসীন থাকে। এইভাবে যারা পার্থিব বিষয়াদিতে নিমজ্জিত হয়ে যায় তাদেরকে আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসে বিশেষভাবে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِعْلَمُوْا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ج وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

"তোমরা জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের

www.amarboi.org

প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। এর উপমা বৃষ্টি, যার দ্বারা উৎপন্ন শস্য ভাণ্ডার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তা পিতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুটি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" (সূরা আল হাদীদ, ৫৭ ঃ ২০)

মুমিনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পারলৌকিক সাফল্য ও মুক্তি লাভ। এ মুক্তির পথে অন্তরায় বা বাঁধা হলো পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়া। দুনিয়া প্রীতি, দুনিয়ার আকর্ষণ ও দুনিয়ার মোহ, আখিরাতের চিন্তা ও চেতনাকে বাদ দিয়ে দুনিয়া অগ্রাধিকার পেলে মানুষ পাপ কাজে লিপ্ত হবেই। আর পাপ কাজ জাহান্নামের দিকে টেনে নেবেই। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ـ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ـ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى.

"অনন্তর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নিয়েছে জাহান্নামই তার আবাস।" (সূরা আন নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৩৭-৩৯)

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে সীমালঙ্ঘন ও দুনিয়ার জীবন বেছে নেয়াকে বা অগ্রাধিকার দেয়ার পরিণতি ও পরিণাম জাহান্নাম বলে দেয়া হয়েছে। পরকালকে উপেক্ষা করে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া আখিরাতমুখী মানুষের কাজ নয়। আখিরাতমুখী মানুষের কাজ হলো দুনিয়ার উপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশমত জীবন যাপন করা। তবেই আখিরাতের সুখ ও শান্তি এবং মুক্তি আশা করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে যদি কেউ দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়ে দুনিয়ার প্রীতি, আকর্ষণ ও মোহে পড়ে যায় তবে সে জাহান্নামী। কেননা, হাদিসে ইরশাদ হয়েছে ঃ "দুনিয়ার ভালবাসাই হলো সকল পাপের মূল। এ কারণে পাপমুক্ত জীবন যাপন করতে হলে দুনিয়ার চাকচিক্য, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, পরকালের তুলনায় অতীব নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী– এ ধারণা ও বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল রাখতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ.

"পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি অনুধাবন কর না?" (সূরা আল আন'আম, ০৬ ঃ ৩২)

أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ ج فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيْلٌ.

www.amarboi.org

"তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অতি নগণ্য।" (সূরা আত তাওবা, ০৯ ঃ ৩৮)

وَفَرِحُوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ.

"এরা পার্থিব জীবনে উল্লসিত অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র।" (সূরা আর রা'দ, ১৩ ঃ ২৬)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ ج وَإِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ج لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

"এ পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত!" (সূরা আল আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৪)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে দুনিয়ার প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া এক প্রতারণার স্থান এবং ধোঁকার ক্ষেত্র মাত্র। মানুষ দুনিয়ার সাময়িক রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্যের বাহার দেখে প্রতারিত হয়ে নিজের অনন্ত জীবন যেন বরবাদ না করে দেয় পবিত্র কুরআন সে আহ্বানই জানিয়েছে।

হাদিসেও রাসূলুল্লাহ (সা.) দুনিয়াকে অতি তুচ্ছ ও নগণ্য বলে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ مِثْلَ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ.

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "আল্লাহর কসম! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার উপমা কেবল এতটুকুই যে, তোমাদের কেউ সমুদ্রে তার আঙ্গুলটি চুবিয়ে নিল, এবার সে দেখুক, এ আঙ্গুল কতটুকু পানি নিয়ে এসেছে।" (মুসলিম শরীফ)

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَاسَقٰى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً.

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "দুনিয়াটা যদি আল্লাহর নিকট একটি মশার ডানার মতোও মূল্যবান হতো তাহলে তিনি কোনো কাফিরকে এ থেকে এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেন না।" (তিরমিযী শরীফ)

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "দুনিয়া মুমিনের জেলখানা আর কাফিরের জন্য জান্নাত।" (মুসলিম শরীফ)

www.amarboi.org

مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهِ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهُ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَايَفْنٰى.

"যে ব্যক্তি দুনিয়াকে মহব্বত করল সে তার আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করল। আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে মহব্বত করল সে তার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করল। সুতরাং তোমরা অস্থায়ী বস্তুর উপর চিরস্থায়ী বস্তুকে প্রাধান্য দিবে।" (আহমাদ ও বায়হাকী শরীফ)

সুতরাং আজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত কোনটি চাই? দুনিয়া না আখিরাত! দুনিয়ার নেশায় অসচ্চরিত্রের বিভিন্ন ছোঁয়ায় সম্পদ বৃদ্ধি করার চেষ্টা না করে মূলত সচ্চরিত্রবান হয়ে ধৈর্য ধারণ করা উচিত। তাছাড়া মানুষ যা চায় আল্লাহ তাদেরকে তাই দেন। আল্লাহ পরিষ্কারভাবে কুরআনে বলে দিয়েছেন ঃ

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِيْ حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا.

"যে ব্যক্তি পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার ফসল বৃদ্ধি সাধন করি আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমি তাকে তাই দান করি, পরকালে তার কোনো অংশ নাই।" (সূরা আশ শুরা, ৪২ ঃ ২০)

দুনিয়ার মহব্বত থেকে মুক্তির উপায়

দুনিয়ার মহব্বত থেকে বেঁচে থেকে চিরস্থায়ী কল্যাণ ও মহাসুখের স্থান জান্নাত লাভের জন্য আমাদের যা করতে হবে তা হলো ঃ

০১. জীবনের অধিক সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ.

"সকল প্রকার স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে তোমরা স্মরণ করো।" (মিশকাত শরীফ)

০২. সকল সময় সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যকে অপরিহার্য করে নিতে হবে। এর বিশেষ প্রভাবে অন্তরে চিন্তা সৃষ্টি হবে। অন্তরে চিন্তা থাকলে সকল কাজই সঠিক পথে পরিচালিত হবে। (শরীয়াত ও তরীকাত)

০৩. অন্যের গাড়ি, বাড়ি দেখে ব্যতিব্যস্ত না হয়ে পড়া।

০৪. ভোগে সুখ নেই ত্যাগেই প্রকত সুখ সে বিষয়টি মাথায় রাখা।

০৫. অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা নিরাপদ। (আবু দাউদ)

০৬. পরিকল্পিতভাবে যথাসময়ে যাকাত প্রদান করা।

www.amarboi.org

০৭. সরকারকে ট্যাক্স ও ভ্যাট প্রদান করার মতো সম্পদ থাকলে তা করা।
০৮. পরিবারের অন্যান্য সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর হকের প্রতি খেয়াল রাখা।
০৯. দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তার হক প্রদান করা।
১০. ধনী শ্রেণী বা দুনিয়া নিয়ে যারা ব্যস্ত তাদের বাসায় যাতায়াত কম করা।
১১. ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদের পরিকল্পনা না করে বা করলে শরীয়াতসম্মত পন্থায় করা।
১২. আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল হওয়া।
১৩. রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের জীবনাদর্শ মনের মধ্যে স্থান দেয়া।
১৪. সর্বাবস্থায় শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য সাহায্য কামনা করা। দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকার জন্য সাহায্য কামনা করা।

রাসূল (সা.) বলেন ঃ "দু'টি ক্ষুধার্ত বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে তারা পালের এতটুকু ক্ষতি করে না, যতটুকু মানুষের ধনসম্পদ ও জাঁকজমকের লালসা তার দ্বীনের ক্ষতি করে।" (তিরমিযী শরীফ)

তাছাড়া মনে রাখতে হবে দুনিয়া ও আখিরাত পরস্পর বিপরীতমুখী। একটি মহব্বত করলে অপরটি স্বভাবতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

"দুনিয়া পেছনের দিক চলে যাচ্ছে। আর আখিরাত সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। এ দু'টির প্রত্যেকটির রয়েছে আসক্তবৃন্দ। সুতরাং তোমরা আখিরাতের আসক্ত হয়ে থেকো। দুনিয়ার আসক্ত হয়ো না। কারণ এখন আমলের সময়। আর আগামীকাল হবে হিসাবের, সেখানে আমল করার সুযোগ নেই।" (বুখারী শরীফ)

যেদিকের মেঘ সেদিকে ছাতা
মানুষকে ভালবাসা পরে ছিদ্রান্বেষণ করা

তেলের মাথায় তেল দেয়া

মানব চরিত্রের একটি অন্যতম দিক হলো নিজস্ব স্বকীয়তাবোধ। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি, পরিবার থেকে পরিবার, এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে এবং সবশেষে রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিগত ভিন্নতাই হলো স্বকীয়তা। এ স্বকীয়তাবোধের জন্যই একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং একজন অপরজনের সাথে একত্রিত হয় বা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। সমাজ সামাজিকতার এ অঙ্গনে মানুষ মানুষের জন্য– এ নীতিবোধে উজ্জীবিত হওয়ার প্রয়োজনেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে হওয়া উচিত আত্ম প্রত্যয়শীল বা আত্মবিশ্বাসী ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আর তাহলেই সে দায়িত্ব ও কতর্ব্য পালন করতে পারবে সকলের প্রতি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধে উজ্জীবিত হয়ে মানতার কল্যাণে কাজ করাই হচ্ছে অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আজকাল সমাজে কতিপয় লোক রয়েছে যারা সবসময় সুযোগ খুঁজতে থাকে, যেদিকে সম্পদ ও ক্ষমতার দাপট বা

www.amarboi.org

প্রভাব বেশি নিমিষের মধ্যেই সেদিকে ঝুঁকে যায়– যাকে বলা হয় তেলের মাথায় তেল দেয়া। যেখানে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করা বা লাভবান হওয়ার সুযোগ বেশি সেদিকে বা সেখানে নীতি নৈতিকতাবোধ বিসর্জন দিতেও এমন লোকজনেরা দ্বিধাবোধ করে না। তারা সবসময় নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং যেখানে তাদের স্বার্থ পরিপূর্ণ হবে সেখানে প্রয়োজনে অন্যায়কেও বরণ করে নিতে তারা সংকোচবোধ করে না। তাদের অন্তর এক রকম, বাইরে অন্যরকম। তারা মুখে দয়া, মায়া-মহব্বত ও ভালবাসা প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে অন্যকে স্থান দিয়ে থাকে। তাদের কাছে দৃশ্যমান সম্পদের কারণে অনাদর্শও আদর্শ হয়ে যায় অর্থাৎ আদর্শিকতার কোনো দাম থাকে না। মানবতার দাবিও নিরবে নিভৃতে কাঁদে, তারা শুধু চায় নিজেদের স্বার্থকে শতভাগ সংরক্ষণ– এ সুযোগ সন্ধানী মানুষগুলোর দ্বারা সমাজের লোকজনের ক্ষতি হয় এবং রাষ্ট্রের সমষ্টিক উন্নয়ন অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। অবশ্য এক সময় তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এমন শ্রেণীর পরিচয় এবং শাস্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে আল কুরআনে বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.

"আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনেছি; কিন্তু তারা মুমিন নয়। আল্লাহ ও মুমিনদেরকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকেও প্রতারিত করে না, তা তারা বুঝতে পারে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তারপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করে দেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, যেহেতু তারা মিথ্যা বলে। তাদেরকে যখন বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি

www.amarboi.org

সৃষ্টি করো না, তারা বলে আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী। সাবধান! তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ঈমান এনেছে তাদের মতো ঈমান আন, তারা বলে নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনব? সাবধান! তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না। তারাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, তারা সৎ পথেও পরিচালিত নয়।" (সূরা আল বাকারা, ৩২ ঃ ০৮-১৩, ১৬)

আমাদের সমাজে এমন যাদের চরিত্র তারা মুনাফিক। আর মুনফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে স্থান পাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا.

"মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কোনও সহায় পাবে না।" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ১৪৫)

আল কুরআনুল কারীমের বহু আয়াতে মুনাফিকদের অপতৎপরতা ও অপকর্মের বর্ণনা রয়েছে। এমনকি এ ব্যাপারে একটি সূরাও নাযিল হয়েছে। কাজেই আজ প্রয়োজন এমন মারাত্মক পাপ থেকে এ উম্মাহকে বাঁচানোর লক্ষ্যে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং তাদেরকে বেশি বেশি করে আদর্শিক জ্ঞান অর্জনে আকৃষ্ট করা, নিরবে নিভৃতে সংশোধন করানোর চেষ্টা করা। যা একান্ত আপনজনদের দ্বারাই সম্ভব।

ভালবাসা অত্যন্ত পবিত্র

ভালবাসা এটি আল্লাহর সিফাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন ভালবেসে মহব্বত করে। আর সেই মহব্বত ভালবাসার কারণে পৃথিবীতে প্রত্যেক প্রাণী তার বংশধরদেরকে ভালবাসে, ভালবাসে যে তাকে আশ্রয় দেয়, খাবার দেয়, আঘাত করে না তাকেও। কুকুর, সাপ, বিড়াল, গরু, মহিষ, ছাগল, হাঁস-মুরগী ও পাখি এ সবই মানুষের সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ।

মানুষের মধ্যে এ ভালবাসা ব্যক্তি বিশেষে, বয়স শ্রেণীভেদে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রকম অর্থে বা নামে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

মা-বাবা শিক্ষক ও বড়দের প্রতি ভালবাসা শ্রদ্ধা অর্থে, সমবয়সীদের সাথে ভালবাসা বন্ধুত্ব অর্থে, বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে হলে প্রেম অর্থে, বয়সে ছোটদের সাথে হলে স্নেহ আদর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অন্যদিকে এ প্রেম ভালবাসা যদি হয় আমাদের স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রতি, আল্লাহর ও আল্লাহর রাসূল (সা.) কে মাঝখানে রেখে আদর্শিকতা বাস্তবায়নে যারা কাজ করে তাদের প্রতি, হৃদয় মন অন্তরের অন্তরস্থল থেকে তাহলে এ ভালবাসা ইসলামে জায়িয এবং পবিত্রতম।

www.amarboi.org

ভালবাসার মূল্য পরিমাপ অযোগ্য

ভালবাসা থেকে ভাললাগা তারপর প্রেম মহব্বত সৃষ্টি হওয়া একে অপরের সাথে চিন্তা-ভাবনায়, মনের মাধুরীতে, অন্তরের অন্তরস্থলে মিলে যাওয়া। এ ভালবাসা অজেয়কে জয় করতে পারে মানুষকে নিয়ে যেতে পারে সীমাহীন মোহনায়, অবধারিত করে দিতে পারে জান্নাত, আবার ঠেলে দিতে পারে জাহান্নামে, এ ভালবাসা মানুষের জীবনে সফলতার দ্বার উন্মোচন করে দিতে পারে আবার মৃত্যুর কোলেও ঢলিয়ে দিতে পারে। এ ভালবাসার বিমুখেই মানুষ আত্মহত্যা ও এসিড সন্ত্রাসের মতো অনেক ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডও ঘটিয়ে থাকে।

এ ভালবাসার আহ্বানে যে কোনো মানুষ অসচ্চরিত্র থেকে সচ্চরিত্রে ফিরে আসতে পারে, এ দাবি অনুসারে মা-বাবা তাদের সন্তানদেরকে, বড়রা ছোটদেরকে, সমাজের নেতারা সমাজে সেবাদানকারী সব লোকজনকে, রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আদর্শ বিরোধী চিন্তা-চেতনা ও কর্মে অংশগ্রহণ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। মানুষ হবে সবসময় সদাজাগ্রত। ফলে সবাই হবে উপকৃত। আর এটিই হচ্ছে ভালবাসার মূল্য। যা পৃথিবীর অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ অযোগ্য।

ভালবাসা কখন অপবিত্র বা হারাম

ভালবাসা যখন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি বা যুবক-যুবতীর প্রতি ইসলামসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয় তখন তা হয় অপবিত্র বা হারাম। ভালবাসা দোষের নয় তবে শরীয়াতসম্মত না হলে তা হবে দোষের। আর এ ভালবাসাকে স্থায়ী রূপ দিতে, অবৈধ প্রেমের ফলে সমাজে যেন শান্তি বিনষ্ট না হয়, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি ও শক্তির জগৎ সৃষ্টি না হয় সে ক্ষেত্রে ইসলাম উভয়ের পছন্দের ভিত্তিতে, অভিভাবকদের মতামত অনুসারে, সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে, সামাজিকভাবে বিয়ের ব্যবস্থা ঘোষণা করেছে। এতে শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিক সকল পক্ষের পজিটিভ দিক ও স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং ভালবাসারও মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজও রাষ্ট্রে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করে।

ভালবাসার পর ছিদ্রান্বেষণ করা অত্যন্ত জঘন্য

সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি আল্লাহর ভালবাসার বাস্তব প্রতিফলন। আর পৃথিবীতে শত শত কোটি মানুষের আগমন আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও আদি মা হাওয়া (আ.) থেকে শুরু করে আজকের মা-বাবাদের ভালবাসার ফসল। কাজেই ভালবাসা এ যে পবিত্র; এ যে জীবন্ত; এ যে সকলের ভুল-ত্রুটি দূর করে আদর্শ মানুষ গঠনের মূলমন্ত্র। শুধু প্রয়োজন আন্তরিকতা, আদর্শ মন-মানসিকতা, সুন্দরভাবে উপস্থাপন এবং সংশোধন করানোর আপ্রাণ চেষ্টা। যে চেষ্টার বদৌলতে ভালবাসার দাবি অনুসারে তাদের যে কোনো ত্রুটি এমনকি অতিবাহিত জীবনের অভ্যাস ও সংশোধন হতে বাধ্য। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

www.amarboi.org

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى.

"তোমরা পুণ্য ও আল্লাহভীতিমূলক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো; কিন্তু গুনাহ ও সীমালংঘনমূলক কাজে পরস্পরের সহযোগী হয়ো না; আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহর দণ্ড অত্যন্ত কঠিন।" (সূরা আল মায়িদা, ০৫ ঃ ০২)

মানুষ ফিরিশতা সমতুল্য নয়। সুতরাং ভুল করবে; দোষ-ত্রুটি থাকবে আবার সংশোধন হবে। এ সংশোধনে যারা ভূমিকা রাখবে তারাই হবে উত্তম। তারাই থাকবে সব সময় মনের মণিকোঠায়। আর এ যে আল্লাহর আদেশ এবং রাসূল (সা.)-এর চরিতাদর্শ। রাসূল (সা.) যখনই সাহাবীদের কোনো ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করতেন সাথে সাথে তা সংশোধনের পরামর্শ দিতেন। কিন্তু আজকে যারা সেই রাসূল (সা.)-এর নীতি মেনে চলে না, ভাল বলে তারপর দুনিয়ামুখিতার ধূয়া তুলে ছিটকে ফেলে দেয়; এটা সেটা বলে ছিদ্রান্বেষণ করার চেষ্টা করে। (হোক মিথ্যা বা সত্য দোষ-ত্রুটির বর্ণনা) এটি কি মানবতার ধর্ম ইসলাম; মুসলিম জাতি গোষ্ঠীর চরিত্রে কস্মিনকালেও সমর্থন করে? এটা কী সচ্চরিত্রবান মানুষের দায়িত্ববোধসম্পন্ন আচরণ হতে পারে?

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

"তোমাদের কেউ (পূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার ইচ্ছা ও কামনা আমার নিয়ে আসা আদর্শের পূর্ণ অনুসারী হবে।"

আবার অন্যদিকে যারা রাসূল (সা.)-কে অনুসরণ করে, ভালবেসে অত্যন্ত আপনজনদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনে পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধূয়া তুলে (চুপচাপ না, শান্তশিষ্ট না, বেশি-বেশি কথা বলে, এত কম বয়সে ইসলাম-ইসলাম করে, যে কোনো বিষয়ে কুরআন, হাদিস নিয়ে আসে ইত্যাদি) দূরে সরিয়ে দেয়, মুখ ফিরিয়ে নেয় সে সকল লোকগুলোও কী সচ্চরিত্রবান মানুষ হতে পারে?

নাকি, যে চেষ্টা করেছে অন্যদেরকে পূত-পবিত্র ও আখিরাতে আল্লাহর প্রিয় বান্দার আদর্শে আদর্শমণ্ডিত করতে; যে দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আখিরাতের দিকে ছুটে, কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য অনুসারে সচ্চরিত্রবান মানুষতো তাকেই বলে। যে ভালবাসার পজিটিভ মূল্য পরিমাপ অযোগ্য; সে ভালবাসার নেগেটিভ মূল্যও কী পরিমাপ অযোগ্য বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি নয়— যা থমকে দিতে পারে, ধ্বংস করে দিতে পারে আগামীদিনের সুন্দর জীবন ব্যবস্থাকে? হয়তোবা তাই! যার জন্যই অনেকে সুন্দর জীবন ছেড়ে আত্মহননের মতো কিছু বেছে নিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

আজকে সমাজে এক শ্রেণীর লোক যেদিকে দৃশ্যমান সম্পদের ভার বেশি

www.amarboi.org

সেদিকে ঝুঁকে (হালাল কি হারাম, বৈধ কি অবৈধ, সৎ কি অসৎ উপায়ে উপার্জিত)। পূর্বের ভালবাসার মানুষটির ব্যাপারে ছিদ্রান্বেষণ করে দূরে সরিয়ে দেয়– একটু চিন্তাও করে না এইতো সেদিন আমিই বলেছি ভাল আজ কী করে বলি কাল? আসলে কি এটি ইসলামসম্মত? নাকি গীবতের ন্যায় মারাত্মক শাস্তি যোগ্য! আছে কী দুনিয়া ছাড়া এটিকে পরিমাপ করার মতো অন্য কোথাও কোন মানদণ্ড– অবশ্যই আছে।

কাজেই আসুন, এমন ভালবাসা পরিহার করে সকলকে সুন্দর সচ্চরিত্রবান করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের হাতকে প্রশস্ত করি। ভাল কাজ করলে সওয়াব পাব জীবন অবধি, আর আখিরাতে উপহার পাব চিরসুখের স্থান জান্নাত।

মিথ্যাচার

মিথ্যা সকল পাপের জননী

মিথ্যা সকল অপকর্মের মূল। মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়; মানুষের মান মর্যাদা ও সম্মানকে করে পদদলিত। মানুষের সকল অহংকারকে করে পরাস্ত এবং পতনকে করে ত্বরান্বিত। মিথ্যা মানুষের মন ও হৃদয়কে করে অত্যন্ত কঠিন ও শক্ত। আর এমন মিথ্যা যে বলে সে কখনো সচ্চরিত্রবান মানুষ হতে পারে না। আর তাই সচ্চরিত্রবান মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে মিথ্যা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ.

"এবং তোমরা মিথ্যা কথন দূরে থাক বা বেঁচে থাকো।" (সূরা হজ্জ, ২২ ঃ ৩০)

মিথ্যা মানুষদেরকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে এবং আল্লাহর কাছেও শাস্তির পর্যায়ে নিয়ে যায়। কুফর ও শিরকের পর কেবল মিথ্যার জন্যই মর্মন্তুদ শাস্তির কথা পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন ঃ

اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ.

"আল্লাহর লানত তার উপর যদি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।" (সূরা আন নূর, ২৪ ঃ ০৭)

এমনকি বাচ্চাদের মন ভুলানোর জন্য অসত্য কথা বলাও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। অল্পবয়সী এক সাহাবী বলেন, "একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের ঘরে ছিলেন। মা আমাকে ডেকে বললেন, এসো, তোমাকে কিছু দিবো। তা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি তাকে কিছু দিতে চেয়েছ? মা বললেন, তাকে খেজুর দিবো। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি তাকে এ সময় কিছু না দিতে তাহলে এই মিথ্যাটিও তোমার আমলনামায় লেখা হতো।"

www.amarboi.org

মিথ্যা মানুষকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّٰى حَتّٰى يُكْتُبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

"তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকবে। কেননা, মিথ্যা পাপাচার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। আর পাপাচার জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। ব্যক্তি যখন অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে তখন আল্লাহর নিকট তাকে মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।"

কথা ও কাজের মধ্যে মিল না থাকাও এক প্রকার মিথ্যাচার। অবশ্য কুরআনের পরিভাষায় একে 'মুনাফিকী' বলা হয়েছে। মুখে এক কথা এবং অন্তরে আরেক অবস্থা একে 'মুনাফিকী' ও কপটতা বলা হয়। মিথ্যাচার হলো কপটতার একটি বিশেষ আলামত বা চিহ্ন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ.

"এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।" (সূরা আল মুনাফিকুন, ৬৩ ঃ ০১)

অঙ্গীকার ভঙ্গ করাও এক প্রকারের মিথ্যা। মুমিনের জন্য উচিত অঙ্গীকার রক্ষা করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। কোনো কথা শুনার পর তা যাচাই না করে বলতে থাকা মানুষকে এক পর্যায়ে মিথ্যা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ.

"কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়।" (মুসলিম শরীফ)

মিথ্যাবাদী ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কখনো উপকার ও উন্নতি বয়ে আনতে পারে না। বরং সে সবার অলক্ষ্যে তার এ অসচ্চরিত্রের দোষে অন্যদেরকেও অনেক ক্ষেত্রে জ্বালাতন করে থাকে। তবে সে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই শাস্তি ভোগ করবে। সুতরাং মারাত্মক পাপ বা ধ্বংসকারী বদ অভ্যাস থেকে আমাদের মুক্ত থাকা উচিত। কেননা, এটি হচ্ছে সকল পাপের মূল। রাসূল (সা.) বলেন ঃ "মিথ্যা সকল পাপের মূল বা জননী।"

www.amarboi.org

কখন মিথ্যা একেবারে নিষিদ্ধ

সম্পদের গৌরব ও ক্ষমতার বাহাদুরি জাহির করতে মিথ্যা বলা চরমভাবে নিষিদ্ধ। সুনিশ্চিতভাবে না জেনে কাউকে কোনো সংবাদ দেয়া নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে কোনো ধর্ম বিধান না জেনে তার 'ফতোয়া' (ব্যবস্থা) দেয়াও নিষিদ্ধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা প্রকাশের ভয়ে ধর্ম সম্পর্কিত কোনো বিধান না জেনে বুঝে অহংকার ও পাণ্ডিত্য খ্যাতি বজায় রাখার জন্য 'ফতোয়া' (ব্যবস্থা) দিয়ে থাকে। নিকৃষ্ট ধর্মজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, দান খয়রাতের পুণ্য ও কল্যাণ বর্ণনার সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে মিথ্যা হাদিস বলা সংগত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সংগত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম নিয়ে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করা নিষিদ্ধ। তিনি বলেছেন, "আমার নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করো না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার নামে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করবে, সে যেন নিজেই জাহান্নামে তার স্থান তালাশ করে।" শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন ছাড়া মিথ্যা বলা অনুচিত। অনুমান নির্ভর, অনিশ্চিত সংবাদ প্রকাশ করা, উচিত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দায়ে ঠেকার মতো মহাপ্রয়োজন সঙ্কটে পরিণত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যা বলা অনুচিত।

কখন মিথ্যা বলা বৈধ বা জায়িয

ইমাম নববী (র.) বলেন, মিথ্যা বলা মূলত হারাম। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কতগুলো শর্ত সাপেক্ষে তা জায়িয। সংক্ষেপে তা হলো ঃ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মানুষকে কথা বলতে হয়। ভাল উদ্দেশ্য যদি মিথ্যা ছাড়া লাভ করা যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা হারাম। কিন্তু যদি তা মিথ্যা কথা বলা ছাড়া লাভ করা না যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা জায়িয। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যদি মুবাহ হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলাও মুবাহ। আর যদি তা ওয়াজিব হয় তাহলে মিথ্যা বলাও ওয়াজিব। যেমন কোনো হত্যাকারী যালিমের ভয়ে কোনো মুসলমান কোনো ব্যক্তির কাছে লুকিয়ে আছে অথবা ধন-সম্পদ লুট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা অন্যের কাছে সরিয়ে রেখেছে, আর যালিম যদি কারো কাছে তা জানার জন্য খোঁজ নেয়, তখন মিথ্যা বলা ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব। এমনিভাবে কারো কাছে যদি কোনো আমানত গচ্ছিত থাকে আর যালিম যদি তা ছিনিয়ে নিতে চায়, তবে তা গোপন করার জন্য মিথ্যা বলা ওয়াজিব। এসব ক্ষেত্রে রূপক ভাষার মাধ্যমে কাজ উদ্ধার করতে হবে। তার কথার সাথে সঠিক উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এক্ষেত্রে সে মিথ্যুক হবে না যদিও শব্দগুলো বাহ্যত মিথ্যার অর্থ প্রকাশ করে বা যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে তার দিক থেকে বিচার করলে তা মিথ্যাই মনে হয়। এই অবস্থায় যদি চতুরতা পরিহার করে সরাসরি মিথ্যা কথা বলা হয়, তবুও তা হারাম হবে না।

www.amarboi.org

এসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ উম্মে কুলসুম (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। হাদিসটি এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِىْ خَيْرَ اَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا.

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে দুই বিবাদমান দলের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে সে মিথ্যুক নয়, বরং সে কল্যাণ বৃদ্ধি করে এবং কল্যাণের কথা বলে।" (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলতে সম্মতি দিয়েছেন –

০১. ধর্মযুদ্ধে বিরোধীপক্ষ থেকে নিজেদের মতলব গোপন করতে।

০২. বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য। এক পক্ষের কথা অপ্রিয় হলেও অন্যপক্ষের কাছে প্রিয়ভাবে উত্থাপন করবেন।

০৩. একাধিক পত্নী থাকলে সবার কাছে 'আমি তোমাকে বেশি ভালবাসি' এরূপ বলা জায়িয।

সত্যবাদী হওয়ার উপায় বা পদ্ধতি

সত্যবাদী হওয়ার প্রশিক্ষণ ছোটবেলা থেকে দিতে হবে। এ প্রশিক্ষণের স্থান হলো পরিবার। প্রশিক্ষক মা-বাবা। একটু সচেতন ও মেধা খাটালে সন্তানদেরকে সত্যবাদী করে তোলা যায়। যা নিম্নরূপ ঃ

০১. সত্য চির সুন্দর মিথ্যা অপসৃত। সন্তানদের সাথে কথোপকথনে মিথ্যা বলতে কিছু আছে তা বুঝতেই দেয়া যাবে না। মিথ্যার সাথে পরিচিত করানো যাবে না। আর সে লক্ষ্যেই সত্য কথা বা সন্তানেরা যা বলবে তাই সত্য এমন স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরকে সত্য বলায় উৎসাহিত করা উত্তম। অর্থাৎ মিথ্যা কিছু আছে বা মিথ্যাবাদী এমন কথা তাদের সামনে বলা অনুচিত।

০২. তাদের কোনো কথা অকস্মাৎ ভুল হলে অনেক সময় মা-বাবারা বলে উঠেন মিথ্যা কথা বলছ কেন? অথচ সে কিন্তু মিথ্যা কী তা তখনো হয়তোবা জানেই না; এমনটি না বলা।

০৩. সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। এটা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়া।

০৪. ছেলে-মেয়েরা অকস্মাৎ কোনো কথা মিথ্যা বললেও তাকে মিথ্যাবাদী বলে লজ্জা না দিয়ে পাশ কেটে তা সংশোধন করে দেয়ার চেষ্টা করা। অর্থাৎ তাদের নেগেটিভকে আপনার কাছে পজিটিভ মনে করা, পজিটিভরূপে গ্রহণ করা।

০৫. সন্তানদের বয়স দশ বছর থেকে পনের বছর এমন অবস্থায় কোনো কিছুতে মিথ্যার আশ্রয় নিলে মা-বাবা বুঝবেন– এটা স্বাভাবিক। কারণ একটা

www.amarboi.org

মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে একশ'টা মিথ্যা কথা বলতে হবে। এক্ষেত্রে এতগুলি মিথ্যা কথা সে গুছিয়ে বলতে পারবে না। সুতরাং আপনি বুঝাবেন – এক্ষেত্রে তাদেরকে সুন্দর করে তার কুফল ও সুফল সমসাময়িক প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যতের টার্গেটের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বলবেন।

০৬. আজকাল সন্তানরা মায়ের সাথে স্কুলে যাওয়া-আসা করে, মা বান্ধবীদের সাথে স্কুল ক্যাম্পাসে গল্প গুজব ও শপিং করতে মার্কেটে গিয়ে থাকে, বাবা ফোন করে তুমি কোথায়? বলে.....। কী করছ? জবাব..... অথবা বাসায় ফিরতে দেরী হয়। এতে বাবার জিজ্ঞাসা এবং রাগ চোখকে পরাস্ত করতে মা শিখিয়ে দিলো তুমি বলবে.....। অর্থাৎ যা বললে বাবা আর রাগ করবে না ইত্যাদি..... ইত্যাদি। এতে সন্তান মায়ের মুখ থেকেই মিথ্যা শিখে নিল। পরবর্তীতে সে আবার নিজেই মায়ের সাথে এমন কথা বলে মায়ের চোখকে বাবার চোখকে ফাঁকি দিতে শুরু করবে। মিথ্যা কথা বলে বাবার চোখকে ফাঁকি দেয়ার প্রথম প্রশিক্ষণ অনেক ক্ষেত্রে এভাবেই হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে মা যদি এমনটি না শিখায় তাহলে সন্তান কখনোই এমন কথা বলবে না, শিখতে পারবে না।

০৭. যাদের বয়স দশ থেকে পনের বা আঠার বছর পর্যন্ত তাদেরকে মিথ্যার পরিণাম বা খারাপ দিক সম্পর্কে আদর করে বলুন, বুঝিয়ে বলুন। তারপরও যদি সে মিথ্যা বলা ত্যাগ না করে তাহলে তাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলুন, যদি আজকের দিনে তোমার কোনো মিথ্যা কথা বলে কোথাও থেকে দশ টাকা পাওয়ার সুযোগ থাকে তুমি সেখানে মিথ্যা বলবে না, সত্য কথা বলবে আমরা তোমাকে এ মিথ্যা না বলার কারণে দশ টাকা এবং আরও পাঁচ টাকা সত্য বলার জন্যে মোট পনের টাকা দিবো। তুমি মিথ্যা কথা বলবে না। এভাবে সবসময় বলুন, প্রতিদিন রাতে আত্মসমালোচনা করুন, ঘুমে যাওয়ার পূর্বে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন। দেখবেন আস্তে আস্তে সত্যবাদী হয়ে যাবে।

০৮. তাদেরকে মিথ্যার কুফল বা শাস্তি বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বুঝাবেন, তাহলে তাদের মনে রেখাপাত করবে।

০৯. অকস্মাৎ বাবার সাথে মিথ্যা কথা বলে ফেললেও মা পরবর্তীতে বাবার অনুপস্থিতিতে তা বুঝিয়ে দিবেন। আবার মায়ের সাথে বললে বাবা বুঝলে মায়ের চোখের অলক্ষ্যে তাদেরকে এমন মিথ্যা কথা বলতে নিরুৎসাহিত করবেন।

১০. কারোর সামনে সন্তানদেরকে মিথ্যাবাদী বলে তাকে লজ্জা দেয়ার চেষ্টা করা ঠিক হবে না।

১১. কখনো আপনার টাকা হারানো গিয়েছে, পকেটমার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে, হাত বা পকেট থেকে পড়ে গিয়েছে, কোনো কিছু কিনেছেন কিন্তু মনে নেই। মায়ের ক্ষেত্রে বাবা নিয়ে গেছে বা অন্য ভাই-বোনদেরকে দিয়েছেন কিন্তু মনে নেই বা অন্য কেউ নিয়েছে কিন্তু আপনি দাবি করলেন আপনার

www.amarboi.org

এক সন্তানকে যে আসলে নেয়নি, সে সত্য কথা বলছে না আমি নেইনি। কিন্তু তবু আপনি তাকে দায়ী করলেন। এজন্যে সে জেদ ধরে পরবর্তীতে সত্যিই এটি করতে উদ্ধত হয় এবং করে বসে। সে তখন মনে করে না করেই যখন দোষী তখন করেই দেখি কি হয়? কাজেই এমনটি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

১২. সন্তানদের সত্যবাদীকরণে যে বিষয়টি সবচেয়ে প্রয়োজন তা হলো মা-বাবা নিজেদেরকে সন্তানদের সামনে সত্যবাদীর পরাকাষ্ঠা হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন এবং তারপরও পরিস্থিতিভেদে সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্তানদেরকে সত্যবাদীকরণে পরিকল্পিতভাবে চেষ্টা করলে সুফল পাওয়া যাবে।

রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত

রিয়া মানব চরিত্রের একটি মারাত্মক দোষ বা ব্যাধি। রিয়ার অর্থ আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ না হয়ে লোক দেখানোর জন্য ভাল কাজ করা। নিজের সকল ইবাদত-বন্দেগী, সৎকর্ম; দান-খয়রাত এবং এ ধরনের যে কোনো সৎকাজের উদ্দেশ্যে এই থাকা যে লোকেরা আমাকে মুমিন বলবে, দাতা বলবে এবং আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবে এমন ইচ্ছা রাখা –যা শিরক। আর এমন ইবাদত যারা করে তাদের ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ.

"আর দুর্ভোগ সেসব নামাযীদের জন্য, যারা নামাযের ব্যাপারে উদাসীন এবং যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তা করে।" (সূরা আল মাউন, ১০৭ ঃ ০৪-০৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ صَلّٰى يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ.

"যে ব্যক্তি লোক দেখানোর মানসে নামায পড়ল, সে আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরীক করে ফেলল। যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সিয়াম রাখল সেও শরীক করে ফেলল, আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করল সেও শরীক করে ফেলল।" (মুসনাদে আহমাদ)

একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি আমার উম্মতের জন্য যে বিষয়ে সব

www.amarboi.org

চাইতে অধিক ভয় করি তা হলো, শিরকে আসগার (ছোট শিরক)। তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! ছোট শিরক কী? তিনি বলেন, তা হলো 'রিয়া' অর্থাৎ যে ইবাদত মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয়। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ এদের লক্ষ্য করে বলবেন ঃ

"তোমরা যাদের দেখানোর জন্যে ইবাদত করেছিলে, তাদের কাছে গিয়ে দেখ কোনো বিনিময় বা কল্যাণ পাও কিনা।" (মুসনাদে আহমাদ ও বায়হাকী শরীফ)

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মানুষ আমার ইবাদত করার সময় এতে অন্য কাউকে শরীক করলে তা কবুল করি না, বরং তার সে সব ইবাদত ছেড়ে দেই।" (মুসলিম শরীফ)

এবার কিসে 'রিয়া' প্রকাশ পায়? এর জবাবে বলা যায় যে, অন্যরা সম্মান করবে, ধার্মিক মনে করবে, তাদের অন্তরে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে, এ উদ্দেশ্যে নিজকে লোকদের সামনে পরহেযগাররূপে প্রকাশ করা ইত্যাদি রিয়ার আলামত। বিভিন্নভাবে রিয়া প্রকাশ পায় যেমন ঃ দেহের বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গিতে রিয়া প্রকাশ পায়। নিজেকে দুর্বল প্রকাশ করা যাতে মানুষ মনে করে যে, এ ব্যক্তি কঠোর ইবাদত করে। মাথার চুলগুলোকে এলোমেলো রাখা যাতে লোকে মনে করে, ইবাদতে লিপ্ত ও ব্যস্ত থাকার কারণে সে মাথার চুল আঁচড়ানোর সময় পায় না।

পোশাক-পরিচ্ছদে 'রিয়া' প্রকাশ পায়। যেমন ঃ পশমের মোটা অপরিষ্কার ছেঁড়া বস্ত্র পরিধান করা, যাতে লোকে মনে করে, এ ব্যক্তি দরবেশ। আবার কেউ কেউ দীর্ঘদিন ধরে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও একটা পুরাতন মডেলের ব্লেজার পরিধান করে মানুষকে বুঝাতে চায় যে, সে খুব সাধা-সিধে মানুষ, সাধা-সিধে জীবন-যাপন করে, সে এসব নিয়ে মোটেও ব্যস্ত নয়; এ দেখিয়ে সে সকলের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে। যা প্রকারান্তরে এক ধরনের রিয়ার সাথেই সম্পর্কযুক্ত।

স্বর্ণ অলঙ্কার যেমন অনেকে বিয়ে বা কোনো অনুষ্ঠানে মানুষকে দেখানোর জন্য বেশি বেশি করে ব্যবহার করে, আবার কেউ কেউ ধার করেও নিয়ে থাকে। যা রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

কথা-বার্তায় 'রিয়া' যেমন ঃ কেউ সবসময় মুখ ও ঠোঁট নাড়তে থাকে, যাতে লোকেরা মনে করে সে আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত আছে। অথচ এরা কালবী যিকির করে না। কেননা, অন্তরে যিকির করলে তা মানুষ দেখবে না।

ইবাদতে 'রিয়া' যেমন ঃ লোক দেখাবার জন্য সুন্দর করে নামায আদায় করা, যাতে লোকে আবেদ বলে। দান-সাদকা করার সময় এমনভাবে করা, যাতে লোকে মনে করে লোকটা খুবই দানশীল ইত্যাদি। অন্যদিকে নিয়তের তারতম্য অনুসারে, 'রিয়া' বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে ঃ

www.amarboi.org

এক. সওয়াব লাভের আশা না করে কেবল লোকের প্রশংসা লাভের জন্য কাজ করা। এ ধরনের রিয়া অতিশয় মারাত্মক।

দুই. লোকের শ্রদ্ধা প্রাপ্তির আশাই প্রবল এবং সওয়াবের আশা খুবই কম। এরূপ লোক মানুষের সাথে থাকলে অতি আগ্রহের সাথে ইবাদত করে এবং একা থাকলে অবহেলা প্রদর্শন করে। এরূপ রিয়াও ঘৃণ্য অপরাধ।

তিন. এ শ্রেণীর লোকেরা সওয়াবের আশায় একাকীও সিয়াম-নামায আদায় করে কিন্তু অন্তরে রিয়া থাকার কারণে অন্য লোক দেখলে তার ইবাদত বাড়িয়ে দেয়। এ শ্রেণীর লোকদের ইবাদত সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না।

তবে রিয়ার উদ্দেশ্যে যে ইবাদত করবে, আল্লাহর কাছে তা কবুল হবে না। এ রিয়া থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আমাদের করণীয় হলো আমরা যা ভাল কাজ করব তা গোপন রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করব যেমন গোপন রাখি আমাদের পাপগুলোকে। তবে এ কাজটি করা খুব কঠিন। সেজন্যে বার বার চেষ্টা ও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

বন্ধু বা সৎ সঙ্গের প্রভাব

মানুষ সামাজিক জীব। সে একা বাস করতে পারে না। সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে তাকে অন্যের সান্নিধ্য গ্রহণ করতে হয়, বন্ধু নির্বাচনের প্রয়োজন পড়ে। কারণ বন্ধু জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার ভাগিদার হয়। বন্ধুই পারে আত্মার মধ্যমণি হয়ে কিছুক্ষণের জন্য হলেও দুঃখকে ভুলিয়ে রেখে একটু স্বস্তি দিতে, একটু সান্ত্বনা দিতে। আর তাইতো এ বন্ধু হতে হবে সে রকম ঠিক যেমনটি ছিলেন রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বন্ধু হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।

পবিত্র কুরআনে বন্ধুত্ব অর্থে ব্যবহৃত শব্দসমূহের মধ্যে ولى শব্দটিই প্রধান। ولى অর্থ বন্ধু, দায়িত্বশীল, অভিভাবক, সংরক্ষণকারী ও অনুগত ইত্যাদি। আল কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও প্রায় সর্বত্রই এর ব্যবহার দেখা যায়, বন্ধু ও অভিভাবক অর্থে। আরবিতে ولى শব্দের কতিপয় ব্যবহার নিম্নরূপ ঃ

وَكُلُّ مَنْ وَلِىَّ اَمْرِ اَحَدٍ فَهُوَ وَلِيُّهُ.

কোনো এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কোনো দায়িত্ব নিলে তাকে (প্রথম ব্যক্তিকে) ঐ ব্যক্তির (দ্বিতীয় ব্যক্তির) ওলী বলা হয়।

বন্ধুত্বকরণে আল্লাহর স্পষ্ট ঘোষণা

মানব জাতি দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পাদনে, সঙ্গী-সাথী নির্বাচনে ও অনুকরণ অনুসরণে অনেক সময় এমন সব অসচ্চরিত্রের বন্ধুর খপ্পরে পড়ে যায়, যাদের

www.amarboi.org

বন্ধুত্বের প্রভাবে তাদের গোটা জীবনটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে পড়ে। কারণ এসব বন্ধু বাহ্যত সচ্চরিত্রের বন্ধুর রূপ ধরে ঠিক তাদেরই অনুরূপ আচরণ দেখিয়ে থাকে। কিন্তু এদের বন্ধুত্বের আড়ালে লুপ্ত থাকে শত্রুতা যে কারণে মানব সাধারণের জীবনে দেখা দেয় সীমাহীন দুর্গতি এবং পরকালে তারা সম্মুখীন হয় মহাব্যর্থতার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত মেহেরবানী করে সেই মহাব্যর্থতার কবল থেকে নিরাপদ থাকার জন্য পূর্বেই মানব জাতিকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। ইসলামী শরীয়াতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাঝেও সেই নিরাপত্তার রহস্য গোপন রাখা হয়েছে। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতেও সেজন্য সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আর বন্ধুরূপী শত্রুতার তাৎপর্য, ধরন, প্রকৃতি ও রহস্য উদঘাটন করে দিয়েছে আল কুরআন।

মানব জাতির প্রধান শত্রু ইবলীসের ষড়যন্ত্রের ইন্দ্রজালে আবদ্ধ হয়ে না পড়ার জন্যে তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার হুঁশিয়ারি হলো ঃ

يَا بَنِيْ آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ.

"হে আদম সন্তানেরা! শয়তান যেন তোমাদের কোনো নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে না ফেলে। যেমনি করে সে তোমাদের আদি মাতা-পিতাকে বেহেশত হতে বের করেছিল। সে অবস্থায় শয়তান তাদের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্যে তাদের দেহ থেকে বেহেশতী পোশাকও খুলে ছিলো। সে এবং তার সঙ্গী-সাথীরা তোমাদের এমনভাবে দেখছে যে, তোমরা তাদের মোটেই দেখছ না। আমি বেঈমান লোকদের জন্যে শয়তানদেরকেই অভিভাবক বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি।" (সূরা আল আরাফ, ০৭ ঃ ২৭)

ইবলীস শয়তান মানব জাতির আদি মাতা পিতা আদম হাওয়াকে মিথ্যা প্ররোচনা দিয়ে আল্লাহর নাফরমানীতে জড়িয়ে ফেলেছিল। আর সে কারণে তাদের স্বর্গীয় পোশাক কেড়ে নিয়ে তাদের স্বর্গ হতে বহিস্কার করা হয়েছিল। তেমনিভাবে আজকের ইবলীস শয়তান এবং মানব শয়তানরাও আদম সন্তানদের বন্ধু সেজে নানারূপ ছল-চাতুরীতে রাব্বুল আলামীনের দেয়া বিধানের বিরুদ্ধে চলতে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। আর এ কাজ উভয় প্রকার শয়তানের জন্যেই সহজ। কেননা ইবলীস শয়তান ও তার স্ববংশীয় সাথীদের অবস্থান মানুষের দৃষ্টিশক্তির বাইরে।

এ শয়তান কখনো দৃশ্য আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অদৃশ্য অবস্থায় মানুষের বন্ধু সেজে তাদের মনে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করে থাকে। অন্যদিকে মানব বংশীয় শয়তানদের অবয়ব-অবস্থান দৃষ্টির আওতায় থাকলেও তাদের ছল-চাতুরী ও

www.amarboi.org

ষড়যন্ত্রের কলাকৌশল কিন্তু সাধারণের দৃষ্টির সম্পূর্ণ বাইরে। তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো থাকে বন্ধুত্বের আড়ালেই। মানব সাধারণ সরল মনে তাদের আসল বন্ধু ভেবে সেই জালে জড়িয়ে পড়ে আর পরিণামে ডেকে আনে মহাধ্বংস। তাই সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সেই মহাধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে সাবধান বাণী ও আগাম হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। হ্যাঁ, শয়তানের সাথে খাঁটি বন্ধুত্ব পাতানোর জন্যে আল্লাহ তায়ালা বেঈমানদের নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। কারণ তারা সত্য পথে আসতেই চায় না। হক কবুল না করার দরুন শয়তানই তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে।

মানুষ কোন পথে কিভাবে অসচ্চরিত্রের বন্ধুর খপ্পরে পড়ে যায়, তার বর্ণনা দিয়ে আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলার সতর্ক বাণী রয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ

أَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَن يَتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْ أَوْلِيَاءَ ج إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ نُزُلاً. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً. الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا.

"তবে কি অবিশ্বাসীরা মনে করে যে, তারা আমাকে ছেড়ে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক বন্ধু ও অভাব মোচনকারী উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করবে? তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা সে অবিশ্বাসীদের জন্যে দোযখকে মেহমানদারীর জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছি। তাদের বল, আমি কী তোমাদের দৈনন্দিন কাজে লোকসান বহনকারীদের পরিচয় বলে দেবো? তারা হলো সেসব লোক, যাদের দুনিয়ার যিন্দেগীর কাজকর্ম (আমল) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অথচ তারা মনে করে যে, তারা ভাল কাজ করেই চলছে।" (সূরা আল কাহাফ, ১৮ ঃ ১০২ - ১০৪)

মানুষের অভিভাবক ও আশা পূরণকারী দুনিয়াতে এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউই হতে পারে না। আশা পূরণ ও অভিভাবকত্বের যোগ্যতা তিনি ভিন্ন কোনো সৃষ্টির নেই। অথচ অজ্ঞতা ও মূর্খতাবশত অথবা সীমালংঘন করার মনোভাব থাকার দরুন মানুষ তারই মতো অন্য মানুষকে অভিভাবক ও আশা পূরণকারী বন্ধুরূপে গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং তাদের এসব বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্ব রক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থতার সম্মুখীন হওয়াই স্বাভাবিক। জীবনের দৈনন্দিন কার্যাবলিতে আল্লাহর দেয়া সীমারেখা অতিক্রম করলে মানুষকে অবশ্যই চরম লোকসান ও মহাক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এ ব্যাপারে অনুকরণকারীরা যত অজ্ঞই থাকুক না কেন অথবা অনুকরণীয়রা তাদের পথের যত নিশ্চয়তাই প্রদান করুক না কেন। কাজেই, সময় থাকতেই সরল পথ ধরে জীবনের যাবতীয় চেষ্টা সাধনাকে ব্যর্থতা থেকে নাজাত দেয়ার উপায় অবলম্বন করা দরকার।

www.amarboi.org

প্রকৃতপক্ষে দৈনন্দিন জীবনের কাজ কর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণ, আত্মপর্যালোচনা বা আত্মসমালোচনার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বা বিধান প্রতিষ্ঠার বিরোধীরা যেমন আদর্শ মানুষদের শত্রু তেমনি আল্লাহর শত্রু। বরং প্রকৃতপক্ষে এরা মানব জাতিরই শত্রু। এমনকি তাদের এ অবিশ্বাস ও বিরোধের কুফলে যেহেতু তারাই শেষ পর্যন্ত ভুগবে, এজন্যে প্রথমে তারা নিজেরাই নিজেদের সাথে শত্রুতা করছে। এক কথায়, "আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহরই সার্বভৌমত্ব চলবে" নীতির বিরোধীরা বিশ্বমানবতার শত্রু। কিন্তু আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠাকামী আদর্শ জামায়াত যেহেতু আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্যে আত্মোৎসর্গকারী কর্মী আর বিরোধী শত্রুরা হলো তার প্রতিবন্ধক। এজন্যে মূলত অবিশ্বাসীরা আল্লাহ ও মানুষদের শত্রু। এদের সাথে কোনো ক্রমেই বন্ধুত্ব করা যাবে না। আল কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَإِيَّاكُمْ لا أَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ ج تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ج وَمَن يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل. إِن يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوْا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ.

"হে ঈমানদাররা! তোমরা আমার শত্রুকে তোমাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরাতো তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করে যাচ্ছো; অথচ তারা তোমাদের কাছে প্রেরিত সত্য দ্বীনের বিরোধিতা করছে। তার রাসূলকে এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করছে। কারণ তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছ। (তোমরা কিছুতেই তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পার না) যদি তোমরা আমার দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এবং আমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে থাকো। তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্বভাব রাখছো। কিন্তু আমিতো তোমাদের গোপন প্রকাশ্য সবকিছুই জানি। তোমাদের যে কেউ এমনটি করবে, সে নিঃসন্দেহে সরল পথ হতে ছিটকে পড়বে। তারা তোমাদেরকে একটু কাবু পেলেই তোমাদের শত্রুতা করে বসবে। তখন তারা তোমাদের সাথে অন্যায়ভাবে হাত মুখ চালাতেও ইতস্তত

www.amarboi.org

করবে না। সর্বোপরি তাদের ঐকান্তিক কামনা হলো তোমরাও যেন ঈমান ছেড়ে দাও।" (সূরা আল মুমতাহিনা, ৬০ ঃ ০১-০২)

উল্লিখিত আয়াত পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো ঃ

এক. আদর্শ মানুষ বৈষয়িক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে বা আত্মীয়তার কারণে অথবা রক্ত সম্পর্ক রক্ষার জন্যে হলেও যেন আল্লাহদ্রোহীদের সাথে বন্ধুত্ব না রাখে।

দুই. তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন ঐসব কাফিরদের সাথে আন্তরিকতা তো রাখবেই না, এমনকি বাচনিক নম্রতা বা বাহ্যিক বন্ধুত্বও দেখাবে না।

তিন. মুসলমানরা ওদের সাথে যতই আন্তরিক ভাব রাখুক না কেন, ওরা কখনো মুসলমানদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বভাব রাখবে না। ওদের হাতে কখনো সুযোগ আসলে মুহূর্ত বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ ওরা মুসলমানদের সাথে চোখ রাংগিয়ে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করবে না। এমনকি মুসলমানদের গায়ে হাত দিতেও তারা কুণ্ঠিত হবে না। সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা ইসলাম বিদ্বেষীদের সম্ভাব্য সকল প্রকার ষড়যন্ত্র ও বিরোধের তথ্য পূর্বাহ্নেই মুসলিম মিল্লাতকে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়ে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

চার. যদি মুসলমানদের কেউ ওদের সাথে গোপনে বন্ধুত্বভাব রাখে তবে তারা নিশ্চয়ই আর মুসলমানদের দলে থাকলো না, তারা মূলত বিদ্রোহীদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে মহাধ্বংসের করাল গ্রাসে নিপতিত হলো। আর তারাই হচ্ছে মুনাফিক। মুনাফিকরা আল্লাহর দরবারে সর্বোচ্চ শাস্তির যোগ্য। এ জাতীয় লোকদের সাবধান করে দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন ঃ

بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا. الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج أَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا.

"মুনাফিকদের কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দাও। যারা মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধু বানিয়ে থাকে, এরা কি ওদের কাছে সম্মান পেতে চায়? সম্মান সম্পূর্ণটাই তো কেবল আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ।" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ১৩৮-১৩৯)

মুসলমানদের দলের ভেতর অন্তর্ভুক্ত থেকে বাহ্যিকভাবে মুসলমানিত্ব দেখিয়ে কার্যত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করা বা মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থ বিরোধী কাজে অংশ নেয়া অথবা আল্লাহদ্রোহীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ঈমানের সম্পূর্ণ বরখেলাফ। এসব মুনাফিকদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার

www.amarboi.org

দরবারে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এরা একদিকে মুসলিম জামায়াতের স্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত থেকে নিজেদের মুসলমাদের দলভুক্ত বলে প্রদর্শন করছে। অন্যদিকে আল্লাহদ্রোহীদের কাছে সম্মানিত হওয়ার জন্য শিরকে নিমজ্জিত হচ্ছে। কারণ ইজ্জত সম্মান পুরোপুরিভাবেই আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ রয়েছে। অথচ এরা তা আল্লাহর সৃষ্টির কাছে প্রত্যাশা করে। আবার সৃষ্টিও এমন, যারা মুনিবের সাথে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে বসে। আল্লাহদ্রোহীদের সাথে বন্ধুত্ব রেখে তাদের অনুকরণ অনুসরণ করলে ঈমানদারগণ উভয় জাহানেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। কারণ তাদের বন্ধুত্বের প্রভাবই হলো বিপরীতধর্মী। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خَاسِرِيْنَ. بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীনে অবিশ্বাসীদের পেছনে চলো তবে তারা তোমাদের উল্টো পেছনের দিকে নিয়ে ছাড়বে। তখন মহাক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। বরং আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত বন্ধু। আর তিনিই তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৪৯-১৫০)

মুসলমানদের জামায়াত হচ্ছে সত্যিকারের প্রগতিশীল এবং সকল প্রকার প্রগতিশীলতার উৎস হচ্ছে বিশ্বপালক আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং যারা আল্লাহকে মুনিব ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, আল্লাহদ্রোহীদের পেছনে চলা তাদের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর। কারণ আল্লাহদ্রোহীরা ভ্রষ্টতার অন্ধকারের যে স্তরে বর্তমানে বিরাজ করছে, মুসলমানেরা ইসলামী বিধান মেনে নেয়ার আগে অন্ধকারের সে স্তরেই বিরাজ করছিল। ঈমান এনে ইসলামী জীবন যাপনের ফলে তারা অন্ধকারের সে স্তর অতিক্রম করে এক নবতর আলোর স্তরে উন্নীত হয়েছে। কাজেই মুসলমানরা বর্তমান পর্যায়ে আসার পর কাফিরদের অনুকরণ করার মানে পুনরায় পূর্বের জাহিলিয়াতের অন্ধকার পর্যায়ে ফিরে যাওয়া।

কাজেই বলব, মুসলিম ভাইদের ছেড়ে কোনো অমুসলিমকে বন্ধু হিসেবে বরণ করে নিলে একদিকে যেমন ইহলৌকিক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে, অন্যদিকে তেমনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করার কারণে আত্মিক ক্ষতিও সাধিত হয়ে থাকে। আবার ইহলৌকিক ক্ষতি বৈষয়িক অথবা আত্মিক অথবা উভয়ই হতে পারে। এজন্যে পূর্বেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সে সামগ্রিক ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার জন্যে আদর্শ মানুষদের সতর্ক করে দিয়েছেন। আল কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا.

"হে ঈমানদারেরা! মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধু বানিয়ে নিও না। তোমরা কি আল্লাহর দরবারে নিজেদের বিরোধী প্রমাণ দাঁড় করাতে চাও?" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ১৪৪)

মানব জাতির পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে যেসব হিতাকাঙ্ক্ষী মানব বন্ধু প্রেরণ করেছেন, সেসব নবী রাসূল ও সত্যের পতাকাবাহী শ্রেষ্ঠ মানবদের দাওয়াতে সাড়া দেয়া মানব সাধারণের নিজেদের স্বার্থেই প্রয়োজনীয়। পক্ষান্তরে তাঁদের দাওয়াতে সাড়া না দিয়ে বরং বিরোধিতায় লিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ পরিণতি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। সত্যের আহ্বানকারীদের এতে কোনোই ক্ষতি নেই। সুতরাং যে নবী রাসূল বা তাঁদের পদাংক অনুসরণকারী সত্যের পতাকাবাহীদের সাথে সর্বপ্রকার বিরোধ ও শত্রুতা পরিহার করে এবং তাদের একান্ত আপনজন মনে করে সত্যের ডাকে সাড়া দেয় সেই বুদ্ধিমান। আল কুরআন বিশ্ববাসীকে পূর্ব হুঁশিয়ারি দিয়ে ঘোষণা করছে ঃ

وَمَنْ لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءُ ج أُولٰئِكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না, সে দুনিয়াতে আল্লাহর কোনো অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তার আর কোনো অভিভাবক বন্ধু পাবে না। এ জাতীয় লোকেরা স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।" (সূরা আল আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩২)

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের জন্যে যুগে যুগে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ মানবদের প্রেরণ করেছেন। এদের ডাকে সাড়া দেয়া, এদের নির্ভরযোগ্য ও অনুকরণীয় আদর্শকে নিজের আদর্শরূপে গ্রহণ করা, সাড়া দানকারী নিজেরই জন্যে মঙ্গলজনক। কেউ যদি সাড়া দানের পরিবর্তে আহ্বানকারী ব্যক্তি বা জামায়াতের বিরুদ্ধে লেগে যায় বা আন্দোলনকে স্তব্ধ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তারা আহ্বানকারীর অথবা আহ্বানের (ইসলামী আন্দোলনের) কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। সাময়িকভাবে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারলেও আসলে পরিণামে তারাই হবে ব্যর্থকাম। সত্য দাওয়াত তথা ইসলামী আন্দোলনের এসব শত্রুরা আসলে কখনো প্রকৃত সফলতা লাভ করতে পারেনি,

www.amarboi.org

আর ভবিষ্যতেও পারবে না। তাছাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে অন্য কোনো বন্ধুই তাদের আর থাকলো না। দুনিয়ার জীবনে তাদের যেসব সঙ্গী-সাথী বন্ধুত্ব দেখাচ্ছে, তারা মূলত তাদের বন্ধুই নয়। তাছাড়া বাতিল সমাজ ব্যবস্থার অধীন বসবাস করার দরুন দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সত্যবিরোধী ধ্যান-ধারণা ও আকীদা বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠে সেগুলোকে ক্ষণিকের জন্যে হৃদয়পটের বাইরে রেখে সারা বিশ্বের প্রকৃত বন্ধু আল্লাহ তা'আলার ঘোষণাসমূহ হৃদয়ংগম করা দরকার। মানব জাতির জীবন, জগৎ ও ইতিহাসের ওপর সত্যের টর্চ ফোকাস করলে সামষ্টিক জাহানে নিজের অবস্থান বা পজিশান সহজে দৃষ্টিগোচর হতে পারে। তখন হয়ত বুঝবে কোন্টা শান্তি ও মুক্তির পথ, আর কারাই বা সে পথের যাত্রী মানবতার বন্ধু।

বন্ধুত্বকরণে রাসূল (সা.)-এর পরামর্শ

দুনিয়ার যিন্দেগীতে সচ্চরিত্রবান মানুষ হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও আখিরাতে মুক্তি লাভের জন্যে বন্ধুত্বকরণে রাসূল (সা.) যে পরামর্শ দিয়েছেন তা হলো ঃ

"মানুষ তার বন্ধুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়। ফলে কারোর সাথে বন্ধুত্ব করার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখা উচিত সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে।"

আসলে দুনিয়ার জিন্দেগীর সব ধরনের লোকের সাথে বন্ধুত্বকরণ ইসলাম সমর্থন করে না। কিন্তু কেন তা উপলব্ধির জন্যে রাসূল (সা.)-এর একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। মানবতার চির কল্যাণকামী উত্তম বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেন ঃ

قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَجَلِيْسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرَةِ فَحَامِلِ الْمِسْكَ اِمَّا اَنْ يَحْذِيْكَ وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّا اَنْ تَجِدْ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخَ الْكِيْرَ اِمَّا اَنَ يُخْرِقُ ثِيَابَكَ وَاِمَّا اَنْ تَجِدْ مِنْهُ رِيْحًا مُنْتَنْسِةً.

"সৎ ও অসৎ বন্ধুর উপমা দেয়া যায় আতর বিক্রেতার সাথে। আতর বিক্রেতা থেকে হয়তো তুমি হাদিয়া পাবে নয়তো তুমি কিনে নিবে আর না হয় একটু ঘ্রাণ হলেও পাবে। আর কামারের দোকানে বসলে হয়তো তোমার কাপড় পুড়ে যাবে নয়তো তুমি কমপক্ষে দুর্গন্ধ পাবেই।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

অর্থাৎ আতর বিক্রেতার সাথে চললে যেমন আতরের সুঘ্রাণ পাওয়ার কথা বলা হয়েছে তেমনি খারাপের সাথে বন্ধুত্ব করলে আজ নয় কাল শয়তানের প্ররোচনায় হোক আর বন্ধু খারাপ চরিত্রের হলে তার প্রভাবেই হোক তোমার মন খারাপের দিকে ঝুঁকবেই। কাজেই ভাল বন্ধু নির্বাচন করে নেয়া কেন প্রয়োজন তাতো হাদিস থেকেই সহজে অনুমেয়।

www.amarboi.org

কাকে, কিসের ভিত্তিতে বন্ধু হিসেবে নির্বাচন করবে

মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে জীবনে চলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্তরেই মনোভাব ব্যক্তকরণ এবং পরামর্শ করার লক্ষ্যে বন্ধু-বান্ধব প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একজন বন্ধুর চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, কথা-বার্তা ও পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি আরেকজন বন্ধুর মনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে– যা চিরন্তন সত্য এবং বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত অভিমত। আর এ জন্যেই কিসের ভিত্তিতে বা কী কী বিষয় বা বৈশিষ্ট্য বিবেচনা সাপেক্ষে প্রাথমিকভাবে কারোকে বন্ধু হিসেবে নির্বাচন করে নেয়া যেতে পারে তার কয়েকটি ধারণা বা ইংগিত নিম্নরূপ ঃ

এক. সে সত্যবাদী এবং নিয়মিত নামায আদায়কারী কিনা

দুই. সে পড়ালেখামুখী বা শিক্ষিত বা শিক্ষানুরাগী কিনা।

তিন. সে নম্র-বিনয়ী ও আদব কায়দাসম্পন্ন এবং ছোটদের প্রতি স্নেহশীল কিনা।

চার. ওয়াদা ও আমানত সংরক্ষণকারী কিনা

পাঁচ. ধূমপানসহ অন্য কোনো কিছুর প্রতি নেশাগ্রস্ত কিনা

ছয়. সৎ কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও অসৎ বা অকল্যাণমূলক কাজে নিরুৎসাহিতকরণ, বাধাদান, ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে কিনা।

সাত. সত্যপন্থীদের চলার পথ সুগম করে দেয়া ও বাতিলপন্থীদের অন্যায় ও অসত্য প্রচার প্রতিষ্ঠার প্রতি আঘাত হানা। মুমিনদের সর্বপ্রকার সহায়তা করা এবং কাফির ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে কিনা।

আট. আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় ও গভীর করে তোলা। প্রতিটি কাজে কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনকে লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা।

নয়. নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলিতে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) দেয়া সীমারেখা অনুসরণ করে চলা এবং সমাজ জীবনেও তা মেনে চলা। সমাজ ব্যবস্থা ইসলাম নির্দেশিত কাঠামোতে ঢেলে গড়ে তোলার বাস্তব চেষ্টা সাধনা করা।

দশ. সমাজে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার এবং অন্যায় ও মিথ্যা প্রতিরোধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করা। আল্লাহর বান্দাদের গায়রুল্লাহর দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে একমাত্র তাঁরই গোলামী করে চলার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয় কিনা।

আল কুরআনুল কারীমের দৃষ্টিতে উপরিউক্ত গুণাবলি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা দল মুমিনদের বন্ধু হওয়ার যোগ্য নয়। এমনকি রক্ত সম্পর্ক থাকলেও নয়। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ ج وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ.

www.amarboi.org

"হে ঈমানদারেরা! তোমাদের বাবা ভাই যদি ঈমানদারীর পরিবর্তে কুফরীকে পছন্দ করে থাকে তবে তাদেরও তোমরা বন্ধুরূপে বরণ করো না। তোমাদের কেউ যদি তাদের বন্ধু হিসেবে গণ্য করে তারাই হবে আত্মঘাতী যালিম।" (সূরা আত তাওবা, ০৯ ঃ ২৩)

কুরআনিক দৃষ্টিতে উত্তম বন্ধু কে বা কারা

পবিত্র কুরআন মানব জাতির বন্ধু কে বা কারা হতে পারে তাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে এই বলে ঃ

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ. وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ.

"নিশ্চয়ই তোমাদের সত্যিকারের বন্ধু হলেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ। আর এসব ঈমানদার হলো যারা নামায কায়েম করে, যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং তারা রুকুকারীও। আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারদের বন্ধুত্ব গ্রহণ করে সেসব আল্লাহর জামায়াতই সফলকাম হবে।" (সূরা আল মায়িদা, ০৬ ঃ ৫৫-৫৬)

এখানে মানব জাতির প্রকৃত বন্ধুদের তালিকা প্রণয়ন করে তিন প্রকারের বন্ধুত্বের পরিচয় দেয়া হয়েছে। ০১. আল্লাহ তা'আলা ০২. তাঁর রাসূল এবং ০৩. ঈমানদার বা মুমিন বা আদর্শ মানুষগণ।

অন্যান্য আয়াতে কেবল আল্লাহকেই মানুষের বন্ধু হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানেও মূলতঃ আল্লাহকেই মানব জাতির একমাত্র বন্ধু-অভিভাবক হিসেবে ঘোষাণা করা হয়েছে। কেননা তাঁর মাধ্যমে নিজেদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলার পরিচয় ও সম্পর্ক জানতে পারে এবং দৈনন্দিন জীবনে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলার নিয়ম নীতি বাস্তবে অনুশীলন করতে পারে। কাজেই রাসূলের সাথে বন্ধুত্ব করার মানে মূলতঃ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখা। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সাথে বন্ধুত্ব নিঃশর্তভাবে। কিন্তু মুমিনের সাথে বন্ধুত্ব শর্ত সাপেক্ষে। আয়াতে ঈমানদারদের মানব জাতির বন্ধু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে। আর তা হলো ঃ ০১. যারা নিজ নিজ ঈমানের দাবিতে স্থির থাকে, ০২. নামায কায়েম করে, ০৩. যাকাত ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং ০৪. নিজেকে সর্বদা দ্বীনি কাজে রত রাখে। সুতরাং এ অর্থে মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার মানে আসলে আল্লাহ তা'আলার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করা। অবশ্য এরা

www.amarboi.org

যতক্ষণ পর্যন্ত মূল বন্ধু আল্লাহ তা'আলার সাথে নিজ নিজ সম্পর্ক রক্ষা আপ্রাণ দানে তৎপর থাকবে, ততক্ষণ তারা বিশ্বাসী মানুষের বন্ধু হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

এক নজরে আদর্শিক ও অনাদর্শিক বন্ধু-বান্ধবীর পরিচয়

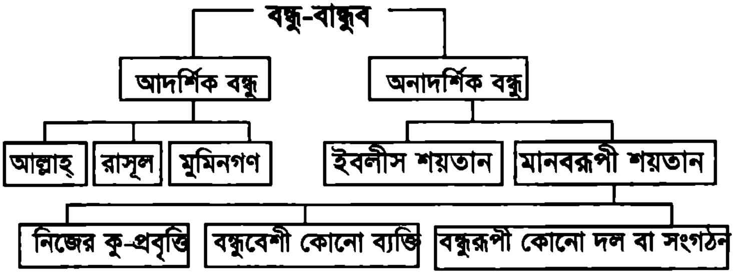

ছাত্র জীবনে বন্ধু-বান্ধব বৃদ্ধি করা অনুত্তম

মুহাম্মাদ ইবনে কাব কুরাজী (রহ.) সচরাচর বলে থাকতেন, "বন্ধু-বান্ধবদের সংখ্যা তোমরা বাড়াবে না এজন্য যে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দায়িত্বের বোঝাও তোমাদের উপর বর্তাবে অধিক পরিমাণে। ফলে তখন তোমরা অক্ষম হয়ে যাবে। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আমিতো একজনের ওয়াজিব হকও যথাযথভাবে আদায় করতে সক্ষম নই।" এবার বন্ধু-বান্ধবদের সংখ্যা কেন কমানো উত্তম সে প্রসঙ্গে বলতে গেলে চোখে ভেসে আসে অনেক দৃশ্য, উপলব্ধিতে আসে মহাক্ষতির কয়েকটি দিক– যা এ শতাব্দীর বন্ধুপ্রিয় মানুষদের অবগতির জন্য লেখা আবশ্যক বা অন্য কথায় দায়িত্ব বলে মনে করছি। এখানে কয়েকটি দিক হলো ঃ

০১. সময় মহামূল্যবান– এতে সময়ের অবমূল্যায়ন হয়।

০২. মেধা আল্লাহর অশেষ দান– এতে মেধার ক্ষতি হয়।

০৩. অর্থ– হালাল পথে অর্জিত অর্থ বহু মূল্যবান, এর অপচয় হয়।

০৪. মিথ্যাবাদী– মিথ্যা সকল পাপের জননী এতে সম্পৃক্ত করে ফেলে।

০৫. মনের অজান্তেই কথোপকথনের ফলে গঠিত পরশ্রীকাতরতা, অশ্লীলতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে।

০৬. বন্ধু-বান্ধব বেশি হওয়া ইসলাম বিরোধী খেলাধূলাসহ বাজে গল্প-গুজবে জড়িয়ে পড়ে বসে বসে ধূমপান ও এটা সেটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকে– যা সবশেষে আদর্শ বিবর্জিত আলোচনায় পরিণত হয়।

০৭. সংখ্যায় বেশি হওয়ায় বন্ধুত্বে স্থায়ীরূপ দেয়া যায় না, শরীয়াতের দৃষ্টিতে একে অপরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় তা সঠিকভাবে পালন করা যায় না।

০৮. ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে।

www.amarboi.org

০৯. পড়ালেখায় মন বসে না এবং

১০. বন্ধু-বান্ধব আদর্শ সচ্চরিত্রবান না হলে নিজের সচ্চরিত্র গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

তাছাড়া স্কুল ও কলেজে পড়ালেখার সময়ে কারো সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে তথা উচ্চ শিক্ষা জীবনে তাদেরকে সাথে নাও পাওয়া যেতে পারে। মূলতঃ চূড়ান্তভাবে বন্ধুত্ব হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এবং তাদেরকেই কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন চেয়ারে ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে। অন্যদিকে বন্ধু-বান্ধব বেশি হলে সচ্চরিত্রবান আদর্শ মানুষদের জন্য সমস্যাই হয়ে থাকে। তাই উপরিউক্ত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রেখে বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি না করাই উত্তম।

মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি ও সচ্চরিত্র গঠনে বন্ধুদের প্রভাব

প্রত্যেকের জীবনে সচ্চরিত্রবান বন্ধুর প্রভাব অত্যন্ত বেশি। ভাল বন্ধু, সচ্চরিত্রবান বন্ধু অন্যকেও সচ্চরিত্রবান করতে পারে। নামাযী বন্ধু আযান দিলে মসজিদের দিকে গমন করলে তার সাথে অন্যরাও মসজিদের দিকে যাবে; যদি অন্যদিকে যায় তাহলে তো আর বন্ধুত্ব হবে না। ধূমপায়ী বন্ধু ধূমপান করবে আরেকজন করবে না তাতো হয় না। কাজেই, ধূমপায়ী বন্ধুর মহলে বসলে ধূমপান করতে হয় এভাবে অসৎ বন্ধুর প্রভাবে মানুষ অসচ্চরিত্রের দিকে ধাবিত হয়।

সুতরাং বিষয়টি সুস্পষ্ট আদর্শ ও সচ্চরিত্র গঠনে একে অপরের উপর প্রভাব পড়াই স্বাভাবিক। কাজেই প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে নেয়ার পরও তাদের সাথে চলতে চলতে কিছুদিন যাওয়ার পরই রাসূল (সা.)-এর হাদিস অনুযায়ী তাকে আবারও পরীক্ষা করে নিবে। রাসূল (সা.) বলেন, কোন্ বন্ধু কেমন তা বুঝার জন্য তিনটি কাজ করতে হবে।

০১. টাকা পয়সা বা অর্থের লেনদেন করা।

০২. তার সাথে রাত্রি যাপন করা।

০৩. দীর্ঘ পথ এক সাথে সফর করা।

এগুলো করার পর যদি দেখা যায়, সে নৈতিকতা ও আদর্শিকতায় উন্নীত নয় তাহলে তাকে ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন স্বয়ং রাসূল (সা.) নিজেই। আবার অন্যত্র রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাউকে ভালবাসল, তাঁর জন্যই কাউকে ঘৃণা করল, তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাউকে দান করল এবং তা থেকে বিরত থাকল তবে নিঃসন্দেহে সে নিজ ঈমানকে পূর্ণতা দান করল।" (আবু দাউদ শরীফ)

জীবনের ভিত গড়ার ক্ষেত্রে বন্ধুর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে জীবনের প্রথম

www.amarboi.org

ধাপে বন্ধুত্ব ধরে হয়তো একজন মানুষ পরিচিত হয় বাইরের জগতের সাথে। এ সময় জানার সুযোগ হয় বিভিন্ন অজানা বিষয়। কৌতূহলবশতঃ বন্ধুদের সঙ্গ দিতে গিয়ে তরুণরা জড়িয়ে পড়ে নানা অসামাজিক কার্যকলাপে। বর্তমানে আমাদের সমাজে কিশোর অপরাধ বেড়ে যাওয়ার মূল কারণই হচ্ছে অসৎ চরিত্রের বন্ধুদের সাহচর্য গ্রহণ। আর এজন্যই বন্ধু নির্বাচনের বা ছেলে-মেয়েরা কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছে সেদিকে মা-বাবার ও অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখা উচিত। এখানে বন্ধু নির্বাচনের যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তা দেখে যদি বন্ধু নির্বাচন করা হয় এবং পরবর্তীতে তার সাথে চলতে গিয়ে রাসূল (সা.)-এর হাদিস অনুসারে যদি পজিটিভ হয় তাহলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখবে নতুবা ত্যাগ করবে। এভাবে চললে অবশ্যই সচ্চরিত্র গঠন ও আদর্শ বন্ধুর সাহচর্যে জীবন যৌবনকে সংরক্ষণ করে আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে।

সচ্চরিত্র গঠনে বিভিন্ন সংগঠনের প্রভাব

সামাজিক সংগঠনের প্রভাব

প্রত্যেকটি পরিবার সমাজের অংশ। সমাজে বসবাসকারী যুবকেরা মিলে এ বয়সে গড়ে তুলবে ঐক্য। সম্মিলিতভাবে সচ্চরিত্রে বলীয়ান হয়ে অসচ্চরিত্রের দোষ-ত্রুটি উৎখাত করে সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে একটি সুন্দর পরিবেশ উপহার দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আর সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করলে সমাজ থেকে অনৈতিকতা দূর করে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সফলতাও পাওয়া যাবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও মদদ পাওয়ার সুযোগ থাকে বেশি। হযরত উমর ফারুক (রা.) বলেন ঃ

"লা ইসলামা ইল্লা বিল জামায়াত।" অর্থাৎ সংগঠন ছাড়া ইসলাম হয় না।

কাজেই, সংঘবদ্ধভাবে অসচ্চরিত্রের বিরুদ্ধে আমাদেরকে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে এবং অন্যদেরকে এক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

এ বয়সে ছেলে-মেয়েরা সমাজে দায়িত্ব পালনের উপযোগী হওয়ার কারণে বহুমুখী পড়া-লেখার পাশাপাশি বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে তাদেরকে সব সময় থাকতে হবে সচেতন, হতে হবে কঠোর উদ্দ্যমী, সেই সাথে সৎ ও দৃঢ় প্রত্যয়ী। স্বাধীনচেতা এ বয়সীরা আত্মমর্যাদাবোধে বলীয়ান হয়ে প্রতিষ্ঠিত করবে নিজেদের মধ্যে মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ। সেবা মূলব্রত এমন মনমানসিকতায় উজ্জীবিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবে সমাজ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, খুন ও রাহাজানিসহ সকল প্রকার অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মানুষের

www.amarboi.org

মধ্যে মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। সকলকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের বা সরকারের উন্নয়নমুখী সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে কুশিক্ষা, অশিক্ষা ও অর্ধশিক্ষার অন্ধকার থেকে বের করে আলোর জগতে প্রবেশ করাতে চেষ্টা করবে। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে জটিল ও কুটিল মৃত্যুরূপী রোগ থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে গড়ে তুলবে সামাজিক সচেতনতা। এতে সমগ্র জাতি সত্তা উপকৃত হবে। এভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে যৌবনকালে সামাজিক সংগঠনের প্রভাবে সুন্দর, নির্মল চরিত্র গড়ে উঠতে পারে আমাদের যুবক সমাজের। আবার একটু ভিন্নভাবে যদি একাকী বা কোনো আদর্শবাদী সেবামূলক সংগঠন ছাড়া সমাজের যুবকদের কথা চিন্তা করি তাহলে খুব সহজেই যা প্রতীয়মান হবে তা হলো জড়তা, অক্ষমতা, অনভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতে কিছু করতে বড় ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়াবে লাজুকতা। তাছাড়া কেউ একাকী চলতে পারে না। একাকী থাকতে চাইলেও শয়তান তার মনে এসে স্থান গড়বে এবং একটার পর একটা কুবুদ্ধি দিতে শুরু করবে। তাতে পুরো সমাজ ব্যবস্থা কলুষিত হবে, ধ্বংস হবে যুবক চরিত্র। আজ সংগঠনের আওতাভুক্ত থাকলে একের দেখাদেখি নিজের চরিত্রের দোষকে দূরীভূত করার লক্ষ্যে সবাই থাকে তৎপর এবং লজ্জার হাত থেকে মুক্তির জন্যে থাকে সদাজাগ্রত।

রাজনৈতিক সংগঠনের প্রভাব

সচ্চরিত্র গঠনের উপযোগী এ বয়সে গ্রামে, পাড়ায়, মহল্লায় সমাজ-সামাজিকতার অঙ্গনে মানুষের মুখে মুখে কর্ম ও আচরণে যে জিনিসটি বেশি বেশি প্রচারিত ও ধ্বনিত হয় তা হচ্ছে রাজনীতি। প্রত্যেক সংগঠনের আদর্শ ও নীতি রয়েছে। রয়েছে আদর্শবান নেতা-নেত্রী। তাদের সুযোগ্য নেতৃত্বেই সংঘবদ্ধ হচ্ছে স্ব-স্ব এলাকার সকল কর্মী। তারা রীতিমত তাদের নেতা-নেত্রীদের রচিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করছে এবং সেই ভিত্তিতে নিজেদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করছে, চরিত্র মাধুর্যকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। বড় বড় রাজনৈতিক সংঠনের ছাত্র সংগঠন, যুব সংগঠন, তরুণ সংগঠন রয়েছে। এ সকল সংগঠনের সকল কর্মীদের যদি মানবীয় গুনে গুনান্বিত করে তোলা যায়, তাদেরকে যদি নীতি নৈতিকতার ধারক-বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে সমাজ থেকে দূর হবে কলুষতা, মারামারি, ছিনতাই, রাহাজানি। আর এ সকল গুনে উজ্জীবিত করতেই পৃথিবীর যত আদর্শ আছে সকল আদর্শের সেরা আদর্শ, যত নীতি নৈতিকতাবোধ প্রতিষ্ঠিত আছে সকল নীতি নৈতিকতাবোধের শ্রেষ্ঠ নীতিবোধসম্পন্ন পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষ হওয়ার সকল উপাদান ও দিক-নির্দেশনা সম্বলিত গ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম ও আল হাদিসের আলোকে জীবন গড়তে হবে। সচ্চরিত্রবান, আদর্শবান, নীতি নৈতিকতাবোধসম্পন্ন, সমাজের

www.amarboi.org

কল্যাণকামী, মানবতাবাদী আদর্শ প্রাণ পুরুষ হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মূলত এ বয়সে চোখকে করতে হবে শানিত, কানকে করে দিতে হবে খাঁড়া, মস্তিষ্ককে রাখতে হবে সচেতন, বিবেক-বুদ্ধিকে করে দিতে হবে জাগ্রত, চিন্তা শক্তিতে হতে হবে প্রখর, আগামী দিনগুলোকে দেখতে হবে আদর্শিকতার ছাঁচে এবং বর্তমানকে করার চেষ্টা করতে হবে জয়। বর্তমান সবসময়ই থাকে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তাই যৌবনকালে সবাইকে হতে হবে প্রত্যয়দীপ্ত। আর তবেই হওয়া যাবে রাজনৈতিক সংগঠনের প্রভাবে সচ্চরিত্রবান। রাজনীতি মানে কাটাকাটি, মারামারি, জোর জবরদস্তি, দখলবাজী, টেন্ডারবাজী, কথা দিয়ে ঢিল ছুড়াছুড়ি, জ্বালাও পোড়াও ভাঙচুর ইত্যাদি নয়। রাজনীতি মানে দেশ ও জাতি সত্তার পরিচয়কে পৃথিবী পৃষ্ঠে সুউচ্চে তুলে ধরার মতো কঠোর সংস্কারমূলক সংগ্রামে নিঃস্বার্থ ত্যাগী মনোভাবে উন্নীত করার এক নীতি। যা দিন-দিন হয়ে পড়েছে দুর্লভ। খুঁজে পাওয়াই যেন হয়ে পড়েছে দুরূহ।

কাজেই এ সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্যে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে আদর্শের দিকে। এ রাষ্ট্রকে আমাদের আগামীদিনের সন্তানদের জন্য গড়ে তুলতে হবে সুখী ও সুন্দর সমৃদ্ধশালী জীবন ধারণের অনুকূল পরিবেশের আদর্শ ভূমি হিসেবে। আর এজন্যেই আজকের রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা নেত্রীদের মধ্যে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো আদর্শিক চিন্তা-চেতনা, কমিটমেন্ট ও দেশপ্রেম অবশ্য এগুলো উৎসারিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হলো আদর্শ শিক্ষা। প্রয়োজন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতভিত্তিক স্রষ্টামুখী চিন্তা-চেতনা ও প্রবল বিশ্বাস এবং তা বাস্তবায়ন।

পরিবার-সমাজের ও রাষ্ট্র প্রধানের ভূমিকা

পারিবারের প্রধান কর্তা হলেন বাবা তারপর মা। এ কর্তা ব্যক্তিদের চিন্তা-চেতনা, কথা-বার্তা, মন-মানসিকতা ও কর্ম আর প্রদেয় উৎসাহ-উদ্দীপনার ভিত্তিতেই গড়ে উঠে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মন-মানসিকতা। আমাদের চরিত্র গঠনের প্রধান ও মূখ্য স্থান হলো পরিবার আর প্রথম নিদর্শন হলো বাবা-মায়ের চরিত্র। এক কথায় ছোটদের জন্য বড়দের চরিত্র মাধুর্য। আল্লাহর হক ও মানুষের হকের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া, তাদের মূল্যায়ন ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে দায়িত্ব যথাযথ পালন করলে সন্তানরাও ভবিষ্যতে তা শিখবে ও বাস্তবায়ন করবে। গড়ে উঠবে তাদের চরিত্রে পজিটিভ একটি ধারা। যার সুফল বা প্রভাব ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য হবে অনুকূল।

পরিবার থেকে বের হলেই সমাজ, সামাজিক অঙ্গন। অনেকগুলো পরিবার মিলে একটি সমাজ গড়ে উঠে। পরিবারে যারা চারিত্রিক বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হোন তারাই পরবর্তীতে সমাজের সকল স্তরের লোকদের চরিত্র গঠনে রাখতে

www.amarboi.org

পারেন অনন্য ভূমিকা। এদেশে গ্রাম্য সমাজ থেকে শিক্ষিত মানুষগুলো বেরিয়ে এসে শহরে অবস্থান করার ফলে গ্রামে নেতৃত্বদান করার মত চরিত্রবান, সৎ নিষ্ঠাবান এক কথায় আদর্শ মানুষের রয়েছে দারুণ অভাব। আবার গ্রাম্য সমাজে মানুষ নিদারুণ কষ্টে দিন যাপন করছে। যদিও আজ্কের এ সভ্যতার দাবীদার শতাব্দীতেও যখন কোথাও দেখা যায় মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, সচ্চরিত্রের উপর কালিমা লেপনকারী তখন সত্যিই বিবেকে প্রশ্ন জাগে এ কেমন সমাজ? এ কোন্ বর্বর যুগের চিত্র? চিন্তা করতে করতে পরক্ষণেই জবাব আসে যে সমাজে নেতৃত্ব দেয়ার মত সচ্চরিত্রবান, আদর্শবান শিক্ষিত লোকের সংকট রয়েছে সেখানকার মানুষের মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থের ছোট-খাট বিষয়ে এমন দ্বন্দ্ব কলহতো হতেই পারে। কাজেই আজ সমাজের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া উচিত আদর্শবান ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের হাতে। এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে গ্রামের সেই সকল লোকজন তাদের চিনবে? নেতা নির্বাচনের সময় তো আমরা দেখি, খুন, ধর্ষণ, হত্যা, সন্ত্রাসের নায়ক অর্থসম্পদের প্রভাবে লোকজনকে নিয়ে সাময়িক প্রলোভনের বিনিময়ে তৎক্ষণাৎ সাজতে চান ভাল মানুষ। তার দলের লোকজনেরা বলে অমুক ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র ইত্যাদি। কিন্তু আসলে কি তাই? যেই নির্বাচিত হলো সেইতো হারিয়ে গেল, সেজে গেল নেতা। গ্রামের রাস্তায় চলতে মাথায় ধরতে হবে ছাতা; দিতে হবে রাস্তা ছেড়ে। যা বলবে তাই মানতে হবে– এভাবে দীর্ঘদিন চলতে থাকলে শোষকের শোষণে শোষিত তরুণরা এক সময় বড় হয়ে প্রতিবাদ করতে শুরু করে। এতে শুরু হয়ে যায় দ্বন্দ্ব আর সমাজ ও সমাজের ছোট ছোট সন্তানরা আদর্শ মানুষ ও সচ্চরিত্রবান হওয়ার স্থলে হয়ে উঠে অসচ্চরিত্রের এক একজন সমাজদ্রোহী দুষ্ট মানুষ। ফলে সমাজের লোকজনের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। কাজেই প্রয়োজন সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষমতা বা নেতৃত্ব সমাজের সৎ, নির্ভীক, আদর্শবান, যারা নামায, যাকাত, হজ্জ ও সিয়াম পালন করে, হক হালালের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যায়ের সাথে আপোষহীন ন্যায়ের পক্ষে জীবন বাজি রেখে যারা মানবতার কল্যাণ করতে চায় তারা দরিদ্র হলেও ক্ষমতা বা নেতৃত্ব তাদের হাতে দেয়া উচিত। আল্লাহভীতি যাদের মধ্যে আছে, যারা মুখে কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর কথা বলে ও বাস্তবায়ন করে তাদের সমাজের প্রধান করলে আদর্শ চরিত্র গঠন হবে। উপকৃত হবে আগামীদিনের আগন্তুক সন্তানরা আর বর্তমান জনগোষ্ঠীতো বটেই।

আর এভাবেই সমাজ থেকে নেতা নির্বাচিত হয়ে সকলের সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে গঠন করা হয় রাষ্ট্র প্রধান। যিনি সমগ্র বিশ্বে এ রাষ্ট্রের পতাকাকে তুলে ধরবেন যার ভিত্তিতেই জন্মভূমি এগিয়ে চলবে। যাকে অনুসরণ

www.amarboi.org

করে এদেশের প্রত্যেকটি মানুষ হবে আদর্শবান, উচ্চ শিক্ষিত ও সকলের কল্যাণকামী। মূলত রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব অনেক। রাষ্ট্রের কোথায় কী হচ্ছে? কার বা কোন্ জনগোষ্ঠীর কী প্রয়োজন? কিসের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে? সর্বোপরি আগামী সন্তানদের জন্য একটি সুন্দর বাসযোগ্য ভূমি উপহার দেয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো রাষ্ট্রপ্রধানের।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর ঈমান, আকীদা সংরক্ষণ আদর্শ শিক্ষার প্রচার প্রসার, আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ, জাতীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যার শরীয়াহ ভিত্তিক সমাধানের ক্ষেত্রে মতামত প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সেটি হলো- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। এদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের সমন্বয়ে এ ফাউন্ডেশনের রয়েছে সুদক্ষ পরিচালনা পরিষদ। যাদের মতামতের ভিত্তিতে দেশে সকল জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ভাবধারা সংশোধিতকরণ, সব ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.), সীরাতুন্নবী (সা.), মুহাররম, মাহে রামাদ্বান, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, যাকাত, ফিতরা ও হজ্জে যাওয়ার সকল ব্যবস্থাসহ সামাজিক সমস্যা, জঙ্গী, হত্যা, সন্ত্রাস, এসিড সন্ত্রাস, যৌতুক -এ সকল ধরনের জাতীয় ও জনবিরোধী সমস্যা সমাধানে এখানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান প্রচারিত হয়, গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সমগ্র দেশে মসজিদভিত্তিক লাইব্রেরী ও গণপাঠাগার, ইমাম, মুয়াজ্জিনদের সুসংগঠিতকরণের লক্ষ্যে পরিচালনা করা হয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। যেখানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও ইমাম ও মুয়াজ্জিনরা এসে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। মোটকথা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সম্পর্কে একটি বিষয় সুস্পষ্ট তা হলো-এ ফাউন্ডেশনের যে কোনো প্রকারের মতামত, সিদ্ধান্ত নিমিষের মধ্যেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সর্বত্র প্রচার করা সম্ভব এবং দেশের জনগোষ্ঠীর কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু এত কিছুর ক্ষেত্রেও পাঁচ-পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন ঘোষিত হয়েছে এদেশ। ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন, অপরাধ দমনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে চৌকস সদস্যদের নিয়ে র‍্যাব, নিয়োগ দেয়া হয়েছে প্রচুর পুলিশ, সংশোধন করা হয়েছে আইন, কিন্তু তবু কি কমেছে অন্যায়, অপকর্ম, হত্যা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি? নিশ্চয়ই নয়। কাজেই একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ধরা দিয়েছে তা হলো, আমাদেরকে আজ অসচ্চরিত্রের পশু প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ঘৃণাবোধ

www.amarboi.org

বাড়াতে হবে আর সচ্চরিত্রের গুণগুলো অর্জনে উৎসাহিত করে তুলতে হবে। অসচ্চরিত্রের কুফল বা খারাপ দিকগুলো মানুষকে জানানো এগুলোর বিরুদ্ধে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সভা সমাবেশের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা। আরো কিছু বিষয় আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কাছে প্রত্যাশা করছি এবং মনে করছি এগুলো আমাদের পাওয়ার অধিকার রয়েছে; যেহেতু আমরা এদেশেরই নাগরিক, আমাদের অর্থেই পরিচালিত হয় এ ফাউন্ডেশন।

০১. দুর্নীতি, হত্যা, সন্ত্রাস, যৌতুক, অবৈধ মানব প্রেম এসব কিছু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও সকলের বোধগম্য করে জনগণের কাছে উপস্থাপন করা। তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে এসব কিছু অসচ্চরিত্রের লক্ষণ। পশু প্রবৃত্তির বশে মানুষ এমন সব করে। কাজেই আমাদেরকে এসব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে সচ্চরিত্রের আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

০২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ধর্ম মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মতবিনিময়, লিফলেট বিতরণ, পোষ্টার, ব্যানার, সংক্ষিপ্ত পরিসরে মূলকথা সম্বলিত বই ইত্যাদি বিতরণের মাধ্যমে যাকাত প্রদানের প্রতি মানুষদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। আমাদের দেশে আজও অনেকে মনে করে যাকাত দিতে হবে কেন সরকারকে ট্যাক্স তো দিচ্ছি অথবা দান-খয়রাত তো দিচ্ছি ইত্যাদি। যাকাত এবং ট্যাক্স দু'টি পৃথক। যাকাতের অর্থ কুরআনে বর্ণিত ৮টি খাতের ব্যয়ের জন্য প্রযোজ্য বা তাদের হক আর ট্যাক্স সমগ্র জনগণের হক– এ দিয়ে অবকাঠামোর উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়ে থাকে, তার ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে দিয়ে সকলকে এ কাজে আত্মনিবেদিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

০৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে দেশের সকল মিডিয়াগুলোতে দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে মানুষ হিসেবে আমাদের করণীয় কী তা তুলে ধরে জনগণকে অবহিত করতে হবে।

০৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পরিচালিত ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের প্রশিক্ষণে আমাদের সম্মানিত ইমাম ও মুয়াজ্জিনদেরকে তাদের স্ব-স্ব এলাকায় গিয়ে ইবাদত (আল্লাহর হক) আর সচ্চরিত্র (সৃষ্টির হক)-এ বিষয়ে বিশেষ তাকিদ ও কিভাবে সচ্চরিত্র গঠন করে অন্য সৃষ্টির হক আদায় করা যায় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করে আলোচনা পেশ করার জন্য গুরুত্বের সাথে তাকিদ দিতে হবে। আলোচনা আসলে উনারা করেন, কিন্তু বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে হওয়ার কারণে তার প্রভাব সমাজের লোকজনদের পশু প্রবৃত্তিকে দমন করতে সক্ষম হয়না।

www.amarboi.org

কাজেই তা গঠনমূলকভাবে করার প্রতি যদি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে জাতীয়ভাবে আমরা সচ্চরিত্রের দিকে ধাবিত হতে পারব। কেননা যেদেশে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি কাজ করে সেদেশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকেইতো অসচ্চরিত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

০৫. আশরাফুল মাখলূকাত বা শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ-এ মানুষ তার দায়িত্ব কর্তব্য কী? তাদের মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ কেমন হবে? কে তাদের সৃষ্টি করল? কেন সৃষ্টি করল? তাদের কোনো জবাবদিহি আছে কি? নাকি খাও, দাও ফুর্তি করো যা ইচ্ছা তাই কর-এ নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে পৃথিবীকে ওরা একটা রঙ্গমঞ্চ হিসেবে গ্রহণ করবে? এ সকল বিষয়ে তাদের বোধশক্তি গঠন ও বিবেককে জাগ্রত করে দেশ, সমাজ ও জাতি সত্তার প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণালব্ধ ও বাস্তবভিত্তিক জীবনবোধ সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশ করে তা কম মূল্যে জনগণের হাতে তুলে দিলে মানুষ আরো সচেতন হতে পারবে। তারা নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি ও দায়িত্ব কর্তব্য বা করণীয় সম্পর্কে জাগ্রত হবে, উদ্বুদ্ধ হবে এবং সুন্দর সমাজ গঠনে উদ্যোগী হবে।

সর্বোপরি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত এদেশের জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়ে তুলতে হবে ইবাদত আল্লাহর হক আর সচ্চরিত্র মানুষের হক। এ সচ্চরিত্র সম্পর্কে কাল হাশরের মাঠে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন এবং এ প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ জবাব ও সকলের অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোনভাবেই আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত উপহার দিবেন না। এছাড়াও আমার কাছে মনে হয়েছে পবিত্র কুরআন দু'টি অংশে বিভক্ত। একটি হলো আল্লাহর হক অন্যটি মানুষের হক। কাজেই শুধু ইবাদত নয় সাথে সাথে মানুষের হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করার বিনিময়েই আমরা পেতে পারি দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে জান্নাত।

মসজিদের ইমাম সাহেবদের ভূমিকা

বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম দেশ বাংলাদেশ। এদেশে রয়েছে প্রায় আড়াই লক্ষ মসজিদ। ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলিমরা প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে আল্লাহর হুকুম পালনে গমন করে থাকেন। এ মসজিদগুলোতে যারা নামাযে নেতৃত্ব দেন তারা হলেন ইমাম। ইমাম এর শাব্দিক অর্থ নেতা। তিনি হলেন মসজিদের নেতা, সমাজেরও নেতা; সকলের শ্রদ্ধাশীল একজন মানুষ। ফলে মসজিদের বাইরেও সামাজিক পরিমণ্ডলে রয়েছে তাঁদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাছাড়া মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবদের মুখোমুখি হোন সমাজের প্রত্যেক মুসলিমরা। যে কোনো জরুরী সমস্যার সমাধানও খুঁজে বেড়ান তাঁদের কাছে। দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যেখানে আজও পানি, বিদ্যুৎ,

www.amarboi.org

গ্যাস ও টেলিফোন সুবিধাও হয়তোবা পৌছেনি সেখানের মসজিদেও রয়েছেন সম্মানিত ইমামগণ। যাঁদেরকে দেখলে সালাম দেয়, শ্রদ্ধা করে বিনয়ের সাথে, নম্রভাবে কথা বলে, ছোট-বড় দলমত নির্বিশেষে এলাকার সমস্ত জনগণ।

দেশে প্রায় আড়াই লক্ষাধিক মসজিদে প্রায় এক লক্ষ খতিব, আড়াই লক্ষ পেশ ইমাম ও আড়াই লক্ষ মুয়াজ্জিন রয়েছেন। এ সকল ব্যক্তিরা হলেন আলেম, জ্ঞানী এবং আদর্শবান ফলে সমাজে সম্মান পান। তাঁদের ডাকে সাড়া দেন সমাজের বালক, কিশোর, তরুণ ও যুবকসহ সকল স্তরের মুসল্লীরা।

এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আলেম জ্ঞানী ব্যক্তিরা অজ্ঞতার, অন্ধকার যখন উজ্জ্বল আলোকে গ্রাস করতে চায়, অনাদর্শ যখন আদর্শকে পরাভূত করতে চায়, চারদিকে যখন অনৈতিকতার কাছে নৈতিকতার অপমৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে, জাতি হিসেবে যখন আমরা বিশ্বের কাছে দুর্নীতিপরায়ণ, সন্ত্রাসী হিসেবে পরিগণিত হচ্ছি তখনও কী আপনাদের বিবেক তাড়িত হয়না, একটু দায়িত্ব পালন করতে মন চায় না, চারদিকে পশু প্রবৃত্তির করাল ছোবলে ৫/৬ বছরের শিশু মেয়েটিরও যখন কোনো কিছু বুঝে উঠার আগেই অমানবিক অত্যাচারে শিকার হয়ে জীবন দিতে হচ্ছে, মুহতারেমা মায়েদের চোখের সামনে যখন তার কন্যাদের সতীত্ব হরণ করা হচ্ছে, এসিড নিক্ষেপ করে ঝলসে দেয়া হচ্ছে সুন্দর ফুটফুটে মানব শরীর, কেড়ে নেয়া হচ্ছে অন্যের সম্পদ, প্রয়োজনে হত্যা করা হচ্ছে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে এক কথায় মানব চরিত্রের সৎ গুণগুলোর অভাবে মানবতা যখন চরমভাবে বিপর্যস্ত, জালিমের অত্যাচারে মজলুমের কাফেলা যখন আতংকগ্রস্ত আজও কী আপনারা সজাগ, সচেতন ও দায়িত্বপ্রবণ হয়ে উঠবেন না? আপনারা তো রাসূল (সা.)-এর উত্তরসূরী। রাসূল (সা.) তো কখনোই এমন অন্যায়-অত্যাচার, অবিচারের কাছে মাথা নত করেননি। বরং তিনিইতো ইমাম হিসেবে মসজিদে নববীতে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ঘোষণার মাধ্যমে মানুষের সচ্চরিত্রের গুণগুলোকে প্রস্ফুটিত করেছিলেন, সকলের মুখে ফুটিয়েছিলেন হাসি, দূরীভূত করেছিলেন অসচ্চরিত্রের দোষগুলো। আজ রাসূল (সা.)-এর অনুপস্থিতিতে এ দায়িত্ব তো কেউ না কেউ পালন করতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ج فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ج لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ج ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত করো। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (সূরা আর রূম, ৩০ ঃ ৩০)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.

www.amarboi.org

"আমি 'উপদেশের' পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হবে।" (সূরা আল আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৫)

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ.

"যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায়ভাবে বিচার করে।" (সূরা আল আ'রাফ, ০৭ ঃ ১৮৯)

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করলে আল্লাহ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৯)

তারপরও কি আপনারা জেগে উঠবেন না? ভাবছেন ওরা সমাজের শক্তিশালী, সম্পদশালী বলতে গেলে চাকুরী চলে যায় নাকি? আজ চাকুরীর ভয়ে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর কথা অমান্য করছেন কিন্তু একবারও ভাবনায় আসে না আল্লাহই সকলের রিযিক দাতা, পালনকর্তা অথবা ভাবছেন অপরাধ দমনে পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, বিডিআর, বিমান, সেনা, নৌ বাহিনীর সদস্যরা আছে, রাজনৈতিক নেতা আছে ও আইন আছে আমাদের বলার দরকার কী? এমন!

যদি তাই হয়, তাহলে আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলব ঃ

- দেশে হত্যা ও সন্ত্রাস বাড়ছে না কমছে?
- এসিড সন্ত্রাস হচ্ছে নাকি হচ্ছে না?
- অপকর্ম হচ্ছে নাকি হচ্ছে না?
- দুর্নীতি মানুষ করছে নাকি করছে না?
- পরশ্রীকাতরতা, চোগলখুরী, গীবত, মিথ্যাচার সমাজে বাড়ছে নাকি কমছে?
- সুদ, ঘুষ বাড়ছে নাকি কমছে?

এক কথায় পশু প্রবৃত্তির বশে অসচ্চরিত্রের ভীড়ে সচ্চরিত্রবান আদর্শ মানুষগুলোও যখন কোণঠাসা এবং তাদের বাণী যখন কেড়ে নেয়ার উপক্রম তখন দেশের এ সকল জনগোষ্ঠীর শ্রদ্ধেয় খতিব ও ইমামরা চুপ করে বসে থাকবেন? তাতো হতেই পারে না, তাছাড়া মানুষের উপর অর্পিত দায়িত্ব মানুষকে পালন করতেই হবে। অন্যথায় জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে যা কারোরই কাম্য নয়। তাই আজ প্রয়োজন-

www.amarboi.org

- অজ্ঞতার অন্ধকার বিদূরীত করে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করে দেয়া,
- সচ্চরিত্র কী, সচ্চরিত্রের গুণাবলি কী কী? বর্তমান সমাজে অসচ্চরিত্রের যে সমস্ত দিকগুলো অহরহ ঘটছে তা থেকে মুক্তির উপায়, দুনিয়াতে ও আখিরাতে তার শাস্তি, আর তাওবা করে ফিরে আসলে –তা থেকে মুক্তির উপায় বর্ণর্না করা।
- মসজিদের মিম্বরে বসে সচ্চরিত্র মানুষের হক এ প্রসঙ্গে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ভিত্তিতে সহজভাবে ব্যাখ্যা প্রদান ও মানতে উৎসাহিত করা, উজ্জীবিত করা তাদের কাছ থেকে কমিটমেন্ট আদায় করা ইত্যাদি।
- সকল ধরনের অন্যায়, অপকর্মের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করা ও সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করা।
- সকল মুসলিম ভাই ভাই এমন ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে ছোট-খাট ভুল ভ্রান্তি ভুলে দোয়াল্লীন না জোয়াল্লীন, আমীন জোরে না আস্তে, লম্বা টুপি না গোল টুপি, মুনাজাত করব কি করব না, পাগড়ী ছোট না বড়, সাদা কাপড় না কালো কাপড়, দাঁড়ি ছোট না বড়, রাসূল মাটির তৈরি না নূরের তৈরি, রাসূল আমাদের মতো মানুষ না মানুষ নয় ইত্যাদি (যা সম্পর্কে কাল হাশরের মাঠে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন না বরং করবেন আমল প্রসঙ্গে) বিভেদ ভুলে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, দলাদলি থেকে মুক্ত থেকে আদর্শ সচ্চরিত্র গঠন এবং সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতি দায়িত্ব পালন করলে জাতি উপকৃত হবে।

আর এভাবেই আমাদের মুহতারাম ইমাম সাহেবদের সচেতনতায় আমরা আগামীতে একটি সুখী সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হবো।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

১৯৭১ সালে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা, অগণিত মানুষের আত্মদান, মা-বোনদের সতীত্ব হরণ, দুঃখ-কষ্ট আর গ্লানির বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের এ স্বাধীনতা। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত এদেশবাসীকে সুসংগঠিতকরণ; সর্বজনীনকরণের জন্যে শিক্ষাকে সকলের দোর গোড়ায় পৌছিয়ে দিয়ে যোগ্যতম নাগরিক হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠন করা হয়েছে একাধিক শিক্ষা কমিশন। বিগত কয়েক বছর ধরে এ খাতে দেয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ অর্থ বরাদ্দ। কিন্তু বিধির কি বাম! সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ সেই ১৮৩৫ সালে প্রণীত ইংরেজ লর্ড মেকলের প্রণীত শিক্ষানীতির আদলেই সবগুলো প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং দুর্ভাগ্য এ জাতির। একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সিলেবাস– যা জাতির ঈমান-আকীদা, কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা আজও পাওয়া যায়নি। আমরা পাইনি সমন্বিত শিক্ষা সিলেবাস। আরো পাইনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের চিন্তা-

www.amarboi.org

চেতনা ও জীবন চরিত্র বিষয়ক গ্রন্থের সমাহার। পাইনি আদর্শিক চিন্তা-চেতনার বিন্দুমাত্র রেশ। ফলে আজ আমরা কী হয়েছি দেখুন!

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু বর্তমানে দেশে শিক্ষার যে হাল-হাকিকত তাতে মনে হয়, বর্তমান ও আগামী আগন্তুকদেরকে একটি মেরুদণ্ডহীন জাতিতে পরিণত করার নীল নকশার বাস্তবায়ন চলছে। আমাদের সমাজ থেকে নৈতিকতা বিদায় নিয়েছে। চারদিকে হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায় এবং সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব অক্টোপাসের মতো আমাদেরকে জেঁকে ধরেছে, মূল্যবোধের জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য, সর্বত্র সবার মধ্যে এক অসাধারণ আর্তি ও হাহাকার। মানুষের মহৎ আকাঙ্ক্ষাগুলো জীবন থেকে নির্বাসিত। ন্যায় বিচারের আশা, সত্য সুন্দর ও কল্যাণের কামনা আজ ক্ষমতার দাপটে পর্যুদস্ত। সৎ-অসৎ চিন্তা বিবর্জিত আত্মসর্বস্বতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা ও মনুষ্যত্বহীনতা আমাদের জীবনকে করে তুলেছে জীর্ণ।

জীবাণু দূষিত গ্যাংগ্রিন সমাজ দেহের সর্বত্র বিষ ঢেলে দিচ্ছে। সমাজে অনাচার, অবিচার, ব্যভিচার, হত্যা, গুম, হানাহানি, খুন-খারাপি এবং সন্ত্রাস ইত্যাদি অসামাজিক ও মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ অপ্রতিহত গতিতে বেড়েই চলেছে।

যতই কথামালা ও আইনী প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করানোর প্রয়াস, ততই যেন বেড়ে চলেছে খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও রাহাজানি। ক্রমেই দেশ এগিয়ে চলেছে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে।

কিন্তু আর কতদিন? একবিংশ শতাব্দীর অনেকগুলো বছর অতিবাহিত হতে চলেছে তবু আজ আমরা পাচ্ছি না ন্যূনতম বেঁচে থাকার সাধ। অথচ আমাদের দেশের মতো বা তার চেয়েও দুর্বল দেশ আজ অনেক উন্নত হয়ে গিয়েছে। মালয়েশিয়ায় আজ আদর্শিকতার বাণীর প্রচার চলছে, অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট সক্রিয় ও শক্তিশালী। কিন্তু আমরা! শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং তাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট চিন্তা করলেও আমরা আজ পিছিয়ে আছি। তাই আজ এ পর্বে যা প্রয়োজন তা হলো আমাদেরকে উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে সকলকে সম্মিলিতভাবে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে আগামীতে আমাদের মাতৃভূমিকে আমাদের গড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

শিক্ষার প্রধান বাহন বই। আজ এ বই কোন্ শ্রেণীতে কোন্ বয়সে কোন্ ধরনের বিষয় পড়ানো হবে তা নির্ধারণ করার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় দেশের জনগণের অর্থে পরিচালিত সর্বোচ্চ অর্থ বরাদ্দের মধ্যে একটি। এ মন্ত্রণালয় অনেক দায়িত্ব পালন করছে বটে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এ মন্ত্রণালয় পরিচালিত শিক্ষা সিলেবাস, পাঠ্যসূচী, পাঠ্যতালিকা কতটুকু আমাদের বর্তমান সময় উপযোগী? আমাদের ধ্যান-ধারণা উপযোগী? আমাদের চিন্তা-

www.amarboi.org

চেতনা উপযোগী? আমাদের কর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? আমাদের জীবনবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? জবাবে এক কথায় বলব অত্যন্ত দুর্বল, কোনো রকমে জোড়া তালি দিয়ে চলছে এদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়। চলছে বিভিন্ন সময়ের মন্ত্রী ও আমলাদের মনগড়ামত বা যার যার ইচ্ছামত। ভুল বললাম! কেউ কেউ ভ্রূকুঞ্চিত করবেন। জবাব তাহলে দিতেই হবে। ঠিক আছে দেখুন! একবার ডিগ্রী থেকে ইংরেজি বাদ, এস.এস.সি স্তরে ৫০০ অবজেকটিভ চালুকরণ, অতিরিক্ত বিষয় পড়বে পরীক্ষা দিবে কিন্তু নম্বর যোগ হবে না, শুধু অবজেকটিভে তেত্রিশ নম্বর পেলেই পাশ, তারপর অবজেকটিভ-রচনামূলক মিলে পাশ, ডিভিশন নেই। আসল A^{+} এখানে আবার, নম্বরের হের-ফের, আগের বছর যে A পেল পরের বছর ঠিক সেই নম্বর পেয়ে A^{+} পেল। কখনো পরীক্ষা দিয়ে কলেজে ভর্তি, কখনও পরীক্ষা ছাড়া কলেজে ভর্তি। ছাত্ররা পরীক্ষা দিয়ে ঘুরছে, ঘুরছে নিরবধি। আল্লাহ্ মাফ করুক। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিবরণ লিখে শেষ করা যাবে না। শেষ না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ এর ফলাফল যে বিশাল। তাছাড়া জাতিকে, আদর্শ সচ্চরিত্রবান করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় পালন করতে পারে বিশাল দায়িত্ব, বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট, শিক্ষা প্রয়োজন একটি কারণে তা হলো জীবনবোধ পরিচালনা। আর জীবনবোধ পরিচালিত হওয়ার জন্য দরকার দু'টি জিনিস। একটি জীবনের সকল অভাব ও কর্ম পূরণ আরেকটি স্রষ্টার আদেশ ধর্ম তথা আনুগত্য পালনের মধ্য দিয়ে আদর্শিক জীবন গঠন ও পরিচালনা। এবার সকল কিছুর সৃষ্টি যার সেই স্রষ্টার আদেশ অনুযায়ী আনুগত্য পালন করতে হবে। এ বিষয়ে নিশ্চয়ই সকল জনগোষ্ঠী একমত, তাহলে জীবনের সকল অভাব ও কর্মপূরণওতো স্রষ্টার আদেশেরই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই স্রষ্টার আদেশ অনুযায়ী, স্রষ্টার দেয়া বিধান অনুসারে, স্রষ্টার প্রেরিত শিক্ষকের দেখানো পথ মত, চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ শিক্ষা অনুকরণ নিশ্চয়ই এটি অর্জন করা সম্ভব। আর তাহলেই তার প্রভাব ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব পরিমণ্ডলে পড়বে এবং জাতি হিসেবে আমরা হবো আরো উন্নত। অন্যদিকে মানবীয় সকল গুনাবলিগুলো অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষা সিলেবাস সাজানো হলে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, একে অপরের প্রতি মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ, আমানতদারী এবং সঠিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে। দেশের অর্থনীতি আগামী ২৫ বছরে উন্নত দেশের পর্যায়ে যাবে। আমরা জাতি হিসেবে আজকের ন্যায় লজ্জায় মাথানত করে দুর্নীতিপরায়ণ, ঘুষখোর, সুদখোর, জঙ্গী এবং এক কথায় অসচ্চরিত্রের হিসেবে অপমানিত, লাঞ্ছিত হবো না; বাংলাদেশ হবে বিশ্বের দরবারে একটি আদর্শিক রাষ্ট্র।

www.amarboi.org

দাওয়াতে তাবলীগের ভূমিকা

আল্লাহর বাণী ও অভিপ্রায় মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানানোই দাওয়াতে তাবলীগ। এর মূল লক্ষ্য হাক্কুল্লাহ তথা আল্লাহর হক ও হাক্কুল ইবাদ তথা মানুষের হক পরিপূর্ণভাবে নিজেরা আদায় করা এবং মানুষকেও আদায় করতে আহ্বান জানানো, সহায়তা করা। এ দায়িত্ব দিয়েই যুগে যুগে পৃথিবী পৃষ্ঠে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দু'লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন। ফলে আদম (আ.) থেকে শুরু করে আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত সকলেই এক আল্লাহর বাণী প্রচার প্রসার ও বাস্তবায়ন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। যখনই কোনো জাতি এ আহ্বান সত্ত্বেও আল্লাহর বাণীকে মেনে নেয়নি, নিজেদের মনগড়া মতো চলেছে এবং পাপাচারের সীমা অতিক্রম করেছে তখনই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা লা'নত চাপিয়ে দিয়ে ঐ জনপদগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْ أُمِّهَا رَسُوْلاً يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ
اٰيٰتِنَا ج وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُوْنَ.

"আপন রব জনপদগুলোকে (প্রথমেই) ধ্বংস করেন না, যেই পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলগুলোতে কোনো রাসূল (বাণী বাহক ও প্রচারক) প্রেরণ না করেন, যিনি আমার আয়াত (বাণী) গুলোকে পড়ে শুনান; আমি ঐ জনপদগুলোকে ধ্বংস করি না (যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানকার অধিবাসীরা আমার বাণী শুনতে থাকে), কিন্তু ঐ অবস্থায় (ধ্বংস করি) যখন তথাকার অধিবাসীরা অনাচার করতে থাকে।" (সূরা আল কাসাস, ২৮ ঃ ৫৯)

এভাবে সর্বশেষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পৃথিবীতে সকল মানবমণ্ডলীর জন্য রহমতস্বরূপ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে দাওয়াতে তাবলীগের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পাঠিয়েছেন আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আল্লাহ পাক রাসূল (সা.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا. وَّدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلاً كَبِيْرًا.

"হে নবী! নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি এ হিসেবে যে, আপনি সাক্ষ্য প্রদানকারী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী। আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল দীপ্তিমান প্রদীপরূপে। মুমিনদেরকে সুসংবাদ

www.amarboi.org

দান করুন যে, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাদের জন্য রয়েছে এক বিরাট অনুগ্রহ।" (সূরা আল আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৫-৪৭)

এভাবে রাসূল (সা.) জীবনের ৬৩ বছরে এ মানবমণ্ডলীকে আল্লাহ্র হুকুম আহকাম পালন এবং সচ্চরিত্রবান হওয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এ দু'টো বিষয়ের সফল ও সার্থক হুকুম পালনকারী ও বাস্তবায়নকারী এ রাসূল (সা.)-এর উম্মতকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এ উম্মতকে নবী কারীম (সা.)-এর দায়িত্ব পালনের হুকুম দিয়ে বলেন ঃ

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ.

"তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, তোমাদেরকে মানুষের (কল্যাণের) জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, তোমরা মানুষকে সৎ কাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১১০)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক উম্মতে মুহাম্মাদীকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পর দুনিয়াতে আর কোনো নবী রাসূল আসবেন না বিধায় আল্লাহ্ পাক সে মহান দায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর অর্পণ করেছেন। উম্মতে মুহাম্মাদী মানুষকে দ্বীনের দিকে আহ্বান করে বদদ্বীনি থেকে ফিরিয়ে রেখে ঈমান ও আমলের প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে সমস্ত মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধন করার চেষ্টা করবে।

আল্লাহর দিকে এ আহ্বানের কাজ উম্মতে মুহাম্মাদী নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, যুবা ও বৃদ্ধ সবার উপরেই অত্যাবশ্যকীয় বা ফরযে আইন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ ج هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ج مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ ج هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِن قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُم وَتَكُونُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ج فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু করতে থাকো, সিজদাহ করতে থাকো,

www.amarboi.org

আর নিজ রবের ইবাদত করতে থাকো, নেক কাজ করতে থাক-আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে। আর আল্লাহর জন্য মুজাহাদা করো যেমন মুজাহাদা করা উচিত। আল্লাহ তোমাদেরকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন, আর তোমাদেরকে প্রদত্ত ধর্মে কোনো প্রকার কঠোরতা রাখেননি, এটা তোমাদের পিতৃপুরুষ ইবরাহিম-এর মিল্লাত (ধর্মাদর্শ), তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান; এই (কুরআনের) আগেও এবং এই (কুরআনের) মধ্যেও, যেমন তোমাদের জন্য রাসূল সাক্ষী আছেন, তেমন তোমরাও সমস্ত মানবমণ্ডলীর জন্য সাক্ষী হও। অতঃপর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, তিনিই তোমাদের অভিভাবক; হ্যাঁ তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী।" (সূরা আল হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৭-৭৮)

নবী কারীম (সা.) বলেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً.

"আমার পক্ষ থেকে মানুষকে পৌঁছাতে থাকো, যদিও তা একটি মাত্র আয়াত (বাণী বা কথা) হয়।"

আর এভাবে দাওয়াত দেয়া, মানুষকে অন্যায় থেকে বা স্রষ্টা বিমুখতা থেকে ফিরিয়ে রাখা, রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করা, পৃথিবীতে সর্বোত্তম কাজ।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"আর কার কথা তার চেয়ে উত্তম হতে পারে, যে (মানুষকে) আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সে নিজেও (তদানুযায়ী) নেক আমল করে এবং বলে যে, নিঃসন্দেহে আমি মুসলমানদের মধ্যে একজন।" (সূরা হা-মীম সিজদাহ, ৪১ ঃ ৩৩)

আর এ আদেশের বাস্তবায়নস্বরূপ আমাদের সকলের উচিত সকলের প্রতি দায়িত্ব পালন করা। কেননা মুসলিম মানেই আল্লাহর এ আহ্বান এবং রাসূল (সা.)-এর জীবন চরিত্র মেনে চলতে বাধ্য। পবিত্র কুরআনের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ, অনুকরণ এবং বাস্তবায়নই দ্বীন বা ধর্ম। অর্থাৎ এ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো ঃ

০১. ঈমান

০২. আমল

০৩. ইহসান

www.amarboi.org

এ আমল আবার বিভিন্ন প্রকারের। যেমন ঃ

(ক) ইবাদত ঃ ইবাদত চার প্রকার। যথা- নামায, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ ।

(খ) মুআমালাত-লেনদেন

(গ) মুআশারাত -আচার ব্যবহার

(ঘ) সিয়াসাত-রাষ্ট্রনীতি

(ঙ) ইকতিসাদিয়্যাত-অর্থনীতি

(চ) দাওয়াত ও জিহাদ ইত্যাদি।

এখানে দ্বীনের এ সবগুলো বিষয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে সচ্চরিত্র গঠিত হয়ে থাকে। আজকাল ঈমান, ইবাদত (নামায, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ) ও ইহসান এ বিষয়গুলোর উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। বাকী আমলের আরো যে পাঁচটি বিষয় রয়েছে তার ঘাটতি বা শিক্ষার জন্য সঠিক ও বাস্তব সমউপযোগী আলোচনা না থাকার কারণে পরিবারে ও সামাজিক পরিমণ্ডলে সৃষ্টি হচ্ছে ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব, কাটাকাটি, মারামারি এবং দেশে সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জঙ্গী বাহিনী। চারদিকে বিরাজ করছে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। সিয়াসাত-রাষ্ট্রনীতি ও ইকতিসাদিয়্যাত-অর্থনীতির বিভিন্ন অঙ্গন থেকে আলেম (জ্ঞানী) লোকজন দূরে থাকার কারণে বা তার বাস্তবভিত্তিক আলোচনা ইসলামিক জলসা ও মসজিদগুলোতে না হওয়ার কারণে দেশ পারিচালনার সকল স্তরে খুঁটি গেড়ে বসে আছে এক শ্রেণীর মানুষ। যাদের পাশাপাশি অফিসে চেয়ার দখল করে মুষ্টিমেয় সৎলোকগুলো যখন ঘুষের ভাগ নিচ্ছে না, সুদের ভাগ নিচ্ছে না অথবা মুখে দাঁড়ি, মাথায় পাগড়ি গায়ে লম্বা জামা আর টাখনুর উপরে প্যান্ট বা পায়জামা পরিধান করছে ঐ সমস্ত অসচ্চরিত্রের লোকেরা তাদেরকে অপছন্দ করছে এবং কিছু হলেই দিচ্ছে এটা-সেটা বলে বকা আর নতুবা রাঙ্গামাটি পাহাড়ী এলাকায় বদলি ওএসডি অথবা অন্য কোনো হুমকি-ধমকি দিয়ে কোণঠাসা করে রাখছে। তাদের পাশাপাশি আবাসিক কোয়ার্টারে থাকলেও বিপদ। কারণ, তারা প্রতিদিন ক্রয় করে বাজার থেকে বড় বড় রূপালি ইলিশ আর রুই। ঐ ভাই আনে কাচকি মাছ বা শুধু আলু আর ডাল। তাদের সন্তানেরা পড়ে ইংলিশ মিডিয়ামে, যায় গাড়িতে করে আর এ সন্তানেরা পড়ে সরকারি স্কুলে, যায় পায়ে হেঁটে। তাদের বাসার সামনে সুন্দর চকচকে লাল পাজেরো গাড়ি আর এ বাসার সামনে কিছুই নেই। ফলে এসব দেখে সন্তানরা হয়ে যায় বাবা বিরোধী, পড়ালেখায় অমনোযোগী, স্ত্রী হয়ে উঠে প্রচণ্ডভাবে না পাওয়ার বেদনায় ব্যাকুল (ব্যতিক্রমও আছে) তারপর কি হয় তা- না হয় নাই বললাম। সুতরাং দ্বীনের সকল দিকের বিষয় নিয়ে সর্বত্র আলোচনা পেশ, তার উপর গ্রন্থ রচনা এবং অন্যায় হতে দেখলেই সাথে সাথে তা প্রতিহত করা উচিত সকলের ঐক্যবদ্ধভাবে। আজকে অসচ্চরিত্রের এ মানুষগুলো চেয়ারে বসে থাকার কারণে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন যাচ্ছে রসাতলে ব্যক্তিক উন্নয়ন তথা কোথাও কোথাও পিয়নেরও গাড়ি, কয়েকটা বাড়ি, সুদৃশ্য অট্টালিকা আরও কত কী?

www.amarboi.org

আদর্শের এ দাওয়াতের কাজ আমাদের সকলের কাজ। পুরো মুসলিম মিল্লাতের কাজ। যে যে ক্ষেত্রে আছি সেখান থেকেই নিজেরা সচ্চরিত্রের ধারক বাহক হয়ে সকলের মাঝে আদর্শভিত্তিক বাণী পৌঁছে দিতে পারলে তা হবে আরো সুদূর প্রসারী। আজ একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে এসে আর চুপ করে থাকার সুযোগ নেই। মূলত বিরোধীতার কারণে বিরোধিতা বা বিভিন্ন দলের মতাদর্শের পার্থক্যের উর্ধ্বে উঠে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। তা না হলে জাতি হিসেবে আমরা যে পিছিয়ে পড়ছি। অন্যদিকে, শুকরিয়ার বিষয় আমাদের দেশসহ বহিঃবিশ্বে আজ পরিকল্পিতভাবে একটি কাফেলা সরাসরি ময়দানে দাওয়াতের এ কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে। তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষদেরকে আল্লাহর বাণী পড়ে শুনাচ্ছেন এবং দলে দলে জান ও মালের কুরবানী দিয়ে উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব পালন করছেন।

কাজেই সচ্চরিত্র গঠনের দাওয়াত এবং এর পেছনে মেহনত করতে হবে বেশি করে। অন্যদের চরিত্রে আদর্শিকতা প্রস্ফুটিত করে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। আর তাহলে জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য বিলীন হয়ে যাবে।

সমাজ থেকে নানা অপকর্ম ও অপরাধপ্রবণতা দূরীভূত করার লক্ষ্যে খোদাভীরু সৎ ও যোগ্য দেশ প্রেমিকের মাথায় সমাজ গঠনের দায়িত্ব যেন আসে সে ব্যবস্থা করতে হবে। রাষ্ট্র গঠনে তাদেরকে সংসদে ভোটের মাধ্যমে জয়ী করে পাঠাতে হবে তাহলে সমাজ ব্যবস্থা হবে সুন্দর শান্তিময় আর এজন্য ছোট খাট বিভেদ ভুলে আলেম সমাজকে হতে হবে আদর্শ শিক্ষায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ। তা না হলে বাতিল শক্তির মোকাবেলায় যে নিজেরাই কুপোকাত হয়ে যেতে হবে। আজকের অস্থিতিশীল এ বিশ্ব পরিস্থিতিতে তাবলীগের ভূমিকা বলে শেষ করা যাবে না। কাজেই আদর্শ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সচ্চরিত্রবান হওয়ার প্রতি মানুষকে আহ্বান জানালে, মানুষের প্রতি মানুষের মূল্যায়ন ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার মনোভাব তৈরি করে দিতে পারলেই দাওয়াতে তাবলীগের এ কাজ সার্থক হবে।

অলী-আউলিয়া ও পীর-মাশায়েখ এবং ভক্তদের ভূমিকা

বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম দেশ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অলী-আউলিয়াদের অদম্য পরিশ্রম, বিরামহীন পথ চলা এবং অত্যন্ত মহব্বত ও ভালবাসার সাথে আদর্শিক দাওয়াতের মধ্যদিয়ে। সুন্দর ও সচ্চরিত্রের অধিকারী এ অলী-আউলিয়াগণ খুব সহজেই মানুষের মন জয় করে তাদের মাঝে তৌহিদবাদের বাণী প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছিলেন। অলী-আউলিয়াদের তীর্থস্থান বাংলাদেশের মাটিতে আজও তাঁদের ভক্তদের অবস্থান কম নয়। কিন্তু তারা ছোট-খাট বিষয়ে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ও একে অপরকে নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা এবং মতবিরোধের ফলে আদর্শ প্রতিষ্ঠার ময়দানে না আসার কারণে শয়তানরা এখন তাদের রাজত্ব বসিয়ে দিয়েছে। ফলে দেশে অসচ্চরিত্রের সবগুলো দিক বাস্তবায়িত হচ্ছে। অথচ খাঁটি অলী-আউলিয়া, পীর-

www.amarboi.org

মাশায়েখদের প্রথম ছবকই হলো তাসাউফ বা আত্মশুদ্ধি অর্জন তথা সচ্চরিত্রবান হওয়া। রাজায়েল বা কুরিপু, বদঅভ্যাস দূর করা ও ফাযায়েল তথা সৎ গুণ বা সৎ অভ্যাস প্রতিষ্ঠিত করা। নফসকে শুদ্ধ করার লক্ষ্যে সচ্চরিত্রের সকল গুণগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলা। আজকে প্রকৃত অর্থে আমাদের অলী-আউলিয়া ও পীর-মাশায়েখদের অনুসারী বা ভক্তগণেরা ইসলামকে একদম মাজার কেন্দ্রিক বা শুধু হাক্কুল্লাহ তথা আল্লাহর কেন্দ্রিক করে তুলেছেন অন্যদিকে হাক্কুল ইবাদ তথা মানুষের কথা আসলেই তারা মনে করে আমরাতো খারাপ কাজ করি না এবং যারা করে তাদের আগে ও পেছনে কোথাও আমরা নাই। কিন্তু এ অবস্থাটা কতটুকু সঠিক দেখুন! দেশ আজ ব্যক্তি পূজারী ও অসচ্চরিত্রের লোকে ভরপুর। যার প্রমাণ বাস্তবিক অস্থিরতা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট। কোথাও শান্তি নেই, শান্তি নেই সমগ্র বিশ্বেও। ফলে মুসলিম উম্মাহ পাখির ন্যায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। নিস্পাপ, নিষ্কলুষ সন্তানগুলো আর নিরপরাধ মা-বোনদের প্রতিদিনকার হত্যা ও কান্নার রোল দেখেও যদি আজ শত সহস্র কোটি-ভক্ত আশেকান ও জাকেরান ভাইয়েরা চুপ করে আপনাদের ভাষায় আপনারা ভাল আছেন বলেন তাহলে কী আপনারা নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত একথা বললে বেশি বলা হয়ে যাবে? একদিন আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় অলী-আউলিয়া ও পীর-মাশায়েখরা জীবনবাজি রেখে মৃত্যুকে হাতের মুঠে নিয়ে সুদূর আরব ভূ-খণ্ড থেকে এসে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কি এজন্যে যে, আমরা ভাল আছি এ কথা বলেই ক্ষান্ত থাকবো। বলুন! লক্ষ কোটি বর্তমান যামানার পীর-মাশায়েখদের ভক্ত অনুসারীরা কি জবাব দেবেন যদি আপনাদের দাদা পীর বা বাবা পীরেরা আপনাদের প্রশ্ন করেন যে, এই জন্যেই কি আমরা এদেশে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলাম, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম! যে তোমরা খানকায় বসে, আমার কবরের চারপাশে বসে, শান্তিতে আছ মনে করে চুপ থাকবে অথচ তোমরা সমাজ থেকে অশান্তি দূর করে মানুষকে আদর্শ সচ্চরিত্রবান বানানোর লক্ষ্যে দায়িত্ব পালন করবে না। না, নিশ্চয়ই নয়, কাজেই আজ আহ্বান করছি- আমিও একজন খেদমতদার হিসেবে আসুন, আর দেরি নয়, সময় যে ফুরিয়ে যাচ্ছে, যারা অনাদর্শের ভয়াল ছোবলে মৃত্যুবরণ করছে তারা যে আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ পেশ করবে তাই তাড়াতাড়ি বর্তমান ও আগামীদিনে আগন্তুক সন্তানদের সুন্দর সচ্চরিত্রবান করে গড়ে তুলে হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদের প্রতি সচেতন করে তুলি। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের পরিবার ও সমাজের প্রতিনিধি, অফিসের প্রতিনিধি। সুতরাং সকল স্তরে আমাদেরকে প্রথমে আদর্শের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করে আমরা যদি অন্যদেরকে শিখানোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হই আর প্রতিদান আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করি তাহলে অচিরেই বিশ্ব পরিমণ্ডলেও বাংলাদেশের এ শান্তিময় আদর্শিক পরিবেশ ও ঈমানী শক্তির সুবাতাস প্রবাহিত করা সম্ভব হবে। আর আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতো অবশ্যই আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

www.amarboi.org

দেশের শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদদের ভূমিকা

শিক্ষিত মানুষ মাত্রই স্বশিক্ষিত। শিক্ষিত মানুষ দেশের সম্পদ, দেশের মেরুদণ্ড। সেজন্যেই তাদের রয়েছে দেশের তরে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। দেশকে গঠন করার লক্ষ্যে বর্তমান ও আগামীদিনের জাতির সামনে সুন্দর কর্মনীতি পেশ ও বাস্তবায়ন এবং সেই সাথে পরিচালনায় নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে তারাই পারে দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। আবার পাশাপাশি এ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই যদি কায়েমী স্বার্থ হাসিল ও সংকীর্ণ চিন্তা চেতনায় মশগুল হয়ে পড়ে তখন দেশ ও দশের সামষ্টিক স্বার্থ তথা উন্নয়ন ব্যাহত হতে বাধ্য। অথচ উচ্চ শিক্ষিত এ মানুষগুলো এ পজিশনে উন্নীত হতে শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন স্তরে দেশ ও দশের পরোক্ষ ভূমিকাই ছিলো অগ্রগণ্য। সোজা কথা, দেশের সকল জনগোষ্ঠীর অর্থ সহযোগিতাই তারা আজ উচ্চ শিক্ষিত, তাই এমন শিক্ষিতরা জাতির কাছে দায়বদ্ধ, তারা জাতির কাছে ঋণী। আর সেজন্যেই এ ঋণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যেই তাদের রয়েছে জাতির প্রতি অনেক করণীয়। যারা তা পালন করে তারা হবে জাতির কাছে স্মরণীয় ও শ্রদ্ধাশীল।

আর যারা পালন করে না তারা যেমনি জাতির কাছে হয় ঘৃণিত, ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে হয় নিক্ষিপ্ত তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকেও লা'নতপ্রাপ্ত। এখানেই প্রশ্ন উচ্চ শিক্ষিতরা কিভাবে জাতির কাছে দায়বদ্ধ? ঋণগ্রস্ত বা ঋণী এ কেমন কথা? এত কষ্ট করে মা-বাবার অর্জিত টাকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে চাকুরীতে প্রবেশ করেছে। সুতরাং মা-বাবার কাছে ঋণী হতে পারে; কিন্তু জাতির কাছে কেন?

আসুন! একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র বেতন দিচ্ছেন ১৬ থেকে ১৮ টাকা মাত্র, হলে থাকছেন, ক্যান্টিনে ১০ থেকে ১৫ টাকায় খাবার খাচ্ছেন, ১ টাকা দিয়ে চা পান করছেন, সর্দি-কাশি হলেই মেডিকেল সুবিধা পাচ্ছেন, হলে থাকছেন না যানবাহনের সুবিধা পাচ্ছেন তাতো সকলেই জানেন। পাশাপাশি অন্যান্য মেধাবীরাও পড়ছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কতটুকু আর ভোগ করতে কেমন টাকা পয়সা ব্যয় করতে হচ্ছে, তাও সকলেরই জানা। অন্যদিকে, পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য বৃত্তিসহ পড়ালেখায় আগ্রহ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন পুরস্কার পাচ্ছেন, আপনিও খুশী হচ্ছেন; খুশী হচ্ছেন মা-বাবা ও দেশবাসী।

এখন এ দু'ক্ষেত্রে কেন এত ফারাক? উভয় ক্ষেত্রের শিক্ষার্থীরাইতো দেশের নাগরিক, দেশেরই প্রতিষ্ঠান। তবে কেন এত ব্যবধান?

তাহলে ব্যবধান হচ্ছে পরিচালনা ও মালিকানার ভিন্নতার জন্য তাইতো। অর্থাৎ এ প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের আওতাধীনে পরিচালিত আর অন্যগুলো ব্যক্তি মালিকানার আওতাধীনে। ফলে ব্যবধান এত বেশি। এবার বলুন, সরকার যে

www.amarboi.org

এত সব করছে কোথায় থেকে করছে? কিভাবে করছে? কাদের টাকা দিয়ে করছে? এ টাকা কি জাতির কষ্টার্জিত টাকা নয়? এ টাকা কি কোনো সরকারের ব্যক্তিগত টাকা?

বরং সরকারইতো সবকিছু ভোগ করে জনগণের ভ্যাট ও ট্যাক্স থেকে, দেশের সঞ্চিত রাজস্ব থেকে। আর এ রাজস্ব গড়ে উঠেছে এদেশের সকল জনগোষ্ঠীর দেয় টাকার বিনিময়ে। এদেশে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আর শাহবাগের মোড়ে যে ভিক্ষুকটি ভিক্ষা করছে তার অর্থও রয়েছে এই সরকাররের কোষাগারে। এবার সে রাজস্বের অর্থে পরিচালিত সরকারী প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করে উচ্চ শিক্ষিত হলে জাতি কি আপনার কাছে আপনার মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে ভাল কিছু প্রত্যাশা করা সমুচিত হবে না? জাতির জন্য কি এখন আপনার করা উচিত নয়? আপনার বিবেক এ প্রসঙ্গে কী বলে একটু প্রশ্ন করে শুনবেন কি?

এভাবে জাতির অর্থে উচ্চশিক্ষিত হয়ে আপনি যখন শিক্ষাবিদ তখনও তো দেশের জনগোষ্ঠী আপনাকে শ্রদ্ধা করছে, আপনার কথা মানে এবং দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য আপনি কিছু করবেন এটা তারা প্রত্যাশা করে। কিন্তু এমনটি সত্ত্বেও যাদের মন চাচ্ছে না কিছু করতে, মন চাচ্ছে নিজের পকেট ভর্তি করতে, (ঘুষ, দুর্নীতি) টাকা দিয়ে টাকার ব্যবসা (সুদ) করতে, সত্যিকার আদর্শ নৈতিকতার কবর রচনা করে মনগড়া আদর্শের ধারক-বাহক ও প্রচারক হতে, এক কথায় আদর্শবিমুখ শিক্ষাবিদ হওয়া, জাতির কল্যাণের বিপক্ষে কথা বলা, আগন্তুক সন্তানের আদর্শ মানুষকরণের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা না রাখা, নিজে নিজে মার্সিডিজ, বিএমডব্লিউ গাড়ি হাকিয়ে চলা তাহলে বলুন জাতি কী পেল? আর এমনটি হতে পারে কুরআন হাদিস তথা সামগ্রিকভাবে আদর্শিক গ্রন্থ আমাদের সিলেবাসে না থাকার কারণে, ধর্মীয় গ্রন্থ না পড়ার কারণে। এখানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ আল্লামা ইকবাল বলেন, "জ্ঞান যদি নিয়োজিত হয় তোমার দেহের সমৃদ্ধির জন্য তবে এ জ্ঞান হচ্ছে এক বিষধর সর্প। জ্ঞান যদি হয় তোমার আত্মার মুক্তির জন্য নিবেদিত তবে এ জ্ঞান হবে তোমার পরম বন্ধু, তোমার গর্ব।"

সুতরাং বক্তব্য সুস্পষ্ট, আদর্শ ও সচ্চরিত্রবান শিক্ষাবিদ আজ কথা না বললে, দেশে দুর্নীতি দমন কমিশন ও যত বাহিনীই গঠন করা হোক না কেন সবকিছুই ভেস্তে যাবে– যদি আমরা এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার গোঁড়া থেকে সকলকে সচেতন ও আদর্শবান করে গড়ে তুলতে না পারি। কাজেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। সকলকে আরো দায়িত্ব সচেতন হতে হবে। দায়িত্ব পালন করতে হবে যতক্ষণ না সমাজে সচ্চরিত্রের সুবাতাস প্রবাহিত হবে, মানুষ মানুষের জন্য এ চিরন্তন সত্যের বাস্তবায়ন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যে আপনাদের দায়িত্ব পালন থেকে মুক্তি নেই।

তাই আজ বলব, দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ যারা আছেন তারা যদি একটু চিন্তা

www.amarboi.org

করে দেশের জনগোষ্ঠীকে সচ্চরিত্রবান আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠন করতে সচেষ্ট হোন তাহলে আপনার ঋণ যেমনি শোধ হবে তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি পাবেন মর্যাদা, দুনিয়ার জিন্দেগীতে পাবেন সম্মান ও শ্রদ্ধা আর বিনিময়ে জান্নাত। দেশকে-দেশের মানুষকে শিক্ষিতকরণে এবং সচ্চরিত্রবান করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আপনারা যে চেয়ারে আছেন বা যে আসনে আছেন সেখান থেকে কথা বললে, মতামত পোষণ করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আদর্শিকরণ করে দিতে পারলে আগামীতে অনাদর্শিকতার এ ছোবল থেকে জাতি কিছুটা মুক্তি পাবে। অবশ্য সেজন্যে চাই আপনাদেরও প্রচুর অধ্যয়ন এবং আদর্শের সাথে জীবন যাপন করা বা আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত থাকা।

আপনারা দেশের কর্ণধার, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ আপনারা যদি পরিকল্পিতভাবে যে কোনো অনাদর্শকে সমূলে বিনাশ করে আদর্শকে প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত না দেন, না লিখেন, না বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হোন তাহলে কিভাবে হবে?

বলুন! সবার কাছে তো সবকিছু জাতি প্রত্যাশা করে না। আবার সবাই দিতেও পারে না। তাছাড়া যার যার পজিশান অনুসারে তার দেয়ার ক্ষমতা বলার যোগ্যতাও থাকে বেশি, আর এ পর্বেও না করলে কাল হাশরের মাঠে কী জবাব দেবেন আল্লাহর কাছে সে কথা একবার ভেবে দেখছেন কি?

সাহিত্য কেন্দ্র, পাঠাগার ও লাইব্রেরীর ভূমিকা

আদর্শ মানুষ দেশের সম্পদ, দেশের গৌরব। দেশ-দেশের পতাকাকে সুউচ্চে তুলে ধরার জন্যে আদর্শ সচ্চরিত্রবান শিক্ষিত মানুষের বিকল্প নেই। আর সে জন্যে বিভিন্ন লেখকের লেখা বাস্তব জীবনবোধসম্পন্ন শিক্ষণীয় গ্রন্থগুলোর সম্মিলন ঘটানোর লক্ষ্যে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাহিত্য কেন্দ্র, পাঠাগার ও লাইব্রেরী। উদ্দেশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য পুস্তক তথা নির্ধারিত সিলেবাসের বাইরে সকল শ্রেণীর পাঠকের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃতি, শব্দ ভান্ডারে সংযোগ, অধ্যয়নের কলা, বই পড়ার স্পৃহা, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা, চিন্তা-চেতনার স্বচ্ছতা, আদর্শের অনুকরণ, মনোভাব ব্যক্তকরণের যোগ্যতা, অন্যদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবনের যোগ্যতা, নিজ মনে অনেক ভুবন সৃষ্টি করা, দেশকে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করে বুঝা, অবসর সময়ে বই পড়ে জ্ঞান-অর্জনে উন্মুখ হওয়া, সংবাদপত্র ও সাময়িকী ইত্যাদি অধ্যয়ন করে নিজেকে মানবতাবোধে উজ্জীবিত করা, নিজের দেশকে গড়া, জাতি সত্তাকে মূল্যায়ন ও তাদের প্রতি মূল্যবোধ সৃষ্টি করে আরো সচেতন ও দায়িত্বপ্রবণ এক কথায়, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা প্রত্যেকের তরে এমন সচ্চরিত্রবান হিসেবে গঠন করার অভিপ্রায়ে-এ সকল সাহিত্য কেন্দ্র, পাঠাগার ও লাইব্রেরীর গ্রন্থ ভাণ্ডার সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

www.amarboi.org

জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা ও কর্মকে দীর্ঘদিন মাথায় রাখা সম্ভব নয় বা আগন্তুক জাতির জন্যে সংরক্ষণ করে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে উত্তরণ ঘটানোর জন্যে পড়ার উপকরণ হিসেবে গ্রন্থ সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে সাহিত্য কেন্দ্র, পাঠাগার ও লাইব্রেরীসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই আজ প্রয়োজন সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে এমন সাহিত্য কেন্দ্র ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসা।

"অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।" মানুষের মেধাকে অলস বা বাজে ও ধ্বংসোন্মুখ চিন্তা-চেতনার শৃঙ্খল থেকে বের করে আমাদের পরিচয়, কৃষ্টি-কালচার, অতীত ঐতিহ্য আগামীদেরকে জানানো এবং আদর্শ ও সৎ চিন্তাশীল করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজন আদর্শবাদী লেখকদের লেখা সম্বলিত গ্রন্থ, স্রষ্টার দেয়া গ্রন্থ যাকে আমরা জীবন বিধান হিসেবে পরিগণিত করি, আমাদের প্রিয় শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ আদর্শ যাকে শুধু মুসলিম নয় সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীতে একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবেই স্বীকৃতি দেয়, সেই মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বাণী সম্বলিত গ্রন্থের সমাহার ঘটানো উচিত।

কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا.

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল আহযাব, ৩৩ ঃ ২১)

যেখানে আল্লাহ্ স্বয়ং ঘোষণা করছেন আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ হচ্ছে রাসূল (সা.)-এর জীবন যেখানে পৃথিবীর আর কোনো মানুষের আদর্শ রাসূলের চেয়ে বেশি অনুকরণীয় হতে পারে তা যেন আজ জ্ঞানীজন মাত্রই ভাবনার বিষয়।

কেননা এদেশে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য কেন্দ্র ও পাঠাগারগুলো ব্যক্তি বিশেষের গুণগান সমৃদ্ধ যত গ্রন্থের সমাহার ঘটিয়েছে সে পরিমাণ যদি স্রষ্টার গ্রন্থের অংশ, দুনিয়ার মানুষের কাছে স্রষ্টা কী চান এবং আখিরাতে কী দিবেন ইত্যাদি ও রাসূল (সা.)-এর চরিত্রাদর্শ সম্বলিত গ্রন্থের সমাহার ঘটত তাহলে এখানে আরো বেশি দেশপ্রেমিক আদর্শ মানুষ গঠিত হতো। এদেশের সাহিত্য কেন্দ্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অন্য ধর্মাবলম্বীদের মনগড়া মতাদর্শের আদলে গড়া যত গ্রন্থ রয়েছে তার সিকি ভাগও প্রকৃত আদর্শ বা আল্লাহ্ ও রাসূলের মতাদর্শের অনুকরণে রচিত গ্রন্থের সমাহার ঘটানো হয়নি। যা-ও করা হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে তা-ও আবার শুধু দোয়া-দুরূদ, তসবীহ-তাহলীল এক কথায় সহজভাবে জান্নাত পাওয়া যায় কিভাবে-সে আদলে লেখা গ্রন্থ কিন্তু মানুষের

www.amarboi.org

সাথে মানুষের মু'আমালাত-লেনদেন, মু'আশারাত-আচার ব্যবহার, সিয়াসাত-রাষ্ট্রনীতি, ইকতিসাদিয়াত-অর্থনীতি, দাওয়াত ও জিহাদ এবং ইহসানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের গ্রন্থের সমাহার তেমন নেই। ফলে মানুষ আজ নামায পড়ে, হজ্জ করে পাশাপাশি হাজী সেজে বা নামের আগে আলহাজ্জ যোগ করে ঘুষ, সুদ ও অপরের জায়গা দখল করে আবাসিক প্লট তৈরি করে রাষ্ট্র বিরোধী কাজ করে ব্যক্তি স্বার্থকে চরিতার্থ করতে চেষ্টা করে-যা সত্যিই দুঃখজনক।

অন্যদিকে বাংলার মানুষের রক্তে গড়া সবুজ এ পুণ্যভূমির মাটিতে ঘুমিয়ে থাকা '৭১ সালের সেই বীর সন্তানদের তীর্থস্থান বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থে পরিচালিত বিভিন্ন সাহিত্য কেন্দ্রে বিশ্বের ভাল ভাল লেখকদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ এবং আমাদের সন্তানদের কাছে তাদেরকে পরিচিত করে দেয়া, তাদের মতের সাথে মিশিয়ে উন্নত মনের অধিকারী করণের লক্ষ্যে তাদের অজস্র গ্রন্থের সমাহার ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে- যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

কিন্তু দুঃখ লাগে, মন ভারাক্রান্ত হয়ে আসে, নিজের বিবেকের কাছে নিজেকে লজ্জিত মনে হয় আর মনে প্রশ্ন জাগে যে সাহিত্য কেন্দ্রে বিশ্ব স্রষ্টার বা মালিকের দেয়া গ্রন্থ নেই, সকল আদর্শের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, যাকে সৃষ্টি করা না হলে পৃথিবী সৃষ্টি করা হত না সেই মহামানবের বাণী সম্বলিত গ্রন্থ নেই, বিশ্বের অন্যতম কবি সাহিত্যিক লেখক আল্লামা ইকবাল, মাওলানা রুমি (রহ.), ইমাম গাযালী (রহ.), মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.), আল্লামা ইউসুফ আল কাযযাবী (রহ.), মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) সহ বিশ্বখ্যাত বিদ্বান শত সহস্র লেখকদের লেখা সম্বলিত গ্রন্থের সম্মিলন নেই তাকে কী করে একটি পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য কেন্দ্র বলা যায়? দেশের অর্থে দেশেই পরিচালিত এসব কেন্দ্রের গ্রন্থ ভাণ্ডারের লেখকবৃন্দ নিজেরাই আদর্শ সচ্চরিত্রবান কতটুকু তা যখন তাদের লেখার মাধ্যমেই ফুটে উঠে, তখন এমন লেখা পড়িয়ে এ যুগের ছেলে-মেয়েদের কতটুকু আদর্শ সচ্চরিত্রবান করা যাবে তা যেন বড়ই ভাবনার বিষয়। বরং আল্লাহর দেয়া এ মেধা ও মহামূল্যবান সময় (পৃথিবীর কোনো অর্থের অংকে যা মূল্যায়ন ও কেনা-বেচা- যা সম্ভব নয়) নষ্ট করার এ অপপ্রয়াস সত্যিই এ জাতির জন্যে হতাশার, অপূরণীয় ক্ষতির। এ যে সকলের চোখের সামনেই কোমলমতী ও আগামীদিনের ভবিষ্যৎ সন্তানদের মেধাকে ধ্বংস করার শামিল। এ যে আদর্শের ছদ্মাবরণে অনাদর্শের নামান্তর। দেশে ভবিষ্যতে আদর্শ মানুষের সংকট ও মেধাশূন্য করারই পাঁয়তারা। এদেশ আমার, আপনার ও আমাদের। তাই দেশকে গড়ার দায়িত্ব সকলের। এদেশের অনেক সম্পদ রয়েছে তা বলব না, তবে যা রয়েছে তা যেন দেশের মানুষগুলোকে স্বনির্ভর করার জন্য যথেষ্ট। দারিদ্র্যমুক্ত, অভাবমুক্ত একটি শান্তি শৃঙ্খলাময় রাষ্ট্র গঠনের জন্য যথেষ্ট। অথচ বর্তমান দেশের পরিস্থিতি তার পুরো উল্টো, ভাবছেন এ কেমন লেখা? এ কেমন মতামত? অবাক হচ্ছেন! হওয়ারই কথা। আমিও জানি দেশের বর্তমান

www.amarboi.org

পরিস্থিতিতে এ কথা কাউকে বুঝানো সম্ভব নয়। তাহলে এ কথা লেখার যৌক্তিকতা কোথায়? যৌক্তিকতা হলো, দেশের শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ দার্শনিকরা সবাই একমত এদেশ সোনার দেশ কিন্তু রয়েছে সোনার মানুষের অভাব, সচ্চরিত্রবান মানুষের অভাব। ফলে সকল ক্ষেত্রেই অভাব। এবার বুঝলেনতো কেন এ অবস্থা?

সে জন্যেই যদি দেশের সকল সাহিত্য কেন্দ্র ও পাঠাগার লাইব্রেরীর মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে আদর্শিক গ্রন্থ প্রকাশ, প্রচার, প্রসার, সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর অভ্যাসের মাধ্যমে আদর্শ সচ্চরিত্রবান মানুষ গঠন করতে পারা যায় তাহলে সত্যিই সোনার দেশে পরিণত করে ছাড়বে ইনশাআল্লাহ। তাই আহ্বান জানাব, এ সকল সাহিত্য কেন্দ্রে অন্য সকল বইয়ের পাশাপাশি আদর্শ সচ্চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত আদর্শিক গ্রন্থের সমাহার ঘটিয়ে আপনারাও দেশের মানুষদেরকে দেশ প্রেমিক, যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে দায়িত্ব পালন করুন। আপনাদের অনেক সুযোগ আছে, আপনারা এগিয়ে আসুন, তাহলে দেশ পাবে আদর্শ জাতি। নতুবা দেশ যে পিছিয়ে পড়ছে, দুর্নীতি, মারামারি, হত্যা যে কোনভাবেই থামছে না, তাতো আপনারা প্রত্যক্ষ করছেনেই। তাই এসব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে একটি সুখী সুন্দর আদর্শ ও উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে এদেশকে গড়ার অভিপ্রায়ে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

উপন্যাস ও উপন্যাসিকের ভূমিকা

উপন্যাস কে না পড়ে? খুব কম লোকই আছে যাদের বাসায় বইয়ের তালিকায় উপন্যাস নেই। যারা উপন্যাস কিনে না। মানুষ বই পড়ে, অভিভাবক সন্তানদেরকে বই কিনে দেয় জ্ঞানার্জন করতে; কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে সাথে নিয়ে যায় সন্তানদেরকে বই মেলাতে; মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থ দিয়ে কিনে দেয় খুব সুন্দর সুদৃশ্য প্রচ্ছদ সম্বলিত বই-উপন্যাস বই। এ উপন্যাসের লেখা কেমন সে বিষয় বিচারের ভার আপনাদের উপর। তবে বর্তমানে যারা পাঠ করে তাদের স্বরূপ একটু উল্লেখ করতে চাই ঃ

উপন্যাস পাঠকরা নিজেদের নাম বদলে মনে ভুবন সৃষ্টি করে অন্য কাউকে নিয়ে ভাবাবেগের সাগরে ডুব দিয়ে বাবার চোখকে ফাঁকি আর মায়ের দুর্বলতার সুযোগে পড়ালেখার নামে টাকা পয়সা হাতিয়ে বিভিন্ন যুক্তিতর্কের আশ্রয়ে বিশ্বাসের নামে লেক ও পার্কে যাওয়ার নামে চাইনিজ হোটেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নরম সুরে গরম গরম মিউজিকের তালে তালে ছায়া ছবি দেখে বা ক্যাম্পাসের ঐ সমস্ত স্থানগুলোতে বসে তেহারী খেতে খেতে নিজেদের শালীনতা, আত্মসম্মান, মর্যাদাবোধকে উপেক্ষা, সময়কে তুচ্ছ করে

www.amarboi.org

আগামীদিনের সুন্দর জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করে পনের থেকে ত্রিশ বছর বয়সী ফুটফুটে জোছনা বা আকাশে তারকারাজির ন্যায় আলোগুলো যখন বেশির ভাগই বিচ্যুতি ঘটতে শুরু করেছে তখনও কি দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বিবেক জাগ্রত হওয়া উচিত নয়? এমন বইগুলোকে দেখলে কি আদর্শ সৎ ও হক হালাল উপার্জনকারী মানুষের গায়ে আগুন ধরে যাওয়া উচিত নয়? শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়? রক্ত টগ বগ করা উচিত নয়? এগুলোকে ডাস্টবিনে আগুনে পুড়ে ছাই করে দেয়া উচিত নয়? প্রশ্ন থাকল বিবেকবান, সচ্চরিত্রবান মানুষগুলোর কাছে !

যে উপন্যাস আগামীদিনের সন্তানদেরকে নৈতিক ও লক্ষ্য উদেশ্যবিহীন ভবঘুরে, আদব-কায়দাবিহীন বেয়াদব, এক কথায় মানুষ হওয়ার বিপরীতে অমানুষ হতে হাতছানি দিয়ে ডাকে তা কি কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে? কেউ কেউ হয়তোবা বলবেন উপন্যাস মানুষকে আনন্দ দেয়, দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে রাখে, সুন্দর মন, মনে লক্ষ ভুবন সৃষ্টি করতে সহযোগিতা করে এতে সমস্যা কী? তাদের উদ্দেশ্যে বলব সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণে, বেহায়াপনা, বেলাজাপনার ছড়াছড়িতে নিছক আনন্দ আপনার কতটুকু ভাল লাগবে? আর এমনটি করাতো আল্লাহর হুকুম নেই। কষ্ট ভুলে থাকার জন্য উপন্যাস লাগবে কেন যিনি দুঃখ-কষ্ট মুছে দিতে পারেন সেই স্রষ্টার কাছে সাহায্য চাইলেইতো হয়। সুন্দর মন লক্ষ ভুবন সৃষ্টি আদর্শবাদী গ্রন্থ পড়লে কি হয়না। এ বিষয়গুলো খেয়াল রেখে কথা বলতে হবে। অন্যদিকে, যারা এ উপন্যাসের লেখক তাদের উদ্দেশ্যে বলব আপনারা যে জ্ঞান অর্জন করেছেন আর যে কলম হাতে নিয়ে আজ অন্যতম উপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন, দেশের বিভিন্ন পদক ও চেয়ার দখল করছেন আপনাদের এ জ্ঞানদাতা হলেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। আপনারা বলবেন আমরা কষ্ট করে পড়ালেখা করেছি, না খেয়ে পড়ালেখা করেছি হ্যাঁ তা-ও সত্য কিন্তু এগুলো আল্লাহর জ্ঞান দানের পথে ওসিলা মাত্র, সহায়ক উপাদান মাত্র, হয়তোবা বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাই মহান আল্লাহর দেয়া আমাদের পথ নির্দেশ ও জীবন চলার সাথী আল কুরআনুল কারীমে প্রথম নাযিলকৃত আয়াতগুলোর অর্থ উল্লেখ করতে চাই।

০১. "পড়! তোমার স্রষ্টার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

০২. যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড হতে।

০৩. পড়, কেননা তোমার স্রষ্টা মহা সম্মানী ও দাতা।

০৪. তিনি কলম দ্বারা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন।

০৫. তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা মানুষ জানত না।" (সূরা আলাক, ৯৬ ঃ ১-৫)

www.amarboi.org

এরপর কি জ্ঞানদাতার ব্যাপারে আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করবেন? জ্ঞানীজন মাত্রই হয়তোবা করবেন না। তারপরও বলছি। আপনাদের কলমের ক্ষুরধারা যদি বাম তথা টিনেজ বয়সের ছেলে-মেয়েদের চরিত্র হনন আর বিকৃত চিন্তা-চেতনার উদ্রেক করা থেকে ফিরিয়ে ডান তথা আদর্শের দিকে ধাবিত করতে পারেন তাহলে আল্লাহ খুশী হবেন আপনাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মেধা দিয়েছেন, সম্মান দিয়েছেন, আপনাদের লেখা মানুষ পড়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে তাই আপনারা সেই সমস্ত পাঠকদের আদর্শিক চিন্তা-চেতনা, আদর্শ জীবন গঠন ও সর্বতোভাবে আদর্শমুখী করার লক্ষ্যে লিখলে আপনাদেরকে আগামীদিনের সন্তানেরা হাঁসি মুখেই গ্রহণ করবে। আপনাদের দুনিয়াতে শান্তি এবং আখিরাতে মুক্তির জন্য দু'আ করবে। তাছাড়া নিছক রোমান্টিকতা আর আনন্দ দানের নামে আপনারা তো মানুষের এত ক্ষতি করতে পারেন না যেমন ঃ

০১. যে সমস্ত উপন্যাস গ্রন্থ পাঠকদেরকে আদর্শের দিকে ধাবিত করতে সক্ষম নয়, সে সমস্ত গ্রন্থগুলো পড়ার কারণে যে সময় ব্যয় হয় তা কি আপনারা বা পৃথিবীর কেউ ফিরিয়ে আনতে পারবেন?

০২. পাঠকদের মেধা মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনার বিকৃতি এবং এর ফলে ক্ষতি কি ফিরে পাওয়া যাবে?

০৩. কষ্টার্জিত অর্থ কি ফিরিয়ে দেয়া যাবে?

০৪. এ বই পড়তে যেয়ে একাডেমিক বই না পড়ে পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষতি কি পুষিয়ে দেয়া সম্ভব হবে?

০৫. এ বই পাঠ করে বিকৃত মস্তিষ্কের কারণে তার যে আত্মসম্মান ও ব্যক্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, সে যে অন্যের কাছে অপমানিত ও ফালতু একজন মানুষ হিসেবে পরিচিত হচ্ছে তা কি ফিরিয়ে দিতে পারবেন?

এক কথায়, যত ব্যাখ্যাই করি না কেন আদর্শ বিবর্জিত যত লেখা আছে, উপন্যাস বই আছে তা মানুষকে পজিটিভ কোনো কিছু দিতে পারে না। অন্যদিকে, এ সমস্ত লেখা লিখে যারা রোমান্টিকতা, একটু বিনোদন, একটু আনন্দ ও একটু মানসিক প্রশান্তি দেয়ার নামে টিনেজ ছেলে-মেয়েদের চরিত্রকে আদর্শবান করার বিপরীতে ধ্বংস করে দিচ্ছেন, সস্তা বাহবা আর টাকা উপার্জন করার প্রতি ঝুঁকছেন তাদের লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا.

www.amarboi.org

"যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করবে সে তা থেকে অংশ পাবে আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজের সুপারিশ করবে সেও তা থেকে অংশ পাবে।" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ৮৫)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষদের উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

فَلْيَنظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ. إِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ.

"মানুষের ভেবে দেখা উচিত তাদেরকে কোন্ সে জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশ থেকে নির্গত এক কাতরা পানি থেকেই। যিনি এভাবে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতেও সক্ষম।" (সূরা আত তারিক, ৮৬ ঃ ০৫-০৮)

কাল হাশরের মাঠে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন বিচারক হবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন সেই দিন কী জবাব দেবেন সে বিষয়টি মাথায় রেখে আজ কলমকে ঘুরিয়ে আদর্শের দিকে লিখতে শুরু করলে আল্লাহ খুশী হবেন। হয়তো ভাবছেন কী লিখব? লেখা খুঁজে পাই না। হ্যাঁ, না পাওয়ারই কথা। কারণ যাদের জীবন যৌবন কেটেছে ঐসব বই পড়ে ও লেখে চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা ও পরিবার কাঠামো গড়ে ঐসব বইয়ের আদলে তাদের কলম হঠাৎ করে আদর্শের লেখা লিখতে গিয়ে থমকে দাঁড়ানোরই কথা। তবু বলব চেষ্টা করুন। বারবার চেষ্টা করুন। আপনারা প্রখর মেধাবী। আপনাদের কলমের লেখায় জাতির যেমন ক্ষতি হতে পারে, তেমনি উপকারও হতে পারে। আর সেই রকম লেখা লিখলেই জাতি আপনাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। এবার কী রকম লেখা লিখবেন সে প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণীটি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। আল্লাহ বলেন ঃ

قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا.

"যদি সাগরের সব পানি কালি হয় আমার কথা লেখার জন্যে, তবে সে সাগরের পানি ফুরিয়ে যাবে প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার আগেই। যদি ফের আনো আরেকটি তেমনি সাগর। তবুও ।" (সূরা আল কাহাফ, ১৮ ঃ ১০৯)

বলুন! পৃথিবীতে এমন আর কি জিনিস আছে যার ব্যাপারে লেখলে সমুদ্রের সব পানি ফুরিয়ে যাবে কিন্তু লেখা শেষ হবে না। হ্যাঁ, এই কথা সত্যি আর তাইতো আপনাদের লেখা কয়েকটা বই পড়লে দেখি ঘুরে ফিরে একই কথা, একই কাহিনী,

www.amarboi.org

কোথাও তির্যক, কোন্‌টা হালকা, কোন্‌টা নরম, কোন্‌টা গরম কিন্তু আসলে সবই এক রকম। অন্যদিকে, আজ পর্যন্ত লেখা হচ্ছে, গবেষণা হচ্ছে আজও কতই না বাকি এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত লেখলেও তা শেষ হবে না। কাজেই আল্লাহর কাছে অতীতের কর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে ভবিষ্যতে ভাল করার জন্য মন স্থির করতে চেষ্টা করুন। অবশ্যই আমাদের রব আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু, অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি তার রহমত দিয়ে আপনাদেরকে পজিটিভ লেখা লেখার তৌফিক দিবেন। আর সেই রকম প্রতিশ্রুতি আল্লাহর কুরআনেই খুঁজে পাই। আল্লাহ বলেন ঃ

إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.

"কিন্তু যারা তাওবা করবে ঈমান আনবে এবং ভাল কাজ করবে, আল্লাহ তাদের অতীতের খারাপ কাজ সমুহকে ভাল কাজ দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন, আর যারা তাওবা করে এবং নেক কাজ করে। আল্লাহর প্রতি তাদের তাওবাই সত্যিকারের তাওবা।" (সূরা আল ফুরকান, ২৫ ঃ ৭০-৭১)

সুতরাং তাওবা করে আদর্শের জয় জয়োগান মানব জাতির সচ্চরিত্র গঠন সম্পর্কে লিখতে শুরু করলে অবশ্যই আল্লাহ হিফাযত করবেন দেখবেন আপনার লেখার ভক্তরাই বেশি বেশি করে আগ্রহভরে এ সমস্ত লেখাগুলো পড়তে ও মানতে শুরু করবে। এতে আপনিও সাওয়াব পাবেন। অতিবাহিত জীবনে লিখেছেন বামপন্থী লেখা, এখন লিখুন ডানপন্থী লেখা দেখবেন আপনারা আবারও হবেন খ্যাত ও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য।

মা-বাবার রেখে যাওয়া সম্পদের ভূমিকা

বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে মা-বাবার সম্মান ও সম্পত্তিতে সন্তানের অধিকার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ج نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا.

"মা-বাবা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্পই হোক বা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ০৭)

www.amarboi.org

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ ج وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ج إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا.

"আর প্রত্যেক ধন-সম্পত্তির জন্যে আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি। যা মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনগণ পরিত্যাগ করে যায়; আর যাদের সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার সম্পাদিত হয়েছে তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত আছেন।" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ৩৩)

মূলত কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কারা পাবে এবং কতটুকু অংশ পাবে তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা করে দিয়েছেন। ধন-সম্পদ, পাকা ইটের তৈরি বাড়ি, গাড়ি, বড় বড় পুকুর আর সারি সারি জমি কোন্‌টিই মানুষের চিরস্থায়ী সম্পদ নয়। কোনো ব্যক্তি যত অর্থেরই মালিক হউক না কেন, মৃত্যুকালে সে কোনো সম্পদই সঙ্গে নিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আমল এবং সচ্চরিত্রের প্রতিচ্ছবি খোদাভীতিই হলো মানুষের স্থায়ী সম্পদ। যার মাধ্যমে সে পরকালে চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করতে পারবে। দুনিয়ায় কেবল সুখ-শান্তি এবং ধন-সম্পদ লাভ করা সচ্চরিত্রবান মুসলিমদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হতে পারে না, বরং এর মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে পরকালের শান্তি-লাভ করাই হলো, আসল উদ্দেশ্য। ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২৮৪)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিছু সম্পদকে বান্দাদের মধ্যে ক্ষণস্থায়ীভাবে ভাগ করে দিয়েছেন। কেবলমাত্র পৃথিবীতে ভোগ করার জন্যে। এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করবেন, কারা আল্লাহ পাককে ভয় করে এবং তাঁর আইন ও বিধি নিষেধ মেনে চলে, আর কারা প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং মানুষ ধন সম্পদ ভোগ করে বলে সে ধন সম্পদের প্রকৃত মালিক নয়। তার মৃত্যুর পর ধন-সম্পদ আল্লাহরই রয়ে যায়। যেহেতু ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ সেহেতু কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ধন-সম্পদ কারা কতটুকু অংশ ভোগ করতে পারবে এ সম্পর্কিত আইন- তৈরি করে দেয়ার অধিকারও রয়েছে একমাত্র আল্লাহরই। তাই আল্লাহ পাক নিজেই কুরআনুল কারীমে ইনসাফের ভিত্তিতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন এবং

www.amarboi.org

তাদের অংশের পরিমাণও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহর এ আইনের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার কোনো মানুষের নেই।

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে সূরা নিসায় সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে মা-বাবার আওতাধীন সম্পদের বণ্টন সন্তানের মধ্যে কিভাবে হবে তা ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। যদিও আজ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অনেকের মধ্যে এ বণ্টন নিয়ে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব-কলহ আর কতিপয় নারীরা বলে তাদের ইসলাম ধর্ম ঠকিয়েছে। অথচ আমরা দেখছি পৃথিবীতে একমাত্র ধর্ম ব্যবস্থা ইসলামই নারী জাতিকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার আসনে আসীন করেছে; দিয়েছে তাদের সকল ধরনের মর্যাদা ও সম্মান যা অন্য ধর্ম দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সেই ব্যর্থতার দায়ভার আজ কতিপয় ইসলাম বিদ্বেষী ও এ সম্পর্কে জ্ঞানী নয় এমন ব্যক্তিদের মাধ্যমে ইসলামের উপর চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

এখানে আমি যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি তা হলো, মা-বাবার এ সকল সম্পদের বাইরেও সন্তানদের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ রয়েছে। যেমন সন্তানদেরকে সচ্চরিত্রবান করা, আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করা, তাদেরকে সম্মানজনক পজিশনে প্রতিস্থাপন করে যাওয়া, সন্তান শিক্ষিত হলে, সচ্চরিত্রবান হলে দুনিয়ার দৃশ্যমান এমন সম্পদ তার পায়ের তলায় পিষ্ঠ হবে। এগুলো তার জন্য অর্জন করা কোনো ব্যাপারই হবে না, তার সম্মান দিন দিন বাড়বে, সকলে তাকে শ্রদ্ধা করবে। আল্লাহর ফিরিশতা পর্যন্ত এমন সচ্চরিত্রবান মানুষদেরকে মূল্যায়ন করে, সম্মান প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে গাড়ি, বাড়ি, সারি সারি জমি দিয়ে গেলেন কিন্তু সচ্চরিত্রবান মানুষ করে যেতে পারলেন না এতে আপনার সেই কষ্টার্জিত সম্পদের তোড়ে সে হবে অসচ্চরিত্রের একজন অমানুষ ও সকলের চোখে ঘৃণিত। দুনিয়ার জিন্দেগীতে মানুষ যতই সম্পদের পিছনে হন্যে হয়ে ছুটুক না কেন একটি কথা চিরন্তন সত্য সম্পদ কখনো মর্যাদার মাপকাঠি নয়। তারাও জানে সম্পদ ও সম্মান দু'টি ভিন্ন জিনিস। ধন-সম্পদশালীদেরকে মানুষ ভয় করতে পারে কিন্তু কেউ তাকে সম্মান প্রদর্শন করে না। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন ঃ একজন আদর্শবান লেখক, কবি, সাহিত্যিক কিংবা শিক্ষক এর মাসিক আয় আট থেকে দশ হাজার টাকা। অপরপক্ষে, একজন অনাদর্শিক বাস ড্রাইভার, দোকানদার, একজন ম্যাচ মেকার কিংবা ঘটকের মাসিক আয় পনের হাজার থেকে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। এখানে মর্যাদা কার বেশী। ড্রাইভার, দোকানদার, ম্যাচ মেকার কিংবা ঘটকের নিশ্চয়ই নয়।

একজন আদর্শবাদী লেখক, কবি, সাহিত্যিক কিংবা সচ্চরিত্রের অধিকারী শিক্ষকের সম্পদ যতই কম থাকুক না কেন মানুষের নিকট তাঁদেরই মর্যাদা সম্মান তুলনামূলক বেশি। শুধু কী তাই আমাদের মালিক স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা এমন সচ্চরিত্রবান মানুষকে মহব্বত করেন। তাদের সম্মানে তাদের মা-

www.amarboi.org

বাবাকেও দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি দিয়ে জান্নাত উপহার দিবেন বলে আশা করা যায়। সুতরাং এমন সম্পদ মা-বাবা দুনিয়াতে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের অভিভাকদের মাথায় রাখতে হবে জ্ঞান হচ্ছে মহাসম্পদ। এ সম্পদের তুলনায় পার্থিব সম্পদ অত্যন্ত তুচ্ছ। কিন্তু আজকের সমাজে যারা সার্টিফিকেট অর্জন করে, আই.এ, বি.এ, এম.এ পাশ করে পার্থিব সম্পদের দিকে ঝুকে যায় বুঝতে হবে তারা প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত জ্ঞানী নয়। এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা.)-এর একটি উক্তি স্মরণীয় ঃ

رَضِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا + لَنَا عِلْمٌ وَلِلاَعْدَاءِ مَالٌ.

"মহাপ্রতাপান্বিত স্রষ্টা আমাদের ব্যাপারে জ্ঞান বণ্টনের যে ফায়সালা করেছেন তাতে আমরা তুষ্ট।"

তিনি আমাদের জন্যে রেখেছেন আদর্শ জ্ঞান আর শত্রুদেরকে দিয়েছেন সম্পদ। কাজেই বলব এমন সম্পদশালীরা কখনোই জ্ঞানীদের মূল্যায়ন করতে শিখবে না, পারবে না। বরং তাদের দৃষ্টি সবসময় সম্পদ অর্জন ও সম্পদশালীদের দিকেই থাকবে। তাদের জন্যে সম্পদের আকর্ষণ থেকে চিন্তা-চেতনা ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন। এ জন্যেও প্রয়োজন স্থায়ীভাবে সৎ চিন্তা, চেতনা ও হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা। সম্পদ নিয়ে যারা ব্যস্ত তাদের থেকে হেকমতের সাথে দূরে থাকা। আর মা-বাবা সন্তানদেরকে আদর্শ চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গঠন করার লক্ষ্যে প্রয়োজন তাদেরকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। সর্বতোভাবে কথা-বার্তায়, চিন্তা-চেতনায় তাদের জীবনোপকরণের যোগান দেয়ার পাশপাশি প্রয়োজন তাদের আদর্শ জীবন গঠন সম্বলিত উপকরণও কিনে দেয়া। তাদেরকে নানাভাবে উৎসাহিত করা, এগুলো পড়তে উদ্বুদ্ধ করা, এগুলো অনুযায়ী জীবন গঠনে উৎসাহিত করা এবং মা-বাবা নিজেরাও সে রঙে রঙিন হওয়া। অর্থাৎ শুধু সন্তানদেরকে আদর্শ বই কিনে পড়তে বললেই হবে না নিজেদেরও পড়তে হবে। আমাদের প্রত্যেক অভিভাবকদের উচিত পরিপূর্ণভাবে বিভিন্ন বিশেষ দিনে বা অনুষ্ঠানে সন্তানদেরকে নতুন নতুন জামা কাপড় ও অন্যান্য উপকরণের পাশাপাশি রাসূল (সা.) কর্তৃক বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষিত দু'টি সম্পদ **এক.** কুরআনুল কারীম, **দুই.** হাদিস গ্রন্থ এগুলো কিনে এনে ওদেরকে পড়তে দেয়া। কী দুর্ভাগ্য! অপ্রিয় হলেও সত্য। আমাদের মা-বাবারা শিক্ষিত হলেও বাসায় শিক্ষার উপাদান ক্রয় করে আনতে কেমন যেন লজ্জাবোধ করেন। আমাদের বাসাগুলোতে ড্রয়িং রুম মানে আরেক নাম ওয়েটিং রুম বা অপেক্ষা কক্ষ এখানে থাকার কথা শিক্ষা উপকরণ শেলফে বই, দেয়ালে ঘড়ি ও স্রষ্টার মহত্ত্বের কথা বা বাণী সেখানে কিনা দেখা যায় হাড়ি, পাতিল, প্লেট সুসজ্জিত করে রাখার সুকেস। এগুলো আগত অতিথিকে দেখানোর কী প্রয়োজন? এগুলো

www.amarboi.org

তো রান্না ঘরের সাথে সম্পৃক্ত জিনিস, মায়ের প্রয়োজন। এগুলো ড্রয়িং রুমে রাখার কী যৌক্তিকতা আছে? যাক সেসব কথা, এবার আসা যাক, যদি শিক্ষার্থীরা অভিভাবককে বই কিনে দিতে বলেও তাহলে তারা অনেক ক্ষেত্রেই গিয়ে উপন্যাসের বই কিনে আনে। বলুন! কিয়ামত পর্যন্ত এমন গাদা গাদা উপন্যাসের বই পড়তে থাকলেও আপনি কি সাওয়াব পাবেন? আপনার সন্তান কি আদর্শ মানুষ হতে পারবে? প্রশ্ন থাকল মুহতারাম মা-বাবাদের কাছে।

অন্যদিকে, আত্মীয়-স্বজনদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেমন বিয়েতে জীবন ধর্মীমূলক আদর্শ ও ভাল লেখকদের লেখা বই উপহার দেয়া যেতে পারে। এতে ঐসব নব দম্পতি যেমন তাদের বিয়ের উপহার হিসেবে এগুলো সংরক্ষণ করবে তেমনি এগুলো পাঠ করে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে যে কোনো কাজ করলে আল্লাহ খুশি হবেন। আর সাওয়াব পাবেন উভয়েই অর্থাৎ উপহারদাতাও কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর কাছ থেকে সাওয়াব পাবেন। যা এর চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয়ে স্বর্ণ-বা অন্যান্য নামী-দামী উপকরণ উপহার দিয়েও পাওয়া সম্ভব নয়।

আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি আমার ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করে। বয়স যখন তিন বা চার হারালাম প্রিয় জনক-বাবাকে। মায়ের আদর আর বড় ভাইয়ের কঠোর শাসনের মধ্য দিয়ে স্কুল জীবন শুরু। বাবার কথা একদমই মনে নেই। যখন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র তখন একদিন বড় ভাইয়ের সংরক্ষণ করা কিছু পত্রিকা আর বিচিত্রা ঘাটাঘাটি করতে যেয়ে পেলাম মাথায় টুপি, মুখে সুন্দর দাঁড়ি ও গাঁয়ে পাঞ্জাবী সাদা-কালো একটি ছবি। দৌড়ে মায়ের কাছে নিয়ে দেখাতেই তিনি বললেন এ তোমার বাবার ছবি। বুকে চেপে ধরে মায়ের চোখের আড়ালে গিয়ে চোখের পানি ফেললাম। আর ভাবলাম বাবার পক্ষ থেকে একটু ভালবাসা, একটু আদর, একটু উপদেশ কিছুই জোটল না ভাগ্যে। আসলে ছোট সন্তান না হয়ে বড় সন্তান হলে বুঝি এমনটি হতো না। যা হোক আদর্শ মানুষ হওয়ার পথে গমন করে একটি কথা সবসময়ই ভাবতাম বাবার স্নেহ আর আদর বুঝি অন্যত্র পাওয়া সম্ভব। নিজেকে ঠিক সেভাবেই গড়তে চেষ্টা করলাম কিন্তু আজ কতটুকু পেলাম জবাব না হয় নাই দিলাম। তবে একটু বুঝি এ যেন সত্যিই অপূরণীয় ক্ষতি। বছর কয়েক আগের কথা প্রায়ই মায়ের সাথে গল্প করতাম। বাবার চরিত্র, চিন্তা, চেতনা, আদর্শ সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করতাম অত্যন্ত আগ্রহভরে। মা বলতেন কিন্তু তাতেও যেন আমার কৌতূহল শেষ হতো না। যে বাবার সন্তান আমি সে বাবাকে না জানলে কি হয়! তাই আমি প্রায়ই একটি জিনিস ভাবি। যদি আমার বাবার সংরক্ষণ করা, রীতিমত অধ্যয়ন করা কুরআন, (ছিলো বুঝতে শিখে আর পাইনি।) অনন্ত পাঁচ-দশটি বই যদি পেতাম তাহলে তো আজ সে বইগুলোকে বাবার রেখে যাওয়া আদর্শ ও সম্পদ হিসেবে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারতাম। খুব সহজেই অনুমান করে নিতে পারতাম বাবা

www.amarboi.org

আমার চোখের অলক্ষ্যে থাকলেও তাঁর চিন্তা-চেতনা ও আদর্শকে। সে বইগুলোর পৃষ্ঠা উল্টাতে গিয়ে যে অংশে আঙ্গুলের ছাপ লাগে তাতে হয়তোবা আমিও স্পর্শ করতে যেয়ে বাবার হাতের ছোয়া আর থুথুর স্পর্শ থেকে ভালবাসা উপলব্ধি করতে পারতাম। বাবার গন্ধ উপলব্ধি করতে পারতাম- এসব কিছু আমার ভাবনা, আমার চাওয়া, আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার মনে হয় জগতে আমার মতো এমন বাবা-মা হারা অনেকেই এতিম আছেন যাদের মাথায় সরাসরি এ বিষয়টি অবিকল এভাবে ধরা না দিলেও একটি বিষয় সুস্পষ্ট সময়ে-অসময়ে সকলেই হারানো মা-বাবাকে উপলব্ধি করতে চান এতে কোনো সন্দেহ নাই। তাদের রেখে যাওয়া সম্পদের সৎ ব্যবহার করতে, ধরে রাখতে –এতে বোধ হয় এমন দুঃখী মানুষদের কারোরই কোনো দ্বিমত নেই। কাজেই এক্ষেত্রে আজকের মুহতারাম মা-বাবাদের কাছে আমার এ লেখার দাবি হলো– আমরা সবাই একদিন না একদিন মৃত্যুবরণ করব। আমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য অন্তত পক্ষে জমি-জমা, ব্যাংক ব্যালেন্স, গাড়ি-বাড়িসহ অন্যান্য দৃশ্যমান সম্পদের পাশাপাশি আরেকটা অমূল্য সম্পদ যার দৃশ্যমান মূল্য অনেক কম কিন্তু অদৃশ্য মূল্য, তার শক্তি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। কুরআন, হাদিস ও জীবন গঠনের লক্ষ্যে সকলের বোধগম্য ভাষায় আদর্শ লেখকের লেখা গ্রন্থ বাসায় সংরক্ষণ করে যেতে চেষ্টা করা। এগুলোতে আপনাদের স্বাক্ষর ও তারিখসহ লেখা থাকলে পরবর্তী আগন্তুকেরা আরো বেশি উৎসাহ বোধ করবে। খুশি হবে, চোখের পানি ফেলে কাঁদবে। আপনাদের অবর্তমানে দু'আ করবে। এতে হয়তোবা আগন্তুকদের আমার মতো আফসোস থাকবে না। আপনাদের আদর্শ সন্তান এবং তাদের ছেলে-মেয়েরাও এগুলো অধ্যয়ন করে আপনাদের কথা মনে করবে, চোখের পানি ফেলে আপনাদের জন্যে দু'আ করবে। আজ আমার মতো বাবার জান্নাত প্রাপ্তির জন্যে সকলের কাছে দু'আ চাইবে। আপনাদের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় তারাও গড়ে উঠতে চেষ্টা করবে আদর্শ সচ্চরিত্রবান হয়ে। যখনই তারা কোনো নেগেটিভ কাজ করতে যাবে তখনই আপনাদের রেখে যাওয়া গ্রন্থের ছবি ও লেখা তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। আপনাদের লাল, সবুজ ও রঙিন কালির কলম দিয়ে দাগানো বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লাইন ও কোটেশনগুলো তারা গুরুত্ব দিয়ে পড়বে এবং মানতে চেষ্টা করবে। চেষ্টা করবে জীবনকে সেই আদলে গড়তে। বিশেষ করে আপনাদের অনুপস্থিতি আপনাদের ছেলে-মেয়ে ও নাতী-নাতনীদের মনে আরো বেশি রেখাপাত করবে। তারা এগুলো পড়বে, মানবে, সচ্চরিত্রবান হবে, সুন্দর করে জীবন গড়বে, আল্লাহর বিধান মেনে নবীর আদর্শে জীবন পরিচালনা করবে আর আপনারা কবরে গেলেও তার সাওয়াব ভোগ করবেন, বিনিময়ে জান্নাত নামক চির শান্তির স্থান উপহার পাবেন।

www.amarboi.org

সচ্চরিত্র গঠনে পরকালের প্রতি বিশ্বাসের ভূমিকা

পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে যুগে যুগে সকল জাতির কাছে সচ্চরিত্র গঠন কথাটি বড়ই সমাদৃত। সচ্চরিত্রবান লোককে সকল যুগেই শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়েছে। সত্য কথা বলা, বৈধ উপায়ে জীবন-যাপন করা, অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন, বিপন্নকে সাহায্য করা, অপরের জীবন, ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-আবরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করা, কর্মঠ ও সৎকর্মশীল হওয়া, আত্মত্যাগ, ধৈর্য ও সহনশীলতা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রভৃতি সচ্চরিত্রের গুণাবলি হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত।

এখন প্রশ্ন হলো, এ চারিত্রিক গুণাবলি কিভাবে অর্জন করা যায়? তা অর্জনের প্রেরণা কী করে লাভ করা যায় এবং সে প্রেরণার উৎসই বা কী হতে পারে?

অবশ্য আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস না করেও উপরে উল্লিখিত গুণাবলির কিছুটা যে অর্জন করা যায় না তা নয়, তবে তা হবে আংশিক, অস্থায়ী, অপূর্ণ ও একদেশদর্শী। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ উক্ত গুণাবলি আংশিকভাবে অর্জন করা যেতে পারে শুধু দেশ ও জাতির স্বার্থে। আবার দেশ ও জাতির স্বার্থেই উক্ত গুণাবলি পরিহার করাই মহৎ কাজ বলে বিবেচিত হয়। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্য দেশ ও জাতিকে পদানত করা, অন্য জাতির লোককে দাসে পরিণত করে তাদেরকে পশুর চেয়ে হেয় জীবন যাপন করতে বাধ্য করা মোটেই দূষণীয় মনে করা হয় না।

ইংরেজ জাতির দৃষ্টান্ত পেশ করে বলা হয় যে, তারা সমষ্টিগতভাবে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী না হয়েও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরশীল, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, মহানুভব ও মানবদরদী, মানবতার সেবায় তারা নিবেদিত-প্রাণ। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ব্যক্তিগতভাবে তাদের কারো মধ্যে কিছু চারিত্রিক গুণ পাওয়া গেলেও গোটা জাতি মিলে তারা যাদেরকে তাদের জাতীয় প্রতিনিধি মনোনীত করে তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকাশ্যে মিথ্যা, প্রতারণা, প্রতিশ্রুতি ভংগ, বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যায়, অবিচার, নরহত্যা প্রভৃতি ঘৃণ্য অপরাধগুলো নির্দ্বিধায় করে ফেলে। এরপরও সমগ্র জাতির তারা অভিনন্দন লাভ করে। ব্রিটিশ শাসকগণ তাদের উপনিবেশগুলোর অধিবাসীদের সাথে যে আচরণ করেছে বর্বরতার চেয়ে তা কি কোন্ দিক দিয়ে কম? ইংরেজ জাতির প্রাতঃস্মরণীয় ও চিরস্মরণীয় নেতা লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের জন্যে যে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা পালন করে তা ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা। বর্তমান জগতের সভ্যতার ও মানবাধিকারের প্রবক্তা আমেরিকানরা কি কোনো মহান চরিত্রের অধিকারী? আপন স্বার্থে লক্ষ-কোটি মানব সন্তানকে পারমাণবিক অস্ত্রের

www.amarboi.org

সাহায্যে নির্মূল করতে তারা দ্বিধাবোধ করেনি। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল নামে একটি ইহুদী রাষ্ট্রের পত্তন করে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি নষ্ট করা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা, সর্বহারা হয়ে পরে মানবেতর জীবন যাপন করেছে। এর জন্যে আমেরিকাবাসী কি দায়ী নয়? এটা কি মানবতাবাদী চরিত্রের নিদর্শন?

মানব জাতির ইতিহাসও একথাই সাক্ষ্য দেয় যে, যখন মানুষ ও কোনো জাতি আল্লাহ ও আখিরাতকে অস্বীকার করেছে অথবা ভুলে গিয়েছে, তখনই তারা চারিত্রিক অধঃপতনের অতল তলে নিমজ্জিত হয়েছে। তাদের কৃত অনাচার-অবিচার সমাজ জীবনে নেমে এসেছে হাহাকার, আর্তনাদ। অবশেষে সে জাতি হয়েছে নাস্তানাবুদ এবং মুছে গেছে দুনিয়া থেকে তাদের নাম-নিশানা।

এখন দেখা যাক, আখিরাত সম্পর্কে কুরআন পাকে কি অকাট্য যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। আখিরাতের বিশ্বাস এমন গুরুত্বপূর্ণ যে এর প্রতি অবিশ্বাস স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর নবী-রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাসেরই নামান্তর। তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সাথে আখিরাতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হলেই নবী-রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত ইসলামী জীবন দর্শন ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রাসাদ সুরক্ষিত হবে। আর আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসের কারণেই এ প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَأَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوتُ ج بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّهُمْ كَانُوْا كَاذِبِيْنَ. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ.

"অবিশ্বাসীরা আল্লাহর নামে কড়া কড়া কসম করে বলে যে, আল্লাহ মৃত ব্যক্তিদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। কেন করবেন না? এটি এমন এক প্রতিশ্রুতি যা পূরণ করা তাঁর (আল্লাহর) কর্তব্য। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন এ জন্যে যে, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল, তার প্রকৃত তত্ত্ব আল্লাহ সেদিন উদঘাটিত করবেন। এতে করে অবিশ্বাসীরা জানতে পারবে যে, তারা ছিল মিথ্যাবাদী। কোনো কিছুর অস্তিত্ব দান করতে এর চেয়ে বেশি কিছু করতে হয় না, যখন বলি 'হয়ে যা' আর তক্ষুণি তা হয়ে যায়।" (সূরা আন্ নাহল, ১৬ ঃ ৩৮-৪০)

আল্লাহ তা'আলা এখানে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন ও পুনরুত্থানের বিবেক

www.amarboi.org

সম্মত ও নৈতিক প্রয়োজন বর্ণনা করছেন। মানব জন্মের প্রারম্ভ থেকেই প্রকৃত সত্য সম্পর্কে বহু মতবিরোধ, মতানৈক্য হয়ে এসেছে। এসব মতানৈক্যের কারণে বংশ, জাতি ও গোত্রের মধ্যে ফাটল ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ হয়েছে। এ সবের ভিত্তিতে বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর ধারক ও বাহকগণ তাদের পৃথক ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। এক একটি মতবাদের সমর্থনে ও তার প্রতিষ্ঠার জন্যে বিভিন্ন সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ জান-মাল, সম্মান-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়েছে। ভিন্ন মতাবলম্বীর সাথে রক্তাক্ত সংঘর্ষও হয়েছে। এক মতাবলম্বী লোক ভিন্নমত পোষণকারীদেরকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছে। আক্রান্ত মতাবলম্বীগণ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের বিশ্বাস ও মতবাদ বর্জন করেনি। বিবেকও এটাই দাবি করে যে, এ ধরনের প্রচণ্ড মতবিরোধ সম্পর্কে এ সত্য অবশ্যই উদঘাটিত হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, তাদের মধ্যে সত্য কোনটা ছিলো এবং মিথ্যা কোনটা। কে ছিলো সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কে পথভ্রষ্ট? দুনিয়ার বুকে এ সত্য উদঘাটনের কোনো সম্ভাবনাই দেখা যায় না। দুনিয়াটার ব্যবস্থাই এমন যে, এখানে সত্য আবরণমুক্ত হওয়াই কঠিন। অতএব বিবেকের এ দাবি পূরণের জন্য এক অন্য জগতের অস্তিত্বের প্রয়োজন।

এ শুধু বিবেকের দাবিই নয়, নীতি-নৈতিকতার দাবিও তাই। কারণ, এসব বিরোধ ও সংঘাত-সংঘর্ষে বহু দল অংশগ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ করেছে অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং কেউ তা সহ্য করেছে। কেউ জান-মাল বিসর্জন দিয়েছে এবং কেউ তার সুযোগ গ্রহণ করেছে। প্রত্যেকেই তার মতবাদ অনুযায়ী একটা নৈতিক দর্শন ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে এবং এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে ভাল অথবা মন্দ প্রতিক্রিয়া সূচিত হয়েছে। এখন এমন এক সময় অবশ্যই হওয়া উচিত, যখন এ সবের ফলাফল পুরস্কার অথবা শাস্তির রূপ নিয়ে প্রকাশিত হবে। এ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় যদি পরিপূর্ণ নৈতিক ফলাফল প্রকাশ সম্ভব না হয়, তাহলে অবশ্যই আর এক জগতের প্রয়োজন, যেখানে তা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ লাভ করবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ج إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ أَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ.

"তোমাদের সবাইকেই তার দিকে ফিরে যেতে হবে। এ আল্লাহ তা'আলার পাকাপোক্ত ওয়াদা। সৃষ্টির সূচনা অবশ্যই তিনি করেন এবং দ্বিতীয় বার সৃষ্টিও

www.amarboi.org

তিনি করবেন। দ্বিতীয় বার সৃষ্টির কারণ এই যে, যারা ঈমান আনার পর সৎ কাজ করেছে, তাদেরকে তিনি ন্যায়পরায়ণতার সাথে প্রতিদান দিবেন। আর যারা অবিশ্বাসীদের পথ অবলম্বন করেছে, তারা উত্তপ্ত পানি পান করবে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। সত্যকে অস্বীকার করে তারা যা কিছু করেছে তার জন্যই তাদের শাস্তি।" (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ০৪)

এখানে পরকালের দাবি ও তার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। দাবি করা হচ্ছে যে, পরকাল অর্থাৎ মানুষের পুনরুজ্জীবন অবশ্যই হবে। এ কাজটা মোটেই অসম্ভব নয়। তার প্রমাণস্বরূপ বলা হচ্ছে যে, যিনি একবার সৃষ্টি করতে পারেন তিনি তো বারবার সে কাজ করতে সক্ষম। অতএব একবার তিনিই যদি মানুষকে সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে দ্বিতীয় বার কেন পারবেন না?

অতঃপর আখিরাতের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। উপরের যুক্তি একথার জন্যে যথেষ্ট যে, দ্বিতীয় বারের সৃষ্টি সম্পূর্ণ সম্ভব। এরপর বলা হচ্ছে, বিবেক ও ন্যায় নিষ্ঠার দিক দিয়ে পুনরুজ্জীবনের বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং এ প্রয়োজন পুনরুজ্জীবন ব্যতীত কিছুতেই পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে স্রষ্টা ও প্রভু স্বীকার করার পর যারা সত্যিকার দাসত্ব-আনুগত্যের জীবন যাপন করছে, ন্যায়সংগতভাবে তারা পুরস্কার লাভের অধিকার রাখে। আর যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে বিপরীত জীবন যাপন করছে তাদেরও কৃতকর্মের জন্যে পরিণাম ভোগ করা উচিত। কিন্তু এ প্রয়োজন দুনিয়ার জীবনে কিছুই পূরণ হলো না এবং হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ প্রয়োজন পূরণের জন্যেই পুনরুজ্জীবন বা আখিরাতের জীবন একান্ত আবশ্যক।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.

"প্রত্যেককেই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং কিয়ামতের দিনে তোমাদেরকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। অতএব সেদিন যাদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করে বেহেশতে স্থান দেয়া হবে তারাই হবে সাফল্যমণ্ডিত।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৮৫)

এখানেও আখিরাতের প্রয়োজনীতার যুক্তি পেশ করা হয়েছে। প্রথমেই এর পরীক্ষিত সত্যের কথা বলা হয়েছে এবং তা হলো এই যে, প্রতিটি মানুষ মরণশীল। প্রতিটি জীবকেই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে হচ্ছে যেটা মানুষের এক দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতা।

এ দুনিয়ার বুকে মানুষ তার জীবদ্দশায় ভাল-মন্দ উভয় কাজই করে যাচ্ছে। ভাল-মন্দ কাজের যথার্থ প্রতিদান এখানে পাওয়া যাচ্ছে না। একজন সৎকর্মশীল

www.amarboi.org

ব্যক্তি সারা জীবন ভাল করেও তার প্রতিদান পান না এবং একজন দুর্বৃত্ত সারা জীবন কুকর্ম করেও শাস্তি ভোগ করে না। এসব অতি বাস্তব সত্য যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। অথচ সৎ কাজের পুরস্কার এবং কুকর্মের শাস্তিও একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিলো। ভাল কাজের জন্যে সঠিক এবং পরিপূর্ণ পুরস্কার এবং দুষ্কৃতির জন্যেও যথোপযুক্ত শাস্তি যেহেতু এ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় হয়তো কখনো কখনো সম্ভব নয়, সে জন্যে মৃত্যুর পর আর একটি জীবনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ.

"প্রত্যেককে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং এই দুনিয়াতে তোমাদেরকে সুখ-দুঃখ দিয়ে আমি পরীক্ষা করব এবং এ পরীক্ষার ফলাফল লাভের জন্যে তোমাদেরকে আমার নিকটই ফিরে আসতে হবে।" (সূরা আল আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৫)

কাজেই মনে রাখতে হবে, মানুষের চরিত্র যদি তৈরি হয় এমনি আল্লাহ ও পরকালভীতির ভিত্তিতে, তাহলে সমাজ থেকে অপরাধ ও দুর্নীতি মূলোৎপাটনের জন্যে কোন প্রকাশ্য বাহিনী পোষণ করার প্রয়োজন হবে না। দুর্নীতি দমন বিভাগ বা বাহিনীর লোকের হৃদয়ে যদি আল্লাহ ও পরকালের ভয় না থাকে, তাহলে তাদেরও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। অতঃপর সে দেশে দুর্নীতি ও অপরাধ দমনের পরিবর্তে সকলে একত্রে মিলে তা পোষণ করাই হবে সবার কাজ।

অসৎ দোষাবলি থেকে মুক্তির উপায় ও সচ্চরিত্রবান মুমিন হওয়ার পন্থা

তাকওয়া ঃ আল্লাহভীতি

'তাকওয়া' আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ভয় করা, বেঁচে চলা, সতর্কতা অবলম্বন করা, বিরত থাকা ইত্যাদি। এসব অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আল কুরআনুল কারীম ও হাদিস পাকে তাকওয়া শব্দটি মূলত বিশেষ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহর উপর সব সময় দৃঢ় ঈমান রেখে জীবনের সর্বস্তরে কাজ করতে থাকলে মানুষ ভাল ও মন্দের মধ্যে সঠিক পার্থক্য করার যোগ্যতা ও প্রবণতা লাভ করে। আর এতে ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ এবং মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। মনের এরূপ আস্থা অনুযায়ী নীতি নৈতিকতাবোধকে ইসলামের পরিভাষায় তাকওয়া বলে।

তাকওয়ার কেন্দ্র

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ اَخُوا

www.amarboi.org

الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَايَخْذُلُهُ وَلَايَحْقِرُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِه ثَلٰثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করে না। তাকে ঘৃণা করে না। অসহায়-নির্বান্ধব করে না। তাকওয়া এখানে (এ কথা বলে তিনি তাঁর বক্ষের প্রতি তিনবার ইংগিত করেন)। মানুষের দুষ্কৃতির জন্য এতোটুকু যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণ্য নিকৃষ্ট মনে করবে। প্রতিটি মুসলমানদের খুন, সম্পদ ও ইযযত সমস্ত মুসলমানের জন্য সম্মানার্হ।"

এ হাদিসে রাসূল (সা.) তাকওয়ার কেন্দ্র প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

এক. ইসলামী ভ্রাতৃত্বের (Brotherhood) দাবি হচ্ছে এই যে, এক মুসলমান অপর মুসলমানের উপর যুলুম করবে না। তাকে যালেমদের হাতে সোপর্দ করবে না। নিজ সম্পদ, বংশ মর্যাদা, দৈহিক ও ইসলামী যোগ্যতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে তাকে ঘৃণা করবে না কিংবা ছোট মনে করবে না।

দুই. তাকওয়ার কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর। মানুষের অন্তরে যদি তাকওয়ার বীজ শিকড় গেড়ে নিতে পারে, তবে তার বাহ্যিক দিকও আমলে সালেহর কুসুম কলিতে তরতাজা হয়ে উঠতে বাধ্য। কিন্তু অন্তরেই যদি তাকওয়ার নামগন্ধ না থাকে তবে কেবল বাহ্যিক পরহেযগারী দ্বারা নৈতিক চরিত্র সংশোধন হয় না এবং তাতে পরকালীন সাফল্যেরও আশা করা যায় না।

তিন. মুসলিম সমাজে কোনো মুসলমানের জান মাল ও ইযযত আবরুর হামলা করা নিকৃষ্টতম নাফরমানী। এরূপ নাফরমানী দুনিয়াতেও কঠিন শাস্তিযোগ্য আর পরকালেও সে আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে না।

তাকওয়া অবলম্বনকারীরাই মুত্তাকী বা মুমিন

যে ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়া থাকে, তাকে মুত্তাকী বা মুমিন বলা হয়। সৎগুণাবলির মধ্যে তাকওয়া হচ্ছে অন্যতম। যার মধ্যে তাকওয়া থাকে, সে পার্থিব জীবনের লোভে কোনো খারাপ কাজ করে না। সে পরকালীন জীবনের কল্যাণ ও মঙ্গলের কাজে সবসময় নিজেকে নিয়োজিত রাখে। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে শিরক, কবীরা গুণাহ ও অশ্লীল কাজকর্ম ও কথা-বার্তা থেকে বিরত রাখে, তাঁকে মুত্তাকী বলা হয়। মুত্তাকী ব্যক্তি সততা, আমানতদারী, ধৈর্য, শোকর, আদল-ইনসাফ ইত্যাদি সব ধরনের গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকে। মুত্তাকীদের পরিচয় প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

www.amarboi.org

الَّذِينَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

"যারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে, নামায আদায় করে এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। আর যারা আপনার উপর যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার আগে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখে, আর তারা আখিরাতের প্রতি ইয়াকীন রাখে।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ৩-৪)

উপরিউক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ মুত্তাকীদের গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

০১. গায়েব বা অদৃশ্য যেমন ঃ আল্লাহ, ফিরিশতা, জান্নাত-জাহান্নাম, আখিরাত ইত্যাদি যা মানবীয় জ্ঞানে বোধগম্য নয়-এরূপ বিষয়গুলোতে ঈমান রাখা।

০২. নামায কায়েম করা অর্থাৎ যথাযথ শর্ত পালন করে নিষ্ঠার সাথে নামায কায়েম করা।

০৩. আল্লাহর পথে ব্যয় করা অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা ও ধন সম্পদ থেকে তাঁরই নির্দেশিত পথে ব্যয় করা।

০৪. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন এবং তাঁর পূর্ববর্তী কিতাবের উপর ঈমান রাখা।

০৫. মুত্তাকীরা পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী। তাঁরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি ইয়াকীন রাখে।

পরহেযগারীর যিন্দেগীতে সতর্কতা

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاعَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا.

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "হে আয়েশা! ক্ষুদ্র-নগণ্য গুনাহ থেকেও আত্মরক্ষা করে চলবে। কারণ আল্লাহর দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (ইবনে মাজাহ শরীফ)।

কবীরা গুনাহ যেমন একজন মুসলমানদের নাজাত ও মুক্তি লাভকে আশংকাযুক্ত করে দেয়, তেমনিভাবে সগীরা গুনাহর ব্যাপারটাও কম বিপদজনক নয়। সগীরা গুনাহ বাহ্যিকভাবে যদিও হালকা তুচ্ছ মনে হয়, কিন্তু তা বার বার করলে অন্তরে মরিচা পড়ে যায় এবং কবীরা থেকে পবিত্র থাকার অনুমতি নিঃশেষ হয়ে যায়।

হাফেয ইবনে কাইয়্যেম লিখেছেন ঃ "এটা দেখো না যে গুনাহ কতো ছোট;

www.amarboi.org

বরঞ্চ সেই মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বকে সামনে রাখো যার নাফরমানী করার দুঃসাহস করা হচ্ছে।"

মানুষ যদি আল্লাহর 'মালিকী ইয়াওমিদ্দীন'-এর মর্যাদা এবং তার ভয়াবহ আযাবের কথা মনে রাখে, তবে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গুণাহ করার সাহসও কোনো মানুষের হতে পারে না।

উপায়-উপাদানের পবিত্রতা

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقُهَا اَلاَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلاَتَحْمِلَكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِى اللّٰهِ فَاِنَّهُ اَيُدْرَكُ مَا عِنْدَهُ اِلاَّ بِطَاعَتِهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "কোন মানুষই ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহর নির্ধারিত রিযিক লাভ করবে। শোনো, খোদাভীতি অবলম্বন করো। জীবিকা উপার্জনে জায়িয উপায়-উপকরণ অবলম্বন করো। রিযিক লাভে বিলম্ব তোমাদের যেনো না-জায়িয পন্থা অবলম্বনের পথে ঠেলে না দেয়। কারণ আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে, তা কেবল তার অনুগত ও বাধ্যগত থাকার মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে।

এ হাদিসে কয়েকটি দ্বীনি তত্ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

এক. কোনো ব্যক্তি যদি কখনো রিযিক লাভে ব্যর্থতা কিংবা বিড়ম্বনা অনুভব করে, তাবে তার নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে যে রিযিক নির্ধারণ করেছেন শীঘ্র হোক কিংবা বিলম্বে হোক তা সে লাভ করবেই।

দুই. আল্লাহর নাফরমানী করেও দুনিয়াতে বাহ্যত স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে দেখা যায়। মূলত, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা অবকাশ মাত্র। এর পরই আল্লাহর আযাব তাদের পরিবেষ্টন করবে। প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তো তাই যা আল্লাহর অনুগত জীবন যাপনের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

বস্তুত 'তাকওয়া' সকল আমলে সালেহ বা সৎ কর্মের উদ্দীপক ও প্রেরণাদায়ক এবং সকল বদ আমল বা অসৎ কর্ম থেকে বাঁচার মতো একটি শক্তিশালী অনুভূতি ও অবলম্বন। ঈমানের প্রকৃত দাবিই হলো মুমিনের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে 'সিরাতে মুসতাকীম' বা সরল পথ দিয়ে চলার শক্তি ও সামর্থ্য জোগাবে।

www.amarboi.org

তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানব চরিত্রের অন্যতম সম্পদ তাকওয়া। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মূল ভিত্তিও হচ্ছে এটি। মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন যাপনের চালিকা শক্তি হচ্ছে তাকওয়া। মানব জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১০২)

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَادِمَائُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.

"আল্লাহর নিকট পৌঁছে না গোশত ও রক্ত (কুরবানীর পশুর)। বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।" (সূরা আল হাজ্জ, ২২ ঃ ৩৭)

তাকওয়া আল্লাহর নৈকট্য ও ভালবাসা লাভ করার উপায়। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।" (সূরা আত তাওবা, ০৯ ঃ ০৪)

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

"এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর মনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ১৯৪)

মূলত তাকওয়া অবলম্বন জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, দু'টি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না, একটি চোখ যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, আর অপর চোখ যা আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে।

তাকওয়া শুধু জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয় না, বরং তা জান্নাতে প্রবেশ করতেও সাহায্য করে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى.

"আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং নিজেকে

www.amarboi.org

কুপ্রবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে রাখে নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।" (সূরা আন নাযি'আত, ৭৯ ঃ ৪০-৪১)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ.

"মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে।" (সূরা আদ্ দুখান, ৪৪ ঃ ৫১)

মুত্তাকী আল্লাহ্র নিকট সম্মানিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ.

"তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই আল্লাহ্র কাছে অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।" (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৩)

বস্তুত তাকওয়া সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে সমাজে ইতিবাচক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে এবং তাকওয়ার অভাবে মানব চরিত্র পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে, যার নজীর বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান।

তাকওয়া অর্জনের পন্থা

০১. আল্লাহ্র কঠোর শাস্তির কথা (দুনিয়া ও আখিরাতে) মাথায় রাখতে হবে।
০২. যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মৃত্যু দিতে পারেন তা মাথায় রাখতে হবে।
০৩. খাঁটি অলী-আউলিয়াদের কষ্ট না দেয়া।
০৪. সত্য ও সুন্দর করে কথা বলা।
০৫. ভাল ও আদর্শ মানুষ তথা হক ও হালাল উপার্জনকারী ব্যক্তিদের পাশাপাশি থাকার চেষ্টা করতে হবে।
০৬. দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী তা সব সময় মাথায় রাখতে হবে।
০৭. আমরা যা কিছু করি না কেন সকল কিছুর জন্যই আমাদেরকে জবাবদিহির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তা মনে-প্রাণে বদ্ধমূল রাখতে হবে।

বর্তমানে সমস্যাসংকুল ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে যতদিন না তাকওয়া সৃষ্টি হবে, ততদিন মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গল আশা করা যায় না। তাই বলা যায়, তাকওয়া হলো মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের মুক্তি ও নাজাতের জন্য মূল চাবিকাঠি।

তাওয়াক্কুল ঃ আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা

'তাওয়াক্কুল' আরবী শব্দ। এর অর্থ আস্থা স্থাপন করা, ভরসা ও নির্ভর করা। কুরআন ও হাদিসের পরিভাষায় ইসলামের বিধান অনুযায়ী পূর্ণ উদ্যমে দৃঢ়

www.amarboi.org

সংকল্পবদ্ধ হয়ে কোনো কাজ করার সাথে তার সাফল্যের জন্য মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা সহকারে ভরসা ও নির্ভর করার নামই 'তাওয়াক্কুল।'

'তাওয়াক্কুল' আলাল্লাহ' মুমিনের একটি মহৎ গুণ। চেষ্টা তদবীর বা কোনো কাজের চেষ্টা-সাধনা না করে কোনো তাওয়াক্কুল হয় না। সুতরাং কাজ ও তাওয়াক্কুল এর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কাজ করতে যেমন আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তেমনি তাওয়াক্কুল-এর নির্দেশও আল্লাহর। বান্দা নিজের যোগ্যতা, জ্ঞান-মেধা ও কর্মক্ষমতা, দক্ষতার সমন্বয় ঘটিয়ে কাজ করবে এবং সাফল্যের জন্য ভরসা করবে আল্লাহর উপর।

কেননা সব কিছুর চাবিকাঠি ও সাফল্য আল্লাহর হাতে। উল্লেখ্য যে, চেষ্টা তদবীর না করে সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধার সদব্যবহার না করে হাত পা গুটিয়ে অকর্মন্য হয়ে বসে থাকা বা চেষ্টা না করে প্রাপ্তির আশা করা শরীয়াতের বিধান নয় এবং এটাকে তাওয়াক্কুল বলা যায় না। বরং শরীয়তসম্মতভাবে চেষ্টা তদবীর করে সফলতার জন্য মনে মনে আল্লাহর উপর ভরসা করাকেই বলা হয় তাওয়াক্কুল।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে 'তাওয়াক্কুল'-এর বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান। আল্লাহর উপর 'তাওয়াক্কুল ব্যতীত মুমিনের কোনো কাজ সফলতা লাভ করতে পারে না। সুতরাং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করা কর্তব্য। তাওয়াক্কুল অবলম্বন প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করো, যদি তোমরা মুমিন হও।" (সূরা আল মায়িদা, ০৫ ঃ ২৩)

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

"আর আল্লাহর উপরই মুমিনগণ ভরসা করবে। ভরসা করা মুমিনদের উচিত।" (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ১১)

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ.

"তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো তখন আল্লাহর উপর ভরসা করো।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৫৯)

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।" (সূরা আত তালাক, ৬৫ ঃ ০৩)

www.amarboi.org

এ আয়াতগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, আল্লাহর উপর নির্ভরশীল ও ভরসাকারীগণ কখনও বিফল মনোরথ হবে না। তার হিফাযত ও কর্ম বিধানের জন্য আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্য থেকে এমন সব ব্যবস্থা করবেন যা সে হয়তো কখনো কল্পনাও করেনি।

মুমিনগণকে মহান আল্লাহর উপরই ভরসা করতে হবে। কারণ তিনি কর্মের সফলতা দানকারী ও বান্দার একমাত্র সাহায্যকারী।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যখন কাফিরগণ চড়কে বেঁধে নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করছিল, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

"আল্লাহই আমার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমার উত্তম কর্মনির্ধারক।" ফলে আল্লাহ তা'আলা আগুনের প্রতি নির্দেশ দেন ঃ

يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلاَمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ.

"হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের প্রতি শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে যাও।" (সূরা আল আম্বিয়া, ২১ ঃ ৬৯)

(সুবহানাল্লাহ) মহান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলে, তার বিনিময় এরূপই হয়ে থাকে। মুমিনের গুণাবলির মধ্যে তাওয়াক্কুল একটি অনন্য গুণ।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

"ঈমানদার তারাই, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের কালে কেঁপে উঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের প্রভুর উপরই আস্থা ও ভরসা রাখে।" (সূরা আনফাল, ০৮ ঃ ০২)

হাদিসে বর্ণিত আছে ঃ

لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِه لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُ وَخِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا.

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "যদি তোমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার হক আদায় করতে তবে তিনি পাখিকে রিযিক দেয়ার মতোই তোমাদেরকেও

www.amarboi.org

রিযিক দিতেন। পাখি তো সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় তারা ভরা পেটে বাসায় ফিরে আসে।" (তিরমিযী শরীফ)

তাওয়াক্কুলে সফলতা-বিফলতা

আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছু হতে পারে না-এই বিশ্বাস ঈমানের অংশ। যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছু হতে পারে না, তাই শরীয়াতের নিয়মানুযায়ী যে কোনো চেষ্টা তদবীর গ্রহণ করার পর কামিয়াবীর জন্যে মনে মনে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে সফলতা নিশ্চিত।

এক্ষেত্রে অনেকে কাজ করে নেগেটিভ অর্থাৎ চেষ্টা চর্চা নেগেটিভ আর বলে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া হয় নাই। এমনটি বলা মূর্খতা। বরং বলা যায়, আপনার শুরুটিইতো নেগেটিভ আবার আপনাকে বিবেক বুদ্ধিতো দিয়ে শ্রেষ্ঠ জীব ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং সবকিছুর সমন্বয় ঘটিয়ে শরীয়তসম্মত কাজ করে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হলে সফলতা নিশ্চিত। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ সফলতা দেয়ার ব্যাপারে বহু জায়গায় ওয়াদা করেছেন।

অন্যদিকে ঘুষ দিয়ে, দুর্নীতি বা স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অন্যের হক নিজের আয়ত্তে আনা বা চাকুরী প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে, নামায পড়ে, সিয়াম পালন করে, দান-খয়রাত করে বা যত ধরনের ভাল কাজই আপাতত স্বার্থ হাসিলের জন্য করুক না কেন এতে সফলতা নিশ্চিত নয় বরং বিফলতা নিশ্চিত। তবে কারোর কারোর সফলতা আসলেও তা সাময়িক।

তাছাড়া মূল কথা হলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে সবসময় আল্লাহর উপর ভরসা খুবই জরুরী। ভাল-মন্দ সবকিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। তাই সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল করা কর্তব্য। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যান।

তাওবা ও ইসতিগফার

মানুষ মাত্রই ভুল করে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, চারিধারে শয়তানের প্ররোচনায় ভুল-ত্রুটি হওয়াই স্বাভাবিক। এতে পাপের সৃষ্টি হয় বা মানুষ পাপে জড়িয়ে পড়ে। পরক্ষণেই মানুষ এ পাপ থেকে মুক্তির জন্যে তাওবা করতে চায়।

তাওবা শব্দের অর্থ হলো প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা, অর্থাৎ গুনাহের কারণে নিজ মনে মনে লজ্জিত হওয়া। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাওবা করার হুকুম দিয়ে বলেনঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"যে মুমিনগণ তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা আন নূর, ২৪ ঃ ৩১)

অন্যদিকে ইসতিগফার হলো বান্দা তার গুনাহের কারণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত

www.amarboi.org

হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, মাফ চাওয়া, মুক্তি চাওয়া। তাওবা ও ইসতিগফার আল্লাহর কাছে অতীব পছন্দনীয় একটি কাজ। মানুষ অজ্ঞতা, শয়তানের শয়তানী প্রভাব ও লোভ লালসায় আকৃষ্ট হয়ে ভুল করবে বা করতে পারে এমনটি আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন। কেননা কোনো মানুষই নফসে আম্মারা (Man as an animal) ও নফসে লাওয়ামা (Man as a moral being) এদের প্রভাব থেকে মুক্ত নন। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে মানুষকে আদর্শ সচ্চরিত্রবান হওয়ার নেশায় সবসময় সচেতন থাকা এবং আল্লাহর কাছে তাওবা ও সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ ج إِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ.

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর নিকট তাওবা করো, তোমার প্রতিপালক পরম দয়ালু ও প্রেমময়।" (সূরা হূদ, ১১ ঃ ৯০)

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর রহমত ও কামিয়াবী পেতে হলে অবশ্যই তাওবা করতে হবে। তাওবা ব্যতীত আল্লাহর রহমত ও জীবনের সফলতা লাভ করা যাবে না।

তাওবা কবুলিয়াতের শর্ত কী কী

তাওবা করা মানুষের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানুষ পাপ করে তাওবা করে এমনকি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও মুসলিমরা তাওবা করার একটি রীতি কোথাও কোথাও দেখা যায়। এ তাওবা সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا.

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো– বিশুদ্ধ তাওবা।" (সূরা আত তাহরীম, ৬৬ ঃ ০৮)

উল্লিখিত আয়াত অনুসারে বিশুদ্ধ তাওবা বা তাওবা কবুলিয়াতের শর্ত প্রসঙ্গে আলেম-ওলামারা বলেন, তাওবা কবুল হওয়ার শর্ত চারটি।

এক. তাওবাকারীকে সেই গুনাহ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।

দুই. অতীতের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে।

তিন. তার পরিপূরক এবং আরো বেশি বেশি নেক কাজ করতে হবে।

চার. চোখের পানি ফেলে কাঁদতে হবে। অঝোর ধারায় কাঁদতে হবে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহই একমাত্র কবুলকারী। সুতরাং

www.amarboi.org

তাওবাকারীকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে সদা-সর্বদা হাযির-নাজির জেনে তাঁরই সমীপে তাওবা করতে হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

"এবং যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি কোনো যুলুম করলে আল্লাহর স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া কে পাপ মাফ করবে এবং তারা যা করে ফেলে জেনে-শুনে তারই পুনরাবৃত্তি করে না।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ১৩৫)

তাওবা ইসতিগফার কোনো সাধারণ বিষয় নয়। মুখের দাবি বা উচ্চারণই নয়। বরং তাওবা ও ইসতিগফার এর চূড়ান্ত পর্যায় হলো—বান্দা তার নিজের অবস্থার সংশোধন করবে। অর্থাৎ পাপাচারের পথ ও মত বর্জন করে সৎপথ অবলম্বন করবে। কোনো গুনাহের কাজের পর বান্দা যদি আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্যে ফিরে না আসে এবং নিজের জীবনের অবস্থার সংশোধন না করে তবে তা কখনো 'তাওবা' হবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতাবশত যদি মন্দ কাজ করে তারপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে (নিজের অবস্থার) তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল আন'আম, ০৫ ঃ ৫৪)

উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে, তাওবা ও ইসতিগফারের সুফল পেতে হলে নিজের অবস্থার সংশোধন করতে হবে, তবেই আল্লাহ তাওবাকারীকে এবং মাফ প্রার্থনাকারীকে মাফ করে দিবেন। তাওবার পর তাওবাকারীকে সৎপথ গ্রহণ করতে হবে, এবং আমলে সালেহ অবলম্বন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا.

"(দ্বিগুণ শাস্তি এবং হীন অবস্থায়) তারা নয় যারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।" (সূরা আল ফুরকান, ২৫ ঃ ৭০-৭১)

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ তাওবাকারী ও ইসতিগফারকারীদের জন্য তাঁর ক্ষমা, দয়া এবং জান্নাতের ব্যবস্থা রেখেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.

"(তাওবা নাসূহার বিনিময়ে) আশা করা যায়, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দকর্মগুলো মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।" (সূরা আত তাহরীম, ৬৬ ঃ ০৮)

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

"হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো এবং গুনাহ মাফ চাও। আমি প্রতিদিন একশ বার তাওবা করি।" (মুসলিম শরীফ)

তাওবা করলেই কী শাস্তি রহিত হবে

তাওবাকারী যদি বিশুদ্ধভাবে খালেছ নিয়তে তাওবা করে তাহলে তা কবুল হবে। আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত যে কোনো ভুলের জন্য তাওবা করে অনুতপ্ত হলে, নিজের ভুলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বা জানার পর আর না করলে, আল্লাহর কাছে তাওবা কবুলিয়াতের শর্ত পরিপূর্ণ করে তাওবা করলে আল্লাহ কবুল করবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ.

"তিনিই (আল্লাহ) বান্দার তাওবা কবুল করেন ও পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা করো তিনি তা জানেন।" (সূরা আশ শূরা, ৪২ ঃ ২৫)

কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের তাওবা কবুল ও শাস্তি রহিত করবেন না, যারা–

০১. অন্যের সম্পদ বা হক হরণ করেছে (যাকাত কুরআন বর্ণিত আটটি খাতের জন্য নির্ধারিত হক, ভ্যাট ও ইনকাম ট্যাক্স দেশের সমগ্র জনগণের স্বার্থে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় হওয়ার কথা। সুতরাং এটি সবার হক। অন্যদিকে কোনো ব্যক্তির অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করা, ইয়াতিমের সম্পদ লুণ্ঠন করা, দুর্নীতি ও কাজ বা ফাইল ঠেকিয়ে বাধ্য করে ঘুষ আদায় করা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।)

০২. কাউকে হত্যা করা, জখম করা।

www.amarboi.org

০৩. কারো মান-সম্মানে আঘাত করা বা অন্যায়ভাবে কারোর প্রতি দোষারোপ করে মনে কষ্ট দেয়া।

০৪. মা-বাবার মনে কষ্ট দেয়া এবং

০৫. গীবত বা পরনিন্দার ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

যে সমস্ত বিষয়গুলো সরাসরি মানুষের হকের সাথে সম্পৃক্ত এবং কোনভাবেই তা আর পূরণীয় নয় এমন শাস্তি তাওবা করলে রহিত হওয়ার ব্যাপারে আলেম ও প্রকৃত জ্ঞানীদের মধ্যে ভিন্নমত আছে।

এছাড়াও যথাসময়ে তাওবা না করে মুমূর্ষ অবস্থায় অনুশোচনা করলে বা মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করলে তা কবুল নাও হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ج أُولٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا.

"তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা আজীবন মন্দ কাজ করে এবং তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, আমি এখন তাওবা করছি। তাওবা তাদের জন্যও নয়, যারা মারা যায় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা, যাদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।" (সূরা আন নিসা, ০৪ ঃ ১৮)

আল কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত ও অনুধাবন

ইসলাম মানব জাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের একমাত্র মূল গ্রন্থ হলো আল কুরআনুল কারীম। এটি হলো মুসলিম জাতির সংবিধান, সকল সমস্যার সমাধান সম্বলিত পরিক্ষিত গ্রন্থ। যে গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

"সেই কিতাব; এতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটা পথ-নির্দেশক।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ০২)

আর এ জন্যেই ইসলাম বিদ্বেষীরা আল কুরআনুল কারীমকে ছেড়ে মুসলিম জাতি গোষ্ঠীকে দুর্বল করার লক্ষ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে, তীক্ষ্ণ মেধা খাঁটিয়ে ইসলামকে করেছে বিভাজন ও খণ্ড-বিখণ্ড। তারা কখনো ইসলামের মানচিত্র ভিত্তিক বিভাজন করছে। যেমন ঃ এশীয় ইসলাম ও আফ্রিকা ইসলাম ইত্যাদি। কখনো বিভক্ত করে কালের ভিত্তিতে। যেমন ঃ নববী ইসলাম, খেলাফতে রাশেদার ইসলাম, আব্বাসী ইসলাম, উসমানী ইসলাম ও আধুনিক ইসলাম ইত্যাদি। কখনো তারা ইসলামকে খণ্ডিত করে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। যেমন ঃ আরবি ইসলাম, ভারতীয় ইসলাম ও মালয়েশীয় ইসলাম ইত্যাদি। কখনো টুকরো টুকরো করা হয় ফেরকার নামে। যেমন ঃ সুন্নী ইসলাম ও শিয়া ইসলাম। আবার

www.amarboi.org

সুন্নী ইসলামকে কয়েকভাবে এবং শিয়া ইসলামকে কয়েকভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করা হয়ে থাকে। কখনো রাজনৈতিক ইসলাম, রূহানি ইসলাম, সূফিবাদ ইসলাম ও মডারেট ইসলাম ইত্যাদি উপাদান প্রয়োগে বিন্যস্ত করে থাকে।

জানি না, ভবিষ্যতে ইসলামকে আর কী কী প্রকার– প্রকরণের ভিত্তিতে খণ্ডিত ও বিভক্ত করবে। তবে সত্য কথা হলো, বিশ্বে মুসলিমদের দৃষ্টিতে ইসলাম একটাই। এক ইসলাম ব্যতিরেকে আর কোনো ইসলাম নেই। এই এক ইসলামই সেই ইসলাম যা আজ থেকে ১৪০০ শত বছর পূর্বে আমাদের প্রিয় নবী রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটিই কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক ইসলাম।

এই এক ইসলামকেই বুঝেছেন এবং জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ও তাবেয়ীগণ। এটাই সঠিক ইসলাম, বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল ইসলাম। জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার মিশ্রণ থেকে এই ইসলাম সম্পূর্ণ মুক্ত। দার্শনিকদের মত ও মতবাদ থেকে ইসলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন। অজ্ঞ ও বিভ্রান্তদের সূত্র ও সংজ্ঞা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। বিদ্‌য়াত ও অনাচারের ঊর্ধ্বে সর্বপ্রকার জটিলতা ও জঞ্জাল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্য মুসলিম জাতির! আর এ দুর্ভাগ্য যে মুসলিম জাতিরই সৃষ্টি সেটি হলো তারা আজ তাদের মূল গ্রন্থ, মূল জীবন বিধান, সংবিধান আল কুরআনুল কারীম রীতিমত না পড়ার কারণে, না বুঝার কারণে, মানতে পারছে না, আর না মানতে পারার কারণে তারা বিপদগামী হচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে আল্লাহর রহমত, বরকত থেকে সবশেষে পতিত হচ্ছে লা'নতে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ إِلاَّ خَسَارًا.

"আর আমি নাযিল করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য শিফা– আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিম–সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৮২)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

"হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার শিফা প্রতিকার ও আরোগ্য লাভ এবং মুমিনের জন্য পথ নির্দেশ ও রহমত–দয়া।" (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫৭)

www.amarboi.org

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ.

"বলুন, মুমিনের জন্য কুরআন পথ-নির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার।" (সূরা হা-মীম আস সিজদাহ, ৪১ ঃ ৪৪)

এ প্রসঙ্গে হাদিসে রয়েছে ঃ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخِرِيْنَ.

হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা এই কুরআনের কারণে অনেক লোককে উচ্চমর্যাদা দান করেন। আবার অনেককে অপদস্থও করেন।"

এই পবিত্র মহাগ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব হলো, বিশ্বের এমন কোনো মৌলিক সমস্যা নেই যার সঠিক, বাস্তবসম্মত এবং শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কিত মূলনীতি এতে বর্ণিত হয়নি। কুরআন সর্বযুগের সকল মানবের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা আন্তঃদেশীয় ও আন্তর্জাতিক সমুদয় বিষয়ের সুস্পষ্ট ধারণা কুরআনে যেমন রয়েছে, অন্য কোনো গ্রন্থে তা নেই। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা ঃ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ.

"নিশ্চয়ই আমি এই মহাগ্রন্থ আল-কুরাআনে মানব জাতির কল্যাণের জন্য সকল বিষয় বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছি।" (সূরা আল কাহ্ফ, ১৮ ঃ ৫৪)

কাজেই বলব, মুসলিমরা আজ কুরআন অধ্যয়ন না করে দূরীভূত হয়ে গেছে আল্লাহর সুহবত থেকে। আজকাল কুরআনকে আমাদের বাসা বাড়িতে শুধু মাহে রামাদ্বানে খতম করার নামে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে থাকে, (মাহে রামাদ্বানে কুরআন পড়া ভাল, সাওয়াবও বেশি আর তাইতো মানুষ পড়েও বেশি) আর খতম দেয় কেউ মারা গেলে তার মাগফিরাতের জন্যে। অন্যথায় সারা বছর রেখে দেয়, ময়লা পড়তে থাকে। অনেকে আবার পরিত্যক্ত শাড়ীর বা পর্দার ছেড়া অংশ দিয়ে গিলাফের মতো করে ঢেকেও রাখে। যদিও টেলিভিশনকে কারুকাজ সম্বলিত সুন্দর দামী নতুন কাপড় দিয়ে ঢেকে থাকে। যাক সেসব কথা। আসলে কুরআনের প্রতি বুঝে, না বুঝে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, শয়তানের প্ররোচনায় যে অবহেলা প্রদর্শন করা হয়, তা লিখে শেষ করা যাবে না। তবে বলব যে কোনো সমস্যার সমাধান কুরআনের কাছ থেকে না নেয়ার কারণে আমরা আজ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছি। মার খাচ্ছি, দেশে দেশে আজ অশান্তির আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। তাছাড়া আমাদের সাথে আল্লাহর সম্পর্কও

www.amarboi.org

কমে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ إِلاَّ خَسَارًا.

"আর আমি কুরআনের মধ্যে এমন সব বস্তু নাযিল করেছি যা বিশ্ববাসীর জন্য রোগমুক্তি ও রহমতস্বরূপ, পক্ষান্তরে অত্যাচারীদের জন্য এটা একমাত্র ক্ষতিই বৃদ্ধি করে থাকে।" (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৮২)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.

"এক কল্যাণময় কিতাব (কুরআন) এ আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।" (সূরা আস ছোয়াদ, ৩৮ ঃ ২৯)

পবিত্র কুরআনে আরও ঘোষিত হয়েছে ঃ

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ج وَمَا يُضِلُّ بِهٖ إِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ.

"আল্লাহ তা'আলা অনেককেই এই গ্রন্থ দ্বারা পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককেই এর বদৌলতে সৎপথে পরিচালিত করেন।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২৬)

উপরিউক্ত আয়াতগুলো থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয়, কুরআন রীতিমত পড়ার বদৌলতেই এ জাতি হতে পারে সচ্চরিত্রবান আর তাদের দ্বারা গঠিত সমাজই হতে পারে আদর্শের আলোতে ম্রিয়মান।

আজ সমগ্র পৃথিবীতে মুসলিমদের সাথে চলছে আদর্শের দ্বন্দ্ব আর এটা বুঝতে পেরেই আমাদের মাঝে নানা বিভাজন সৃষ্টি করে লাগিয়ে দিতে চাচ্ছে ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ এবং সবশেষে ইসলামকে মূল্যায়ন করছে বিভিন্নভাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে অপ্রিয় হলেও সত্য তারা আজ সফল। এ সকল বিভাজনে মুসলিমরা ব্যস্ত থাকার কারণে তারা আজ কুরআন থেকে দূরে অনেক দূরে। কুরআন তিলাওয়াত করার সময় তারা পাচ্ছে না। ফলে তাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গিয়েছে। আর এ মরিচা দূর করে আদর্শ ও সচ্চরিত্রবান মুসলিম হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে হাদিসে পাকে এসেছে ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبُ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جَلاَئُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلاَوَةِ الْقُرْاٰنِ.

ইবন্ উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ

www.amarboi.org

"(মানুষের) এ সব অন্তরে মরিচা ধরে থাকে, যেমন লোহায় পানি লাগলে এতে মরচে ধরে যায়। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এ অন্তর পরিষ্কারের উপায় কি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ বেশি করে মৃত্যুর স্মরণ এবং কুরআন তিলাওয়াত।" (বায়হাকী শরীফ)

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত নিঃসন্দেহে উত্তম ইবাদত, এ ইবাদত থেকে গাফিল থাকা কিংবা বঞ্চিত হওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয়। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الَّذِيْنَ لَيْسَ فِيْ جَوْفِهِ شَيْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرَابِ.

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ "যার অন্তরে কুরআনের কোনো অংশই নেই, সে হচ্ছে পতিত ঘরের মতো।" (তিরমিযী শরীফ)

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত সত্যিকার অর্থে ঈর্ষার বিষয়। যদিও কোনো কোনো বিষয়ে ঈর্ষা করা নিষেধ। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاحَسَدَ اِلاَّ فِي الاِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْلُ بِهٖ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ.

হযরত ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "দুটি বিষয় ব্যতীত কোনো ঈর্ষা নেই।

০১. কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কুরআন তিলাওয়াতের সৌভাগ্য দান করেছেন। আর তিনি দিবা-রাত্রি কুরআন অনুসারে চলেন।
০২. কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে লোকটি দিবা-রাত্রি তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে অর্থাৎ দান করে। (এ দু'ব্যক্তির বিষয়ে ঈর্ষা করা যায়)।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

কুরআন তিলাওয়াতে মুসলিম জাতি যেমন দুনিয়াতে পাবে সম্মান ও মর্যাদা তেমনি আখিরাতে পাবে জান্নাত। রাসূল (সা.) বলেন ঃ

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ حَرْفًا فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.

"যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর তিলাওয়াত করবে, সে ব্যক্তি দশ নেকী পাবে।" যেমন ঃ আলিফ-লাম-মীম তিনটি অক্ষর, যে ব্যক্তি এই তিনটি হরফ তিলাওয়াত করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ১০+১০+১০=৩০ নেকী প্রদান করবেন। অপর এক হাদিসে আছে ঃ

www.amarboi.org

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ اَجْرَانِ.

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "ইলমে কুরআন পারদর্শী ব্যক্তি ঐসব ফিরিশতার শ্রেণীভুক্ত, যাঁরা পুণ্যবান এবং আল্লাহর হুকুমে লেখার কাজে লিপ্ত। আর যে ব্যক্তি কষ্ট স্বীকার করে ঠেকে ঠেকে কুরআন তিলাওয়াত করে, সেও দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে।

বস্তুত কুরআন পঠন-পাঠনে বিশেষ মনোযোগী হওয়া অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা, কুরআনে কারীমের মাধ্যমেই মানব জাতি মানযিলে মাকসুদে পৌঁছার পথ সুগম করতে পারে।

আমলে সালেহ্ বা সৎ কর্ম

সচ্চরিত্রবান মানুষের পূর্ব শর্ত হলো ঈমান আনয়ন ও আমলে সালেহ বা সৎ কর্ম করা। সৎ কর্ম সুন্দর কল্যাণকামী তাই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। এটি আল্লাহর হুকুম। আর এ পালনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে যেমন সম্মান প্রাপ্তির ব্যবস্থা করবেন, তেমনি আখিরাতেও দিবেন চিরসুখের স্থান জান্নাত। ফলে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে চাহিদা পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে সৎ, হক ও হালাল কর্মের মাধ্যমে উপার্জন এবং মানবতার হক পরিপূর্ণকরণে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো সকল সচ্চরিত্রবান মুসলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

অন্যদিকে, অসৎ কর্ম মানুষকে অমানুষে পরিণত করে। মানব অন্তরে কালিমা লেপন করে, হৃদয়-মনকে নির্দয়, কঠোর ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে দেয়। ফলে আল্লাহর আদেশ না মানা বা কিছু মানে কিছু মানে না এমন চরিত্রের মানুষগুলো কখনোই আল্লাহর কাছে প্রিয় হতে পারে না। অধিকন্তু তাদের সৎ চিন্তা ও সৎকর্মের মনমানসিকতা তথা নফসে মুতমাইন্নাকে নফসে আম্মারা ও নফসে লাউওয়ামা গ্রাস করে দেয়ার চেষ্টায় ব্যাকুল হয়ে উঠে। সুতরাং ইসলাম কর্তৃক নিষিদ্ধ বা লা'নতপূর্ণ কর্ম ও ব্যবস্থা ছাড়া অন্য যে কোনো পেশায় মানুষ তাদের যোগ্যতা দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত (ঘুষ, কথিত মামা, খালু ছাড়া) হলে সেই পেশাই হবে সম্মানজনক এবং অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে উপার্জন করলে তা হবে সৎ উপার্জন।

এদিকে যারা নেশা করে আলগা বা অতিরিক্ত পাওয়ার বা খাওয়ার চেষ্টায় বিভোর তাদের সবকিছু হারাম হয়ে যায়। এ হারাম অর্থে যারা আচ্ছন্ন তাদের দ্বারাই দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের অকল্যাণ হয়ে থাকে। আর এ অবস্থায় ব্যক্তি হয়ে উঠে মানবতা বিরোধী ও দুর্নীতিবান এবং তাদের চিন্তা-চেতনা হয়ে উঠে পশুর মতো। এ অভিশাপ পূর্ণ অবস্থা থেকে দূরে থাকার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্ কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

www.amarboi.org

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ.

"কেউ সৎ কাজ করলে সে তার কল্যাণের জন্য তা করে, আর কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করে, অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আল জাসিয়া, ৪৫ ঃ ১৫)

মানবীয় কয়েকটি সৎগুণ মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। তন্মধ্যে সৎকর্মও রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ. إِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

"মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।" (সূরা আল আসর, ১০৩ ঃ ১-৩)

মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তাঁর অসীম দয়ায় বান্দার পাপ কাজকে পুণ্যের দ্বারা দূরীভূত করেন। ইরশাদ হলো ঃ

اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ.

"সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটিয়ে দেয়।" (সূরা হূদ, ১১ ঃ ১১৪)

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ.

"তোমরা ভাল যা কর তা আল্লাহ্ ভাল করে জানেন।" (সূরা আল বাকারা, ০২ ঃ ২৭৩)

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা অতি সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছেন। বুদ্ধি-বিবেক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা বিভূষিত করে সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। কিন্তু কর্মদোষে মানুষ অবনতির ও যিল্লতির নিম্ন স্তরে পৌছে। তবে যারা সৎ কর্মশীল তারা নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ.

"কিন্তু (অধঃপতনের নিম্ন স্তরে) তারা নয় যারা মুমিন ও সৎ কর্মপরায়ণ, এদের জন্য আছে বিশেষ পুরস্কার।" (সূরা আত ত্বীন, ৯৫ ঃ ০৬)

যারা সৎ কর্মশীল তাদেরকে মহান আল্লাহ্ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হলো ঃ

www.amarboi.org

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ.

"যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে তাঁরাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।" (সূরা বায়্যিনা, ৯৮ ঃ ০৭)

সৎ কর্মের সুফল সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

"মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎ কর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক জীবন দান করবো এবং তাঁদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।" (সূরা আন নাহল, ১৬ ঃ ৯৭)

وَمَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰى. جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ج وَذٰلِكَ جَزَاؤُ مَنْ تَزَكّٰى.

"আর যারা মুমিন অবস্থায় সৎ কর্ম করে তাঁর কাছে উপস্থিত হবে, তাদের জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা, স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং এ পুরস্কার তাদেরই যারা পবিত্র।" (সূরা তোহা, ২০ ঃ ৭৫-৭৬)

আত্মসমালোচনা

ব্যক্তি নিজে নিজের সমালোচনা করাই আত্মসমালোচনা। আত্মসমালোচনাকে আত্মপর্যালোচনা, আত্মদর্শন, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং গভীর মনোযোগসহকারে নিজের কৃতকর্ম পর্যবেক্ষণ করা ও আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়াকেও বুঝনো যায়। মূলত নিজের মনকে দুনিয়াবী চাকচিক্যময়তা, কলুষতা ও পংকিলতা থেকে মুক্ত করে আল্লাহমুখী করার লক্ষ্যেই এটি একটি বাস্তবিক ও পরীক্ষিত মেথড বা পদ্ধতি। আজকে ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলিমরা নফসে আম্মারা ও লাউওয়ামাকে দমিয়ে রেখে নফসে মুতমাইন্নাকে জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত করে তোলার লক্ষ্যে অনেক মেথড আবিষ্কারকদের কাছে যায়। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! সেই মেথড অনুসারে কয়েকদিন চলে যাওয়ার পর আবার সেই পূর্বের ন্যায় হতে থাকে। অথচ ইসলামপন্থীদের এ ধরনের কোনো মেথড অনুসরণ করতে যাওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ, ইসলামের মেথড বা পদ্ধতিতো শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। মনে রাখতে হবে ইসলামে দাখিল হওয়া ছাড়া নাই

www.amarboi.org

কোনো গতি। আর এ জন্যে ঐ সকল মেথডেও আজকাল ইসলামের অসম্পূর্ণ কিছু কথা সংযোজন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া একাকী বসে রাতের একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন নিজেরাতো নিজেদের প্রতিটি আমল ও কাজকর্ম পর্যালোচনা করতে পারি– যা আত্মসমালোচনার অন্তর্ভুক্ত। মানুষ যেখানে, যখন, যেভাবে যা করে তা অন্ততপক্ষে সে এবং আল্লাহ্ জানেন। যদিও মানুষ অনেক ক্ষেত্রে মনে করে কেউ তো দেখছে না।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَاكُنْتُمْ.

"তোমরা যেখানেই থাকো আল্লাহ্ তোমাদের সাথে থাকেন।" (সূরা আল হাদীদ, ৫৭ ঃ ৪)

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ.

"আল্লাহর নিকট আসমান ও জমিনে কোনো কিছুই গোপন থাকে না।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩ ঃ ০৫)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ.

"আল্লাহ চোখের বিশ্বাসঘাতকতা (অর্থাৎ অবৈধ দৃষ্টি) ও মনের গোপন কথা জানেন।" (সূরা আল মুমিন, ৪০ ঃ ১৯)

রাসূল (সা.) বলেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ.

"তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে না দেখ, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে ধারণা রাখবে।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اِيْمَانِ الْمَرْءِ اَنْ يَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ.

"মানুষের ঈমানের একটি উত্তম স্তর হচ্ছে এই যে, সে এ কথা বিশ্বাস করবে যে, সে যেখানেই থাকুক আল্লাহ তার সাথে রয়েছেন।" (বায়হাকী শরীফ)

উল্লিখিত আল কুরআনুল কারীমের আয়াত ও হাদিসের দ্বারা এ কথা বুঝা

www.amarboi.org

যায়, মানুষ লোক চক্ষুর অন্তরালে বা যেখানে যা কিছু করুক না কেন আল্লাহ্ তা দেখছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, আছেন সর্বত্র। কাজেই আল্লাহ তা'আলার কাছে হিসাব দেয়ার পূর্বে নিজে নিজের হিসাব করে পূর্ব প্রস্তুতি নেয়ার এ হচ্ছে এক সর্বোত্তম মেথড বা পদ্ধতি।

রাসূল (সা.) বলেন ঃ

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

"বুদ্ধিমান সে ব্যক্তিই যে তার নফসের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে।" (তিরমিযী শরীফ)

সচ্চরিত্রবান হওয়ার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব ও করণীয়

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর চরিত্রকে পবিত্র ও কলুষমুক্ত করার লক্ষ্যে আত্ম সমালোচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মানুষ ভুল করবে নিজে নিজে লজ্জিত হবে। আল্লাহ্র দরবারে তাওবা করে ক্ষমা চাইবে- আল্লাহ্ ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত। তাছাড়া সচ্চরিত্রবান হওয়ার লক্ষ্যে আত্মসমালোচনা করে সংশোধন হওয়া প্রত্যেকের জীবনে আজ অত্যাবশকীয়।

এবার কীভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে বলছি ঃ

০১. আত্মসমালোচনার জন্যে দিনের ২৪ ঘণ্টা সময়ের কোনো একটি সময় বিশেষ করে রাতে এশার নামায আদায়ের পর ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে ঐ দিনের সব কাজের হিসাব নিকাশ করে শুকরিয়া ও ক্ষমা চেয়ে নেয়া অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করা উত্তম।

০২. সম্পূর্ণ একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে হাযির-নাযির উপলব্ধি করে তিনি গাফুর ও রাহীম এ বিশ্বাস মনে মনে জাগ্রত করে তিনি জাব্বার, তিনি কাহ্হার ভয়ানক শাস্তিদাতা এ ভীতি তীব্রভাবে মনে করে সাহায্য চাইতে হবে।

০৩. আল্লাহর দেয়া দু'চোখে দৃশ্যমান অসংখ্য নেয়ামতের কথা চিন্তা করে শোকর আদায় করে নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য চোখের পানি ফেলে ক্ষমা চাইতে হবে।

০৪. অতীত জীবনের সকল হিসাব নিকাশগুলোকে মাথায় এনে ক্ষমা ও সাহায্য চাইতে হবে।

০৫. অসচ্চরিত্রের সকল দোষগুলোর কথা মনে রেখে তার কোন্‌টির সাথে বিন্দুমাত্র রেশ থাকলে তা থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া।

০৬. এমন কোনো কাজ সংঘটিত হয়ে গিয়েছে কিনা যাতে আল্লাহ্ অসন্তোষ ও

www.amarboi.org

দোযখের আশঙ্কা রয়েছে। আপনার নিয়ত কি কখনো কোনো কাজে খারাপ হয়েছিল? কখনও কি আপনার দৃষ্টি আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল? আপনি কি কোনো মিথ্যা কথা বলে ফেলেছেন? কোনো ওয়াদা খেলাফ করেছেন? কারো মনে কোনভাবে কষ্ট দিয়েছেন? কারো অসাক্ষাতে নিন্দা করেছেন? কোনো সাহায্য প্রার্থীকে বিমুখ করেছেন? নামাযে কি পূর্ণ মনোযোগ ছিলো? নামাযের জামায়াত সম্পর্কে কি উদাসীন ছিলেন? - এ জাতীয় যে কোনো গুনাহ্ হয়ে থাকুক তার জন্য বিনয় সহকারে তাওবা করে ভবিষ্যতে এসব গুনাহ থেকে বাঁচার জন্যে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করলে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

০৭. সচ্চরিত্রের সৎ গুণগুলো আপনার দ্বারা কতটুকু আজ পালিত হলো বা লঙ্ঘিত হলো তার জন্য চোখের পানি ফেলে কেঁদে কেঁদে তাওবা করে তা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে আল্লাহ্ তা থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করে আদর্শ সচ্চরিত্রবান মানুষ হিসেবে কবুল করবেন।

মুজাহাদা (প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করা)

নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে আল্লাহর এ জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে অর্থ, শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করার নাম মুজাহাদা। এই মুজাহাদার মাধ্যমেই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য আল্লাহর সন্তোষ ও নৈকট্য লাভ করা সম্ভব হবে।

এ মুজাহাদা হলো ঃ

এক. নফসে আম্মারা ও লাউওয়ামার বিরুদ্ধে।

দুই. শয়তানরূপী প্রকাশ্য ঘোষিত মহাশত্রুর সাথে। এ জিহাদ অত্যন্ত কঠোর।

তিন. ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুদের সাথে। এ জিহাদ ও বিভিন্ন রকমের কথা দ্বারা, বুদ্ধি ও মেধা দ্বারা, বক্তৃতা ও কলমের আদর্শ লেখা দ্বারা ইসলামের শত্রুদের ঘায়েল করা।

এ জিহাদের চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে সামগ্রিক জিহাদ।

অন্যদিকে, নফসের বিরুদ্ধে সকল ব্যক্তিকেই জিহাদ ও সংগ্রাম মৃত্যু পর্যন্ত করতে হবে। 'মুজাহাদা' বা কঠোর চেষ্টা সাধনা কোনো সময়ের জন্যই বান্দার জিম্মা থেকে বাদ দেয়া যাবে না। আমল, চেষ্টা, তদবীর ছেড়ে দিলে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য। এ মর্মেই পবিত্র কুরআনে সূরা আল আসর-এ ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ.

www.amarboi.org

"নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই ধ্বংসের মধ্যে আছে। কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে।" (সূরা আল আসর, ১০৩ ঃ ২-৩)

এ আয়াতদ্বয়ে ঈমান ও সৎকর্মকে ধ্বংস থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ঈমানের পর কঠোর সাধনা করে সৎকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে। নফসে আম্মারা (কুপ্রবৃত্তি) এবং শয়তান সর্বদাই তাকে বদকাজে এবং জীবন ধ্বংসী কাজে উৎসাহ যোগাতে থাকে। ফলে সে তাতে নিপতিত হয়ে নিজেকে ধ্বংস করবে। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে মুজাহাদার জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"আর যারা আমার জন্য চেষ্টা সাধনা করবে তাদেরকে অবশ্যই আমি আমার পথ দেখাব, আর আল্লাহ নিশ্চিতই সৎকর্মশীল লোকদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা আল আনকাবূত, ২৯ ঃ ৬৯)

এ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, যারা আমার জন্য অর্থাৎ আমাকে পাওয়ার জন্য, আমার নৈকট্য লাভের নিমিত্ত, আমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় মুজাহাদা করবে, অবশ্যই আমি তাদেরকে আমাকে পাওয়ার পথ দেখাব। আল্লাহ যাদেরকে পথ দেখাবেন, তারা নিশ্চিত সফলকাম। এ কারণেই উলামায়ে কিরাম মুজাহাদাকে আত্মশুদ্ধির উপায় বলেছেন। রাসূল (সা.) মুজাহাদা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِذَا اَتَانِيْ يَمْشِيْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "মহান আল্লাহ বলেছেন বান্দাহ যখন আধ হাত আমার দিকে এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার কাছে হেঁটে আসে, আমি তার কাছে দৌড়িয়ে যাই।" (বুখারী শরীফ)

www.amarboi.org

গ্রন্থপঞ্জি

০১। আল কুরআনুল কারীম ❑ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।
০২। আল কুরআনের পরশ মনি ❑ খান বাহাদুর মুহাম্মাদ ইউছুফ খাঁন।
০৩। কুরআনের জ্যোতি ❑ সৈয়দ বদরুদ্দোজা।
০৪। আল কুরআন পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ❑ মোহাম্মদ রজব আলী।
০৫। ইসলাম পরিচয় ❑ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
০৬। ফী যিলালিল কুরআন ❑ আল কুরআন একাডেমী লণ্ডন।
০৭। রিয়াদুস সালেহীন ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড ও ৪র্থ খণ্ড ❑ বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার।
০৮। মুসলিম পরিচয় ❑ ইমাম গাযালী (রহ.)
০৯। অনুপম মুসলিম চরিত্র গঠন ❑ ইমাম গাযালী (রহ.)
১০। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম ❑ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।
১১। আহকামে যিন্দেগী ❑ মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দিন।
১২। ইসলামে খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন ❑ মাওলানা নোমান আহমদ।
১৩। ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন ❑ এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম।
১৪। শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ❑ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম।
১৫। অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম ❑ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম।
১৬। মুমিনের জীবন যাপন পদ্ধতি ❑ ডা. মাহমুদ
১৭। মৃত্যু যবনিকার ওপারে ❑ আব্বাস আলী খাঁন।
১৮। চরিত্র গঠন ❑ আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী।
১৯। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ❑ আফজাল হোসাইন।
২০। নামাজের দার্শনিক তাৎপর্য ❑ হাফিজ মাওলানা মুহাম্মাদ এহতেশামুল হক।
২১। মকছুদুল মুত্তাকীন বা মোমেনের সম্বল ❑ অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক।
২২। মসজিদে নববী (সা.)-এর কার্যক্রম ও ইমামদের ভূমিকা ❑ হাফিজ শহীদুল ইসলাম।
২৩। ছোটদের প্রিয়নবী (সা.) ❑ শাববীর আহমদ শিবলী।
২৪। দাওয়াতে তাবলীগ কি ও কেন ❑ মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম মুনশী
২৫। ইসলামে মসজিদের ভূমিকা ❑ এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম।
২৬। জিহবার হাকীকত ও হেফাযত বা শান্তির সহজ পথ ❑ আবু রাযীন মোঃ নুরুল আমীন আমীরী।
২৭। কুরআন ও হাদিসের আলোকে সফলতার পথ ❑ মাওলানা মুহাম্মাদ আশিক ইলাহী।
২৮। আত্ম সংশোধন ও সমাজ সংশোধনের কর্মপন্থা ❑ আল্লামা সাইয়েদ মুজতাবা মুসাভী লারী।
২৯। সুন্দর বলুন সুন্দর শিখুন ❑ আবদুস শহীদ নাসিম।
৩০। দেশ সমাজ রাজনীতি ❑ শাহ আবদুল হান্নান।
৩১। নির্বাচিত হাদিস সহস্র ❑ জামি'আ ইসলামিয়া লালমাটিয়া, মুহাম্মাদপুর।
৩২। এন্তেখাবে হাদিস ১ম ও ২য় খণ্ড ❑ আব্দুল গাফ্ফার হাসান নদভী।
৩৩। বিভ্রান্তির বেড়াজালে পর্দা ❑ আব্দুল হামিদ আল বেলালী
৩৪। ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপরেখা ❑ মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী।
৩৫। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় ❑ শতাব্দী প্রকাশনী।
৩৬। কুরআনের আলোকে মুমিনের জীবন ❑ শতাব্দী প্রকাশনী।
৩৭। ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান ❑ মো ঃ ওসমান গনি।

www.amarboi.org

আদর্শ জীবন
আদর্শ জাতি
ও
আদর্শ দেশ গঠনে

জাবেদ মুহাম্মাদ রচিত
সমসাময়িক কয়েকটি গ্রন্থ

- আদর্শ ছাত্র ও চরিত্র
- আদর্শ শিক্ষা ও নৈতিকতা
- সিয়াম
- জাতি গঠনে আদর্শ মা
- সচ্চরিত্র গঠনের রূপরেখা
- আল্লাহর হক মানুষের হক
- ইসলামে যাকাত
- ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত
- আদর্শ ছাত্র-ছাত্রী দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ
- ছাত্র-ছাত্রী কি শিখবে কেন শিখবে কিভাবে শিখবে
- পড়ালেখায় ভালো হওয়ার কৌশল
- পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের টেকনিক
- ভাল ছাত্র-ছাত্রী গঠন হওয়ার উপায়
- ছেলে-মেয়েদের আদর্শ জীবন গঠনে পিতা-মাতার কর্তব্য

Ahsan Publication
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

www.amarboi.org

আল কুরআনুল কারীম ও হাদিসের আলোকে

সচ্চরিত্র গঠনের রূপরেখা

আহসান পাবলিকেশন
Ahsan Publication
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

ISBN 984-32-2854-5
9 789843 228543